সূচিপত্র



ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া

দ্বিতীয় খন্ড

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক

সূচিপত্র

ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া

[দুই খণ্ডে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব (দাঃ বাঃ)

কর্তৃক

দারুল ইফতা-জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে প্রদত্ত মাসিক রাহমানী পয়গামে প্রকাশিত আকাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়াসমূহের সুবিন্যস্ত সংকলন।

ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশনা

রাহমানিয়া পাবলিকেশন্সের পক্ষে

মাকতাবাতুল আসরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২য় খন্ড

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

যাকাত
যাকাতের নিসাব ও শর্তাবলী
অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়
হজ্জের জন্য সংগৃহীত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব কি-না?
যাকাত কে? কাকে? কখন? দিবে?
যাকাত সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
সোনা, রুপা, নগদ অর্থে যাকাত
ব্যাংক সঞ্চয়কৃত টাকায় যাকাত
শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলে তার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি
যাকাতে ঋণ প্রসঙ্গ
দোকান/বাড়ি ভাড়ার জন্য এডভান্স টাকা যাকাত
স্বর্ণ-রৌপ্য মিশ্রিত নিসাব যাকাতের হুকুম
ব্যবসায় মাল ও ব্যবহারিক স্বর্ণ রৌপ্য যাকাত আদায়ের মূল্য নির্ণয় পদ্ধতি
টাকা ও স্বর্ণ রৌপ্য মিলে নিসাব হলে তার যাকাতের হুকুম
বছরের মাঝে বর্ধীত সম্পদের যাকাতের প্রদানের হুকুম
স্বর্ণ-রূপার অলংকারাদির উপর যাকাত আসবে কি না
পিতা ও স্বামী কর্তৃক মহিলাকে প্রদানকৃত অলংকারের যাকাতের হুকুম
চাকুরীজীবীদের বেতনের উপর যাকাত প্রযোজ্য কিনা?
ঋণ দেওয়া টাকার উপর যাকাত
পাওনা টাকার পাওয়ার সম্ভাবনায় যাকাত আদায়
প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর যাকাতের বিধান
বছরের মধ্যবর্তী সময়ে টাকা হাতে আসলে এর যাকাত

সূচিপত্র

গরীবদের উপকারের প্রতি লক্ষ রেখে নিসাব নির্ণয়
বন্ধকের বিনিময়ে ঋণ দেয়া টাকার উপর যাকাত
যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করে দেয়া
যাকাত আদায়ের খাতসমূহ
ঋণী ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া
নিজ ভাই ও বোনকে হাদিয়ার নামে যাকাত দেয়া
নিজ মেয়ের জামাইকে যাকাত দেওয়ার হুকুম
প্রতিবেশীকে না দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়ার হুকুম
যাকাতের টাকা দিয়ে গরীব ব্যক্তিকে বিদেশ পাঠানোর হুকুম
পাওনাদারের মহিলাকে যাকাত দেয়ার বিধান
যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না
অমুসলিমকে যাকাত দেয়া
রাজনৈতিক দলকে যাকাত দেয়া
মসজিদ মাদরাসার কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা
যাকাতের মাল জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার হুকুম
সরকারী ফাণ্ডে যাকাত দেওয়ার হুকুম
যাকাতের টাকা দিয়ে জমি বন্দক ও ভোগের জন্য গরীবকে দেয়া
যাকাতের বিবিধ মাসাইল
যাকাত আদায়ের হুকুম
যাকাত তরককারীর পরিণতি
সঠিক হিসাব না করে যাকাত দেওয়ার হুকুম
যাকাতের নির্ধারিত টাকা থেকে অতিরিক্ত টাকা দেয়ার হুকুম
বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বা পরে যাকাত আদায় করার হুকুম
নিকটবর্তী আত্মীয়দের বাদ দিয়ে দূরবর্তী লোকদের যাকাত দেয়ার হুকুম

সদকা ও যাকাতের বেশী হকদার কারা?
সাদকাতুল ফিতর
নিজ কাজের লোককে ফিতরা দেয়া যাবে কিনা
ঈদের আগে বা পরে ফিতরার হুকুম কি? ইসলামী সংগঠনকে ফিতরা দেয়া
ঈদের পরে ফিতরা দিলেও ওয়াজিব হিসেবেই আদায় হবে, নফল হবে না
পিতার জন্য সন্তানাদির ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব কিনা?
ধান চাল দিয়ে ফিতরা আদায় করা সুরত
উশর/ট্যাক্স
বাংলাদেশের জমিন উশরী না খারাজী? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা
ঘুষ দিয়ে ট্যাক্স কমানো
বিবাহ
বিবাহ বৈধ হওয়ার শতাবলী
পত্র বা টেলিফোনে বিবাহ সহীহ কি?
বিয়েতে কাবিন রেজিষ্ট্রী করার হুকুম
বিবাহ সহীহ হওয়ার পদ্ধতি
দ্বিতীয় বিবাহের বিধান
বিবাহ সহীহ হওয়ার বিধান
আলহামদুলিল্লাহ দ্বাড়া বিবাহ সম্পন্ন
বৃদ্ধ পিতার বিবাহের বিধান
বিবাহ অভিভাবকত্ব, কুফু ইত্যাদি
বালেগ ছেলে-মেয়েকে বিবাহ করানো
পাত্রীর গুনাবলী কেমন হওয়া চাই
একাকী বিবাহ করার হুকুম
পালক সন্তানের বিয়েতে পালক পিতার নাম উল্লেখ করা

রেজেষ্ট্রী ব্যতীত দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ
যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ/বৈধ নয়
কোন মহিলার সাথে ব্যভিচারের পর তার মেয়েকে বিবাহ করা
কামভাবের সাথে দৃষ্টিপাত করলে হুরমতে মুসাহারাত
নাবালিগা মেয়ের সঙ্গে অবৈধ কর্ম ও উক্ত মেয়ের সঙ্গে বিবাহ
ফুফাত ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা
কাদিয়ানিদের সাথে বিবাহ-শাদী
আহলে হাদিসদের সাথে বিবাহ
সৎ নাতিনীকে বিয়ে করা
মাতার ফুফাত বোনের নাতনীকে বিয়ে করা জায়েয
বিবাহের উপকারীতা ও তার শর'ঈ বিধান
দূর সম্পকের ভাইয়ের ভাগিনীকে বিবাহ করা
অপরিচিত মহিলাকে মা বোন সম্বোধন করার পর বিবাহ করা
আপন ভাতিজীর মেয়ে (নাতনী) কে বিবাহ করা
পিতার আপন মামাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ করা
মামার শালীকে বিবাহ করা
স্ত্রীর বর্তমানে তার সৎ বোনেরে সঙ্গে বিবাহ
গায়েরে হাফেযের জন্য হাফেযাকে বিবাহ করা
অবৈধ যৌন মিলনের দ্বারা গর্ভধারণ ও পরবর্তীতে বিবাহ
মামাত, ফুফাত, চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা
মুসলিম মেয়ের সাথে অমুসলিম ছেলের বিবাহ
হিন্দু মেয়ের ইসলাম গ্রহণের পর তার সাথে
খৃষ্টান মেয়ের সাথে মুসলিম ছেলের বিবাহ
জ্বিন বা পরীর সাথে বিবাহ

সূচিপত্র

আপন চাচার চাচাত শ্বশুরের মেয়ের সাথে বিবাহ
১৪ প্রকার মহিলা ছাড়া আরও যাদেরকে বিবাহ করা হারাম
কোন ছেলের সাথে অপকর্ম করে নিজের মেয়েকে বিবাহ দেয়া
বিবাহের সময় ঈমান তাহকীক করা
অল্প বয়সী ছেলের সাথে বিবাহ
ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা
পিতার খালাতো বোনের সাথে বিবাহ
ইসলাম ধর্ম গ্রহণে ওয়াদায় হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করা
তালাক প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহ করা
সৎ বোন ও তার ভাগনীর নাতনীকে বিবাহ করে
বড় বোনের সঙ্গে অপকর্ম করে ছোট বোনের সঙ্গে বিবাহ
দুধ ভাই-বোনের ভাই-বোন বিবাহ করা
সৎ মাকে বিবাহ করা
মহর
স্ত্রীর কাছে মহর মাফ চওয়া
প্রতিবছর বিবাহের দিন স্ত্রীকে উপহার দেয়া
যৌতুক
বিবাহের মহর
সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মহর
৫ হাজার টাকার পরিবর্তে জমি দ্বারা পরিশোধ
সামর্থের অধিক মহরানা ধার্য্য করা
বহু পূর্বে নির্ধারিত মোহর আদায়
মহর আদায় করার সামর্থ না থাকিলে
স্ত্রী মারা গেলে মহরের টাকা কে পাবে

সূচিপত্র

মহরের টাকা আদায় না করা
আমাদের দেশে প্রচলিত ধার্যকৃত মহর আদায়ের বিশুদ্ধতম পন্থা
মহরে ফাতেমীর পরিমাণ
মহরের নিম্ন পরিমান
তালাকের পর স্ত্রী প্রাপ্য
মহর দেয়ার উদ্দেশ্য
বিবাহের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কু-প্রথা
কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে খাওয়ানো
বর-কনের হাতে দাড়িতে মেহেদী লাগানো
বিবাহ অনুষ্ঠানে বাজনার আয়োজন করা
বিবাহে বৌভাত ও মেয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান করা
‘বিবাহ তো একবার হয়’ এ কথার অসারতা
খোরপোষ/লালন-পালন
স্বামীর অজান্তে ফসল বা সম্পদ বিক্রি করে সন্তানের প্রয়োজন মিটানো
বিধবা মাতার খোরপোষ
বিবাহের বিবিধ মাসাইল
ভালবাসা ও বিবাহের ব্যাপারে শপথ করা
সন্তান মায়ের গর্ভে সর্বোচ্চ দুই বছর থাকে
বিবাহের জন্য পাত্রী দেখার নিয়ম
বিবাহের খুতবা পড়ার সময় ও পড়ার তরীকা
ঈজাবের দ্বারা বিবাহ
একসাথে অধিক স্বামী গ্রহনের অনুমতি না দেয়ার কারণ
বংশসূত্র প্রমাণিতকরণ
স্বামী নিরুদ্দেশ হলে স্ত্রীর করণীয়

সূচিপত্র

কাবিন রেজিষ্ট্রী ও উকিল বাবার হুকুম
নিজেকে পবিত্র রাখতে পারলে তার জন্য বিবাহ না করার হুকুম কি?
তাবিজ-কবজ দিয়ে বিবাহ আটকিয়ে রাখা
উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা চাই
বিবাহ পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করার হুকুম
অবৈধ ভালবাসা
বেগানা মহিলাদের সাথে সর্ম্পক স্থাপন করা
ভালবাসা করা জায়িয কিনা?
শরী'আতের দৃষ্টিতে একজন আদর্শ স্বামী
স্বামীর-স্ত্রী একত্রে ইসলাম গ্রহণের পর করণীয়
দুই বিবাহ দুই স্বামীর অধিকারিণী পরকালে কার সাথে থাকবে
অবিবাহিত অবস্থায় মারা যাওয়া
বিবাহের উপঢৌকনের মালিক কে হবে?
দুগ্ধ পান
উত্তেজিত অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো
দুগ্ধপান করনোর সর্বোচ্চ সীমা
সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো
নিজের স্ত্রীর দুধ পান করা
জন্মনিয়ন্ত্রণ
জন্মনিয়ন্ত্রণ করে তাওবা করা
যে সমস্ত কারনে জন্ম বিরতিকরন বৈধ
অসুস্থতার দরুন জন্মনিয়ন্ত্রণ করা
সংসার ছোট রাখার জন্য সন্তান বন্ধ রাখা
তালাক

সূচিপত্র

তালাকের শর্তাবলী
পূর্বে যিনাকারীনী ছিল বলে নিজ স্ত্রীরকে তালাক প্রদান
আধা পাগল ব্যক্তিকে তালাক প্রদান
ডাকযোগে তালাকনামা প্রদান
মনে মনে তালাক প্রদান
তালাকে সরীহ/কিনায়া
জবরদস্তী করে মেয়ের মাধ্যমে ছেলেকে তালাক দেয়া
স্ত্রীকে এক তালাক, দু'তালাক ও বাইন তালাক বলা
নিজ স্ত্রীকে 'তুমি আমার জন্য হারাম' বলা
তিন তালাক
ঝগড়ায় সময় তিন তালাক দেওয়া
তিন তালাকের বিধান
স্ত্রীকে রাজ'আতের পর তালাক দেওয়া
স্ত্রী স্বামীকে তিন তালাক দিলে
তিন তালাক দিয়ে হালালা ব্যতীত বিবাহ
একই বৈঠকে তিন তালাকের হুকুম
'তুমি যদি বাবার বাড়ী যাও তাহলে তিন তালাক' বললে
তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসারকারী স্বামীর সঙ্গে লেনদেন
এক তালাক, দু'তালাক তিন তালাক ও বাইন তালাক বললে
'যদি তিন তালাক দেই তাহলে তুই কি করবি' বলা
কথা কাটাকাটির সময় এক দুই তিন তালাক বললে
গর্ভবতী অবস্থায় তিন তালাক
ঝগড়ার সময় তিন তালাক দেওয়া
হীলা বিবাহের হুকুম

সূচিপত্র

খোলা তালাক
স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ডির্ভোস করা
স্ত্রীর দুধ পান করলে তালাক হবে কি
তালাকে তাফবীয
বিবাহের পূর্বে তালাক প্রধান
স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেওয়া
তালাক শর্তের সাথে মুয়াল্লাক্ব করলে
স্বামী স্ত্রীকে বলল, ‘তোর ভাইয়ের সাথে কথা বললে তুই তালাক’
শর্ত সম্বলিত তালাকের হুকুম
শর্তের সাথে তালাক দিলে
যিহার
নিজ স্ত্রীকে মা বলে ডাকা
স্ত্রীকে মা বলে ডাকা এবং তার বুকের দুধ পান করা
ইদ্দত
ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে বিবাহ
স্ত্রীর মারা যাওয়ার পর স্বামীর বিবাহ
ইদ্দতের সময় সাজসজ্জা ত্যাগ করা জরুরী
তালাকের বিবিধ মাসাইল
অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার হুকুম
তালাক দেওয়া পর একত্রে বসবাস করা
স্বামীকে কাফির ও হারামী বলা
পিতা-মাতার অবাধ্য স্ত্রীর হুকুম
দস্তখত দ্বারা তালাক
তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা

কুরআন হাতে নিয়ে স্ত্রীকে শাস্তি না দেওয়া কসম
কোন আলেমকে গালি দেয়া
শাশুড়ীর সাথে যিনা করা
শ্যালিকার সাথে যিনা করা
লেনদেন ও ব্যবসা বানিজ্য
ডলারের ব্যবসার শর'ঈ হুকুম
দায়িত্বে অবেহেলাকারীর চাকুরীর টাকা দিয়ে ব্যবসা করা
বাকীতে বেশী দামে বিক্রয়
কিস্তিতে মেশিন ক্রয় করা
বাকী টাকা গাভী ক্রয় করে দুধের দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা
কিস্তি আদায়ে দেরী করলে
দীর্ঘ মেয়াদী বাকীতে কোন জন্তু ক্রয় করা
ফাসিদ, বাতিল ও মাকরূহ লেন-দেন
মাছ ছাড়া পানিতে বাসকারী অন্য প্রাণী বিক্রি করে টাকা নেওয়া
দাম নির্ধারণ না করে বিক্রি
বিক্রেতার কাছেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করা
একই ব্যক্তি ক্রেতা-বিক্রেতা হওয়া
একই জিনিস বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করা
ইয়াতীমের মাল দ্বারা ব্যবসা করা
অবৈধভাবে উপার্জিত টাকা দান করা
ঔষধের দোকানে কনডম ইত্যাদি বিক্রি করা
স্টক ব্যবসা করা
টিভি-অডিও ইত্যাদি বিক্রি করা ও তার ব্যবসা
পানির ভিতরের মাছ বিক্রি ও তার বিক্রয় লব্ধ টাকা

মুজারিব ব্যবসার টাকা নিজে খরচ করার পর তার থেকে লাভ নেয়া
<u>ধোকা-প্রতারণা ও দালালী</u>
দালালী ব্যবসার শর'ঈ বিধান
চুক্তিভিক্তিক গোপন রোগের চিকিৎসা করা
দেশ-বিদেশ চাকুরীর জন্য লোক সরবরাহ করে কমিশন গ্রহণ
ধোকার মাধ্যমে ব্যবসা করা
<u>মুরাবাহা/বাইয়ে সালাম ও মুযারাবা</u>
ব্যাংকের মাধ্যমে মাল খরীদ করা
তিন হাজার টাকার চেক আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করা
টাকা ভাঙ্গিয়ে কিছু নগদ ও কিছু পরে নেয়া
ব্যাংক থেকে বাইয়ে মুরাবাহার সঠিক পদ্ধতি
বাই'য়ে সালাম তথা নগদ টাকায় বাকী মাল ক্রয়ের সঠিক পদ্ধতি
<u>শেয়ার ব্যবসা</u>
শেয়ার ব্যবসার লভ্যাংশ বন্টনের পদ্ধতি
শেয়ার ব্যবসা বিবিধ মাসাইল
সম্মিলিত ব্যবসায় পুঁজি সমান হওয়া জরুরী নয়
<u>ব্যাংক, বীমা-ইন্স্যুরেন্স</u>
বীমাকৃত টাকার লভ্যাংশের বিধান
জীবন বা পণ্যের বীমা করা
ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখা
সুদের টাকায় জনসেবা করা
সুদী লোন দ্বারা কোন বস্তু ক্রয় করা
শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যাংকে লেন-দেন
সি সি লোন নেওয়া

ব্যাংকের জন্য ঘর ভাড়া দেয়া
সুদী ব্যাংকের চাকুরীজীবিদের উপার্জন
সুদী ব্যাংকে চাকুরী
সুদ, ঘুষ ও জুয়া
সুদ সক্রান্ত হিসাব-নিকাশ
বন্ধক রেখে সুদের উপর টাকা আনা
সুদ-ঘুষ খায় এমন আত্মীয়ের বাসায় খাওয়া
সুদখোর মায়ের বাড়িতে খাওয়া
সুদ প্রদানের শর্ত ঋণ গ্রহণ
নির্দিষ্ট পরিমাণ লভাংশ দেয়ার শর্তে টাকা ঋণ দেয়া
ছিঁড়া দশ টাকা দিয়ে নয় টাকা গ্রহণ করা
জরিমানার টাকা সুদে লাগানো
বাড়ি ভাড়ার বিনিময়ে গৃহ ঋণ গ্রহণ করা
টাকার পরিবর্তে টাকা ও ধান
ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি থেকে হাওলাত নেয়া
গ্রামীণ ব্যাংক থেকে লোন নেয়া
প্রাইজ বন্ডের পুরষ্কার
প্রাইজ বন্ড ও লটারী
অবৈধ উপার্জনকারীর দান সদকা
ঘুষ দিয়ে চাকুরী গ্রহণ
ঘুষ দিয়ে বা প্রতারণা করে চাকুরী গ্রহণ
ঘুষ দিয়ে বিল পাশ করানো
বন্ধক, ইজারা, বর্গা
জমি, এগ্রিমেন্ট বা রেহান পদ্ধতি

সূচিপত্র

জিনিসপত্র বা জমি বন্ধক রাখার নিয়ম
জমি এগ্রিমেন্টের বৈধ পদ্ধতি
জমি বর্গা দেয়া
পশুপাখী বর্গা দেয়া
কড পদ্ধতিতে জমি লেন-দেন
শ্রমিককে তার হস্তে কর্তিত ফসল থেকে মজুরী দেয়া
মুসলমানের খৃষ্টান ভাড়াটে রাখা
লেন-দেনের বিবিধ আহকাম
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা
প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা আনা
অন্যের জন্য কেনা
কর্য আদায় না করলে কি হুকুম
অনৈসলামিক এনজিওতে চাকুরী ও লেনদেন
শর্ত সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ
ভুলবশতঃ বাসের কন্টাক্টর হতে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ
ছোট ভাইয়ের কাছে ঋণী হলে ঋণ পরিশোধ করা জরুরী কিনা
গাছের ফল বিক্রয়
সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার
মাতা-পিতা, উস্তাদ ও স্বামী-স্ত্রীর হক সমূহ
মা-বাবার খিদমত করতে গিয়ে ফরজে কিফায়া ছেড়ে দেয়া
প্রসঙ্গঃ হালাল উপার্জন এবং মা-বাবার আনুগত্য
নামাযী ব্যক্তি মাকে কষ্ট দিলে তার মুক্তির রাস্তা
আত্মীয়তার বন্ধন টিকিয়ে রাখা
কি ধরনের আচারণে পিতা-মাতার অবাধ্য সাব্যস্ত হয়?

সূচিপত্র

মাতা-পিতার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত
মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ
পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর অবাধ্য সন্তানের করণীয়
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক সমূহ
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক
স্ত্রী-স্বামীকে তুমি বলে সম্বোধন করা
অসদাচরণের কারণে স্ত্রীর বিছানা আলাদা করা
স্ত্রী-পুত্রের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন
স্বামীর পদতলে স্ত্রীর বেহেশত
উস্তাদের জিম্মাদারীতে অবহেলা করা
রাগ করে কথা না বলা
প্রতিবেশী ও জনসাধারণের হক
সুদের টাকা মসজিদ-মাদরাসা কিংবা গরীবদেরকে দান করা
রাস্তার দুই পার্শ্বের গাছপালা কেটে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার
প্রসঙ্গঃ বিধর্মীকে সম্মান প্রদর্শন করার তরীকা
আত্মীয়তা ছিন্ন করা
কেউ কথা না বললে করণীয়
হেবা, হাদিয়া দান-সদকা
অবৈধ উপার্জনের টাকা দান
ছোট বাচ্চাদের সম্পদ সাংসারিক কাজে ব্যয় করা
ঋণী ব্যক্তির নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ
অন্যান্য সন্তানাদীর চেয়ে একজনকে বেশী সম্পদ দেয়া
বিধর্মীকে হাদিয়া, উপহার দেয়া
ফারায়েয ও অসিয়্যত

মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারে অংশীদার হওয়া
পালক পুত্রের মীরাস ও তার সাথে পর্দার বিধান
সন্তানকে সম্পত্তি দান করে পুনরায় ফেরত নেওয়া
জীবিত অবস্থায় ওয়ারিশদের সম্পদ বন্টন করা
অবাধ্য ছেলেকে তুলনামূক কম সম্পত্তি দেওয়া
কোন সন্তানকে সম্পত্তি না দেওয়ার অসিয়্যত করার পর করণীয়
মেয়েদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত
বিদ'আতী ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা
ইয়াতীমের অংশ পৃথক না করে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি ব্যয় করা
ছেলে মারা যাওয়ার পর নাতীদেরকে সম্পত্তি লিখে দেওয়া
স্ত্রীকে সম্পত্তি হেবা করা
ধোকা দিয়ে সম্পত্তি লিখে নেওয়া
এক সন্তানের নামে জমি রেজিষ্ট্রী করা
এক স্ত্রীর সন্তানদের নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া
মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন
দুধ সম্পর্ক ভাই বোন ওয়ারিশ হয় না
প্রাপ্ত সম্পদ
রাস্তায় পড়ে থাকা টাকা-পয়সা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা
রাস্তায় প্রাপ্ত টাকা মসজিদে দান করা
পাওনাদার না পাওয়া গেলে তখন করণীয়
নও মুসলিমের কুফুরী অবস্থার অর্জিত সম্পদের শর'ঈ হুকুম
উত্তোলিত চাঁদার প্রয়োজন না হলে খরচের নিয়ম
সামাজিকতা
সালামের শর'ঈ বিধান

বিধর্মী লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন
পিতা-পুত্রের যৌথ কর্মে পুত্রের মালিকানা
টেলিফোন করার নিয়ম
হালখাতার মিষ্টান্ন খাওয়ার হুকুম
আত্মীয়দের বাসায় খাওয়া
পর্দা-পোষাক
যাদের সঙ্গে দেখা দেয়া বৈধ/অবৈধ
চাচী, মামী, চাচাত বোন, মামাত বোনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ
জ্বীনকে বাধ্য করে তদবীর ও বেগানা মহিলাদের চিকিৎসা প্রদান
পর পুরুষদের সাথে দেখা দেওয়া
চাচাত বোনকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া
দুলা ভাইয়ের ভাইয়ের সাথে দেখা দেয়া
সৎ মার সাথে দেখা দেয়া
চাচা, মামা, খালু, ফুফা এদের সাথে দেখা দেয়া
উকিল বাবার সাথে দেখা দেয়া
পর্দার সাথে গায়রে মাহরামের সাথে সালাম বিনিময়
মেয়েদেরকে সালাম দেয়া
ভাবির সাথে সাক্ষাৎ বা দেখা দেয়া
পুরুষ এবং নারী কার কার সাথে দেখা দিতে পারবে
পুরুষরা নিম্নবর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা করতে পারবে
মহিলাগণ নিম্নবর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষের সাথে দেখা করতে পারবেন
মহিলাদের শিক্ষা, শিক্ষকতা ও মার্কেটিং করা
অসহায় অবস্থায় মহিলাদের চাকুরী
প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাকে প্রাইভেট পড়ানো

সূচিপত্র

প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে বেপর্দা অবস্থায় নূরানী ট্রেনিং দেয়া
ইমামের জন্য বালিকা স্কুলে শিক্ষকতা করা
মহিলাদের বোরকা পরিধান করে মার্কেটে যাওয়া
নিজ ঘরে বসে মহিলাদের তালীম করা
দাইয়ূস-এর পরিচয়
শরী'আতের দৃষ্টিতে মহিলাদের চাকুরী
স্বামীর চাপের মুখে স্ত্রীর চাকুরী করা
ইসলামের দৃষ্টিতে সহশিক্ষা
শরী'আতের দৃষ্টিতে মহিলাদের পার্থিব শিক্ষা অর্জন করা
মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার কুফল
সুন্নাতী পোষাক
মহিলাদের সুন্নাতী পোশাক
পর্দা কার জন্য?
টুপি, রুমাল ও পাগড়ী পরার তরীকা
মেয়েদের জন্য পুরুষের কাপড় ও শাড়ী-ব্লাউজ পরিধান করা
যে ধরনের কাপড় পরিধান করা সুন্নাত
জুব্বা পরিধান করে নামায আদায়
সুন্নাতী পোশাক সম্পর্কে
বিধর্মীদের পোশাক পরিধান করা
পায়ের গিরা ঢেকে পোশাক পরিধান করা
টাখনুর নীচে কাপড় পরা
মুসলমানের জন্য টাই পরা
পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা
প্যান্ট পরা

পুরুষের জন্য লাল রং এর কাপড় পরিধান করা
কাফির-ফাসিকের পোশাক পরিধান করা
পর্দা ও পোশাকের বিবিধ আহকাম
পর্দা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পর তাওবা
পুরুষের সতর ঢাকায় বিধান
মেয়েদের ছবি দেখা
অর্ধ রেশমী কাপড় পরিধানের হুকুম
প্রয়োজনবশতঃ বেগানা মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত
পুরুষদের জন্য মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবন
বেপর্দা মেয়ের প্রতি পিতার করণীয়
মেয়েদের পর্দা করার সময় ও তার পরিমাণ
বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয়
পিতা-মাতার আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা
আংশিক চেহারা খোলা অবস্থায় ভিন পুরুষের সাথে দেখা দেয়া
পর্দাহীন মহিলাদের সাথে পর্দা করা
দন্ডবিধি
যিনা করার পর তাওবাকারীর হুকুম
ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা
দুনিয়ার বিচার কি গুনাহ মাফ করে?
পশুর সঙ্গে ব্যভিচার
অবৈধ মিলনে সন্তানের বংশসূত্র নির্ধানণে শরী'আতের বিধান
অবৈধ গর্ভকে ঔষধের মাধ্যমে নষ্ট করা
হস্তমৈথুন ও সমকামিতার শাস্তি
বিবাহিত যিনা করলেন

যিনার দ্বারা সন্তান হলে তার হুকুম
বাংলাদেশে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ইসলামী দন্ডবিধি
ইসলামী আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়া
ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে যিনাকারীদের বিচার সালিস
ওয়াকফ-মসজিদ
মসজিদের মাইকে হারানো বিজ্ঞপ্তি ও জানাযার ঘোষণা
মসজিদের মাইকে ক্বিরা'আত গজল ও যিকির করা
মসজিদের মাইকে অন্য কাজে ব্যবহার করা
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গা
মসজিদের কোণায় নির্মিত কামরায় স্ত্রীসহ বসবাস করা
মসজিদে ইমাম, মুয়াযযিনের বাসস্থান নির্মাণ
সরকারী জায়গায় নির্মিত মসজিদের চৌহদ্দী নির্ধারণ
মসজিদের আসবাবপত্র ঈদগাহে নেয়া
মসজিদের উযুখানার উপরে ফ্যামিলিসহ ইমাম সাহেবের বসবাস
মসজিদে মিউজিক ঘড়ি ব্যবহার
কা'বা শরীফ বা মাজারের ছবি অংকিত পাথর মেহরাবে লাগানো
বেতন বিহীন ইমামের মসজিদের জমি থেকে ফসল গ্রহণ
মসজিদে মুর্দারের খালি খাট রাখা
মসজিদে খতম পড়ানো
মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার সাওয়াব
মসজিদে মান্নতের হুকুম
বলপূর্বক অন্যের জমিনে মসজিদে নির্মাণ
মসজিদের পরিত্যক্ত কুরআন শরীফ বিক্রয় করা
মসজিদে হারিকেন জ্বালানো

সূচিপত্র

মসজিদের জায়গায় লাগানো গাছের ফল খাওয়া
মসজিদের ভিতর উচ্চস্বরে সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত
মসজিদে ছবি বিশিষ্ট ঘড়ি রাখা
মসজিদে কা’বার ছবি
মিম্বারের তাকে কুরআন শরীফের বা ধর্মীয় পুস্তকাদি রাখা
মসজিদে তালীম করা
মসজিদের জন্য ধর্ম মন্ত্রালয়ের অনুদান গ্রহণ করা
মসজিদে পত্রিকা পড়া ও রেডিও শ্রবণ
মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা
কা’বা শরীফের ছবি সম্বলিত জায়নামায ব্যবহার
মিহরাবের স্থান মাঝখানে হওয়া চাই
মসজিদের টাকা দিয়ে মিষ্টি বিতরণ
ইফতারের টাকা মসজিদে খরচ
মকতবের জায়গায় মসজিদ তৈরি
মকতব
ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি
কররস্তান ভেঙ্গে মসজিদ নির্মান
মসজিদের ওকাকফকৃত স্থানে লাশ দাফন
কবরস্থানের দোতলায় মসজিদ তৈরী করা
মসজিদের দেয়ালে নির্মাতাদের নাম লিখে রাখা
মসজিদ সম্পর্কিত মাসাইল
জিদের বশবর্তী হয়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ
মসজিদ স্থানান্তরিত করার পর পূর্ববর্তী স্থানের হুকুম
মসজিদের জমিতে দোকান ঘর করে ভাড়া দেওয়া

সূচিপত্র

আবাদকৃত জমিতে মসজিদ স্থানান্তর ও সেখানে নামাজের হুকুম
মসজিদের পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করা
পুরাতন মসজিদকে নতুন মসজিদের বারান্দা বানানো
ওয়ারিশদের অন্যায় কর্তৃত্ব দেখানোর দায়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ?
মসজিদের উন্নয়ন কাজে লিল্লাহ ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ
মসজিদে দ্বীনী তালীম দিয়ে ভাতা গ্রহণ করা জায়িয হবে কি-না?
হিন্দুর জমিনে মসজিদ নির্মাণ
মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ইমামের লাশ দাফন
মসজিদের তহবিল কোন খাতে খরচ হবে
বিধর্মী কতৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামায আদায়
ফাসিকদের দ্বারা মসজিদ মাদরাসা পরিচালনা করা
মসজিদ কমিটি কেমন হওয়া উচিত?
ব্যাংকের সুদের টাকা দ্বারা-মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ
অবৈধ টাকায় নির্মিত মসজিদের হুকুম
মসজিদের সভাপতি কিংবা সদস্য অমুসলিম হওয়া
মাদরাসা
মসজিদ মাদরাসার টাকা ঋণ প্রদান
মাদরাসার জন্য দানকৃত টাকা নিজ কাজে ব্যবহার করা
ব্যক্তিগত কাজে মসজিদ মাদরাসার জিনিস ব্যবহার করা
বদলী হজ্জের টাকা দিয়ে মাদরাসার জন্য জমি ক্রয়
ছাত্রদের দ্বারা মাদরাসার কাজ নেয়া
মসজিদ-মাদরাসার পরিচালকের যোগ্যতা
মাদরাসা সরিয়ে ব্র্যাক স্কুল তৈরি
প্রচলিত মহিলা মাদরাসা

মহিলা মাদরাসায় শিক্ষকতা
পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকের সমন্বয়ে মহিলা মাদরাসা করা
মাদরাসা শিক্ষাকতার পূর্ব থেকে বেতন ধার্য করা
বিনা যাচাইয়ে মাদরাসায় দান গ্রহণ করা
পুরুষ শিক্ষক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে পড়ানো
মান্নত / কসম- কাফফারা
সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে মিসকিনকে খাওয়ানোর নিয়্যত করা
অন্যের মালে মান্নত করা
শর্ত পুরা না হলে মান্নত পুরা করা
মান্নত পুরা করতে অসমর্থ হলে কি করণীয়?
মান্নতগুলো সারা জীবনের জন্য করেছি বলা
কসম পুরা না করলে কি করণীয়
মসজিদ মাদরাসায় মান্নত করা
মসজিদের নামে মান্নত করে অন্য ক্ষেত্রে দেয়ার বিধান
মসজিদের নামে ছেড়ে দেয়া হাসা-মুরগী খাওয়া
মাজারে মান্নত করা
মসজিদে হিন্দু কর্তৃক শুকর মান্নত করা
পীরের নামে বা তার মাজারে মান্নত করা
মাজারে বাতি জ্বালানো এবং মান্নতকৃত বস্তু খাওয়া
পীর সাহেবের বাড়ী, মাজার বা মসজিদ ইত্যাদিতে মান্নত করা
শবীনা করার মান্নত করা
নির্দিষ্ট জন্তু মান্নত করলে করনীয়
সারা জীবন রোযা রাখার মান্নত
রোগা গরু বা মহিষের মান্নত

ওয়াকফ-মান্নতের বিবিধ আহকাম
ওয়াকফ এর শর'ঈ বিধান
এক মসজিদের ওয়াকফকৃত জমিতে দ্বিতীয় আরেকটি মসজিদ নির্মাণ
মসজিদের ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করা
মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমি নিজে ভোগ করা
ইজমালী সম্পত্তির কিয়দাংশ ওয়াকফ করা
মাদরাসার জমিতে মসজিদ তৈরী
ঈদগাহ ও মসজিদের ওয়াকফকৃত জমিতে মাদরাসা তৈরি করা
ওয়াকফ বিহীন নির্মিত মসজিদে নামাজ আদায়
কবরস্থানের উপর বাড়ী-মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা
কবরের উপর ঘর নির্মাণ
খোদায়ী ষাঁড় মাদরাসার ছাত্রদের খাওয়ানো
ওয়াকফকৃত জমি পরির্তন করা
ওয়াকফ বিহীন মসজিদে নামায আদায়
এক মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গা অন্য মসিজদের জন্য দখল করা
কবরের উপর গরু চরানো
ঈদগাহে ফুটবল খেলা
মসজিদে ওয়াকফকৃত মাইক ভাড়া দেয়া
জায়িয/নাজায়িয
নির্বাচনী শ্লোগান
শরী'আতের দৃষ্টিতে ভোট
হরতাল পালন
শরী'আতের দৃষ্টিতে কদমবুছী করা
ঝিনুকের দানা দিয়ে তৈরী করা মালা ব্যবহার

গোবর বা পায়খানা থেকে তৈরী গ্যাস দ্বারা খানা পাকানো
মেয়েলোকের নাক-কান ছিদ্র করণ
জিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করা
মুসলমানের শরীক অমুসলিমের রক্ত প্রবেশ করানো
চিংড়ি মাছ খাওয়া
গুল বা জর্দা খাওয়া
বে-নামাযী বা অমুসলিমের হাতের রান্না খাওয়া
দেয়ালে চিত্র অংকন করা
সেন্ট ব্যবহার করা
ভাতের মধ্যকার কালো ভাতের হুকুম
গরু ছাগল বর্গা দেয়া
নাচ-গানের অনুষ্ঠানে তিলাওয়াত করা
পড়ার অযোগ্য কুরআন শরীফ সম্পর্কে করণীয়
ছবি আঁকা ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণে জরিমানা আদায়
পীর সাহেবকে কেবলা সম্বোধন করা
একসাথে কুরআন ও গীতা পাঠ করা
দাবা খেলা
ছবি তোলার শর‘ঈ বিধান
বাড়ীতে কুকুর বা অন্যান্য স্মৃতি রাখা
মেয়েদের মাথার চুল কাটা
সরকারী চাকুরীজীবিদের বেতন
প্যাকেটজাত গোশতের হুকুম
যুব কল্যাণ প্রজেক্ট এর নামে সদস্যপদ গ্রহণ

সন্তান গ্রহণে বিলম্ব করা
অমুসলিমের জন্য দু‘আ করা
স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করা
উলামা কর্তৃক অনুমোদিত হালাল গোশত
বিধর্মীকে সালাম দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া
পিতার সম্পত্তি থেকে দান করা
জন্মনিয়ন্ত্রণ
ওরস করার হুকুম
পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার
হাউস মাছ ও শাপলা মাছ খাওয়া
বিধর্মীদের মৃত্যুতে কুরআনখানী করা
আত্মহত্যাকারীর শাস্তি কি? তাদের ঈসালে সাওয়াব করা যাবে কি?
বিড়ালের ঝুটা
চলাফেরা ও কাজ করা অবস্থায় যিকির করা
শ্বশুরকে আব্বা বলা
যে অবস্থায় ফটো তোলা জায়িয
হিন্দু ঘরের নিকটবর্তী রুমে নামায-কুরআন তিলাওয়াত করা
গোবরের জ্বালানী বিক্রয় করা
বিনা যাঁচায়ের হোটেল ও রেস্টুরেন্টর যবেহকৃদ জন্তুর গোস্ত খাওয়া
কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়া
ড্রইংরুমের পুতুল ও প্রাণীর মূর্তি রাখা
তাবীযের টাকা দিয়ে ঘর নির্মাণ
ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য ছবি তোলা
কিবলার দিকে পিঠ যবেহ করা

চামচ দিয়ে বা ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া
দেশী-বিদেশী সাবান ও প্রসাধনী ব্যবহার
হাত দ্বারা ইশারা করে সালাম বা উত্তর দেওয়া
কুরআন শরীফ পড়ে গেলে কাফফারা
চুল ছোট রাখা
দাড়ি মুণ্ডানো
স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করা
কনডম ব্যবহার করা
হাদিয়াকৃত তাফসীর গ্রন্থ ক্রয় করা
বে-নামাযীর দাওয়াত কবুল করা
তাফসীরে মানুষের ছবি
উসীলা দিয়ে দু'আ করা
নকল করে বৃত্তি পেয়ে বৃত্তির টাকা ভোগ করা
সুদী ব্যাংক ও টেলিভিশনের প্রচার করা
উযু ব্যতীত ইসলামী বই পড়া
হালাল প্রানীর যে সমস্ত অংশ হারাম
চোরাই মার্কেট থেকে আসবাব পত্র ক্রয়
আরামের জন্য ট্রেনে হাফ সিটের জন্য টিকেট করা
অমুসলিমদের মৃত্যুতে সাহায্য-সহযোগিতা
দ্বীনী স্বার্থে মাযহাব ছেড়ে দেয়া
সিনেমা না দেখার কসম খাওয়া
মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা-ছিড়ার বিধান
বিধর্মীকে রক্ত দান করা
চিংড়ী ও টেপা মাছ সংক্রান্ত শর'ঈ বিধান

সূচিপত্র

আব্দুস সুবহান নাম রাখা সহীহ কি-না?
চুলে কলপ ব্যবহার
আল্লাহকে ভিন্ন নামে ডাকা
ক্যাসেটে তিলাওয়াত বা গান শ্রবন করা
বিভিন্ন বিক্রিত জিনিসে দেয়া লটারী গ্রহণ
দানকৃত কুরআন শরীফ বিক্রি করা
মসজিদ ও মাদরাসার টাকা কর্জ হিসাবে খরচ করা
কুরআন শরীফ আগুনে পুড়ে ফেলা
টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান দেখানো
ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারে বসে আহার করা
মেলামাইনের তৈরী পাত্র ব্যবহার
ফরয তরককারী ফুটবল খেলায়াড়ের খেলা দেখা
পুস্তকে ছবি ব্যবহার করা
বিধর্মীদের বাড়ীতে যাওয়া নাপাক পানীয় পান করা
পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ
ধূমপানের শর'ঈ বিধান
মদ ও সিনেমার ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত টাকা হালাল কি-না?
পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে স্বীকার করা
বিসমিল্লাহ শব্দ দিয়ে দোকান বা হোটেলের নাম রাখা
উলামায়ে কিরামকে মাওলানা বলে সম্বোধন করা
এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে চাকুরী করে বেতন গ্রহণ
মানুষের নাম সংক্ষেপে ডাকা
তিলাওয়াত ও দু'আ- দরূদ পড়ে বিনিময় গ্রহণ

সূচিপত্র

গেম খেলা
‘বেসমল’ ব্যবহারের শর‘ঈ হুকুম
ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি
মেয়েদের কপালে টিপ দেয়া
মাছ বা ডিম কাঁচা বা পুড়িয়ে খাওয়া
টাই ব্যবহার করা
মাসিক অবস্থায় তিলাওয়াত, সুরমা ব্যবহার ও কিতাব পড়া
টেলিভিশন দেখা
কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করা
বিধর্মী লোক মারা গেলে করণীয়
মুসলমানদের জন্য কাঁকড়া ও কুঁচে খাওয়া
খরগোশ খাওয়া
কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা
নিষ্প্রয়োজনে তা’লীম ও যিকিরে মাইক ব্যবহার
বিবিধ
“সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়” এর অর্থ কি?
কি ধরনের বই পড়া উচিত?
মুহাম্মদ শব্দের বিশুদ্ধ বানান
ওয়ায়েস কুরুনী নাম রাখা
হিলফুল ফুজুল পাঠাগারের নামকরণ
কালো খেজাব ব্যবহার করা
নিজ অফিসে ফেলে যাওয়া জিনিসের হুকুম
রেডিও, টিভিতে সালাম, সিজদার আয়াত শুনলে করনীয়
তাওবার দ্বারা কি গুনাহ মাফ করা হয়?

সূচিপত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামের উসিলা দিয়ে দু'আ করা
কারো নামে প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা
কুরআনে কারীম স্মরণ না থাকা
কোন কাজকে হারাম বললে
রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নামের পূর্বে জনাব শব্দের ব্যবহার
অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত
স্বপ্নদোষ
নব ভূমিষ্ট সন্তান মরে গেলে তার নাম রাখা
হায়াত বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া
পড়ার অযোগ্য কুরআন হিফাজতের তরীকা
চান্দ্র মাসের ক্যালেন্ডার
ইসলামে পালিত দত্তক বিধান
নামাযের বাহিরে কুরআন শোনা
কবীরা গুনাহের পর তাওবা
যাদের অনুকরণ জরুরী
কোন দুষ্কর্ম কি মৃত্যুর কারণ হতে পারে?
ইবলিশের বেহেস্তে প্রবেশ করা ও ময়ূর পাখা ঘরে রাখা
হস্তমৈথুন বৈধ কিনা?
জোড় ফল খাওয়া
নবী ﷺ-এর শরীরে ছায়া থাকা
পড়া মনে থাকার গুরুত্বপূর্ন পরামর্শ
চক্ষু, রক্ত ইত্যাদি দান করা
হিন্দু কর্তৃক অনুদিত কুরআন শরীফ পড়া
পরীক্ষার ফি উদ্ধৃত্ত টাকার ব্যাবহার

ক্লাশে অনুপস্থিতির জরিমানা
সংক্ষিপ্ত নাম রাখা
মৌলবাদ শব্দের অর্থ
কুশলাদি জিজ্ঞাসার জবাবে অসুস্থ ব্যক্তিরও ভাল আছি বলা
কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে চরমপন্থী বলা
কলবের জং পরিষ্কার করার উপায়
মহিলাদের দাড়ি হলে
হযরত ঈসা আ.-কে অবৈধ সন্তান বলা
ইলেকট্রিক বিল প্রদান পদ্ধতি
কোটি গুন সাওয়াব সম্পর্কে
আখলাক ও আত্মশুদ্ধী
তাযকিয়ার গুরুত্ব
আত্মশুদ্ধি বাদ দিয়ে শুধু ইবাদত-বন্দেগী করা
মুনাসাবাতের উদ্দেশ্য
ভণ্ড পীর বা মুনাসাবাত ছাড়া পীরের কাছে মুরীদ হলে করনীয়
জান্নাতের আমল না করে পীরের উপর ভরসা
পীরের ইন্তেকালের পর নতুন পীর ধরা
সর্বযুগেই কি আত্মার রোগের চিকিৎসক বিদ্যমান?
অন্তরের রোগের কথা ছেড়ে পীরের মুহব্বতেই আত্মশুদ্ধি
ক্রোধ বা রাগের চিকিৎসা
হিংসা বা হাসাদের প্রতিকার
নামাযে খুশুখুযু হাসিল করার পদ্ধতি
আত্মশুদ্ধি সংক্রান্ত কিতাবাদী
আলেমগণের জন্যও কি আত্মশুদ্ধি জরুরী?

সূচিপত্র

কউমী মাদরাসার তালিবে ইলমদের আত্মশুদ্ধিও উস্তাদের যিম্মাদারী
ছাত্রাবস্থায় বাই‘আত হওয়া
মহিলাদের জন্য বাই‘আত হওয়া
যিকির তাহাজ্জুদ ইত্যাদির দ্বারা আত্মশুদ্ধি
শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হাসিল হয় কি?

যাকাত

যাকাতের নিসাব ও শর্তাবলী

অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়

জিজ্ঞাসাঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের মালের উপর যাকাত ফরয হয় কি-না?

জবাবঃ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য আকেল অর্থাৎ সুস্থ মস্তিকসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া জরুরী। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের মালের উপর যাকাত ফরয নয়।

[প্রমাণঃ আলমগীরী, ১:১৭২ ফাতাওয়া শামী, ২:১৬৮ নসবুররাহ রায়াহ, ২:৩৩৩ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৬:৪২]

.ومن شرائط وجوب الزكوة، منها العقل والبلوغ. فليس الزكوة على صبى ومجنون اذا

وجد منه الجنون في السنة كلها هكذا في الجوهرة النيرة كذا في العالمگيرى ص ۱۷۲/۱

হজ্জের জন্য সংগৃহীত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি হজ্জ করার জন্য টাকা সংগ্রহ করেছে কিন্তু ঘটনাক্রমে এ বছর যাবে না। টাকাগুলো কারো নিকট জমা রেখেছে অথবা সুদমুক্ত ব্যাংকে জমা রেখেছে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে কি-না?

জবাবঃ হ্যাঁ, উক্ত টাকা খরচ না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত দিতে হবে। অবশ্য যদি তা ঋন হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে উক্ত ঋন বাবদ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা যাকাতের ফরয পরিমাণ টাকা হলে যাকাত দিতে হবে। [প্রমান নিযামুল ফাতাওয়া, ২:১০৩]

لڑکی کو شادی یا مکان بنوانے کیلئے یا سواری خریدنے وغیرہ کیلئے جمع کی ہوئی رقم ایک سال سے زائد رکھنے پر جبکہ صاحب نصاب بھی ہو کیا اس جمع کی گئی رقم پر زکوۃ واجب ہوگی.

جواب : جس شخص کے پاس یہ رقم سال بھر رکھی رہی جب وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اسکی بھی زکوۃ ادا کرنی فرض ہوگی خواہ کسی بھی مقصد کیلئے تر کھی رہی ہو ۔ نظام الفتاوی : ۲/۱۰۳)

যাকাত কে, কাকে, কখন দিবে?

জিজ্ঞাসাঃ যাকাত কার উপর, কখন ওয়াজিব হয়? যাকাত এর হকদার কারা? যাকাত রমাযান মাসেই কি আদায় করতে হয়? নাকি অন্য কোন মাসে আদায় করলেও চলে?

জবাবঃ সাবালক সজ্ঞান মুসলমান নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর চান্দ্র মাস হিসেবে ঠিক এক বছর কাল অতিক্রান্ত হলে, যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। নিসাবের পরিমাণ ঋন ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তৎসমমূল্যের নগদ টাকা, বা ব্যবসার মালের মালিক হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হয়। যাদের সাথে দাতার জন্মগত সম্পর্ক আছে, যেমন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, প্রমুখ এবং দাদার সাথে যাদের জন্মগত সম্পর্ক আছে, যেমন, ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী ইত্যাদি, তাদেরকে যাকাত-ফিতরা দেয়া যায় না। অনুরুপভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত-ফিতরা দিতে পারে না। অমুসলিম ও ধনী ব্যক্তিকে দান করলে যাকাত

ফিতরা আদায় হয় না। তা এমন সব গরীব ও ফকির-মিসকীনকে দিতে হবে, যাদের নিকট নেসাব পরিমাণ মাল নেই। ধর্মীয় খিদমতে রত নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে যাকাত-ফিতরা দান করলে, ধর্মীয় খিতমতের সহযোগিতা হিসেবে অধীক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়টি যদি রমাযান মাসে হয় তাহলে সে মাসেই যথা তারিখে সমুদয় মালের যাকাতের সম্পুর্ণ হিসাব নিকাশ করে যাকাতের পরিমাণ বের করা জরুরী এবং আদায়ের ক্ষেত্রেও যদি ফরয যাকাত আদায় না করাই উত্তম। কারণ, কোন লোক রমাযান আসার আগে যদি ফরয যাকাত আদায় না করে ইন্তেকাল করে, তাহলে যাকাতের ফরয তার জিম্মায় থেকে যাবে। তবে ওয়াজিব হওয়ার আগেই যদি রমাযানে যাকাত অগ্রীম আদায় করে তাতেও কোন দোষ নেই। এভাবে সারাজীবন অগ্রীম যাকাত দিতে থাকলেও কোন অসুবিধা নেই।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫৫, কিফায়াতুল মুফতি ৪:২৬২, আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২]

واما وقت ادائها فجميع العمر عند عامة مشائخنا رحمهم الله كذا في البدائع ومصارف الزكوة والفطرة الفقير وهو من له ادنى شئ وهو مادون النصاب ومنها المسكين وهو من لاشئ له . ومنها العامل ومنها الرقاب ومنها الغارم ومنها في سبيل الله ومنها ابن السبيل كذا في العالمكيرى ۱۹۱/۱

যাকাত সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ প্রশ্ন

জিজ্ঞাসাঃ

(১) ‘বেহেশতী জেওর’-এর যাকাত সংক্রান্ত অধ্যায়ে ১৯ নং মাসআলায় ‘হাজাতে আসলিয়া’-এর যে সংজ্ঞা বলা হয়েছে, তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়। হাজতে আসলিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরন কি?

(২) যারা সরকারী চাকুরী করে, যাদের প্রতি মাসে বেতন বিল থেকে বাধ্যতামূলকভাবে একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা কর্তন করে জি.পি তহবিল জমা করা হয়। আবার যারা স্বায়ত্ব শাসিত এবং আধা সরকারী সংস্থায় চাকুরী করেন, তাদেরও বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি মাসের বেতন বিল থেকে একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা কর্তন করে সি,পি,এফ, (প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিল) তহবিল জমা করা হয়। এ সংস্থা আবার সমপরিমাণ বা কিছু কম টাকা নিয়মিত প্রতিমাসে কর্মচারীদের সি,পি,এফ এ্যাকাউন্টে জমা দেয়। সরকারী, আধা সরকারী উভয় ক্ষেত্রে এ জমাকৃত টাকা চাকুরী থেকে অবসর গ্রহনের পর সরকারী সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত সুদসহ এককালীন পাওয়া যায়। আবার জমাকৃত টাকা থেকে চাকুরীকালীন সময় কিছু শর্তসাপেক্ষে ঋন গ্রহণ করা যায় এবং বাধ্যাতামূলকভাবে এ ঋণের টাকা নিয়মিত প্রতি মাসে নিদিষ্ট হারে ফেরত দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, প্রতি বছর যাকাতের হিসাবের সময়ঃ

(ক) জি,পি/সি,পি,এফ তহবিলে জমাকৃত এ টাকা হিসেবে আসবে কি? অর্থাৎ যাকাত প্রদানযোগ্য অন্যান্য পুঁজি/সম্পদের সাথে তা যোগ করতে হবে কি?

(খ) গৃহীত ঋণের টাকা যদি পুরো এক বছর হাতে থাকে (পুরো টাকা হোক বা আংশিক) তবে তা যাকাতের হিসাব নিতে হবে কি? অর্থাৎ অন্যান্য পুঁজি যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে তা যোগ করতে হবে কি?

(৩) কারো নিয়ন্ত্রণে ৮ ভরি স্বর্ণালংকার রয়েছে। কয়েক বছর আগে এগুলো সংগ্রহকালীন তৈরি খরচসমূহ মোট (৪০,০০০/=) চল্লিশ হাজার টাকা (আসল ক্রয় মূল্য) ব্যয় হয়। এখন বাজার সোনার মূল্য প্রতি ভরি (৭,০০০/=) সাত হাজার টাকা। এ মূল্য হিসেবে এগুলো স্বর্ণালংকারের মূল্য দাঁড়ায় ৫২৫০ টাকা (বর্তমানে ক্রয় মূল্য)। আবার এগুলো স্বর্ণকারের দোকানে বিক্রি করতে গেলে ৪ আনা বাদ দিয়ে মূল্য দিতে চায়। প্রতি ভরি ৫২৫০ টাকা হিসেবে ৪২০০০ টাকা (বর্তমান বিক্রি মূল্য)। এখন প্রশ্ন হলো, এ ৩টি মূল্যের কোনটির উপর হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

(৪) গত রমাযান মাসে একটি দৈনিক ‘মাহে রমাযান’ শিরোনামে এক নিবন্ধের এক জায়গায় দেশের একজন খ্যাতনামা আলেম বলেছেন, ‘স্বর্ণ বা রূপা হোক’ সর্বপ্রকার ব্যবসার মালে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যই গ্রহণযোগ্য, ক্রয় মূল্য নয়। যেমন, কারও নিকট যা যাকাতের মাল বর্তমান আছে, তার ক্রয় মুল্য ১ লাখ টাকা, কিন্তু বিক্রি মূল্য ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, এখন উক্ত মালের ১ লাখ ১০ হাজার টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব। এখন প্রশ্ন হলোঃ

(ক) নিসাব পরিমাণ সোনা, রূপা তথা ব্যবসার মালের উপর যাকাত দেয়া ফরয, না ওয়াজিব?

(খ) মজুদ ব্যবসা পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য ধরে যাকাতের হিসাব করতে হবে, এতদিন এমনটা জানতাম। কিন্তু উল্লেখিত নিবন্ধে বিক্রি মূল্যের কথা বলা হয়েছে। কোনটি সঠিক?

(৫) ইদানিং জানতে পারলাম যে, অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র না হওয়ায় টেলিভিশনের যাকাত দিতে হবে। ১০ বছর আগে ৭৩০০ টাকা দিয়ে ২০

ইঞ্চি একটি ফিলিপস সাদাকালো টেলিভিশন কিনেছিলাম। বর্তমানে এগুলোর মূল্য আরো বেশী। তবে আমরা পুরাতন টিভিটি বিক্রি করতে চাইলে তেমন ক্রেতা পাওয়া যাবে না এবং পাওয়া গেলেও মূল্য হয়ত ক্রয় মূল্যের অর্ধেকও হবে না। উল্লেখ্য, বাসায় ব্যবহৃত টিভি, ব্যবসার পণ্য হিসেবে হয়ত গণ্য হবে না। এ অবস্থায় যাকাত আদায়ের খাতিরে আমরা পুরাতন টিভি সেট এর মূল্য এখন কিভাবে কত টাকা নির্ধারন করতে হবে?

জবাবঃ (১) হাজাতে আসলিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য, নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যথাঃ বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র, যানবাহন, খিদমতের দাস, সমরাস্ত্র ইত্যাদি। সুতরাং এগুলো বাবদ খরচ করার পর ঋন অতিরিক্ত যা অবশিষ্ঠ থাকে, তা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে।

(২) (ক) সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের জি,পি এবং সি,পি,এফ তহবিলে বাধ্যতামূলকভাবে যে টাকা কেটে রাখা হয়, তা হাতে আসার আগে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। চাকুরী শেষে যখন ঐ টাকা উঠানো হবে, তখন আগে থেকে নিসাবের মালিক না থাকলে উক্ত টাকার উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে যদি আগে থেকে নিসাবের মালিক হয়ে থাকে, তাহলে আগের টাকার যাকাত দেওয়ার সময় জি,পি ও সি,পি,এফ তহবিলের প্রাপ্ত টাকারও যাকাত দিতে হবে, সেক্ষেত্রে ঐ টাকার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরূরী নয়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৩৩১, আহসানুল ফাতাওয়া ৮:২৬১]

ومن شرائط وجوبها فراغ المال عن حاجته الاصلية فليس في دور السكني وثياب البدن واثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاحالاستعمال زكاة وكذا طعام اهله وما يتجمل به من الاواني اذا لم يكن من

الذهب والفضة كذا في العالمكيري... ١/١٧٢

(খ) মূলতঃ এটা সাধারণ ঋণ হিসাবে গণ্য হয়ে যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে বাদ পড়বে। তাই তার যাকাত দিতে হবে না।

[প্রমাণঃ আলমগীরী, ১:১৭২ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:২৮২]

(৩) বর্তমান বাজারে ব্যবহৃত অলংকারের বিক্রয় মূল্য হিসাবে যাকাত দিতে হবে। (বর্তমান বাজারে বিক্রয় মূল্য ৪২,০০০ হাজার টাকা) অর্থাৎ ব্যবহৃত সোনা-রুপার যাকাত বর্তমানে বাজারে বিক্রয় মূল্য হিসেবে নির্ণয় করে যাকাত আদায় করতে হবে। তাই ক্রয় মূল্য থেকে বেশী বা কম হোক।

[প্রমাণঃ মাহমুদিয়া ১৩/৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:১০৮]

وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتاق وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الاداء وفي السوائم يوم الاداء اجماعا وهو الأصح كذا في الشامي/

(৪) (ক) আলেম সাহেব যা বলেছেন, তা সঠিক অর্থাৎ ব্যবসায় মালের যাকাত বর্তমান মূল্য হিসাব দিতে হবে। আর নিসাব পরিমাণ মালের যাকাত দেয়া ফরয, কোন কিতাবে ওয়াজিব লিখলেও তার অর্থ ফরয।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল ৬:১৪১, শামী ২:২৮৬]

(খ) ব্যবসায় পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের মূল্য হিসেবে যাকাত দিতে হবে। এটাই সঠিক।

(৫) অত্যাবশকীয় আসবাবপত্র না হওয়ায় টেলিভিশনের যাকাত দিতে হবে, এই কথাটা সঠিক নয়। কিন্তু কারো নিকট যদি টিভি এবং নিত্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্যান্য মাল মূল্য হিসাবে নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে সে যাকাত খেতে পারবে না এবং সদকায়ে-ফিতর ও কুরবানী তার যিম্মায় ওয়াজিব হবে।

(৬) সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার বাজার মূল্য বলতে বাজারে উক্ত পরিমাণ নতুন রূপা কিনতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন হয়, তা বুঝায়। সুতরাং (বর্তমান বাজার হিসেবে) ১৬০ টাকার দর হিসেবে নিসাব ঠিক করবেন। অবশ্য কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকলে (নতুন বা পুরাতন) তার ওপর যাকাত ফরয, বাজার মূল্য যাই আসুক।

ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত টাকার যাকাত

জিজ্ঞাসাঃ আমার কিছু টাকা ব্যাংকে জমা আছে, তবে ব্যাংক থেকে কোন প্রকার লভ্যাংশ গ্রহণ করি না। ব্যাংকে টাকা রাখার আগে উক্ত টাকার যাকাত সঠিকভাবে আদায় করেছি। এখন প্রতি বছর সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি-না?

জবাবঃ যদি ঐ টাকাগুলো ঋণমুক্ত হয়ে নিসাব পরিমাণ হয়ে থাকে। প্রতি বছরই ব্যাংকে জমাকৃত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। [প্রমাণঃ আলমগীরী, ১:৭১ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া,৩:৫৭ নিযামুল ফাতাওয়া, ২:২৭০ জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১:৫১]

শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলে তার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তির নিকট যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ, অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে এবং তার নিকট অন্য কোন সম্পদ না থাকে, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে কি-না? এবং তার যাকাত দেয়ার পদ্ধতি কি হবে?

জবাবঃ হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মালিক হয় এবং তার নিকট ঋণমুক্ত হয়ে আরবী বছর হিসেবে এক বছর উক্ত সম্পদ স্থায়ী থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে, যদিও তার নিকট অন্য কোন মাল না থাকে। উক্ত মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ বা তার সমপরিমাণ মূল্য যাকাত হিসেবে গরীবদেরকে প্রদান করতে হবে।

[প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার, ২:২৯৫ ও ২:২৯৯, ১:১৭৮ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:২৫৩-৫৪]

যাকাতে ঋণ প্রসঙ্গ

জিজ্ঞাসাঃ (১) যাকাতের মধ্যে কোন ধরনের ঋন মূল টাকা থেকে বাদ দিতে হবে? স্বল্প মেয়াদী ঋণ, না দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ?

(২) যারা বড় বড় ব্যবসা করে, তারা ব্যাংক থেকে যে লোন নেয় তার একটা অংশ নিয়ে শিল্প-কারখানা তৈরী করে। বাকী টাকা দিয়ে মাল কিনে। এখন প্রশ্ন হলো, এই দুই প্রকার ঋণের হুকুম কি? অর্থাৎ যাকাত দেয়ার সময় উভয় প্রকার ঋণ মূল টাকা থেকে বাদ দিবে? না উভয় মধ্যে পার্থক্য আছে?

জবাবঃ যদি কেউ হাজাতে আসলিয়া অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যথা বাসস্থান, পরিদেয় বস্ত্র, ঘরের আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি বাবদ ঋণ করে তাহলে এই ঋণ স্বল্প মেয়াদী হোক আর দীর্ঘ মেয়াদী হোক

পুরোটাই যাকাতের নিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। আর যদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য নয় বরং ব্যবসা-বানিজ্য, মিল-কারখানার জন্য শিল্প ঋন নেয়া হয়, তখন দেখতে হবে ঐ টাকা কোথায় লাগানো হয়েছে। যদি ঐ টাকা দিয়ে এমন কিছু করা হয় যার উপর যাকাত আসে না, যেমন মিল-কারখানা, মেশিনরী বস্তু ইত্যাদি তাহলে ঐ ঋণ তথা যাকাতের নিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে না। কারন, ঋন নিয়ে যেহেতু সম্পদ তথা মিল-কারখানা করা হয়েছে, সুতরাং একদিকে ঋণ আছে অপর দিকে তার পরিবর্তে সম্পদ আছে। মালিক কখনও ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে এ সম্পদ থেকে ব্যাংক তার প্রাপ্য ঋণ উসুল করে নিবে। সুতরাং এ ধরনের ঋণ যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে না। কাজেই এ ধরনের ঋণ থাকা সত্বেও কারো নিকট যদি নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রূপা বা নগদ ক্যাশ কিংবা ব্যাবসার মাল থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। আর যদি উক্ত ঋণ দিয়ে ব্যবসার মালমাল ক্রয় করা হয়, তাহলে সেই ঋণ থেকে চলতি বছরের পরিশোধযোগ্য কিস্তি পরিমাণ যাকাতের নিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। এমনিভাবে প্রতি বছর যে পরিমাণ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে সে পরিমাণ ঋণ বাদ দিয়ে বাকী সম্পদের উপর ঐ বছরের যাকাত দিতে হবে।

[প্রমাণঃ আলমগীরী ১:১৭২, ফাতহুল কাদীর ২:১২০, জাদীদ মাইশাত]

দোকান/ বাড়ী ভাড়ার জন্য প্রদত্ত এডভান্স টাকায় যাকাত

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে বাড়ী ভাড়া নিলে কিংবা দোকান ভাড়া নিলে মালিকের নিকট যে টাকা অগ্রীম জমা রাখতে হয়, এই শর্তের সাথে যে, যখন সে বাড়ী অথবা দোকান ছেড়ে দিবে তখন বাড়ী বা দোকানের মালিক তার সেই টাকা ফেরত দিবে। সেই টাকার উপর যাকাত ফরয হবে কি? যদি

সেই টাকার উপর যাকাত ফরয হয়, তাহলে সেই টাকার যাকাত কে আদায় করবে?

জবাবঃ হ্যাঁ, যিনি ভাড়া নিচ্ছেন তিনি সাহেবে নিসাব হলে তার উক্ত টাকার উপর যাকাত ফরয হবে। কেননা, উক্ত টাকা তার মালিকানায়ই রয়ে গেছে। জমা রাখার জন্য তার মালিকানা শেষ হয়নি। কাজেই ভাড়া গ্রহণকারীর উপর যাকাত আদায় করা জরুরী হবে। সুতরাং অন্যান্য মালের সাথে হিসাবে করে তার এ টাকারও যাকাত আদায় করতে হবে।

[প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার ২:৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬১]

স্বর্ণ-রৌপ্যের মিশ্রিত নিসাব যাকাতের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলার ব্যবহৃত সোনা এবং রুপার অলংকার আছে। যার মুল্য ২০,০০০ টাকা। তার নগদ কোন টাকা নেই। এখন মহিলার অলংকারের যাকাত দিতে হবে কি? যদি দিতে হয়, তাহলে তার নিকট নগদ কোন টাকা নেই, সে কোথা থেকে যাকাত দিবে?

জবাবঃ উক্ত মহিলার ২০,০০০ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রুপার অলংকারের উপর যাকাত ফরজ। কারন, (বর্তমান বাজারে) স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যদিও যাকাত ফরয হয় না, কিন্তু রৌপ্যের নিসাব ধরলে যাকাত ফরয হবে, সেটার হিসেব ধরতে হবে। নিয়ম হলো, উভয়টা থাকলে স্বর্ণ বা রুপা যেটার হিসাব ধরলে যাকাত ফরজ হয় সেটার হিসাব ধরতে হবে।

আর যাকাত আদায় এভাবে করতে হবে যে, উক্ত অলংকারের বাজারমূল্য (নতুন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য নয়) হিসাব করে তার ৪০ ভাগের এক ভাগ টাকা যাকাত দিতে হবে। নগদ টাকা না থাকলে, উক্ত অলংকারের থেকে ৪০ ভাগের এক ভাগ, অথবা কিছু পরিমাণ অলংকার বিক্রি করে যাকাত দিবে। অথবা যদি তার স্বামী কিংবা বাবা-ভাই অন্য কেউ উক্ত মহিলার

অনুরোধে নিজের টাকা দ্বারা মহিলার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয়, তাতেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ হিদায়া ১:১৯৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৫০, শামী ২:২৯৮]

وفى الهداية وفي تبر الذهب والفضة وحليهما واوانيهما الزكوة عندنا

الخ كذا في الهداية /

وفي الدر المختار ولو تبراً او حلياً مطلقاً مباح الاستعمال اولا ٢/٢٩٨

ব্যবসার মাল ও স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত আদায়ে মূল্য নির্ণয়

জিজ্ঞাসাঃ ব্যবসার মালের যাকাত ক্রয়মূল্য হিসেবে দিতে হবে, নাকি বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে দিতে হবে? ঠিক তদ্রুপ ব্যবহারিক স্বর্ণ রুপার যাকাত আদায়ে কোন মূল্য দিতে হবে?

জবাবঃ ব্যবসার মালের যাকাত বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে দিতে হবে। তদ্রুপ ব্যবহৃত সোনা রুপার যাকাতও বর্তমান বাজারে সেগুলোর বিক্রয় মুল্য হিসেবে নির্ণয় করে আদায় করতে হবে। চাই বর্তমান বাজারমূল্য ক্রয়মূল্য থেকে বেশী বা কম হোক। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:১০৮, শামী ২:২৮৬]

وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتاق وتعتبر القيمة

يوم الوجوب وقالا يوم الاداء كذا فى الدر المختار /

টাকা ও স্বর্ণ-রুপা মিলে নিসাব হলে তার যাকাতের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ স্বর্ণ বা রুপার মধ্যে যে কোন একটির গহনা আছে, কিন্তু নিসাব পরিমাণ নয়। তার সাথে কিছু নগদ টাকা এক করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা

রূপার দামের সমান হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যাকাত ফরয হবে কি-না? তার যাকাত দেয়ার নিয়ম কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, এরূপ ক্ষেত্রেও যাকাত ফরয হবে। স্বর্ণ-রূপার দাম ও নগদ টাকা মোট অংক বের করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৬:৫০-৬:১১৭-১২৭ রদ্দুল মুহতার, ২:২৯৬]

বছরের মাঝে বর্ধিত সম্পদের যাকাত প্রদানের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যখন ব্যবসা শুরু করেছিল, তখন তার মূলধন ছিল ২০,০০০ টাকা, বছর শেষে তার সম্পদের পরিমাণ হয়েছে ১,০০,০০০ টাকা। এ ব্যক্তি কত টাকার হিসেবে যাকাত দিবে?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে উক্ত ব্যক্তি এক লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করবে। কেননা, বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ বহাল থেকে মাঝ বছর যত টাকা হাতে আসবে এবং বছরের শেষ পর্যন্ত থাকবে তারও যাকাত দিতে হবে। মাঝামাঝি সময়ে অর্জিত টাকার জন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী নয়। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:২৮৩ দুররে মুখতার ২: ২৮৮]

وفي الدر المختار والمستفاد ولو بهبة اوارث وسط الحول يضم الى النصاب من جنسه فيزكيه يحول الاصل ٢/٢٨٨

স্বর্ণ-রৌপ্যের অংলকারাদির উপর যাকাত আসবে কি-না

জিজ্ঞাসাঃ মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারাদির উপর যাকাত আসবে কি-না? আর যদি ব্যবহার না করা হয় তাহলে এর কি হুকুম?

জবাবঃ মহিলাদের স্বর্ণ-রুপার অলংকার ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর সর্বাবস্থায় যাকাত ওয়াজিব। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্য হোক বা সৌন্দর্যের জন্য রেখে দেয়া হোক। [প্রমাণঃ ফাতওয়ায়ে শামী ২:২৯৮, খাইরুল ফাতওয়া ৩:৩৫৮, ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ৬:৫০]

পিতা বা স্বামী কর্তৃক মহিলাকে প্রদানকৃত অলংকারের মালিকানা ও এর যাকাতের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমার বিয়েতে আমার স্ত্রীকে মোহরানা বাবদ কিছু স্বর্ণালংকারের দিয়েছি এবং আমার শ্বশুরও তার মেয়েকে কিছু স্বর্ণলংকার দিয়েছেন। উপরোক্ত স্বর্ণালংকারের প্রকৃত মালিক কে হবে? যাকাত কার পক্ষ থেকে দিতে হবে এবং কিভাবে দিতে হবে?

জবাবঃ আপনি আপনার স্ত্রীকে মোহরানা বাবদ এবং আপনার শ্বশুর তার মেয়েকে যে স্বর্ণলংকার দিয়েছেন তার প্রকৃত মালিক আপনার স্ত্রী-ই। সুতরাং, উক্ত অলংকারাদির যাকাত আপনার স্ত্রীর পক্ষ থেকেই দেয়া ওয়াজিব। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬:৫০, হিদায়া ১:১৯৫]

চাকুরীজীবীদের বেতনের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ চাকুরীজীবীদের বেতনের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি-না? যদি এক্ষত্রে যাকাত ওয়াজিব হয়, তাহলে সেটা নির্ধারণের মানদন্ড কি হবে?

জবাবঃ চাকুরীর বিনিময়ে প্রাপ্ত বেতন দ্বারা নিজের খরচ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের খরচ ইত্যাদি নির্বাহের পর যদি ঋণ পরিশোধ করে অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার দাম যা আনুমানিক আট/দশ হাজার টাকা থাকে, আর এ টাকার বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে যদিও মাঝে কম বেশী হয়, তাহলে উক্ত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

আর যদি টাকা একত্রে জমা না হয়, বরং জমা হওয়ার আগের খরচ হয়ে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। [প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার ২:২৬০, ২৬২, ৩০২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫৪, ৩৭৩]

ঋণ দেয়া টাকার উপর যাকাত

জিজ্ঞাসাঃ ঋণ দেয়া টাকার উপর যাকাত আসবে কি-না?

জবাবঃ ঋণ দেয়া টাকা উসুল হওয়ার পর উক্ত টাকায় যাকাত দিতে হবে এবং বিগত বছরসমূহ উক্ত টাকার যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার ২:২৬৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬:৪৫,৭৭]

পাওনা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা যাকাত আদায়

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর নিকট এক লক্ষ টাকা পাওনা। কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ী তার ঋণের টাকা আদায় করবে কি-না? অথবা কখন আদায় করবে- এ সম্পর্কে স্পষ্টকরে কিছু বলেনি। এভাবে দুই/তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। আর উক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বিগত দুই/তিন বছর যাবত পাওনা টাকার যাকাত আদায় করছেন। পাওনা টাকা পাওয়ার আশায়। প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে টাকা কেবলমাত্র পাওয়ার আশা থাকে, সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি-না?

জবাবঃ কেবলমাত্র আশার উপর নির্ভর করে পাওনা টাকার যাকাত উক্ত টাকা উসুল হওয়ার পুর্বে আদায় করা জরুরী নয়। তবে পরবর্তীতে উসুল হওয়ার পর হিসেবে করে বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি একবারেই কোন টাকা উসুল করা সম্ভব না হয়, তাহলে মোটেও যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে যে কয় বছরের যাকাত আদায় করেছেন টাকা পেলে সে বছরগুলো যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে

না। [প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতাব ২:২৬৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬২, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৭:২৫৪]

প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর যাকাতের বিধান

জিজ্ঞাসাঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর যাকাত ওয়াজিব কি-না? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত কি?

জবাবঃ সরকারী কর্মচারিদের বেতন থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য বাধ্যতামূলক যে পরিমাণ টাকা কর্তন করে রাখা হয় সে প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ যেহেতু উত্তোলনের আগে কর্মচারীর মালিকানায় আসে না, তাই সরকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ ফান্ডে থাকাকালীন তার উপর যাকাত আসবে না। এ কারণে উক্ত ফান্ডের টাকা পাওয়ার বিগত বছরের যাকাতও দিতে হবে না। তবে যদি কর্মচারী উক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাধ্যতামুলক পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ রাখে অথবা কর্মজীবী যদি স্ব-উদ্যোগে ঐ ফান্ডের সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে স্থানান্তর করিয়ে নেয় সে ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ স্বতন্ত্রভাবে বা অন্য যাকাতযোগ্য মালের সাথে যোগ হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে যথা নিয়মে তার উপর যাকাত ওয়জিব হবে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬০, শামী ২:৩০৬]

وعند قبض مأتين مع حولان الحول بعده اى بعد القبض من دين ضعيف

وهو بدل غير مال كمهر ودية الخ كذا في الدر المختار ۰/

বছরের মধ্যবর্তী সময়ে টাকা হাতে আসলে যাকাত দিতে হবে কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ আমি বিদেশে কর্মরত থাকা অবস্থায় আমার বেতনের পরিমাণ জানা ছিল না। অতঃপর গত ১৯৯৩ সালের ২৫শে রমাযান ৫০ হাজার

টাকা প্রথম পেলাম। উক্ত টাকা আমার প্রয়োজন অতিরিক্ত। ৬মাস গত হওয়ার পর আবারো দু'লক্ষ টাকা পেলাম। প্রশ্ন হলো, বর্তমানে রমাযান মাসে পাওয়া এক লক্ষ টাকার বছর কখন পুরো হবে এবং এ টাকার যাকাত হবে কি-না?

জবাবঃ নেসাব পরিমাণ মাল হাতে আসার পর ঋণ অতিরিক্ত হয়ে চান্দ্রমাসে ১ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে, উক্ত মালের যাকাত দিতে হয়। বছরের মাঝে যত টাকার মালিক হবেন সেগুলো আগের মালের সাথে সংযোগ হয়ে মোট মালের যাকাত দিতে হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে সর্বশেষে প্রাপ্ত ১ লক্ষ টাকা যদি ১ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে অর্থাৎ ১৯৯৪ সনের ২৫শে রমাযানের আগে পেয়ে থাকেন তাহলে উক্ত ১ লক্ষ টাকা আগের প্রাপ্ত আড়াই লক্ষ টাকার সাথে যোগ করে মোট সাড়ে তিন লক্ষ টাকার যাকাত দিতে হবে। আর যদি চান্দ্রমাস হিসেবে বছর পুরা হওয়ার পর '৯৪ এর ২৫শে রমাযানের পর ঐ এক লক্ষ টাকা হাতে এসে থাকে, তাহলে এ বছর আর ঐ টাকার যাকাত দিতে হবে না। বরং ঐ টাকা হাতে থাকলে, আগামী বছর তার যাকাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ ১৯৯৫-এর ২৫শে রমাযান। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১:১৭৫]

ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول مالاً من جنسه ضمه الى ماله وزكاه بميراث أو هبة او غير ذالك هكذا في الفتاوى الهنديه /

গরীবদের উপকারের প্রতি লক্ষ রেখে নিসাব নির্ণয় করতে হবে

জিজ্ঞাসাঃ আপনাদের প্রকাশিত "রহমানী পয়গামে" মাহে রমাযান সংখ্যায় প্রশ্ন-উত্তর পর্বের একটি প্রশ্নের জবাবের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যেখানে যাকাতের নিসাব নির্ধারণের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যার নিকট চান্দ্রমাস হিসেবে এক বছর স্থায়ীরুপে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ

কিংবা সাড়ে বাযান্ন ভরি রৌপ্য অথবা তৎসমপরিমাণ টাকা আছে, তার উপর যাকাত ফরয। এখন দেখা দিচ্ছে যে, সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের হিসাব করা হয় তাহলে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার (সাড়ে সাত×৬০০০) কম টাকা থাকলে যাকাত ওয়াজিব হয় না। পক্ষান্তরে যদি সাড়ে বাহান্ন ভরি রুপার হিসাব করা হয় তাহলে দশ হাজার পাঁচশ টাকা (সাড়ে বায়ান্ন×২০০) হলেই তার উপর যাকাত ফরয হয়ে যায়। এখন আমার প্রশ্ন হল, এমতাবস্থায় আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে?

জবাবঃ যে নিসাব ধরলে গরীবদের উপকার হয়, সেদিকে লক্ষ্য করে আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং রৌপ্যের নিসাব ধরলে অনেক লোকের উপর যাকাত ফরয হয়। এবং গরীবদের উপকার হয় বিধায় স্বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য মালের ব্যাপারে তথা ব্যবসার মাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং স্বর্ণ-রুপা উভয়টা হলে রৌপ্যের নিসাব হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে। [প্রমাণঃ হিদায়া, ১:১৯৫]

الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب يقومها بما هو انفع للمساكين واحتياطا الحق الفقراء الخ وبقوله عليه السلام فيها يقومها فيودى من كل مأتي درهم خمسة

বন্ধকের বিনিময়ে ঋণ দেয়া উপর যাকাত

জিজ্ঞাসাঃ বন্ধককৃত মালের পরবর্তে যে টাকা প্রদান করা হয়েছে সে টাকার মূল মালিকের উপর উক্ত টাকার যাকাত দেয়া ওয়াজিব কি-না?

জবাবঃ যে কোন ঋণ, চাই বন্ধককৃত মালের পরিবর্তে দেয়া হোক, অথবা বন্ধক ব্যতীত শুধু ঋণ হিসাবে অন্যকে দেয়া হোক, সকল প্রকার ঋণই অন্য মালসহ যখন নিসাব পরিমাণ এবং তার পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত

হয়, তখন উক্ত টাকার মুল মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে ঋণের টাকা উসুল হওয়ার আগে তার যাকাত আদায় করা জরুরী নয়। উসুল হওয়ার পর তার যাকাত আদায় করা যায়। অবশ্য আগে আদায় হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩০৫, কেফায়াতুল মুফতি ৪:২৮৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৬২, ৪৫]

যাকাতের নিয়্যতে ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ যাকাতের নিয়্যতে ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে কি-না?

জবাবঃ যাকাত আদায় হওয়ার জন্য তামলীক তথা অন্যকে খালেসভাবে যাকাতের মালের মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। আর যাকাতের নিয়্যতে পাওনা ঋণ মাফ করে দিলে গরীবকে যাকাতের মালিক বানানো হচ্ছে না। সুতরাং এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের সঠিক পন্থা হলো, ঋণদাতা প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে গরীব ঋন গ্রহিতাকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিবে। তারপর তার থেকে উক্ত টাকা উসুল করে নিবে। এতে করে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ঋণও উসুল হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ২:২৭০-১:১৭১, ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৭১, ফাতাওয়া রাহহীমিয়া ১:১২]

যাকাত আদায়ের খাতসমূহ

ঋণ ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার আপন ভাইয়ের ঘরভিটা ছাড়া আয়ের কোন জায়গা-জমি নেই। আমি তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। এর জন্য ২,২০,০০০ টাকা ঋণও দিয়েছিলাম। কারো থেকে সে আরো ৫০,০০০ টাকা ঋণ করেছে। হঠাৎ গণ্ডগোল করে বিদেশ থেকে চলে আসে। বর্তমানে সে ২,৭০,০০০ টাকা ঋণী। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যায় কি-না? ঋণ পরিশোধের জন্য দিলে কিভাবে দেওয়া যায়?

জবাবঃ হ্যাঁ, আপনি আপনার ভাইয়ের ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে মালিক বানিয়ে যাকাতের টাকা দিতে পারেন। এতে আপনি অন্যান্য গরীব-মিসকীনদেরকে দেয়ার চেয়ে অধিক সাওয়াব পাবেন। যাকাতের টাকার মালিক হওয়ার পর সেই টাকা দ্বারা সে আপনার এবং অন্য লোকের ঋণ আদায় করে দিবে। উল্লেখ্য, উক্ত ঋণ বাবদ টাকা সরাসরি তার হাতে না দিয়ে আপনার যাকাত থেকে কর্তন করে দেয়া জায়িয হবে না এবং এতে আপনার যাকাত হবে না। যাকাত আদায় হবার জন্য তার যাকাত আদায়ের নিয়্যতে টাকা দিতে হবে। যাকাত দিচ্ছেন তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা জরুরী নয়। নিয়ত করা জরুরী।

[প্রমাণঃ মিশকাত ১:১৭০; ২:৩৫৩ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬৬৯; ২৯২ খাইরুল ফাতাওয়া ৩:৪০৬]

নিজ ভাই ও বোনকে হাদিয়ার নামে যাকাত দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ যাকাত বিতরনের ক্ষেত্রে আপন সহোদর ভাই ও ভগ্নি যদি গরীব থাকে, তবে তাদেরকে যাকাতের কথা না বলে টাকা-পয়সা বা কাপড় ইত্যাদি দিলে উক্ত যাকাত আদায় হবে কি-না? কারণ, যাকাতের

কথা উল্লেখ করলে, ভাই বা বোন মনে কষ্ট পাবে এবং তা গ্রহণ করতে চাইবে না। এ অবস্থায় যাকাতের হুকুম কি?

জবাবঃ সহোদর ভাই বোন যেহেতু উসুল বা ফুরূ (অর্থাৎ যাকাত দাতার মূল বা শাখার) নয় বিধায় তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে। এমনিভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে কাপড়-চোপর কিনে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অন্তরে যাকাতের নিয়্যাত রেখে মুখে তা উল্লেখ না করে এমনিতে দিয়ে দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অথবা হাদিয়া বলেও দিতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই বরং এটাই উচিত। তবে যাদেরকে দেয়া হচ্ছে, তারা গরীব বা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:২০৬; বাদায়িয়ুস সানায়ি ২:৪৯; মারাকিল ফালাহ ৫৮৯]

নিজ মেয়ের জামাইকে যাকাত দেয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। কিছু দিন পরে আমার মেয়ের জামাই গরীব হয়ে গেল। নিসাব পরিমাণ মালামাল নেই। যাকাত-ফিতরা খাওয়ার উপযুক্ত। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমি তাদেরকে যাকাত-ফিতরা দিলে তারা খেতে পারবে কি-না?

জবাবঃ যাকাত-ফিতরা নিজের উসুল বা ফুরূ অর্থাৎ আপনি যাদের থেকে দুনিয়ায় এসেছেন যেমন, মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, এমনি যত উপরের দিকে যাবে এবং আপনার থেকে যারা দুনিয়ায় এসেছে, যেমন, আপনার ছেলে-মেয়ে এবং তাদের সন্তানাদি এমনিভাবে যত নীচে যাবে, তাদেরকে যাকাত ফিতরা দিতে পারবে না। যাকাত- ফিতরা তাদেরকে দিলে যাকাত আদায় হবে না। মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার পরে তার খোরপোষ ইত্যাদি দেয়া তার স্বামীর দায়িত্ব। আর মেয়ের জামাই যেহেতু

উসুল ও ফুরূর মধ্যে শামীল নয়, তাই জামাইকে আপনার যাকাত থেকে সাহায্য দিতে পারবেন। নিজের গরীব আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত থেকে সাহায্য অধিক ফযীলতের কথা হাদীসে উল্লেখ আছে। তবে তাদেরকে যাকাতের মাল হাদিয়া বলে দেয়ার নিয়ম, যাতে যাকাতের কথা শুনার কারণে তাদের মনে ব্যাথা না লাগে। জামাইকে যাকাত প্রদান করার পর সে উক্ত টাকার মালিক হয়ে নিজের সংসারের যে কোন জরুরতে খরচ করতে পারবে। কিন্তু সরাসরি মেয়েকে বা মেয়ের সন্তানাদিকে আপনার যাকাত- ফিতরা দেয়া জায়িয হবে না। আপনি মেয়েকে বা তার সন্তানাদিকে কিছু দিতে চাইলে, তা যাকাত থেকে নয়, বরং আপনার আসল মাল থেকে হাদিয়া হিসাবে দিতে হবে।

[প্রমাণঃ আল-রাহরুর রায়িক ২:৪২৫ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬৯ তাফসীর মাআরিফুল কুরাআন (উর্দু) ৪:৪১২]

প্রতিবেশীকে না দিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমার গ্রামের প্রতিবেশীকে যাকাত না দিয়ে সমস্ত টাকা নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে কি-না? আর যদি প্রতিবেশীকে কিছু দিতে হয় তাহলে কি পরিমাণ বা কত শতাংশ দেয়া যায়? যেহেতু প্রতিবেশীরও হক আছে। আত্মীয়-স্বজনের হকও আছে।

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে যে সকল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া জায়িয নেই যেমন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, সন্তান, নাতি-নাতনী, স্বামী-স্ত্রী তাদের ছাড়া অন্যান্য নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দিলে হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। গ্রামের গরীব পাড়া প্রতিবেশী থেকে গরীব আত্মীয়-স্বজন যাকাতের

অধিক হকদার। তাই প্রথমে তাদের প্রয়োজন পুরা করে, এরপর পাড়া প্রতিবেশীকে যাকাত দিবে। আর নিজের গরীব আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যাকাতের সমস্ত টাকা দিয়ে দিলেও যাকাত শুদ্ধ হবে। তবে কম বেশী কিছু কিছু যাকাত প্রতিবেশীকেও দেয়া উচিত। এর জন্য কোন নির্ধারিত শতাংশ নেই।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৫৪, ফাতাওয়াল দারুল উলূম ৬:২১৬-২৭১]

যাকাতের টাকা দিয়ে গরীব ব্যক্তিকে বিদেশ পাটানোর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমার এক ভাইয়ের ছেলের নিজস্ব কোন সহায় সম্পদ নেই। বর্তমানে সে যে কাজ করে এতে তার সংসার চলে না। যাকাতের টাকা দিয়ে তাকে বিদেশে পাঠানো যাবে কি-না? যদি দেয়া যায় তাহলে কিভাবে দেওয়া যায়?

জবাবঃ যাকাতের এমন হকদার যে ঋণমুক্ত তাকে এক সাথে নিসাব পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৮৫০০ টাকা দেয়া মাকরূহ। কাজেই আপনার ভাইকে বিদেশে পাঠানোর জন্য এক সাথে নিসাব পরিমাণ যাকাত দেওয়া মাকরূহ। সহজ সুরত হলো যে, প্রথমে সে কারও নিকট থেকে টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার খরচাদি সম্পন্ন করবে। অতঃপর আপনি ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে যাকাতের পরিমাণ নিসাবের চেয়ে বেশী হলেও অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য যে, একান্ত প্রয়োজনের সময় কোন অমুসলিম দেশে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান করে বৈধ চাকুরী করা এই শর্তে জায়েয আছে যে, সেখানে অবস্থান করার সময় বাস্তব জীবনে দ্বীনের হুকুম-আহকাম পালন করার ব্যাপারে আস্থাশীল হবে এবং সেখানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী

এবং অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার ব্যাপারেও আস্থাশীল হবে। যে দেশে দ্বীন- ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা আছে, সে দেশে যাওয়া, অবস্থান করা জায়িয নেই।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৩৩, ফাতাওয়া শামী ২:৩৫৩, খাইরুল ফাতাওয়া ৩: ৪০৬]

পাওনাদার মহিলাকে যাকাত দেওয়ার বিধান

জিজ্ঞাসাঃ স্বামীর নিকট থেকে মহিলা যে পরিমাণ মহর পাওনা আছে, এছাড়া অন্য কোন মাল মহিলার কাছে নেই। এমন মহিলাকে যাকাত দেয়া জায়িয হবে কী?

জবাবঃ যদি মহর চাওয়া মাত্র নগদ আদায়যোগ্য হয় এবং স্বামী নগদ আদায়ে সামর্থবান হয়, তাহলে মহিলাকে ধনী ধরা হবে এবং তাকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না। কিন্তু যদি স্বামী তাৎক্ষণিকভাবে মহর আদায় করতে অসামর্থবান হয় অথবা মহর নগত আদায়যৌগ্য না হয় তাহলে উক্ত মহিলাকে যাকাত দেয়া যাবে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫৬, ফাতাওয়া শামী ৬:৩১২]

যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না

জিজ্ঞাসাঃ কাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না? মা যদি সাহেবে নিসাব হয়, তাহলে তার ইয়াতীম বাচ্চাদেরকে মার নিজের যাকাত দেয়া জায়েয আছে কি?

জবাবঃ যাকাত-ফিতরা নিজের উসুল বা ফুরূ অর্থাৎ আপনি যাদের থেকে দুনিয়ায় এসেছেন যেমন, মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, এমনি যত উপরের দিকে যাবে এবং আপনার থেকে যারা দুনিয়ায় এসেছে, যেমন,

আপনার ছেলে-মেয়ে এবং তাদের সন্তানাদি এমনিভাবে যত নীচে যাবে, তাদেরকে যাকাত ফিতরা দিতে পারবে না। যাকাত-ফিতরা তাদেরকে দিলে যাকাত আদায় হবে না। তেমনীভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বা ধনীকে বা বিধর্মীকে যাকাত দেয়া জায়িয নয়। সুতরাং ইয়াতীম হোক বা না হোক মা নিজের ছেলেকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। [প্রমাণঃ হিদায়া১:২০৬ বাদাইস সানায়ি, ২:৪৯]

অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া যাবে কি-না?

জবাবঃ না কোন অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যাবে না। অবশ্য যাকাত ছাড়া অন্যান্য সদকা যেমন, ফিতরা ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম গরীবদেরকে দেয়া যায়। তবে উত্তম হলো, অন্য সদকাগুলোও মুসলমান গরীবদেরকে দেওয়া।

[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ১৫৫ ফাতাওয়া শামী, ৬:৩৫১ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৬:২২০]

রাজনৈতিক দলকে যাকাত দেওয়ার বিধান

জিজ্ঞাসাঃ যদি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল যাকাতের টাকা, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি চিকিৎসা সেবার নামে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করে অথচ এর দ্বারা উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। আর এ সমস্ত খাতে যা অর্জিত হয় তা তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যথা- ইলেকশনের খরচাদি থেকে রাজনৈতিক কর্মীদের ভাতা হিসাবে প্রদান করে থাকে। এ রকম দলকে উল্লেখিত সদকা প্রদান কোন পর্যায়ের? আর ঐ সমস্ত দলের পক্ষে এ সমস্ত টাকা ব্যবহার করা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ সদকায়ে ওয়াজিবকে ইলেকশনে ও কর্মীদের ভাতা হিসেবে প্রদান ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যায় করা বৈধ হবে না। যারা এ সমস্ত খাতে এ অর্থ ব্যয় করে তাদেরকে এ জাতীয় সদকা প্রদান করা জায়িয নয়। যেকোন সদকার সবচেয়ে ভাল ব্যবহার হচ্ছে মাদরাসার গরীব ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা। গরীব আত্মীয়-স্বজনকেও যাকাতের মাল দেয়া উচিত। অবশ্য তাদেরকে হাদিয়া বলে দেয়া ভাল যেন তারা কষ্ট না পায়।

[প্রমাণঃ খাইরুল ফাতাওয়া, ৩: ৩৯৭]

মসজিদ মাদরাসার কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদ-মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদির নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে কি-না? যদি কেউ ব্যয় করে ফেলে তাহলে তার যাকাত আদায় হবে কি?

জবাবঃ যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যাকাতের প্রকৃত হকদারকে বিনা বিনিময়ে মালিক বানিয়ে দেয়া। মালিক বানানো ছাড়া যাকাত আদায় হয় না। নির্মাণ কাজে ব্যয় করলে যেহেতু কোন হকদার ব্যক্তিকে বিনিময়েহীনভাবে মালিক বানানো হয় না, সেহেতু মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদির নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়িয হবে না এবং এতে যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং এ সব নির্মাণ কাজে কেউ যাকাত দিয়ে থাকলে ঐ পরিমাণ টাকা যাকাত পূনরায় আদায় করতে হবে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:২৮২ আলমগীরী, ১:১৮৮]

যাকাতের মাল জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয় করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ যাকাতের মাল জনকল্যান কাজে, যেমন- মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদির জন্য খরচ করা যাবে কি-না? যাতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে উপকৃত থেকে পারে।

জবাবঃ যাকাতের মাল শুধুমাত্র গরীবদের ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দিলেই যাকাত হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ যাকাতের মাল কোন বিশেষকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয় না। প্রিয়নবী ﷺ হযরত মু'আয রাযি.-কে বলেছেন, এ সম্পদ ধনীদের থেকে গ্রহণ করে ফকীরদের মধ্যে বিতরণ করার কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাদেরকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

[প্রমাণঃ খাইরুল ফাতাওয়া, ৩:৩৮৮]

সরকারী ফান্ড যাকাত দেয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত দেয়া যাবে কি-না?

জবাবঃ যে সরকার নামায কায়িম করে না, ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে যাদের কোন অবদান নেই, সে সরকারের যাকাত উসুল করার কোন অধিকার নেই। যাকাত কোন মামুলী জিনিস নয়। এটা কোন ছিনিমিনি খেলার বস্তু নয়। যাকাত আল্লাহ তা'আলার বড় হুকুম এবং ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। যাকাত একদিকে দান, অপরদিকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যাকাত আদায় করতে হলে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট খাতে তা ব্যয় করা অপরিহার্য। যে সরকার কুরাআন সুন্নাহর ভিত্তিতে দেশে পরিচালনা করে না, সে সরকার শরী'আতের দৃষ্টিতে যাকাত আদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা রাখে না। তাই এরূপ সরকারী ফান্ডে যাকাতের টাকা দেয়া জায়িয হবে না। বরং মুসলমানদের কর্তব্য নিজের হাতে সঠিক খাতে যাকাত দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সম্পন্ন করতঃ আল্লাহর

দরবারে দায়মুক্ত হওয়া, অথবা হক্কানী উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে যাকাত বিতরণের দায়মুক্ত হওয়া। বিগত কয়েক বছর যাবত সরকারী ফান্ডে যাকাত প্রদানের আবেদনের জন্য সরকার কতিপয় আলেমকে ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ হক্কানী উলামায়ে কিরাম সরকারের ধর্মদ্রোহী ভূমিকার কারণে তাদের এ আবেদনের বিরোধীতা করে আসছেন। এবং সরকারী ফান্ডে যাকাত দেয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করে আসছেন। সুতরাং, নিজের আখিরাতের ব্যাপারে ঝুঁকি নেয়া দ্বীনদার মুসলমানদের কাজ নয়। উল্লেখ্য, ধূর্ত ইংরেজ জাতির পাকাপোক্ত অভিজ্ঞতা, সমগ্র বিশ্বের উপরে কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কায়েম করতে একমাত্র বাধা হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার মুসলমান। এদের কেন্দ্র হল মসজিদ মাদরাসা সমূহ। সুতরাং এগুলো বন্ধ না করতে পারলে, তাদের প্রভূত্ব কায়িম হবে না। কতিপয় আরবদেশে গরীব-মুসলমান দেশের জন্য এবং ঐসব মসজিদ-মাদরাসা সমুহের জন্য যথেষ্ট অবদান রাখতো, তা ইসলাম বিদ্বেষী ঐ চক্রের বরদাশত হয়নি। সেখানে এক পরিকল্পিত যুদ্ধের অভিনয় করে তারা ঐসব দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এর পরে সেসব দেশের দানবীদের একান্ত সংস্থা মসজিদ-মাদরাসা সমূহে সামান্য অবদান রাখতো, সেটাও বন্ধ করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করে চলছে। এরপরও তারা ক্ষান্ত হয়নি। মাদরাসাগুলোর গরীব ছাত্ররা যেহেতু অনেকটা যাকাতের উপর নির্ভরশীল। এ জন্য মাদরাসাসমূহের আমদানী বন্ধ করার জন্য তারা সরকারকে নসিহত করেছে গরীব- দুঃখীদের জন্য সরকারী পর্যায়ে যাকাত উসুল করতে। তাদের নসীহত বাস্তবায়নে যেহেতু গনবিক্ষোভের আশংকা আছে, এ কারণে তারা নিজেরা যাকাত চাচ্ছে না, বা সংসদেও বিল পাস করছে না, বরং কতিপয় আলেম দ্বারা আবেদন-নিবেদন পেশ করাচ্ছে। যতদুর ধারনা করা যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য, এভাবে যখন পরিস্থিতি পক্ষে

আসবে, তখন যাকাত উসুলের ব্যাপারে কঠোরতা প্রয়োগ করবে। যাতে করে ধনীগন মাদরাসা সমূহ আর সাহায্য করার সুযোগ না পায়। ফলে মাদরাসা সমূহ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই ইসলাম বিদ্বেষী চক্রের খাহেশ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা। সুতরাং সরকারকে যাকাত দেয়ার অর্থই মাদরাসা সমূহ বন্ধ করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সহযোগিতা করা।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:২৮৫ জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ২:৮৯ মাআরিফুল কুরআন, ৪:২০০]

যাকাতের টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রেখে তা ভোগের জন্য গরীবকে দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার আপন বোনের একটি মেয়ে, দুটি ছেলে নাবালক। তার আর্থিক সচ্ছলতার জন্য যাকাতের টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রেখে সেই জমির ফসল বোনকে খেতে দিলাম। এতে আমার যাকাত আদায় হবে কি-না? আর যাকাতের যে টাকা দিয়ে জমিন বন্ধক রাখলাম সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি-না? যদি সেই টাকার যাকাত দিতে হয়, কে দিবে? যে এসব ভোগ করে-সে দিবে, না আমি দিব?

জবাবঃ যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত হলো, গরীব-মিসকীনকে কোন বিনিময় ছাড়া যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেয়া, আর বন্ধক রেখে তার ফসল বোনকে খেতে দেওয়ার দ্বাড়া আপনার যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং এখন আপনার কর্তব্য হলো, জমি বন্ধক রাখা টাকা উঠিয়ে আপনার বোনকে বা যে কোন গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয়া আর এ টাকার মধ্যে ভিন্নভাবে কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ, টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রেখে উক্ত জমি ভোগ করা সুদ এবং হারাম। তাই আপনি জমি বন্ধক না রেখে, আপনি যাকাতের টাকা দিয়ে জমি কিনে আপনার বোনকে দিতে পারেন এবং সে সময় যাকাতদাতা বা

যাকাত গ্রহিতা কারও উপর সে জমি মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২:২৫৭]

যাকাতের বিবিধ মাসাইল

যাকাত আদায়ের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ যাকাত আদায় করার হুকুম কি?

সাহেবে নিসাব অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকার ব্যক্তির জন্য যাকাত আদায় করা শরী'আতের দৃষ্টিতে ফরয। যাকাত ইসলামের আরকানের মধ্যে অন্যতম একটি রোকন। যাকাত অস্বিকার করলে ঈমান চলে যায়। আর যাকাতের ফরযিয়্যাত স্বীকার করে তা আদায় না করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

যাকাত তরককারীর পরিণতি

জিজ্ঞাসাঃ যাকাত আদায় না করলে কি হবে?

জবাবঃ যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন, সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর যারা স্বর্ণ-রূপা, (ধন-সম্পদ) জমা রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে (অর্থাৎ যাকাত দেয় না) তাদেরকে কঠোর আজাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তাদের সম্পদ উত্তপ্ত করা হবে। এবং এর দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশকে দগ্ধ করা হবে, সে দিন বলা হবে, এগুলো (সেই সম্পদ) যা তোমরা (যাকাত না দিয়ে) নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন (যাকাত না দিয়ে) মাল জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ কর। "[সূরা তাওবা, ৩৪,৩৫]

এমনি ভাবে অনেক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, "যারা মালের যাকাত দেয় না তাদের সম্পকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন তাদের ধন-সম্পদ বিষাক্ত সাপের

আকৃতি ধারন করবে, যার থেকে সেসব সম্পদের মালিক পলায়ন করতে থাকবে আর সেই সাপ তাকে খুঁজতে থাকবে। (পরিশেষে তাকে ধরে ফেলবে) এমনি এক পর্যায়ে তার হাতের আঙ্গুলসমূহ গিলে ফেলবে। মিশকাত শরীফঃ১/৫৭]

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার গলায় (সেই মালকে সাপ বানিয়ে ঝুলিয়ে দিবেন।" [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১৫৭, তিরমিযী শরীফ, নাসায়ী শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফ]

এতদভিন্ন যাকাত না দেয়ার আরো অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু যাকাত মালকে পবিত্র করে দেয়, তাই কেউ যদি পূর্ণ হিসাব করে যাকাত আদায় না করে, তাহলে যাকাতের সেই মাল তার আসল মালকে ধ্বংস করে দেয়। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ১৫৭ পৃঃ]

এ পরিণতি কখনো মালিকের জীবদ্দশায়ই ঘটে থাকে। আবার কখনো তার উওরসুরীদের জীবনে ঘটে।

সঠিক হিসাব না করে যাকাত দেওয়া হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ যারা হিসাব-কিতাব ছাড়া কিছু মাল যাকাত হিসেবে আদায় করে দেয়, এর দ্বারা তাদের যাকাত আদায় হবে কি?

জবাবঃ যাকাত না দেয়া অপরাধ, তেমনিভাবে সঠিক হিসাব না করে বা ঠিকমত আদায় না করা বা কম দেয়াও যাকাত না দেয়ার মতই অপরাধ। ফরয যাকাতের পরিমাণ থেকে যদি সামান্য কিছুও আদায় না করা হয়, তাহলে যাকাত অনাদায়কারীর কাতারে দাঁড়াতে হবে। এজন্যই তো আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেছিলেন যে "কোন ব্যক্তি যদি যাকাতের উটের

সাথে একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে দেয়া হতো, তাহলে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব।" [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১:১৫৭]

যাকাতের নির্ধারিত টাকা থেকে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ অনেক সময় গরীব-মিসকীনদের যাকাত দিতে দিতে যাকাতের নির্ধারিত টাকা শেষ হয়ে অতিরিক্ত দেয়া যায়। এখন অতিরিক্ত টাকা দান করার সময় পরবর্তী বছরের যাকাতের নিয়্যাত করলে, তা আগামী বছরের যাকাত হিসেবে আদায় হবে কি?

জবাবঃ যদি কেউ শুরু থেকেই এ নিয়্যাত করে নেয় যে, এ বছর যা যাকাত আদায় করতে যাচ্ছি, তার চেয়ে অতিরিক্ত যা দেয়া হবে, তা আগামী বছরের অগ্রীম যাকাত হিসেবে আদায় করবো। তাহলে অতিরিক্ত টাকা আগামী বছরের যাকাতের মধ্যে গণ্য হবে।

তবে উক্ত অতিরিক্ত টাকার মধ্যে যাকাতের নিয়্যাত না করা ভাল। কারণ, ধণীদের মালের মধ্যে যাকাত ছাড়াও সাধারণ দান হিসেবেও গরীবের হক আছে। তাছাড়া ফরজ যাকাতের মধ্যে কিয়ামতের ময়দানে কোন ত্রুটি বের হলে, নফল দান দ্বারা তা পূর্ণ করা হবে। সুতরাং নফল দানও করা উচিত।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৯২]

বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বা পরে যাকাত আদায় করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ রমাযানের আগেই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরও বিলম্ব করে রমাযান মাসে যাকাত আদায় করাতে কোন অসুবিধা আছে কি? এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান কি?

জবাবঃ যখন কারো মালের নিসাবের উপর আরবী মাস (অর্থাৎ চাঁদের) হিসাবে বছর পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। তাই কোন ব্যক্তি যদি রমাযান মাসের আগেই নিসাবের মালিকের হয়ে থাকে, তাহলে তার পরবর্তী বছরের রমাযাস মাসের অপেক্ষা করা ঠিক না। বরং উক্ত ব্যক্তি প্রথমে যে মাসে নিসাবের মালিক হয়েছে পরবর্তী বছর ঠিক সেই মাসেই তার উপর যাকাত ফরয এবং অনেক ফিকাহবিদদের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে দেয়াই ওয়াজিব। যদিও দ্বিতীয় বর্ণানা হিসেবে বিলম্ব করে আদায় করারও অবকাশ আছে। তবে বিলম্ব না করার মধ্যেই অধিক সতর্কতা। কেননা, অসতর্কতার কারণে আরো একটি অসুবিধা হয়ে থাকে, তা হল যখন তার নিসাবের বছর পূর্ণ হল, মনে করুন তখন তার মাল ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা; কিন্তু তখন সে তার মাল হিসাব করে এটা ভেবে যাকাত দেয় নি যে, রমাযান মাস আসলে যাকাত দিবে। পরবর্তীতে যখন রমাযান মাস আসলো, তখন সে তার বর্তমান মাল হিসাব করল এবং দেখল তিন লক্ষ টাকা তার হাতে আছে। কারণ, ইতিমধ্যে তার কিছু টাকা লোকসান হয়ে গেছে বা বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ হয়ে গেছে। আর উক্ত হিসাব মতে সে তিন লক্ষ টাকারই যাকাত আদায় করল। বাকী দুই লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করল না, ফলে উক্ত দুই লক্ষ টাকার যাকাত তার উপর উপর রয়ে গেল এবং যাকাত দিয়েও যাকাত অন্যদায়কারীর কাতারে তার নাম উঠল। রমাযানের অপেক্ষা করার কারণে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এ অসুবিধাগুলো দেখা দিলো। অবশ্য নিসাবের বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি রমাযান বা যে কোন মাসে যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে নিয়ম হল, চান্দ্র মাসের হিসেবে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই রমাযানের যাকাতের নির্দিষ্ট একটি অংশ আদায় করে দিবে। তারপরে চান্দ্র বছর পূর্ণ হলে চুড়ান্ত হিসাব করে অবশিষ্ট অংশের

যাকাত আদায় করে দিবে। আর যদি প্রথমবারেরই ওয়াজিব পরিমাণ থেকে বেশী দিয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত অংশ নফল হিসেবে গন্য হবে বা তার পরবর্তী বছরের অগ্রিম যাকাত হিসেবেও গণ্য করতে পারবে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:২৫৫]

নিকবর্তী আত্মীয়দের বাদ দিয়ে দুরবর্তী লোকদের যাকাত দেয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ নিজ দাদী শ্বাশুড়ীর বিধবা, দুস্থ-অসহায় ও গরীব দুই সহোদর বোনকে বঞ্চিত করে, যথেষ্ট পরিমাণ যাকাত-ফিতরার টাকা অজানা ভিন্ন স্থানের লোকদের দেয়া উচিত হবে কি?

জবাবঃ নিজ গরীব আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র পাড়া-প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ ইয়াতিম-মিসকীনদের না দিয়ে অন্য এলাকার অচেনা-অজানা গরীবদেরকে যাকাত ফিতরা দিলে তা আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব কম হবে। যাকাত আদায়ের বেলায় উচিত হল নিজের নিকটবর্তী গরীব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া- প্রতিবেশীদেরকে প্রথম প্রদান করা। অতঃপর দূরবর্তী আত্মীয় (যেমন প্রশ্নে বলা হয়েছে) এরপর দূরবর্তী এলাকার গরীবদের দেয়া। তবে নিজ এলাকা থেকে অন্য এলাকার লোক বেশী অসহায় হলে, সেক্ষেত্রে অন্য এলাকায় যাকাত প্রেরণ করতে পারে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। [প্রমাণঃ হিদায়া১:২০৮:২৯২ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:২৯৪ ফাতাওয়া রহিমিয়া ৫:১৫৫]

সদকা ও যাকাতের বেশী হকদার কারা?

জিজ্ঞাসাঃ সদকায়ে ফিতরা, যাকাত ও কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকার প্রথম হকদার কে? ইয়াতীম-গরীব আত্মীয়, না গরীব, ইয়াতীম-মিসকীন, আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দিয়ে দেয়া হয় আর যথাসম্ভব নফল দানের

টাকা মাদরাসায় দেয়া, তবে তাকওয়ার দৃষ্টিতে কোনটি উত্তম? কুরআন-হাদীস থেকে জওয়াব দিবেন।

জবাবঃ সদকায়ে ওয়াজিব অর্থাৎ যাকাত, ফিতরা বা কুরবানীর চামড়ার মূল্য এমনিভাবে নফল দানের সবচেয়ে বেশী হকদার গরীব তালিব ইলম। তারপর গরীব আত্মীয়-স্বজন, অতঃপর সাধারণ গরীব।

যেহেতু ফুকাহায়ে কিরামের বর্ণনা মতে ফযিলতের ক্ষেত্রেও তালিবে ইলমদেরকে দান করলে ৩ গুন সাওয়াব (অর্থাৎ দান, দীনের সহায়তা ও সদকায়ে জারিয়ার নেকী) পাওয়া যাবে।

পক্ষান্তরে গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে ২গুণ সাওয়াব। দান করা ও আত্মীয়তা রক্ষা। সাধারণ গরীবদের বেলায় শুধু যাকাত, ফিতরাই নয় বরং যাকাত-ফিতরার পাশাপাশি সাধারণ দানও করতে থাকলে আরো বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে এতে বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

উল্লেখ্য, শরী'আতের দলীল চারটি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং কিয়াস নতুন কোন জিনিস নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ থেকেই সংগৃহীত। সুতরাং, তা অমান্য করা কুরআন-সুন্নাহ অমান্য করার শামিল। কাজেই, কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি দলীল দিতে বলা ঠিক নয়। বরং এটা পথভ্রষ্ট লোকদের দাবী। [প্রমাণঃ সূরা বাকারাহ,২৭৩]

সদকাতুল ফিতর

নিজ কাজের লোককে ফিতরা দেয়া যাবে কিনা

জিজ্ঞাসাঃ নিজ বাড়ীর কাজের মেয়েকে সমস্ত ফিতরা দেয়া কি জায়িয?

জবাবঃ যদি নিসাবের মালিক না হয়ে থাকে, তাহলে নিজ বাড়ীর কাজের মেয়েকে সমস্ত ফিতরা জায়িয আছে। তবে প্রারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া জায়িয নয়। তার পারিশ্রমিক আলাদাভাবে দিতে হবে।

[প্রমাণঃ তাতারখানিয়া, ২: ৪২৩ আলফিকহু আলা মাজহিবিল আরাবাআহ, ১: ৬২৭]

ঈদের আগে বা পরে ফিতরা দেয়ার হুকুম কি? ইসলামী সংগঠনকে ফিতরা দেয়া যাবে কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ সৌদিতে ফিতরা নেয়ার যোগ্য লোক খুব কম। প্রবাসী বাঙ্গালীরা নিজ দেশে উপযুক্ত প্রার্থীর নিকট ঈদের ২/৩ দিন আগে কিংবা ৫/৭ দিন পরে ফিতরা পৌঁছালে ফিতরা আদায় হবে কি? অথবা ঈদের নামাযের আগে প্রার্থীকে পৌঁছানো নিয়্যাত আলাদা রেখে দিলে পরে পাঠানোর সুযোগ আছে কি? দেশের ইসলামী সংগঠনকে ফিতরা দেয়া যাবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, এভাবে দিলেও সদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে যাবে। এতে কোন গুনাহ হবে না। তবে উত্তম হলো ঈদের নামাযের আগেই ফিতরার টাকা গরীবদের নিকট পৌঁছে দেয়া। আগে আলাদা করে রেখে পরে পাঠিয়ে দিলে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে।

সহীহ ইসলামী সংগঠনকে ফিতরা দেয়া যাবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তারা ফিতরার টাকা সঠিক খাতে অর্থাৎ গরীব-মিসকীনদেরকে

মালিক বানিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, সহীহ ইসলামী সংগঠন হওয়ার শর্ত হলো, তাদের ঈমান-আকীদা সহীহ থাকতে হবে। যদি এসব ঠিকমত পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে যাকাত-ফিতরার টাকা দেয়া যায় এবং তারা সে টাকা গরীব-মিসকীনদের খাতে ব্যয় করবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১:১৯২-১৯৪ আল বাহারুলরা রায়িক, ২:২৫৫]

ঈদের পরে ফিতরা দিলেও ওয়াজিব হিসেবেই আদায় হবে, নফল হবে না

জিজ্ঞাসাঃ কোন লোক যদি ঈদুল ফিতরের দিনের আগে অথবা ঈদের নামাযের পরে সদকায়ে ফিতর আদায় করে, তাহলে তার সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হিসেবে আদায় হবে, না সাধারণ দান হিসেবে আদায় হবে?

জবাবঃ সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতরের দিনের আগে বা পরে আদায় করলে উভয় সুরতে তা ওয়াজিব হিসেবে আদায় হয়ে যাবে এবং সদকায়ে ফিতর হিসেবেই গণ্য হবে। সাধারণ দান হিসেবে হবে না। তবে সদকায়ে ফিতর ঈদের দিন ঈদের নামাযের আগে আদায় করাই সর্বোত্তম।

[প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়িক ২:২৫৫; আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৩৭৪ হিদায়া ১:২১১]

পিতার জন্য সন্তানাদির ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ পিতার জন্য সন্তনাদির ফিতর দেওয়া ওয়াজিব হলে তার সন্তানাদির পক্ষে থেকে তার উপর ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব কি-না?

জবাবঃ নিজের পক্ষে থেকে যেমন ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব তেমনি নাবালিগ সন্তানাদির পক্ষ থেকেও ফিতরা দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব। অবশ্য যদি নাবালিক সন্তান ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী তথা নিসাবের

মালিক হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে আদায় করবে। পিতার নিজ সম্পদ থেকে দেওয়া জরুরী নয়। আর বালিগ সন্তানদের ফিতরা পিতার উপর কখনো ওয়াজিব নয়। তবে যদি পিতা আদায় করে দেয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে। তাছাড়া কোন নাবালিগ মেয়েকেও যদি বিবাহ দেয়া হয় আর সে তার স্বামীর খিদমত করার যৌগ্য হয় তাহলে ফিতরা পিতার উপর ওয়াজিব হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী,২ ৩৬২ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৬:৩১৫]

ধান চাল ফিতরা আদায় করার সুরত

জিজ্ঞাসাঃ ধান চাল দিয়ে ফিতরা আদায় করা যাবে কি-না? যদি যায় তাহলে এর নিয়ম কি?

জবাবঃ ধান চাল দিয়ে ফিতরা দেয়া জায়িয আছে। সেক্ষেত্রে পৌণে দুই সের গম বা আটার মূল্যে যে পরিমাণ ধান বা চাল আসে সে পরিমাণ দিতে হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী,২ :২৬৪ ইমাদুল আহকাম, ৩:৪০]

উশর/ট্যাক্স

বাংলাদেশের জমিন উশরী না খারাজী? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

জিজ্ঞাসাঃ বাংলাদেশের জমিন উশরী না খারাজী ও বাংলাদেশের লোকেরা উশর আদায় করবে, না খারাজ আদায় করবে? আর যদি উশর দিতে হয় তাহলে ১০ মণে ১মণ না দিয়ে ২০মণে ১মণ দিলে হবে কি-না? কারণ হলো, আগের দিনে বৃষ্টির পানিতেই আবাদ হতো, কিন্তু এখন (খাজনা) সার, বিষ ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

যদি কোন জমি আবাদযোগ্য হয় কিন্তু সে জমিনে কোন চাষাবাদ করা না হয় তাহলে সে জমির খাজনা ও বিভিন্ন কর, উশর বা খারাজের বিকল্প কি-না?

জবাবঃ বাংলাদেশের জমি উশরী না খারাজী, তা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেয়া জটিল। কেননা বৃটিশ সরকার এদেশের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা হাতে নেয়ার পরে উলামায়ে কিরাম একদিকে এদেশেকে ‘দারুল হরব’ ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হওয়ার ফাতাওয়া দিয়েছেন। আর দারুল হরবের জমি উশরী বা খারাজী কোনটাই হতে পারে না। যা বিভিন্ন কিতাবের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। অপরদিকে ফিকহী কিতাবের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত হুকুম ঐ সমস্ত দারুল হরব সম্পর্কে, যা আগে থেকেই দারুল হরব ছিল। অথচ আমাদের দেশে আগে থেকেই দারুল হরব ছিল না। বরং আটশত বছর দারুল ইসলাম থাকার পর দারুল হরব হয়েছিল। সুতরাং ঐ হুকুম আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া ইংরেজরা এদেশের ক্ষমতা দখল করার পর যে সমস্ত জমি মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের মালিকানা বাতিল করে হিন্দুদেরকে জমিদারী প্রদান করে। ঐ সমস্ত জমি আর উশরী থাকে না। কিন্তু সে সমস্ত

জমি নিদির্ষ্টভাবে শনাক্ত করাও কঠিন ব্যাপার, এ সব কারণে আমাদের দেশের জমি ধারাবাহিকভাবে মুসলমানদের মালিকনায় চলে আসছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলোকে উশরী ধরে উশর আদায় করা কর্তব্য। অতঃপর অবস্থাভেদে প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যের দশভাগের এক ভাগ বা বিশভাগের এক অংশ উশর আদায় করতে হবে। অর্থাৎ যদি জমির সেচ বৃষ্টির পানিতেই সম্পন্ন হয় এবং সেচকার্যে ডিপ টিউবওয়েল বা অন্য কোন খরচ না লাগে তাহলে দশ ভাগের একাংশ অন্যথায় বিশ ভাগের একাংশ আদায় করবে। তবে সারের খরচের কারণে উশরের পরিমাণ কম হবে না। কেননা, উশরের পরিমাণ ২০ ভাগের একভাগ হওয়ার ব্যাপারে শুধু সেচকার্যের খরচেই ধর্তব্য, সার ইত্যাদি বা অন্য কোন খরচ ধর্তব্য নয়। কেননা, সার প্রয়োগের ফলে কিছু বাড়তি খরচ লাগলেও তাতে ফসলের পরিমাণও অনেক বেড়ে যায়, নিশ্চয় তা সারের খরচের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। তাই সারের খরচের কারনে উশর কম হবে না।

আর যদি প্রমানিত হয় যে, উক্ত জমি বিধর্মীর হাত থেকে মুসলমানদের হাতে এসেছে, তাহলে খারাজী গণ্য করে প্রত্যেক বছর একবার খারাজ বা ট্যাক্স আদায় করবে। আমাদের দেশে সরকারের পক্ষ থেকে যে খাজনা নেওয়া হয়, তাতে দাতা যদি খারাজ আদায়ের নিয়্যাত করে, তাহলে খাজনা দ্বারাই খারাজ বা ট্যাক্স আদায় হয়ে যাবে। তবে জমির কর ও খাজনা উশরের বিকল্প হিসেবে গন্য করা হবে না। বরং উশরও যাকাতের ন্যায় কেবল গরীব-মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে হবে। আর যদি উল্লেখিত কোন সুরত জানা না যায় বা সন্দেহ হয়, সে ক্ষেত্রে সতর্কতা হিসেবে উশর আদায় করা ভাল।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল ১২:৩০৫ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:৩৩৮, ৩৪৫, আদ দুররুল মুখতার ২:৩৩৯]

ঘুষ দিয়ে ট্যাক্স কমানো

জিজ্ঞাসাঃ সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের উপর আরোপিত নির্ধারিত ট্যাক্স এর পরিমাণ কমিয়ে সরকারী খাতে জমা দেয়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

জবাবঃ সরকারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচাদি ও ব্যয় প্রথমতঃ সরকার রাজস্ব আয় থেকে বহন করবে। আর যদি অপচয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ ব্যাতিরেকে জরুরী ব্যয়ের খাত আয়ের তুলনায় বেশী হয়, তাহলে যে পরিমাণ বাড়তি অর্থের প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ অর্থের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষ সরকার ধণী ব্যক্তিদের প্রতি ট্যাক্স আরোপ করতে পরাবে।

(ক) ট্যাক্সের হার সম্পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতে, জনগনের বহন ক্ষমতার ভিতরে ও যুক্তিযুক্ত হতে হবে।

(খ) ট্যাক্স নিরুপণ পদ্ধতি হতে হবে একবারে সাদাসিধে, যা বুঝতে সাধারণ লোকের কষ্ট না হয় এবং কতৃপক্ষের ঘাপলা করার সুযোগ না থাকে।

(গ) ট্যাক্স এর আদায় পদ্ধতির হতে হবে অত্যন্ত সহজ ও ঝামেলা মুক্ত, যেন তা আদায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

উল্লেখিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে একটি শর্তও বাদ দিয়ে অথবা সঠিকভাবে পালন না করে যদি ট্যাক্স আরোপ করা হয়, তবে সেটা নিশ্চিতরূপে জনগনের উপর জুলুম ও অত্যাচার হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা হবে সম্পুর্ণভাবে শরী'আতের পরিপন্থী। আর বর্তমানে উল্লেখিত শর্তসমূহের অনুস্মরন করা হয় না; বরং সরকারী আমলাদের যাবতীয়

ভোগ-বিলাস, অপচয় ও অপব্যয় এবং আত্মসাতের সকল বোঝা ট্যাক্স আকারে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। আর ট্যাক্স নির্ধারণকারী ও ট্যাক্স আদায়কারীও সাধারণতঃ জুলমের কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতে রাজি হয় না। আর এ জন্য আইনের আশ্রয় নিতে গেলে ভোগান্তি আরো কয়েকগুণে বেড়ে যায়। এ জুলুম থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো এবং ঘুষ দেয়া থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকতে চেষ্টা করা উচিত। এর ফলে আর্থিক কিছু ক্ষতি হলেও তা বরদাশত করে নিতে হবে। এতটুকু করার পরও যদি জুলুম থেকে বাঁচার কোন পথ না থাকে এবং একান্ত অপারগ হয়ে জুলুম থেকে বাঁচার জন্য হিলা-বাহানা করে, তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। অবশ্য গ্রহিতার ক্ষেত্রে তা সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ হারাম হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়াহ, ৫:১১৭ ফাতাওয়া শামী, ৬:৪২৩-২৪]

বিবাহ

বিবাহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলী

জিজ্ঞাসাঃ পত্র বা টেলিফোনের মাধ্যমে বিবাহ জায়েয কি-না?

জবাবঃ পত্রের মাধ্যমে বা টেলিফোনের মাধ্যমে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তবে এগুলোর মাধ্যমে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার একটা সুরত আছে, তা হলো, উভয় পক্ষের কোন একপক্ষ থেকে চিঠি বা টেলিফোনের মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে নিজের উকিল বানাবে। তিনি উকিল হয়ে দু'জন স্বাক্ষীর সামনে প্রস্তাব করবেন। অপর পক্ষ তখন কবুল করবে। তাতে বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কনে টেলিফোনের বরকে নিজের বিয়ের উকিল বানাতে পারে। তখন বর যদি দু'জন স্বাক্ষীর সামনে বলে যে, অমুক মহিলা তার বিয়ের জন্য আমাকে উকিল বানিয়েছে। আমি তাকে এত টাকার বিনিময়ে বিয়ে করলাম। এতেও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে।

[প্রমাণঃ জাদীদ ফিকহী মাসাইল, ১:১৪৮ খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ২:৪৮]

বিয়েতে কাবিন রেজিষ্ট্রি করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে বিয়েতে যে কাবিন রেজিষ্ট্রি করা হয়, এটা শর'ঈ দৃষ্টিকোণে কতটুকু জরুরী? শরী'আতে এর কোন ধর্তব্য আছে কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে বিবাহের সময় সরকারী রেজিষ্ট্রিরে কাবিন রেজিষ্ট্র করা বা বিবাহের বিস্তারিত বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করে রাখা জরুরী কিছু নয়। স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে মহর ধার্য করে ঈজাব কবুলের দ্বারা বিবাহ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তবে রাষ্ট্রিয় আইন হিসাবে বা অন্য কোন প্রয়োজনে কাবিন রেজিষ্ট্রি করা জায়েয আছে। শরী'আতে এতে কোন

নিষেধাজ্ঞা নেই। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩:২৫৭ দারুল উলূম ৭:৮৫ ইমাদাদুল মুফতীন, ৫২৫]

বিবাহ সহীহ হওয়ার পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জন রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে আইনত বিবাহ রেজিষ্ট্রি করি। অনেকে বলে আমাদের এই বিবাহ সহীহ হয়নি। আমাদের এই বিবাহ সম্পর্কে আমাদের উভয়ের অভিভাবকগন অবগত নন। আমাদের বিবাহে আপত্তি থাকার কারণে আমি মেয়েটিকে তালাক দিতে চাই। তা ছাড়া আমার বর্তমান আয়-রোজগারও নেই। উল্লেখ্য, মেয়েটির আশ্রয় দেয়ার মত কেউ নেই।

জবাবঃ বিবাহের যে সমস্ত শর্ত আছে তার মধ্যে একটি শর্ত হল, স্বজ্ঞান সাবালক দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর ঈজাব-কবুল করা। যদি দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ না হয়, তাহলে সে বিবাহ শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাত কিছু জায়িয নয়। এতদিন তার সাথে দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশা জিনা হয়েছে। এখন থেকে আপনি তার থেকে সম্পুর্ণরূপে পৃথক হয়ে যাবেন এবং উভয়ে এ জঘণ্য অপরাধের জন্য অতিসত্বর তাওবা করে নিবেন। সাথে সাথে বিবাহের সকল শর্ত সহকারে স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ পরিয়ে নিবেন। আর যদি কাজী অফিসে দু'জন স্বাক্ষীর সামনে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে আপনাদের বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত বিবাহ সহীহ হয়ে গেছে। সন্দেহ করার দরকার নেই।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহ সহী হয়ে থাকলে মেয়েটি আপনার স্ত্রী হয়ে গেছে। বিনা দোষে তাকে পরিত্যাগ করা যাবে না। আর যদি বিবাহ সহী না হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ সহী করে মেয়েটির আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলে তা আপনার নাজাতের উসিলা হতে পারে।

এ মুহুর্তে রোজগারের ব্যবস্থা নেই। ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মেয়েটিও পর্দার ভিতরে থেকে হ্যাঁস-মুরগী পালন করতে পারবে। কাঁথা সেলাই বা মেশিনে কাজ করতে পারবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া, ২:৩০৬ তাতার খানিয়া ২:৫৮১]

দ্বিতীয় বিবাহ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ আমি শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাই। কারণ আমার বর্তমান স্ত্রী প্রায়ই অসুস্থ থাকে। এ জন্য আমার খিদমত পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই বিবাহের প্রয়োজন। কিন্তু ছেলে-মেয়ে আছে এবং মানুষ বলবে যে, লোকটি দু'টি বিবাহ করেছে। তাই সংকোচও হয়। কিন্তু আমি ইবলিসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তাতো কেউ দেখেনা বা জানে না। আরেকটা বিবাহ না করলে হয়তো আমার দ্বারা পাপ হয়ে যেতে পারে। তাই পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিবাহ করা যাবে কি-না?

২য় বিবাহ করলে তো ১মা স্ত্রী আমার উপর বেশী অসুন্তুষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহপাক আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন কি না?

জবাবঃ একজন স্ত্রী থাকা সত্বেও আপনার আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ থাকলে আপনি গুনাহ থেকে বাঁচার বা অন্য কোন উপকারের জন্য বা কোন অসহায় মেয়ের সহায় হওয়ার জন্য আরো তিনটা বিবাহ করতে পারেন। শরী'আতের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু আপনার

স্ত্রী খুবই অসুস্থ। তাই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আপনার বিবাহ করা বাঞ্ছনীয় বটে। এতে শরী'আত মতে, সমাজ বা আপনার ১মা স্ত্রী ও তার সন্তানদের নারাজ হওয়ার বা সমালোচনা করার অধিকার নেই। যারা সমালোচনা করবে বা বাধা দিবে, তারা গুনাহগার হবে। পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য জায়িয বিবাহ অবলম্বন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরই উপায় বৈ কি?

তাই এতে আল্লাহ পাকের নারাজ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ থাকার পরই কেবল একাধিক বিবাহ করা এবং সে ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীদের মধ্যে থাকা, খাওয়া পরা এবং রাত্রে স্ত্রীর নিকট স্বামীর অবস্থান প্রভৃতিতে পূর্ণভাবে সমতা বজায় রাখা জরুরী। তাদের মধ্যে এ সকল ব্যাপারে বেশকম করলে এবং সমান ইনসাফ কায়িম না রাখতে পারলে, তজ্জন্য আপনাকে পরকালে কঠিন শাস্তির ভাগী থেকে হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম,৭:২২৫ সূরা নিসা,১]

বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্ত

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলল, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। প্রেমিকাও সাথে সাথে বলল, আমি সম্মত আছি। উল্লেখ্য যে, সেখানে কোন স্বাক্ষী ছিল না। উক্ত প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ বৈধ হয়েছে কি?

জবাবঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণনা মুতাবিক প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ সঠিক হয়নি। কেননা, শরী'আতের দৃষ্টিতে বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ হওয়ার জন্য স্বাক্ষীর উপস্থিতি হচ্ছে অন্যতম শর্ত। স্বাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তাই তারা যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে দু'জন স্বাক্ষীর

সামনে মহরের পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। আর ছেলে-মেয়েরা নিজ নিজ বিবাহে আবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রেম-প্রীতির ভিত্তিতে যে বিবাহ-শাদী হচ্ছে তা বৃটিশ শিক্ষার বিষফল। শরী'আতে বিবাহের আগে প্রেম-মহব্বতের কোন স্বীকৃতি দেয় না। বরং তাকে যিনা ও হারাম গণ্য করে।

[প্রমাণঃ আল-বাহরুক রায়িক্ব,৩:১৫৫ তিরমিযী, ১:২১০ হিদায়াহ, ২:৩০৬]

আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় অনেকে বিবাহে ঈজাব কবুলের সময় শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে। এতে বিবাহ সম্পন্ন হবে কি-না?

জবাবঃ কবুল শব্দের পরিবর্তে আলহামদুলিল্লাহ শব্দের দ্বারাও বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে এ প্রথাটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং স্পষ্টভাবে আমি কবুল করলাম বলা উচিত।

[প্রমাণঃ আলমগীরী, ১:২৭২, খোলাসাতুল ফাতাওয়া ২:৩ আহসানুল ফাতাওয়া, ৫:৩৭-৩৮]

বৃদ্ধ পিতার বিবাহের বিধান

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের সংসারে আমাদের পাঁচ ভাইকে রেখে আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন। তাই আমার বৃদ্ধ পিতা চাচ্ছেন নতুন করে বিবাহ করতে। এদিকে আমাদের ভাইদের মধ্যে কেউ কেউ তো নতুন বিবাহের পক্ষে, আবার কেউ বিবাহের বিপক্ষে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি আব্বার বিবাহের পক্ষে। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা হচ্ছে, এই ব্যাপারে এই মুহূর্তে শরী'আতের আইন কি? আর আমার করণীয় কি?

জবাবঃ আপনার পিতার যদি একটি মহিলার খাওয়া দাওয়া, লেবাস-পোশাক ও থাকার ঘর ইত্যাদি সর্বপ্রকার খরচ দেয়ার মত ব্যবস্থা থাকে, তাহলে আপনার পিতার জন্য বিবাহ করাই উত্তম। আপনাদের বাধা দেয়ার কোন অবকাশ নেই। বাধা দিলে পিতার কষ্টের জন্য আপনারা পিতার নাফরমান সাব্যস্ত হবেন। আপনাদের জন্য উচিৎ, সহযোগিতা করে পিতাকে বিবাহ করিয়ে দেয়া এবং পিতার খিদমতের ব্যবস্থা করা। কারণ- মানুষ যত বেশী বার্ধক্যে পৌঁছে, ততবেশী স্ত্রীর এমন খিদমতের মুখাপেক্ষী হয়, যে সব খিদমত দুনিয়াতে অন্য কোন কারো দ্বারা সম্ভব নয়। নিজের ছেলে-মেয়ে বা বেটার বউ দ্বারাও সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তার বাহ্যিক দু'চারটা খিদমত করতে পারে, যা তার জন্য যথেষ্ট নয়। আপনাদের বাধার কারণে যদি আপনাদের পিতা বিবাহ না করেন এবং কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যান বা কষ্ট পেতে থাকেন, তাহলে এই কষ্ট বা গুনাহের জন্য আপনাদের আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর যদি আপনাদের পিতার উক্ত মহিলার খরচ চালানোর মতো কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে আপনাদের ক্ষমতা থাকলে, অবশ্যই বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিৎ। এটা পিতার খিদমতের মধ্যে শামিল। আর পিতার খিদমত করা বা খিদমতের ব্যবস্থা করা সন্তানের জন্য জরুরী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা পিতাকে বিবাহে এই জন্য বাধা দেয় যে, তারা ভয় পায়, যদি পিতার এই বিবাহের কারণে তাদের আরো ২/১টি ভাই-বোন দুনিয়াতে আসে, তাহলে পিতার সম্পদের মধ্যে তাদের অংশ কম হয়ে যাবে। তাদের এ ধারনা ভুল ও মস্ত বড় জাহেলিয়্যাত। কারণ বেশী সম্পদের লোভে পিতাকে কষ্টে রাখা কোন সুসন্তানের জন্য জায়িয তো নয়ই সম্ভবও নয়। তাছাড়া তাদের জানা উচিৎ, তাদের ভাগ্যে যতটুকু সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে লেখা আছে, তা তারা সর্ব অবস্থায় পাবে। এটা কেউ কমাতে পারবে না। সুতরাং পিতাকে কষ্ট দিয়ে সম্পদ বাড়ানোর

চিন্তা করা অবাস্তব। তাদের বুঝা উচিত পিতার থেকে বিনা পরিশ্রমে যতটুকু পাচ্ছে, এটাই তো বেশী। তারপরও কি পিতার এই ইহসানের কারণে তাকে কষ্টে ফেলে রাখা জায়িয হতে পারে? সুতরাং এ অবস্থায় আপনার কর্তব্য, অন্য ভাইদেরকে রাজী করাতে চেষ্টা করা এবং তাদের সামনে শরী'আতের বিধান বর্ণনা করে তাদেরকে পিতার নাফরমানীর আযাব-গযবের কথা বুঝিয়ে রাজী করা। তারা রাজী না হলে, আপনি নিজের দ্বায়িত্বে পিতার খিদমতের লক্ষ্যে আপনার আপনার থেকে যতটুকু সম্ভব, তা করে নিবেন। এতে আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে বর্ণনাতীত লাভবান হবেন।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:৪২]

বিবাহে অভিভাবকত্ব/কুফু ইত্যাদি

বালেগ ছেলে-মেয়েকে বিবাহ করানো

জিজ্ঞাসাঃ ছেলে বালেগ হলে বাবা-মায়ের উপর বিয়ে করানো জরুরী কি-না?

জবাবঃ হ্যাঁ ছেলে-মেয়ে বালিগ হওয়ার পর শরী'আত সম্মত কোন বাঁধা না থাকলে এবং উপযুক্ত সম্বন্ধ পাওয়া গেলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব। অন্যথায় ছেলে-মেয়ে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হলে পিতা বা অভিভাবকও গুনাহের ভাগী হবে! হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ ও সতর্কবাণী এসেছে।

[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ২৬১, ২৭১ সূরা নূর, ৩২ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:৪৬ ইসলামী শাদী- ৪৪]

পাত্রীর গুণাবলী কেমন হওয়া চাই

জিজ্ঞাসাঃ বিভিন্ন ধর্মীয় বইয়ে বিবাহ সম্পর্কে পাত্রীর গুণাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন গুনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে; যেমন, (১) মেয়েকে ধার্মিক হতে হবে (২) কুমারী হতে হবে (৩) সতী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের হতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু স্বামী, পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীকে বিবাহ করা সম্পর্কে স্পটভাবে তেমন লিখা নেই। স্বামী পরিত্যক্তা গরীব মেয়েকে বিবাহ করা কেমন হবে। স্বামী পরিত্যক্তা/বিধবা নারীকে বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে কুরআন/হাদীসের ব্যাখ্যা জানতে চাই। এ ক্ষেত্র মা-বাবা এবং নিকট আত্মীয়-স্বজন নারায হলে কি করা উচিত? পাত্র নিজে বিয়ে করতে পারবে কি না? তার বিস্তারিত জবাব চাই।

জবাবঃ শরী'আতে বিধবা মহিলাকে বিবাহ করা জায়িয, কোন প্রকার দোষণীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে বিধবা মহিলা বিবাহ করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকে বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেছেন। এধরনের মেয়েদের উপকারার্থে বিবাহ করা মহৎ কাজ। সুতরাং এক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নারায হওয়া উচিত নয়। আর বিধবা মহিলাকে বিবাহ করা দোষণীয় মনে করে নারায হলে শক্ত গুনাহ হবে।

আর বিবাহকারীর জন্য উচিৎ হবে হেকমতের মাধ্যমে মাতা-পিতাকে বুঝিয়ে রাযী করিয়ে তারপর বিবাহ করা। এতে যদি পিতা-মাতা অন্য কোন শর'ঈ উযর ছাড়াই রাযী না হয় আর পাত্রও যদি বালেগ হয় তাহলে একা একা বিবাহ করলে করতে পারে।

[প্রমাণঃ সূরা নূর ৩২, বুখারী শরীফ ২:৭৬০ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:৪৮ ইমদাদুল মুফতীন ১১৭]

একাকী বিবাহ করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন অবিবাহিত লোক। আমার ছোট বোন এবং বড়-ভাই থাকার কারণে পরিণত বয়সে বিয়ে করতে পারি নাই। আমি আগ্রহ প্রকাশ করলেও পরিবার থেকে তেমন সাড়া পাইনি। তাই পরিণত বয়সে বিয়ের সুযোগ না হওয়ায় আমি বাধ্য হয়ে অন্যায় কার্যকলাপ করে ফেলেছি।

এখন আমি একাকী বিয়ে করতে পারব কি? দয়া করে জানাবেন।

জবাবঃ হাদীস শরীফে এসেছে সন্তান যখন বিবাহের উপযুক্ত হয়, তখন বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বিবাহ করানো পিতার কর্তব্য। আর এমন অবস্থায় যদি পিতা সন্তানের বিবাহ-শাদীর কাজ সমাধা না করে আর তারা

যদি কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে পিতা ঐ গুনাহের মধ্যে শামিল হবে। যেহেতু আপনি বিবাহের উপযুক্ত হয়েছেন, এবং আপনার জন্য বিবাহ করা জরুরী হয়ে পড়েছে, তাই আপনার পিতা যদি রাযী নাও থাকে তবুও আপনার পিতা ও আপনাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য আপনার বিবাহ করা জরুরী এবং আপনি পরিণত বয়সে বিবাহ করতে পারতেন। এতে দোষের কিছু ছিল না। আর বর্তমান সমাজে যেটা দেখা যায় এটা শরী'আত সম্মত নয়। বরং সমাজের কারণে যদি কোন ছেলে বিবাহ না করে গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলে ছেলে নিজে এবং তার পিতা-মাতা সকলেই সেই গুনাহে শামিল হবে এবং এর জন্য দায়ী হবে।

[প্রমাণঃ মিশকাত ২:২৭১, ২:২৬৭ ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১:২৭০ আযীযুন ফাতাওয়া ১:৪৬৬]

পালক সন্তানের বিয়েতে পালক পিতার নাম উল্লেখ করা সহীহ না

জিজ্ঞাসাঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে পালিত ছেলে বা মেয়ের বিয়ের সময় পালক পিতার নাম উল্লেখ করে বিয়ে পড়ানো যাবে কি-না। না আসল পিতার নামই উল্লেখ করতে হবে?

জবাবঃ জন্মদাতা পিতা প্রকৃত পিতা, তাই সর্বদা সন্তান তার জন্মদাতা পিতার সাথে সম্পৃক্ত করবে। শুধুমাত্র লালন-পালনের কারণে কেউ সন্তানের পিতা হয় না। যেমন, মহান রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরায়ে আহযাবের মধ্যে ইরশাদ করেছেন "এবং আল্লাহ তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন"। অন্য আয়াতে বলেন, "তোমরা তাদেরকে (আসল) পিতৃ পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত"।

বিবাহ সময় পিতার নাম নেয়া শরী'আতে জরুরী নয়। তবে নিতে হলে জন্মদাতা পিতার নাম উল্লেখ করে বিবাহ পড়াতে হবে। [প্রমাণঃ সূরা আহযাব ৪৫]

রেজিষ্ট্রি ব্যতীত দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে যদি দু'জন স্বাক্ষীর সামনে প্রচলিত রেজিষ্ট্রী ছাড়া ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করে, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে কিনা ? যদি হয়, তাহলে ঐ মেয়ের অভিভাবকগণ যদি তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতীত অন্য কোথাও বিবাহ দেয় তাহলে দ্বিতীয় বিবাহের হুকুম কি!

জবাবঃ যদি ছেলে-মেয়ের মধ্যে কুফু বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বংশ মর্যাদা, দ্বীনদারী ও পেশার দিক দিয়ে ছেলে যদি মেয়ের থেকে নীচু না হয়, তাহলে পিতা-মাতা রাযী হোক বা না হোক বিবাহ সহীহ হবে। যদিও অভিভাবকের সম্মতি না নিয়ে এভাবে বিবাহ করা মেয়ের জন্য নিতান্তই গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। শরী'আত সম্মত কোন কারণ না থাকলে এমতাবস্থায় পিতা-মাতা নারাযী প্রকাশ না করে এ বিবাহ মেনে নেওয়াই ভাল। এই অবস্থায় মেয়েকে অন্য কোথাও বিবাহ দিলে বিবাহ সহীহ হবে না; বরং আগের বিবাহ বহাল থাকবে। কিন্তু যদি মেয়ে অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া তার চেয়ে নীচু বংশের বা বখাটে বদ-দ্বীন ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়-তাহলে এ বিবাহ সহীহ হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ মেয়েটিকে অন্যত্র বিবাহ দিতে পারবেন। শরী'আতের দৃষ্টিতে বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য রেজিষ্ট্রি করা জরুরী নয়। ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য রেজিষ্ট্রি করে নেওয়া ভাল।

[আদ্দুররুল মুখতার ২:৩৪৪ দারুল উলূম ৮:১৮৪ ইমদাদুল মুফতীন ১:৫৫১ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫:২৫৮ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৯৬ শামী ২:৩৪৪]

যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ /-বৈধ নয়

কোন মহিলার সাথে ব্যভিচারের পর তার মেয়েকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ একজন অবিবাহিত পুরুষ একজন বিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত মহিলার মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বিয়ের পর জামাই উক্ত শাশুড়ীর সাথে আর ব্যভিচারের লিপ্ত হয়নি। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সে ঘরে ৫ জন সন্তান হয়েছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী, বিবাহিত-অবিবাহিত যে কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে কিংবা কামভাব সহকারে তাকে স্পর্শ করলে, চুমু দিলে, অথবা কামভাব সহকারে তার যৌনাঙ্গের ভিতরাংশের দিকে তাকালে, সে পুরুষের জন্য উক্ত মহিলার উদ্ধর্তন ও অধঃতন সব মহিলারা স্থায়ী হারাম হয়ে যায়। একথা তার জানা ছিল না। এখন এ বিবাহ হারাম হবে কিনা? যদি এ বিবাহ হারাম হয়, তবে যেহেতু ৫ জন সন্তান আছে, সেহেতু এ বিবাহ বৈধ্য করার জন্য ইসলামী বিধান আছে কি-না? উল্লেখ্য যে, ১৫ বছর যাবত বিয়ে হয়েছে এবং এখনও তারা একসাথে আছে।

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত ইসলামী বিধান সম্পূর্ণ সহীহ এবং যিনাকারী ব্যক্তির জন্য উল্লেখিত মেয়েটি কোন দিনও হালাল হবে না। কাজেই উক্ত মেয়ের সাথে তার বিবাহই শুদ্ধ হয়নি। এতদিন তাদের মিলামিশা সবই নাজায়িয ও হারাম হয়েছে। এজন্য তাদের উভয়কে খালিস দিলে তাওবা করতে হরে।

মাসআলা জানার পর এখনই তাদের পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী। উক্ত মহিলার জন্য অন্য স্বামী গ্রহণের আগে ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত পালনের পর উক্ত মহিলা অনত্র বিবাহ বসতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে উল্লেখিত বিবাহ শুদ্ধ না হলেও শরী'আতের বিশেষ হিকমতের কারণে সন্তান-সন্ততিগুলো হারামজাদা গণ্য হবে না। বরং পিতার থেকে তাদের নসব প্রমাণ হবে এবং পিতার থেকে তারা মীরাস-উওরাধিকার পাবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ২:৩০৯ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৫৪ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:৩২৭ ইমদাদুল মুফতীন ৫৫৩ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৫৩৪ কিফায়াতুল মুফতী ৫: ২৩ রদ্দুল মুহতার ৩:৩১ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৬২ ফাতাওয়া আবদুল হাই ২:৮৪]

কামভাবের সাথে দৃষ্টিপাত করলে হুরমতে মুসাহারাত প্রমাণিত হয় না

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন মেয়ে লোকের প্রতি কামভাবের সহিত তাকানোর ফলে উত্তেজিত হয়ে পড়ে তাহলে উক্ত ব্যক্তি সেই মেয়ে লোকের কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি ?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন মহিলার গুপ্তাঙ্গের ভিতর ছাড়া অন্য কোন অঙ্গের দিকে কাম উত্তেজনার সাথে তাকানোর দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত প্রমানিত হয় না। অর্থাৎ এর দ্বারা-উক্ত মহিলার উসূল ও ফুরূ অর্থাৎ উর্দ্ধতন ও অধঃতন কু-দৃষ্টকারীর জন্য হারাম হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত পুরুষের জন্য সেই মহিলার কন্যাকে বিবাহ করা জায়িয হবে।

[প্রমাণঃ শামী ৩:৩১, দারুল উলূম ৭:৩৬৫]

নাবালিগা মেয়ের সঙ্গে অবৈধ কর্ম ও উক্ত মেয়ের মায়ের সঙ্গে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি এক বিধবা মহিলার সাত বছরের নাবালিগা মেয়ের সঙ্গে অপকর্ম করার পর উক্ত মহিলাকে বিবাহ করল। এই বিবাহ বৈধ হয়েছে কি-না ?

জবাবঃ কোন মেয়ের সঙ্গে বৈধ বা অবৈধ পন্থায় যৌন মিলন সংঘটিত হওয়া মাত্রই তার মা এবং মেয়ে উক্ত ব্যক্তির জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়। তবে এর জন্য শর্ত হল উক্ত মেয়ে 'মুশতাহাত' (যার দর্শনে পুরুষদের মধ্যে কামভাব সৃষ্টি হয়) হতে হবে। আর এরূপ অবস্থা সাধারণত মেয়েদের নয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই হয়ে থাকে। সুতরাং, এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত হল, নয় বছরের কম বয়সের কোন মেয়ের সাথে মিলন হলে যদিও কাজটি হারাম ও যিনা, কিন্তু তারপরও উক্ত নাবালিগার মা তার জন্য হারাম হবে না। সুতরাং, প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহ সহীহ হয়েছে। তবে লোকটির জন্যে অন্তরে খালিস তাওবা করে নেয়া জরুরী।

প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১:১২৭; খুলাসাতুল ফাতাওয়া২:৮

ফুফাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আজ প্রায় চৌদ্দ বছর যাবত আমি ফুফাত ভাইয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছি। ফুফাত ভাই আমার অভিভাবক ফুফাত ভাইয়ের মেয়ে আমাকে আপন কাকার মত শ্রদ্ধা করে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন ফুফাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? উল্লেখ্য যে, সামাজিকভাবে এটাকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই এ মুহূর্তে আমার করণীয় কি? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে মুহাররামাতের (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) একটি তালিকা দিয়েছেন। এদের মধ্যে ফুফাত, মামাত ও চাচাত

বোন অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং ফুফাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা নিঃসন্দেহে জায়িয এবং এটাকে না জায়িয মনে কবা হারাম এবং এর দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সামাজিকভাবে এটাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়, এটা একটা কুসংস্কার মাত্র। সুতরাং আপনি এবং আপনার অভিভাবকগণ যদি এ বিবাহকে মঙ্গলজনক মনে করেন তাহলে সামাজিক কুসংস্কার উপেক্ষা করে বিবাহ করতে পারেন। শুধু তাই নয়; বরং এ ধরনের কুসংস্কার কার্যকরীভাবে নির্মূল করার জন্য এ বিবাহ বিশেষ সওয়াবের কাজ বলে বিবেচিত হবে।

[প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার ৪:৯৯]

কাদিয়ানিদের সাথে বিবাহ-শাদী

জিজ্ঞাসাঃ কাদিয়ানিরা কি মুসলমান? যদি মুসলমান না হয়, তাহলে তাদের সাথে মুসলমানদের সন্তানদের বিয়ে-শাদী হয়ে থাকলে এখন কি করতে হবে ?

জবাবঃ সারা পৃথিবীর আলেম, মুফতী, ইসলামী বুদ্ধিজীবি ও মুসলিম দেশের ইসলামী আদালতের রায়ঃ কাদিয়ানী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' শব্দের ব্যাখ্যা অস্বীকার করার দরুন এবং তাদের স্বতন্ত্র আক্বীদা ও বিশ্বাসের কারণে কাফির। তারা আমাদের নবীকে ﷺ শেষ নবী মানে না। তারা খাতামুন্নাবিয়্যিন শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করেছে আর এতটুকুই তাদের কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট! তারা মুসলমানদের ঘরে-ঘরে গোপনে তাদের সে সব প্রচারপত্র বিলি করে তার মধ্যে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্য মদীনার মুনাফিকদের মত (যার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা মুনাফিকুন এ এসেছে) কালেমা তাইয়্যিবা লিখে এবং উচ্চারণ করে এবং

লিখে থাকে যে, আমরাও খাতামুন নাবিয়্যিন বিশ্বাস করি। এবং এতবেশী বিশ্বাস করি যে আলেমগন আমাদের বিশ্বাসের একশ ভাগের এক ভাগও বিশ্বাস করে না। যে বিশ্বাস করে না, তাকে কাফির মনে করি। এ কথা বলার পর অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পরক্ষণেই চতুরতার তার লেখার চতুরতার মধ্য দিয়ে আমাদের নবীর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে এই বাহানায় যে, খাতামুন নাবিয়্যিন আমরা মানি কিন্তু এ ব্যাপারে মোল্লাদের অপব্যাখ্যা আমরা মানি না।

অথচ মাওলানা-মুফতী উক্ত শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, তা কখনো তাদের মনগড়া নয়, বরং কুরআনের ১০০ আয়াত এবং দুই শতাধিক সহীহ হাদীস এবং সাহাবাগণের রা. ইজমা দ্বারা তা প্রমাণিত।

সুতরাং মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিৎ। মুসলিম শব্দ দেখে ধোকা খাওয়া ঠিক নয় এবং মনে করা উচিত নয় যে, এরাও মুসলমান। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যেমন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী, অমুসলিম, কাফির, তেমনিভাবে কাদিয়ানী মতবাদও ভিন্ন ধর্ম ও অমুসলিম জামাত। তারা তাদের ভন্ড নবী কর্তৃক ইংরেজ গভর্মেণ্ট-এর তরফদারী করে তাদের বিরূদ্ধে জিহাদ হারাম হওয়ার ফাতাওয়া দেয়ার কারণে জিহাদ সম্পর্কীয় সমস্ত আয়াত ও হাদীস তারা অস্বীকার করেছে। যার একটি আয়াত অস্বীকার করলে কাফির হতে হয়।

সুতরাং, আহমদীয়া মুসলিম জামাত (কাদিয়ানীরা) নিশ্চিতভাবে কাফির। কোন মুসলমানের সাথে কাফিরদের বিবাহ শাদী যেমন কখনও জায়িয নয়, তেমনিভাবে কাদিয়ানীদের সাথেও বিবাহ জায়িয নয়, সম্পূর্ণ হারাম। যদি না জেনে কেউ তাদের সাথে বিবাহ-শাদী করে থাকে, বা বিবাহ দিয়ে থাকে তাহলে তা ভঙ্গ করে দিতে হবে এবং তাওবা করে নিতে হবে। নতুবা তাদের ঈমান থাকবে না। কাদিয়ানী কাফিররা নিজেদের বর্ণনায়

ও লেখনীতে সাধারণতঃ নিজেদের কাদিয়ানী বলে উল্লেখ করে না। বরং ‘আহমদী মুসলিম জামাত’ বলে থাকে।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারা ২, বাদাঃ ২/৩৩৭]

আহলে হাদীসদের সাথে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ হানাফী মাযহাবের ছেলেদের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মেয়েদের সাথে বিবাহ জায়িয হবে কিনা ?

জবাবঃ শরী‘আতের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই। বিবাহ জায়িয হবে। তবে বর্তমান যমানার অধিকাংশ আহলে হাদীস অত্যন্ত বেশী বাড়াবাড়ি করে। তারা চার মাযহাবের ইমামদের শানে মারাত্মক গোস্তাখী ও বেআদবীপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে থাকে, যা একজন সাধারণ মুসলমানের ব্যাপারেও ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া তারা প্রচার করে বেড়ায় যে, ইমাম মানা শিরক। তারা আরো বলে থাকে, হানাফী-মালেকীগণ যেভাবে নামায, পড়ে তা সহীহ হয় না; একমাত্র তাদের মত নামায পড়তে পারলে সেটাই সহীহ নামায ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথচ হানাফী মাযহাবে যেভাবে নামায পড়তে বলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. তাঁর ২০ খন্ডে লিখিত ইলাউস সুনান কিতাবে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আহলে হাদীসদের কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান না থাকার দরুণ নিজেরা ভুলের মধ্যে থেকে অন্যদেরকে ভুলের মধ্যে মনে করছে যা-ই হোক, যেহেতু আহলে হাদীস বা লা- মাযহাবীগণও মুসলমানদের মধ্যে শামিল সুতরাং তারা যদি ইমামদের শানে গুস্তাখী না করে এবং মাযহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তাহলে তাদের সাথে বিয়ে-শাদী করতে কোন অসুবিধা নেই। আর যারা বাড়াবাড়ি করে, তাদের

সাথে বিবাহ জায়িয থাকলেও দাম্পত্য জীবন সুখময় করার খাতিরে তাদের সাথে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক না করা উত্তম।

[খাইরুল ফাতাওয়া ৪:৩২৩]

সৎ নাতনীকে বিয়ে করা

জিজ্ঞাসাঃ একটি লোকের ২ জন স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী নাতনীর ঘরের পুতনীর বিবাহ হয়েছে দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলের সাথে ১২ বছর আগে। তাদের ১টি ছেলেও রয়েছে। বয়স ৭ বছর। এখন লোকজন বলছে যে, এই বিবাহ জায়িয হয়নি। যদি জায়িয না হয়ে থাকে, তাহলে এখন কি করনীয়?

জবাবঃ উপরোক্ত বর্ণনা মতে উক্ত ছেলে তার সৎ ভাই/বোনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছে। সৎ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা জায়িয নেই। যদি ভূলক্রমে বিবাহ করে থাকে তাহলে ফাতাওয়া জানার সাথে সাথে পৃথক হয়ে যাবে। এত দিনের মেলামেশা সব হারাম হওয়ায় উভয়ে খাটি মনে তাওবা করবে। যদি পৃথক না হতে চায় তাহলে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় প্রশাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে পৃথক করে দিবে।

এই অবৈধ বিবাহের দ্বারা যে সন্তান হয়েছে তার বংশ পরিচয় উক্ত পিতা-মাতার থেকেই হবে। যেহেতু এটি ভুলক্রমে এমন হয়েছে তাই সন্তাটিকে জারজ সন্তান বলা যাবে না। পিতা মারা গেলে সন্তান উত্তরাধিকারী হবে।

[প্রমাণঃ সূরা নিসা ২৩, তাফসীরে মাযহারী ২:২৫৪, তাবয়ীনুল হাকায়ক ২:১০১, আননুতাফ ফিল ফাতাওয়া ১৬৩, বাহরুর রায়িক ৩:৯৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৭:৬৮৬, দারুল উলূম ৭:৩১৬]

মাতার ফুফাত বোনের নাতনীকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার আম্মার ফুফাত বোনের ছেলের মেয়ে, আমার সম্পর্কে ভাস্তী (ভাইয়ের মেয়ে) তাকে কি বিয়ে করা যাবে?

জবাবঃ জায়িয আছে! আপনার আম্মার ফুফাত বোনের ছেলের মেয়ে দূর সম্পর্কের ভাস্তী হলেও তাকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন। এতে শর'ঈ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:২২০ খা ফাতাওয়া শামী ৩:৩০]

বিবাহের উপকারীতা ও তার শর'ঈ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ মানুষ কেন বিবাহ করে এবং তার উপর কখন বিবাহ করা ফরয হয়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানালে উপকৃত হবো

জবাবঃ বিবাহ আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় একটি নিয়ামত এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দ্বীন-দুনিয়া উভয় দিক থেকে এতে অসংখ্য ফায়দা ও উপকার নিহিত রয়েছে। কুরআন-হাদীসে বিবাহের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহ মানুষের পবিত্রতা, সতীত্ব, পরহেযগারী ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যম। বিবাহের দ্বারা মানুষ গুনাহ থেকে বাচঁতে পারে। অন্তর ঠিক হয়ে যায়। দ্বীনের উপর চলা অনেক সহজ হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা যে, বিবাহ অসংখ্য সাওয়াব ও উপকারীতার কারণ। স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে বসে ভালবাসা পূর্ণ আলোচনা, হাসি-খুশী ও মন ভুলানো ইত্যাদি পর্যন্ত নফল নামাযের চেয়েও উত্তম।

স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যদি কামভাব তেমন বেশী না হয় এবং স্ত্রীর মহর খোর-পোষ দেয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর যদি কামভাব এমন বেশী হয় যে, বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত

হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তাহলে বিবাহ করা ওয়াজিব। আর গুনাহে লিপ্ত হওয়ার নিশ্চিত হলে বিবাহ করা ফরয।

[প্রমাণঃ সূরা রুম ২১ সূরা নিসা ২৪ ফাতাওয়া শামী ৩:৩৬ বেহেশতী যেওর ৪:২ আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৫:২৮]

দূর সম্পর্কের ভাগিনীকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার বাবার চাচাত ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে আমি বিবাহ করতে পারবো কি-না?

জবাবঃ শরী'আতে ১৪ প্রকারের মেয়েলোকের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম করা হয়েছে। কিন্তু বাবার চাচাত ভাইয়ের মেয়ে বা তার মেয়ে এই ১৪ প্রকারের কোনটার মধ্যে পড়ে না বিধায় তার সাথে বিবাহ জায়িয হবে।

[সূরা নূর ৩১ তাফসীরে মাযহারী ৬:৪৯৭ শামী ৪:৯৯]

অপরিচিতা মহিলাকে মা বোন বলে সম্বোধন করার পর বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান রীতি অনুযায়ী কোন অপরিচিতা মহিলাকে মা বোন ডাকা যাবে কি-না? যদি ডাকা হয়, তবে তাদেরকে আবার বিবাহ করা যাবে কি-না?

জবাবঃ অপরিচিতা কোন মহিলাকে মা বোন বলে ডাকা ঠিক নয়। এর উপর ভর করে সমাজে অনেক অন্যায় অপরাধের জন্ম হচ্ছে। তদুপরি কেউ এরূপ ডেকে থাকলে, উক্ত মেয়েটি তার জন্য হারাম হবে না। তাকে বিবাহ করা যাবে।

[প্রমাণঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন সৌদি সংস্কার, ১০৭০]

আপন ভাতিজীর মেয়েকে (নাতিনী) বিবাহ করা।

জিজ্ঞাসাঃ শরী'আতে আপন ভাতিজীর মেয়েকে বিবাহ করা জায়িয আছে কি-না? দয়া করে দলীলের সাথে জানালে উপকৃত হব।

জবাবঃ আপন ভাতীজীর মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। না জেনে কেউ বিবাহ করলে মাসআলা জানার সাথে সাথে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং আল্লাহর দরবারে দিলে খালিস তাওবা করে নিব।

[প্রমাণঃ সূরা নিসা ২৩; তাফসীরে মাযহারী ২:২৫৪ তাবয়ীনুল হাকায়িক ২:১০১; আলমগীরী ১:২৭৩; বাহার ৩:৯৩ দারুল উলূম ৭:৩৬১]

পিতার আপন মামাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমি আমার আপন মামাতো ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। সমস্যা হচ্ছে, এতে আমার পিতা মাতা রাজি নয়। এর কারণ হচ্ছে এ বিষয়টিকে সামাজিকভাবে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। এখন আমি পিতা-মাতার কথা রক্ষা করব, না কুরআন হাদীসের পথ অনুসরণ করব?

জবাবঃ শরী'আতে যেটা জায়িয, সে বিষয়ে সমাজের লোকেরা কি বলল, না বলল, সেদিকে লক্ষ্য করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং সমাজকে সহীহ মাসআলা শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং সামাজিক কু-প্রথা দূর করার জন্য এ ধরনের বিবাহ বিরাট সাওয়াবের কাজ। কাজেই অন্য কোন সহীহ ও গ্রহণযোগ্য কারণ যদি না থাকে তাহলে লোকে কি বলবে এই ভয়ে যদি পিতা-মাতা উক্ত ব্যক্তির সাথে আপনাকে বিবাহ দিতে না চান, তাহলে শরী'আতের সহীহ হুকুম সম্পর্কে তাদেরকে বুঝিয়ে রাযী করানোর চেষ্টা করতে হবে এবং পিতা-মাতারও কর্তব্য যে, যদি বাস্তবে কোন সমস্যা না থাকে এবং ছেলে দ্বীনদার হয়ে থাকে ও নীচু বংশের না হয়ে থাকে তাহলে

এ ব্যপারে সম্মতি প্রদান করা। যাতে কোন মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন না হয়।

মামার শালীকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ মামার অধীনে মামী থাকা অবস্থায় মামীর বোন অর্থাৎ মামার শালীকে আমি বিবাহ করতে পারবো কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে মামী মামার স্ত্রী থাকার অবস্থায়ও তার বোন অর্থাৎ মামার শালীকে আপনি বিবাহ করতে পারবেন। এতে শরী'আতে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ, পবিত্র কুরআনে যেই ১৪ স্তরের লোকদের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে, মামার শালী তাদের আওতাভুক্ত নয়। তাই সর্ব অবস্থায় তাকে বিবাহ করা জায়িয আছে।

[প্রমাণ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, সূরা নিসা ২৩ তাফসিরে মাযহারী ২:২৬৩]

স্ত্রীর বর্তমানে তার সৎ বোনের সঙ্গে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ স্ত্রীর বর্তমানে তার সহোদর বোনের সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয় এটা আমরা জানি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে তার সৎ বোনের সঙ্গে বিবাহ বৈধ হবে কি?

জবাবঃ যেহেতু শর'ঈ বিধানে সহোদর বোন ও সৎ বোনের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি তাই স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর জন্য যেরূপ তার সহোদর বোন বিবাহ করা হারাম, তদ্রূপ তার সৎ বোনও বিবাহ করা হারাম।

প্রমাণঃ সূরা নিসা তাফসীরে মাযহারী ২:২৬০ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩:২১৬

গায়রে হাফেযের জন্য হাফেযা কে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমরা শুনেছি যে, হাফেযা মেয়েকে হাফেয ছেলে ছাড়া শুধু মাওলানা বা সাধারণ কোন ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে না। কথাটা ঠিক কি-না?

জবাবঃ আপনারা যে কথা শুনেছেন, তা ভিত্তিহীন। শরী'আতের দৃষ্টিতে একথা ঠিক নয়। বরং হাফেযা মেয়েকে মাওলানা ছেলে বা সাধারণ লোকেরাও বিবাহ করতে পাররে। [প্রমাণঃ সূরা নিসা আয়াত ২৪]

অবৈধ যৌন মিলনের দ্বারা গর্ভধারণ ও পরবর্তীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি অবিবাহিতা এক গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত মহিলা বাচ্চা প্রসবের আগে যার সাথে অবৈধ মিলনের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে, তার সঙ্গে অথবা অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহবাস করতে পরবে কি-না ?

জবাবঃ যদি কেউ কোন মহিলার সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হয় এবং এর ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে তবে অপকর্মকারী পুরুষ সেই মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। বিবাহের পর অপকর্মকারী পুরুষের পক্ষে উক্ত মহিলার সাথে বাচ্চা প্রসবের আগেও সহবাস করা জায়িয।

অনুরূপভাবে অন্য পুরুষের জন্যও উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা জায়িয। তবে তার জন্য উক্ত মহিলার বাচ্চা প্রসবের আগে তার সাথে সহবাস ও সহবাসের আনুসঙ্গিক কোন কাজ করা জায়িয হবে না। বাচ্চা প্রসবের পর নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেলে তখন এসব জায়িয হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহ ১:২৮০ দুররুল মুখতার ২:৩১৭ হিদায়াত ২: ৩১২]

মামাত, ফুফাত ও চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের ঘোষণা মুতাবিক মামাত, ফুফাত ও চাচাত বোনের মেয়েকে বিবাহ করা জায়িয কিন্তু আমাদের সমাজে তা সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়। এ ব্যপারে আমার পিতা-মাতার বক্তব হচ্ছে, কুরআন উক্ত বিবাহের অনুমতি প্রদান করলেও যেহেতু সামাজিকভাবে সেটা দোষণীয়। সুতরাং, তা করা যাবে না। এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান মানরবা, না সমাজ ও পিতা-মাতার কথা মান্য করব?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে আপন মামাত, ফুফাত ও চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা জায়িয। জায়িয-নাজায়িয ও হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা সমাজের লোকদের কোন অধিকার নেই। হয়তবা অজ্ঞতাবশতঃ তারা এরূপ উক্তি করেছে। সুতরাং তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, এরূপ বিবাহ জায়িয। এটাকে কোন অবস্থাতেই নাজায়িয মনে করা যাবে না। কেননা এরূপ বিবাহকে নাজায়িয বলার দ্বারা এ কথা কুরআনের বিধানের সঙ্গে সংঘর্ষপূর্ণ হওয়ার দরুণ তাতে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা আছে। সুতরাং, কেউ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করলে, তার তাওবা করে সতর্কতামূলক নতুনভাবে ঈমান আনয়ন করতে হবে। সে বিবাহিত হলে তার বিবাহ দোহরাতে হবে। কাজেই এ ধরনের কোন দ্বীনদার সম্পর্ক পাওয়া গেলে এবং তারা রাযী থাকলে, সামাজিক কু-প্রথা উৎখাৎ করার লক্ষে পিতা-মাতাকে বুঝিয়ে অবশ্যই সেখানে বিবাহ করা উচিত। যাতে কুরআনের বিধান সম্পর্কে সকলে অবগতি লাভ করতে পারে।

[প্রমাণঃ সূরা তাহরীম ১ সূরা মায়িদা ৮৭ সূরা নিসা ২৪ মা'আরিফুল কুরআন ৭:১৫৬ জাওয়াহিরুল ফিক্বহ ১:২৮-৩৩]

মুসলিম মেয়ের সাথে অমুসলিম ছেলে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

জিজ্ঞাসাঃ অমুসলিম ছেলের সাথে মুসলিম মেয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ কেন? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি যে হুকুম আরোপিত হয়, তা স্বতঃস্ফূর্ত- ভাবে মেনে নেয়াই প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এরই মাঝে তার কামিয়াবী নিহিত। সুতরাং যখন আল্লাহপাক কুরআনে কারীমে, স্পষ্টভাবে উপরোক্ত বিষয়টি নিষেধ করেছেন তখন এ ব্যপারে আর কোন কারণ খোঁজার প্রয়োজন নেই। তবে স্বাভাবিকভাবে এতটুকু বুঝা যায় যে, মুসলমানের উপর কোন অমুসলিমের কর্তৃত্ব চলে না। তাছাড়া এ পদ্ধতি জায়িয থাকলে মুসলিম স্ত্রী অমুসলিম স্বামীর প্রভাবে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যেতে পারে অথবা তার অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা বের হয়ে যেতে পারে। ফলশ্রুতিতে উক্ত ব্যক্তিও কুফর-শিরকের মাঝে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। যার পরিণতি একমাত্র জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং কাফির-মুশরিকদের সাথে এ ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করা যে মারাত্মক ক্ষতিকারক; সেটা বলাই বাহুল্য।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারাহ ২২১ মা'আরিফুল কুরআন ১:৪৮৪]

হিন্দু মেয়ের ইসলাম গ্রহণের পর তার সাথে মুসলমানের বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় এক মুসলিম ছেলে ও হিন্দু মেয়ে দু'জন দু'জনকে ভালবাসত। মেয়ের অবিভাবক জানতে পেরে মেয়ের ভারতে নিয়ে গিয়ে সেখানে হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয় এবং কিছু দিন তারা ঘর সংসার করে। এরপর আবার মেয়ে বাড়ীতে আসার পর উক্ত মেয়ে এবং ছেলে দু'জন পালিয়ে গিয়ে কাজী অফিসে হাজির হয়ে মেয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে এবং সেখানে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখন মেয়ের

আগের স্বামী যেহেতু তাকে তালাক দেয়নি এমতাবস্হায় তাদের পরের বিবাহ বৈধ হবে কি? আর মেয়ের বাবা ছেলের নামে কোর্টে মামলা করেছে এবং ছেলের বাবা ছেলেকে বাড়িতে উঠতে দিচ্ছে না। এরা দু'জন এখন কি করবে জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ বিবরণ অনুযায়ীই শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত ছেলে ও মেয়ের বিবাহ সহীহ হয়েছে। এতে মেয়ের আগের স্বামীর কোন তালাকের প্রয়োজন নাই। বরং মেয়ে মুসলমান হওয়ার দ্বারাই তাদের পরস্পরের হিন্দু থাকাকালীন বিবাহ ভঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমান হওয়ার পর মেয়েটির বিবাহ সহীহ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, তাদের এ বিবাহ সাথে সাথে যৌন মিলন উচিৎ হবে না। বরং উক্ত মহিলা ঋতুস্রাব হলে পরবর্তী ঋতুস্রাব আসা পর্যন্ত, আর ঋতুবর্তী না হলে এক মাস, আর গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা উচিত। এর পর তাদের মেলামেশা জায়িয হবে।

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ যেহেতু জায়িয হয়েছে তাই ছেলের বাবার জন্য ছেলের সাথে অনুরুপ ব্যবহার করা ঠিক হবে না। বরং পুত্র ও পুত্রপধুকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। আর মুসলমান মেয়ের প্রতি তার বিধর্মী মাতা-পিতার কোন দাবী দাওয়া শরী'আতে গ্রহণযোগ্য নয়।

[প্রমাণঃ সূরা নিসা ১৪১ মুসলিম শরীফ ১:৭৬ ৩ আদ-দুররুল মুখতার ৩:১৯৩ হিদায়া ২:৩৪৮]

খৃষ্টান মেয়ের সাথে মুসলমানের বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মুসলমান ব্যক্তি কোন এক খৃষ্টান মহিলাকে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে বিবাহ করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত মহিলা খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয় নাই। শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ বৈধ

হয়েছে কি-না? যদি তাদের উক্ত বিবাহ বৈধ না হয়ে থাকে, তবে তাদের মেলা-মেশা সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম কি এবং সমাজের করণীয় কি?

জবাবঃ এ কথা ঠিক যে, ইসলামী শরী'আতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও নাসারা (খৃষ্টান) মহিলাকে মুসলমান পুরুষের জন্য বিবাহ করা জায়িয আছে। কিন্তু যে কোন ইয়হুদী-খৃষ্টান মহিলা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাদেরকে বিবাহ করাও জায়িয নয়। বহু ইয়াহুদী খ্রিষ্টান রয়েছে যারা আদমশুমারীতে ইয়াহুদী খ্রিষ্টান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মূসা আ. বা ঈসা আ. কে মানে না এবং তাদের শরী'আত মানে না। তারা তাদের ধর্মের কোন তোয়াক্কা করে না। শুধু নামকা-ওয়াস্তে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান। এ ধরনের মহিলারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং কোন মুসলমানের জন্য এ ধরনের মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। বিবাহ করলেও সে বিবাহ কখনো সহীহ হবে না। এবং এতে ঐ মুসলমান ব্যক্তির দ্বীন-ঈমান সব কিছু বরবাদ হয়ে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। বর্তমান যমানায় অধিকাংশ ইয়াহুদী/খৃষ্টান মহিলার অবস্থাই এরূপ, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ্য করা হয়েছে।

শরী'আতে যে আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা জায়িয করেছে, তার উদ্দেশ্য হলো মহিলাটি বাস্তবিকপক্ষ মূসা আ. বা ঈসা আ.-কে নবী বলে মনে প্রাণে স্বীকার করে তাদের দ্বীনকে সহীহ মনে করে এবং তা মানতে ও তার উপর চলতে সব সময় চেষ্টা করে। এ ধরনের মহিলারা যেহেতু একটা আসমানী দ্বীনের উপর আছে, যা কোন একসময় সহীহ ছিল এবং তার ধর্মের কিতাবের সাথে এবং কুরআনের সাথে অনেকটা মিল আছে। সুতরাং, সেরূপ মহিলা যদি কোন মুসলমানের সংস্পর্শে আসে এবং ইসলামকে নিকট থেকে দেখার সুযোগ পায়, তাহলে আশা করা যায় যে,

সে ইসলাম কবুল করে নিবে এবং তার দ্বারা স্বামীর দ্বীন ইসলামের কোন ক্ষতির আশংকা নেই।

তবে এ ধরনের আহলে কিতাব মহিলা বর্তমানে পাওয়া দুস্কর। সুতরাং, যে কোন আহলে কিতাব মহিলাকে কিতাবী মহিলা মনে করে বিবাহ করা নিজের দীন ঈমান ধ্বংসের শামিল। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য এই ধরনের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয নাই।

বিবাহ সহীহ না হওয়ায় উক্ত মহিলা তার জন্য হালাল হবে না। সুতরাং তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মেলামেশা সবই যিনা ও হারাম হবে এবং সর্বদা হারামের মধ্যে লিপ্ত থাকার দরুন ঈমান কমজোর হতে হতে শেষ পর্যন্ত ঈমান হারা হয়ে মারা যাওয়ার পরিণতি কত ভয়াবহ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ব্যাপারে সমাজের দ্বীনী ও ঈমানী দ্বায়িত্ব হচ্ছে, উক্ত মহিলাকে ও বিবাহকারী মুসলমান পুরুষকে প্রথমে নসীহত করবে এবং এ বিবাহের ক্ষতি এবং আল্লাহর নাফরমানী সম্পর্কে অবগত করে, এ মহিলাকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে খালিস দিলে তাওবা করতে বলবে। লোকটি যদি সমাজের কথা মেনে নেয়, তাহলে তার সাথে সমাজের লোকদের আচরণ ঠিক থাকবে।

আর যদি ঐ ব্যক্তি এ নসীহত অমান্য করে তাহলে সমাজ থেকে তাকে বয়কট করতে হবে। তার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখা, তার বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করা, তার সাথে সালাম-কালাম করা এবং তার সাথে লেন-দেনসহ সব ধরণের আচরণ তার তাওবা করা পর্যন্ত বন্ধ করতে হবে। যারা নাফরমান ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখবে, তারাও গুনাহগার হবে।

তবে উক্ত মহিলা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে বিবাহ দোহরিয়ে তাকে রাখতে পারবে।

[প্রমাণঃ মা'আরিফুল কুরআন ১:৫৩৮ ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৬:১৭৬ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ২৭৭ জাওয়াহিরুল ফিকহ ২:৩৭৮, ফাতাওয়া শামী ৩:৪৫]

জ্বিন বা পরীর সাথে বিবাহ।

জিজ্ঞাসাঃ কোন নারী জ্বিনের (পরীর) সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কিনা ?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিকোন থেকে জ্বিনের নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কি-না এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়িয বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে এ বিবাহকে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ "আ-কামুল মারজান ফি আহকামিল জান" কিতাবে উল্লেখ আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়ের জায়িয হওয়া বা নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণের মধ্যে মতবিরোধ পাওয়া যায়। সুতরাং, সতর্কতার দাবী এটাই যে, এ ধরনের বিবাহ পরিহার করা। কারণ কোন কিছু জায়িয হলে সেটা করা জরুরী নয়। কিন্তু নাজায়িয হলে তার থেকে বাঁচা জরুরী।

[প্রমাণঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, সৌদি সংস্করণ পৃ:৯৯৩]

আপন চাচার চাচাত শ্বশুরের মেয়ের সাথে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ আমার আপন চাচার চাচাত শ্বশুরের মেয়ে আমার সম্পর্কে নানার মেয়ে অর্থাৎ আমার খালা। তার সাথে আমার বিবাহ জায়েয হবে কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে ১৪ প্রকারের মেয়ে লোকের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম করা হয়েছে। কিন্তু আপন চাচার চাচাত শ্বশুরের মেয়ে এই ১৪ প্রকারের কোন প্রকারের মধ্যে পড়ে না বিধায় তার সাথে আপনার বিবাহ জায়িয হবে।

[প্রমাণঃ সূরায়ে নূর ২৩, ৪]

১৪ প্রকারের মহিলা ব্যতিত আরও যাদেরকে বিবাহ করা হারাম

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি বলেছেন পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত মেয়েদের সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ন্যায় আরও কিছু মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। প্রশ্ন হচ্ছে সে ব্যক্তির কথা যদি সঠিক হয়, তহালে তারা কারা? আপন চাচাতো ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করার বিষয়ে শরী'আতের হুকুম কী?

জবাবঃ পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত মেয়েদের বিবাহ করা হারাম ঘোষনা করেছেন, তাদের মতো আরো কিছু মহিলাকে বিবাহ করা শরী'আতের দৃস্টিতে হারাম। যথাঃ

(১) চার এর অধিক মহিলা বিবাহ করা।

(২) ঘনিস্টতম দুই মহিলাকে এক সাথে বিবাহ বিবাহ করা অর্থাৎ এমন দুইজন দুধ সম্পর্কীয় বা নসবী মহিলাকে একত্রে এ একসাথে বিবাহ করা, যে কোন দিক থেকে তাদের একজনকে পুরুষ মানলে অন্য জনের সাথে

পরস্পরের বিবাহ সহীহ হবে না। যেমন, ফুফু এবং ভাতিজিকে এক সাথে বিবাহ করা।

(৩) স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করার পর কোন ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা।

(৪) অন্য পুরুষের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতকালে বা স্বামী মৃত্যুর, ইদ্দাৎবর্তী স্ত্রীকে বিবাহ করা।

(৫) অমুসলিম মহিলাকে বিবাহ করা।

(৬) মহিলার জন্য স্বীয় গোলামকে বিবাহ করা।

(৭) স্বামীর জন্য তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা (অন্য কারো সাথে বিবাহ হয়ে তার মৃত্যু বা তালাকের পর ইদ্দত পালনের আগে)।

(৮) যে মহিলার সাথে যিনা করেছে বা যৌন উত্তেজনার সাথে তাকে স্পর্শ করেছে বা চুম্বন করেছে এমন মহিলার মেয়ে নাতি বা উপরস্হ কোন মহিলা যেমন- মা, নানীকে বিবাহ করা।

উল্লেখ্য, আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জায়িয।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১:২৭৩ তাবঈনুল হাবাইক ২:১০১]

কোন ছেলের সাথে অপকর্ম করে তার নিকট মেয়ে বিবাহ দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি এক ছেলের সাথে অপকর্ম করেছে। এখন ঐ ব্যক্তি নিজের মেয়েকে ঐ ছেলের নিকট বিবাহ দিতে চায়। শরী'আত মতে এই বিবাহ জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ পুরুষ পুরুষের মাঝে অপকর্মের দ্বারা বিবাহ বন্ধন হারাম হয় না। সুতরাং, অপকর্মকারী ব্যক্তির কন্যা ঐ ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয়া শর'ঈ দৃষ্টিতে জায়িয আছে। [আলমগীরী ১-২৭৫]

ফুফাত বোনের মেয়েকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি আমার আপন ফুফাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। ফুফাত বোনের মেয়ে আমাকে মামা বলে ডাকে। সে আমার ভাগ্নি। (সম্পর্ক, মামা-ভাগ্নি) আমাদের উভয় পরিবারের ধারণা এটা নাজায়িয। আমি জানি জায়িয। আর জায়িযকে নাজায়িয মনে করা গুনাহ। তাদেরকে অনেক বই থেকে জায়িয এর ফাতাওয়া দেখানো হয়েছে। তারা বলে, এখন সব নতুন-নতুন হাদীস বের হয়েছে। তারা বড় এবং অভিজ্ঞ আলেমের নিকট জানতে চায়। আমি বিশেষভাবে আপনাদের সঠিক সাহায্য একান্তভাবে কামনা করি। উল্লেখ্য যে, সামাজিকভাবে এটাকে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই এ মুহূর্তে আমার করণীয় কি? জানতে চাই।

জবাবঃ আপন ফুফাত বোনের মেয়েকে বিবাহ করা নিঃসন্দেহে জায়িয। এমন কি ফুফাত বোনকেও বিবাহ করা শরী'আতে জায়িয রয়েছে। যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, ফুফাতো বোন বা তার মেয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আপনি সমাজের মানুষদেরকে বুঝাবেন যে, আলাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তা হারাম মনে করা অপরাধ। এমনকি ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তাদের এ ধারণা ত্যাগ করা চাই।

[প্রমাণঃ সূরা নিসা-২২; ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:২০; শামী ৪:৯৯]

বিবাহের সময় ঈমান তাহকীক করা

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে বলে থাকেন যে বর্তমান ফিতনার যমানায় ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের কাছে মেয়ে বিবাহ দিতে হলে তাদের ঈমান তাহাকীক করা জরুরী। কথাটা কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

জবাবঃ কথাটা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। কারণ, বর্তমানে স্কুল-কলেজের পরিবেশ সাংঘাতিক করুণ। বদদ্বীনীর সয়লাব উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রাস করে ফেলেছে। ওসব প্রতিষ্ঠানে এমন ধরনের অনেক শিক্ষক আছেন, যারা জন্মগত বা নামগত মুসলমান। কিন্তু বাস্তবে তারা নাস্তিক, খোদাদ্রোহী ও ধর্ম বিরোধী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের কোনটাই তারা বিশ্বাস করে না। ফরয পর্দাকে তারা ধর্মীয় কুসংস্কার বলে বিশ্বাস করে। মনে করে, এগুলো যুক্তি বহির্ভূত ও আলেম-উলামাদের মনগড়া কথা। যারা বেকুফ তারাই এগুলো মানে। ঐ সব নাস্তিক শিক্ষকরা গর্বের সাথে তাদের নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে থাকে। ঐ সব শিক্ষকদের কাছে যারা পড়ে, তাদের অনেকেরই পিতা-মাতা দ্বীনদার নয়। আর তারা নিজেরাও দ্বীনী কোন পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এ অবস্হায়ে এই সব বদদ্বীনী পরিবেশ ও নাস্তিক শিক্ষকদের প্রচারণা তাদের বিভ্রন্ত করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তারাও নাস্তিক হয়ে যায়। যদিও তার নাম মুসলমানী নামই থাকে।

মেয়ে বিয়ে দিতে হলে, কোন ঈমানদার ছেলের সংগে বিয়ে দেয়া জরুরী। কারণ, কোন নাস্তিক বা মুরতাদ ছেলের সাথে মুসলিম মেয়ের বিবাহ জায়িয নয়। বিয়ে পড়িয়ে দিলেও সহীহ হবে না। বিয়েই হবে না। সেক্ষেত্রে তাদের উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ, মিল-মিশঅ, আলাপ সবই অবৈধ। যিনা ও ব্যভিচার হবে। তাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তা হারামজাদা গণ্য হবে। কাজেই ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে হলে, তার ঈমানকে তাহকীক করা বা যাঁচাই করা জরুরী।

[প্রমাণঃ ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত ২:৩৯ আগলাতুল আওয়াম ১৫৭ আল ইফাযাত ৫:৩৫৮]

অল্প বয়সী ছেলের সাথে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মহল্লায় এক মেয়ে অল্প বয়সী এক ছেলেকে বিবাহ করেছে। ছেলেটা ছিল মেয়ের ছোট ভাইয়ের বন্ধু। শরী'আত মুতাবেক জায়িয আছে কি-না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ বয়স্কা মহিলা অল্প বয়সী ছেলেকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু উত্তম হল মেয়ের বয়স ছেলের তুলনায় কম হওয়া। আর ছেলে যদি একেবারে নাবালিগ হয় তাহলে তার পক্ষে কোন অলীর অনুমতি থাকা শর্ত। সুতরাং আপনাদের মহল্লায় যে মেয়ের অল্প বয়সী ছেলের সাথে বিবাহ হয়েছে সে যদি সাবালগ হয় এবং তাতে ছেলের ওলীর ইজাযত থাকলে তা জায়িয আছে। কোন অসুবিধা নেই।

[প্রমাণঃ দুররে মুখতার, ৩:৮ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:২২৭ দুররে মুখতার ৩:৫৬]

ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আপন ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা জায়িয হবে কি না?

জবাবঃ পবিত্র কুরআনে যে সব মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ভাগ্নী ও তার মেয়ে তথা বোনের বংশানুক্রমিক সকল অধঃস্তন মেয়েও অন্তর্ভুক্ত। তাই ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা হারাম।

[প্রমাণঃ সূরা নিসা, ২৩ তাফসীরে মাযহারী, ২:২৫৪-২৬১ বাদায়িউস সানয়ি, ২:২৫৭ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:২৭৩ তাফসীরে জালালাইন,

১:৭৩ আদ- দুররুল মুখতার, কাদীম ২:৩০১ হিদায়াহ ২:২৭৩ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৭:৩১৯ আহসানুল ফাতাওয়া, ৫:৯১ ফাতাওয়া মাহমূদীয়া,৩: ৩২৬]

পিতার খালাতো বোনের সাথে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ আমার দাদীর চাচাতো বোনের মেয়ে আব্বার খালাত বোন হয়, এখন আমার জন্য ঐ মেয়েকে বিবাহ করা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ আপনার আব্বার খালাত বোনকে আপনার জন্য বিবাহ করা জায়িয আছে। কারণ, শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যাদেরকে বিবাহ কবা হাবাম, আপনার আব্বার খালাত বোন তাদের মধ্যে শামিল নয়।

[প্রমাণঃ সূরা নিসা ২২, শামী ৩/২৮]

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ওয়াদায় হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করা জায়িয আছে কি-না? সে বলছে, বিবাহ করার পরে সে মুসলমান হয়ে যাবে।

জবাবঃ কোন মুসলমান পুরুষের জন্য সহীহ আহলে কিতাব ব্যতিত কোন অমুসলিম মহিলাকে বিবাহ করা জায়িয নয়। চাই হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান অগ্নি পূজারী বা যে কেউ হোক না কেন। তবে হিন্দু মহিলাটি যদি মুসলমান হতে চায়, তাহলে মুসলমান বানানোর পরে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, "তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। অতএব যখন তারা ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাবে, তখন তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন জায়িয হবে"।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারা, ২২১ ইবনে কাসীর, ১:২৬৪ হিদায়া, ২:৩১০ ফাতাওয়া রহীমিয়া, ২:১০০ বুখারী শরীফ, ২:৭৯৬]

তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ একটি তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ বসেছে। প্রথমতঃ জানার বিষয়-তার বিবাহ জায়িয হয়েছে কি? বিবাহের পর সমাজের লোকেরা ঐ স্ত্রীর স্বামীকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছে। কিছুদিন পর ঐ স্ত্রীর স্বামী সামাজিকভাবে তাওবা করেছে। এখন প্রশ্ন হল, তার তাওবা সঠিক হয়েছে কি? তার সাথে সমাজ করা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত চলাকালীন সময়ে অন্যত্র বিবাহ বসা সম্পূর্ণ নাজায়িয এবং হারাম। ইদ্দতের মধ্যে কেউ তাকে বিবাহ করলে সে বিবাহ সহীহ হবে না। স্বামী ও স্ত্রীকে মেলামেশা থেকে পৃথক রাখতে হবে। আর এ অপরাধের জন্য উভয়কে খালিস দিলে আল্লাহর দরবারে তওবা করতে হবে।

অতঃপর প্রথম স্বামীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় স্বামী বিবাহের সকল শর্ত সহ পুনরায় বিবাহ করতে পারে। অবশ্য মেয়ে দ্বিতীয় স্বামী ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ বসতে চাইলে তখন দ্বিতীয় স্বামীর থেকে পৃথক হওয়ার পর থেকে আরেকটি ইদ্দত পুনরায় পালন করতে হবে। কারণ, নেকাহে ফাসিদের পরও ইদ্দত পালন করতে হয়। সেই কথিত স্বামী যদি তাওবা করে, তাওবা কবুল হবে। তবে আগে উল্লেখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। তার তাওবা পূর্ণ হওয়ার পর তার সাথে সমাজ করা জায়িয হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:৫১৯ কিফায়াতুল মুফতী ৫:৩০৫]

সৎ বোন ও তার ভাগনীর নাতনীকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ সৎ বোন ও সৎ বোনের ঘরের ভাগনির যে নাতনী এদেরকে বিবাহ করা জায়েয কি-না?

জবাবঃ সৎ বোন ও সৎ বোনের নাতনীর যে নাতনী, তাদেরকে বিবাহ করা জায়িয নয়। কেননা, বোনের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। এখানে বোন দ্বারা বাবা-মা শরীক, বাবা শরীক, মা শরীক- এই তিন শ্রেণীর বোনকেই বুঝানো হয়েছে। আর বোনের মেয়ের মধ্যে নাতনী শামিল। সুতরাং, তাদেরকেও বিবাহ করা জায়িয নয়।

[প্রমাণঃ মা'আরিফুল কুরআন শামী ৩:৯৯]

বড় বোনের সঙ্গে অপকর্ম করে ছোট বোনের সঙ্গে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি এক মহিলার সঙ্গে অপকর্ম করার কিছুদিন পর তার ছোট বোনকে বিবাহ করেছে। এ বিবাহ সহীহ হয়েছে কি-না?

জবাবঃ বিবাহের দ্বারা যেমন হুরমতে মুসাহারা প্রমাণিত হয়, যিনার দ্বারাও তেমনি হুরমতে মুসাহারা প্রমাণিত হয়। এর ফলে যে মেয়ের সঙ্গে যিনা বা ব্যভিচার হয়েছে তার উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন মহিলাদের সঙ্গে যিনাকারীর বিবাহ হারাম। এখানে আলোচিত মহিলার ছোট বোন যেহেতু তার উর্ধ্বতন বা অধস্তন মহিলাদের কেউ নয়। সুতরাং, এমতাবস্থায় যিনাকারীর জন্য তার সাথে বিবাহ জায়িয। তবে উল্লেখ্য যে, শরী'আতের দৃষ্টিতে যিনা মারাত্মক অপরাধ ও হারাম। ইসলামী বিধানমতে এর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। অর্থাৎ যিনাকারী পুরুষ ও মহিলা অবিবাহিত হলে তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। আর তারা বিবাহিত হলে, পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আমাদের দেশে ইসলামী

হুকুমত কায়িম না থাকায় এ শাস্তি জারী করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে উভয়কে অন্তরে খালেস তাওবা করা জরুরী।

[প্রমাণঃ হিদায়াত, ২:৩০৯ নূরুল আনওয়ার ৭০ সূরা নূর ২ সূরা নূর ৩১]

দুধ ভাই-বোনের ভাই-বোন বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ রহীমা এবং হামীদা আপন দুই বোন। রহীমার এক ছেলে (আযাদ) হামীদার দুধ পান করেছে এবং হামীদার এক মেয়ে (রোকসানা) রহীমার দুধ পান করেছে। এখন রহীমা এবং হামীদর এ দু'ছেলে-মেয়ে ব্যতীত তাদের অন্য ছেলে-মেয়েদের সাথে বিয়ে জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ আযাদ হামীদার কোন মেয়েকে তার দুধ বোন হওয়ার কারণে বিয়ে করেতে পারবে না। তদ্রুপভাবে হামীদার মেয়ে (রোকসানা)-কে দুধ ভাই হওয়ার কারণে রহীমার কোন ছেলে বিয়ে করতে পারবে না। তবে রহীমার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের ও হামীদার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পরস্পর বিয়ে জায়েয হবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া, ২:৩৫১]

সৎ মাকে বিবাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার আম্মা দুনিয়াতে বেঁচে নেই। এখন আমার আব্বা আরেকটি বিবাহ করেছেন এবং উক্ত সৎ মাকে বাবা এখনও তালাক দেয়নি। এমতাবস্তায় আমি সৎ মাকে বাবার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে বিবাহ করেছি। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়িয হয়েছে কিনা? আমাকে সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ অন্যের স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোন মহিলাকে বিবাহ করার কোন পদ্ধতি শরী'আতে নেই। কেউ এরূপ বিবাহ করলে তা কোন বিবাহই হবে

না। আর পিতা সৎ মাকে তালাক দেয়ার পরও কুরআনুল কারীমের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী নিজ মায়ের ন্যায় সৎ মাকেও বিবাহ করা স্থায়ীভাবে হারাম। তাই বিয়ে না হওয়ায় আপনাদের মেলা মেশা সবই হারাম ও যিনা হবে।

সুতরাং, অচিরেই আপনাদের পরস্পরে পৃথক হয়ে যেতে হবে এবং উক্ত অপরাধে লিপ্ত হওয়ার দরুণ কান্নাকাটি করে খালিছভাবে তাওবা করতে হবে।

[প্রমাণঃ সূরা নিসা ২২, মিশকাত শরীফ ২৭৪; ফাতাওয়া শামী ৩:৩১, ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৭:৩৩২]

মহর

স্ত্রীর কাছে মাফ চাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক ব্যক্তি ৫০ হাজার বা তার চেয়ে কম বেশী দেনমহর ধার্য করে বিয়ে করল। বিয়ের সময় নগদ টাকা দিল না। পরে যদি সে স্বামী তার স্ত্রীর কাছে মহর মাফ চায়, স্ত্রী যদি মাফ করে দেয়, তাহলে এ ধরনের বিয়ে সহীহ হবে কি?

জবাবঃ যদি কোন ব্যক্তি দেনমহর ধার্য করে বিবাহ করে তাহলে, তার জন্য ভাল হচ্ছে যে, মেলামেশার আগে উক্ত দেনমহর পরিশোধ করে দেয়া। কেননা, এটা হচ্ছে স্ত্রীর হক বা প্রাপ্য এবং এটা স্বামীর দ্বায়িত্বে একটা ঋণ যা অন্যান্য ঋণের মত পরিশোধ করা জরুরী। তবে স্ত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তুষ্টচিত্তে মহরের টাকা হাতে পাওয়ার পর স্বামীকে মহরের কিছু অংশ বা পূর্ণ মহর হেবা করে দেয়, তাহলে মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু চাপে পড়ে মাফ করলে লৌকিকতার দ্বারা মহর মাফ হয় না। সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করলেই মাফ হয়। এতে বিবাহ বন্ধনে কোন অসুবিধা বা

ক্ষতি হবে না। তবে স্বামীর জন্য এটা হালাল নয় যে, মহর মাফ করানোর জন্য স্ত্রীকে চাপ প্রয়োগ করা বা দুর্ব্যবহার করা বা অন্য কোন হিলা করা। এভাবে মাফ করালেও মাফ হবে না। স্বামীর উচিৎ একবারে বা অল্প অল্প করে মহরের টাকা স্ত্রীকে পরিশোধ করে দেয়া। টাকা হাতে পাওয়ার পর স্ত্রী যদি কিছু অংশ খুশী হয়ে স্বামীকে হাদিয়া দেয়, তাহলে তা স্বামীর জন্য হালাল হবে। টাকা হাতে না দিয়ে অন্তরের সন্তুষ্টি বুঝা মুশকিল। এ জন্য হাতে দেয়ার কথা হযরত থানবী রহ. তার তাফসীরে উল্লেখ্য করেছেন।

[প্রমাণঃ মা'আরিফুল কুরআন, ২:২১৯, ২:২৯৮ হিদায়া ২:৩২৫, ২:৩২২]

প্রতিবছর বিবাহের দিন স্ত্রীকে উপহার দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ প্রতি বছর বিবাহের দিন স্বামী স্ত্রীকে কিছু উপহার দিলে এবং ঘরের লোকদের জন্য ভাল খাবারের ব্যবস্থা করলে সেটা জায়িয কি-না?

জবাবঃ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে খাওয়া-দাওয়া ও পোষাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি দেয়ার ব্যাপারে দুটি অবস্থা হয়ে থাকে। (১) প্রয়োজন অনুপাতে দেয়া (২) প্রয়োজনাতিরিক্ত দেয়া।

নিজ সঙ্গতি অনুপাতে প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়া হল একান্ত কর্তব্য এবং যখন প্রয়োজন হয় তখনি দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনের সময়টাই হল সেগুলো তাদেরকে দেয়ার নির্ধারিত সময়।

আর প্রয়োজনাতিরিক্ত দেয়া হল তাবাররু বা হাদিয়া। তাবাররু বা হাদিয়ার জন্য নির্ধারিত কোন ওয়াক্ত বা সময় নেই; বরং তা যে কোন সময় দেয়া যেতে পারে।

কাজেই এখন উল্লেখিত প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে স্বামী বা পিতার সঙ্গতি থাকা অবস্থায় যদি স্ত্রী বা সন্তানের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তা না দিয়ে বিবাহ বা জন্মদিনের অপেক্ষা করে, তাহলে তা জায়িয হবে না।

এমনিভাবে উক্ত জিনিস যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়, তা হলে তা হাদিয়া হবে। আর হাদিয়ার জন্য কোন দিনকে নির্ধারিত করা অনুচিত। কাজেই তা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য। মোদ্দাকথা, এগুলো বদ-রুসুম। এসব থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৬: ১৪৫/৪৬, তাবলীগুল হক্ব, ৮৯৭]

যৌতুক

চার নিয়মের যৌতুক

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় যৌতুক মোটামুটি চার নিয়মে নেয়া হয়।

প্রথমঃ যৌতুক চুক্তি করে নেয়া। যেমন, মেয়ের পক্ষ থেকে নগদ টাকা, ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি মোটকথা ঘর সাজাতে যা লাগে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব কিছু ছেলের পক্ষ, মেয়ের পক্ষ থেকে চুক্তি করে নিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় নিয়মঃ যৌতুক চুক্তি ছাড়া নেয়া। যেমন, ছেলের পক্ষ বলে দেয়, যৌতুকের ব্যাপারে আমাদের দাবী নাই। আপনারা খুশি হয়ে যা দেন। যেহেতু আমরা আপনাদের মেয়ে নিচ্ছি তাই কিছু দিলে আপনাদের মেয়েরই থাকবে।

তৃতীয় নিয়মঃ ছেলে পক্ষ বলে থাকে আমরা কোন যৌতুক চাই না। কিন্তু মনে মনে পাওয়ার জন্য আশায় থাকে। আর কিছু দিলেও ফেরৎ দেয় না।

চতুর্থ নিয়মঃ খাওয়া চুক্তি। যেমন, ছেলের পক্ষ থেকে মেয়ের পক্ষকে বলে, আমাদের ১০০ থেকে ২০০ লোক খাওয়াতে হবে।

উপরে উল্লেখিত নিয়মগুলো জায়িয কি-না? যদি জায়িয না হয়ে থাকে তাদের জন্য তাওবা করার পদ্ধতি কি? বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

জবাবঃ ইসলামী শরী'আতে বিবাহ অত্যন্ত সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন বান্দা বিবাহ করল তখন যেন তার দ্বীন অর্ধেক পরিপূর্ণ হল। এখন সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। এর গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। কিন্তু আমরা গুরুত্বপূর্ণ এই ইবাদতকে বিদ'আত, রুসুমাত (কুসংস্কার) অপব্যয়, অডিও, ভিডিও, বেপর্দা, গান-বাদ্য ও বিভিন্ন ধরনের গুনাহের কাজ দ্বারা বিকৃত করে ফেলছি।

যার কারণে বিবাহ শাদী আমাদের জন্য বিশেষ করে মেয়ের পিতার জন্য মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবাহের কুসংস্কার সমূহের মধ্যে যৌতুকের প্রথা অন্যতম। প্রশ্নে বর্ণিত যৌতুকের চার নিয়মের ইসলামী বিধান নিম্নরূপ।

(১) যৌতুক চুক্তি করে নেয়া অর্থাৎ ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষ থেকে নগদ টাকা, ফ্রিজ, টিভি, ঘর সাজানোর আসবাবপত্র ইত্যাদি চুক্তি করে নেয়া নাজায়িয ও হারাম।

(২) যৌতুক চুক্তি ছাড়া নেয়া যেমন, ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলে থাকে যে, আমাদের কোন দাবী নেই যা কিছু দিবেন তা আপনাদের মেয়েরই থাকবে। এটাও এক রকমের চাওয়া। সুতরাং, মনকে অন্যের মালের লোভ থেকে পাক করে শুধু এতটুকু বলা ঠিক যে, আমাদের কোন দাবী নাই এবং আমরা যৌতুক নিতেই রাযী নই। এমতাবস্থায় মেয়েকে যা কিছু দিবে তাতো হালাল হবেই এবং ছেলেকে যা কিছু দিবে তাও

জায়িয ও হালাল হবে। তবে যা দিবেন আপনাদের মেয়ের থাকবে, এটা বলবে না; কারণ এর মধ্যে চাওয়া আছে।

(৩) ছেলের পক্ষ মুখে বলে আমরা কোন যৌতুক চাইনা, কিন্তু মনে মনে আশায় থাকে। এমতাবস্থায়ও যৌতুক না নেয়া চাই। কারণ কারো মালের আশায় থাকার পর তা পাওয়া গেলে তার মধ্যে বরকত হয় না। আশায় না থেকে যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে তার মধ্যে বরকত হয়। তবে বিবাহের অনুষ্ঠানে দেয়া-নেয়া বদ-রুসুম। বিবাহ-শাদী হওয়ার পর সুযোগমত দিতে ও নিতে পারে।

(৪) খাওয়ার চুক্তি যেমন, ছেলের পক্ষ বলে থাকে, আমাদের দেড়শ/দু'শ লোক খাওয়াতে হবে- এটাও নাজায়িয ও হারাম। কারণ, শরী'আতে বর যাত্রীদের খাওয়ানোর ব্যাপারে কোন হুকুম নেই। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে, বরের সাথে দেড়শ/ দু'শ বরযাত্রী যাবে, তাদের উন্নতমানের খানা পিনার ইন্তিজাম মেয়ের পিতাকে করতে হবে; মেয়ের পিতার সামর্থ্য থাকে বা না থাকে, মেয়ের পিতা প্রথা হিসেবে ঋণ করে বা জমি বন্ধক রেখে তাদের খানা-পিনার ইন্তিজাম করে থাকে। এটা সম্পূর্ণ জুলুম এবং এভাবে অন্যের মাল খাওয়া জায়িয নয়। সঠিক নিয়ম হলো, বরের সাথে পরামর্শদাতা হিসাবে দুই-এক জন লোক যাবে। মেয়ের পিতা সামর্থ অনুযায়ী তাদের মেহমানদারী করবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। অন্য সকল মেহমান ও আত্মীয়গণ বিবাহ পড়ানোর পর বাড়ীতে চলে যাবে।

আর যারা মেয়ের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করে যৌতুক নিয়েছে তাদের তাওবা করার পদ্ধতি হল, যৌতুকের নামে যা কিছু নিয়েছে তা ফিরিয়ে দিয়ে বা অন্য যে ভাবেই হোক তাদেরকে খুশি করে মাফ নিয়ে নিবে। এবং এ রকম নাজায়িয কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করবে।

[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ২৫৫ ইসলামী শাদী ১৮৮ আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৫:১৩৭]

বিবাহের মহর

জিজ্ঞাসাঃ বিবাহের সময় মহর ধার্য ছিল ৫০,০০০/- টাকা। আর বিবাহের সময়ই তাকে ৫০,০০০/- টাকার স্বর্ণালংকার দেয়া হয়েছে। পরে বাসর ঘরে আমার স্ত্রী মহরের টাকা চাওয়ায় আমি তাকে বলছি পঞ্চাশ হাজার টাকার স্বর্ণালংকারেই মহরের অন্তর্ভুক্ত। একথা শুনে সে আমাকে দায়মুক্ত করে দেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে কি মহর আদায় হয়েছে? না পুনরায় মহর আদায় করতে হবে।

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী আপনার মহর আদায় হয়ে গিয়েছে। কেননা, সেই টাকা বা মালকে মহর বলা হয় যা বিবাহের সময় নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং আপনি যদি উক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের অলংকার মহর হিসাবে উল্লেখ্য করে দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই মহর আদায় হয়ে গিয়েছে। আর যদি তা স্ত্রীকে উপহার হিসাবে দেয়া হয় থাকে, তাহলে উক্ত স্বর্ণালংকার হাদিয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং তা মহরের মধ্যে শামিল হবে না। অবশ্য সর্বাবস্থায়ই দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

[প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার ৩:১৫১ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:২৬৩]

সহবাসের আগে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মহর

জিজ্ঞাসাঃ অভিভাবক তার ছেলেকে নাবালিগ অবস্থায় বিবাহ করিয়েছে। ছেলে বালিগ হওয়ার পর উক্ত মেয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত হয়েছে, কিন্তু মেয়ে এখনও নাবালিগ। অতঃপর বাবার অত্যাচারে ছেলেটি ঐ মেয়েকে তালাক দিয়েছে। ছেলেরও তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। এখন প্রশ্ন হলো, এ মেয়েকে মহরানা দিতে হবে কিনা বা দিলে কি পরিমাণ দিতে হবে?

জবাবঃ উক্ত নাবালিগা স্ত্রীকে অর্ধেক মহরানা দিতে হবে। কারণ, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা না হওয়া অবস্থায় তালাক দিলে, স্ত্রী নির্ধারিত মহর থেকে অর্ধেক মহরের হকদার হয়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:২৪৭ শামী ৩:১০৪]

৫০০০ টাকার পরিবর্তে জমি দ্বারা মহর পরিশোধ

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক ব্যক্তি বিয়ের সময় দেন মহরের টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। সে সময় ৫০০০ টাকা দেন মহর ধরা হয়। এখন বর্তমানে তার স্ত্রীকে ৫০০০ টাকার বদলে এক বিঘা জমি দেন মহর বাবদ দিয়েছে, তার কি এতে মহরের টাকা পরিশোধ হয়েছে।?এটা জানালো খুশি হব।

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রী রাজী থাকলে তার প্রাপ্য ৫০০০ হাজার টাকার পরিবর্তে এক বিঘা জমি দিলে তা মহর হিসাবে আদায় হবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

[প্রমাণঃ বাদায়ে ২:২৭৯ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৮:২১৪ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৩:২৪৪ আলমগীরী ১:৩০২]

সামর্থ্যের অধিক মহরানা ধার্য করা

জিজ্ঞাসাঃ (১) সামার্থ্য না থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে সামার্থের উর্ধ্বে মহর ধার্য করে, যা ছেলের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় পিতা-মাতা নিজেদের পক্ষ থেকেই ছেলের অজান্তেই মহরানা ধার্য করে ফেলেন। এটা সামাজিকতার মত হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে শরী'আতের হুকুম কি ?

(২) মহরানা ধার্য হয়ে গেলে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী মিলে মহরানা কমানো যাবে কি?

(৩) শুধু সামাজিকতার কারণে এরকম প্রথার মহরানা ধার্য করে বিবাহ করার কি হুকুম?

(৪) পিতা-মাতার ধার্যকৃত মহরানার টাকা ছেলেকে পরিশোধ করতে হবে কি?

(৫) যদি ছেলের সামর্থ্য না থাকে, তবে এক্ষেত্রে শরী'আতের ফায়সালা কি ?

জবাবঃ (১) উভয় পক্ষ মিলে যে মহর নির্ধারিত করে এবং বিবাহের সময় উল্লেখ্য করা হয়, স্বামীর উপর তা আদায় করা জরুরী। কেননা, নির্ধারিত মহরের উপর স্বামী রাযী না থাকলে, তার সম্মুখে যখন উল্লেখ করা হয়, তখন তিনি অসম্মতি প্রকাশ করতে পারতেন। যেহেতু অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি, তাই এতে তার সম্মতিই প্রকাশ পায়। বেশী মহর নির্ধারিত করা শরী'আতে জায়িয আছে। তবে মহর কম হওয়া উত্তম, যাতে আদায় করা সহজ ও সম্ভব হয়। তাই অভিভাবকদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা উচিত। সামর্থ্যের কথা বিবেচনা না করে প্রথা অনুযায়ী অধিক মহর ধার্য করা ঠিক নয়। আদায় না করার ইচ্ছা নিয়ে এরূপ করলে গুনাহ হবে। এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও জায়িয হবে না।

[প্রমাণঃ তাতারখানিয়া ৩:৪২:৪৩ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:২৫৮:৬৩ কানযুল উম্মাল ১৬:৩২২]

(২) স্বামী-স্ত্রী মিলে উভয় রাযী হয়ে নির্ধারিত মহর থেকে কমাতে পারবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৩১৩ হিদায়া ২:৩২৫]

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, স্ত্রী যেন অন্তরের খুশীর সাথে মাফ করে দেয়, কোনরূপ চাপ ও হুমকীর কারণে না হয়।

(৩) সামাজিকতার কারণে যে মহর ধার্য করে বিবাহ করা হয়, এ মহরও আদায় করা স্বামীর উপর জরুরী।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:৩১০]

(৪) পিতা-মাতার ধার্যকৃত মহরও ছেলেকে আদায় করতে হবে। কারণ এ মহর জানার পর ছেলে অসম্মতি প্রকাশ করেনি। তবে পিতা যদি দায়িত্বে নেন, তাহলে পিতার নিকটও দাবী করা যাবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩:৪২ দারুল উলূম ৮:২৬৫]

(৫) যেহেতু পিতা ছেলের অনুমতি ও সামর্থ্যের খেয়াল না করে কম মহর নির্ধারিত না করে অধিক মহর নির্ধারিত করেছে সুতরাং সেই মহর আদায় করতে স্বামীর সামর্থ্য না থাকলে, যতটুকু সম্ভব ততটুকু আদায় করবে। বাকীটুকু পিতার নিকট থেকে চেয়ে নিবে। কারণ ছেলের কাছে জিজ্ঞাসা না করার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, এ ব্যপারে তিনিও যিম্মাদারী নিবেন। তিনিও অপারগ হলে, হিকমতের সাথে চাপ সৃষ্টি না করে সহীহভাবে স্ত্রী থেকে মাফ করিয়ে নিবে। যার ব্যাখ্যা আগে দেয়া হয়েছে।

বহু আগে নির্ধারিত মহর আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমার পিতার বয়স প্রায় ৭৫ বছর। তিনি বৃটিশ আমলে ৫০ টাকা মহর নির্ধারন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন টাকা ছিল রূপার। এখন কথা হল, মোহরের টাকা পরিশোধ করতে হলে কত টাকা দিতে হবে?

আর এ টাকা যদি আমার কোন ভাই আব্বাকে দেন এবং তিনি উক্ত টাকা দিয়ে মহর পরিশোধ করতে চান, তাহলে জায়িয হবে কি? উল্লেখ্য যে, তিনি এখন কোন কাজ-কর্ম করতে পারেন না। তবে জমি-জমা আছে।

জবাবঃ যেহেতু বিবাহ করার সময় টাকা ছিল রূপার এবং ঐ সময় এক তোলা রূপা দ্বারা একটি টাকা বানানো হত, তাই সে হিসাবে ৫০ টাকা মহর নির্ধারণ করার অর্থ হল ৫০ তোলা তথা ৫০ ভরি রূপা মহর নির্ধারণ করা। তাই এখন ৫০ ভরি রূপা বা সমমূল্যের টাকা উক্ত মহিলাকে মহর হিসাবে আদায় করে দিতে হবে।

যদি আপনার কোন ভাই যিম্মাদার হয়ে ঐ পরিমাণ টাকা আপনার আব্বার পক্ষ থেকে আপনার আব্বার অনুমতিক্রমে মহর হিসেবে আদায় করে দেয়, তাহলে উক্ত মহর হয়ে যাবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:১৪০ ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ১৩:২৪৯ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:২৪০]

মহর আদায় করার সামর্থ্য না থাকলে

জিজ্ঞাসাঃ আমার পাশের গ্রামে আমার এক বন্ধু বিয়ে করে। বিয়েতে তার একান্ত ইচ্ছা ছিল মহরে ফাতেমী ধার্য করা। কিন্তু তার একবারে পরিশোধ করার সামর্থ্য নেই। বিয়ের আগে কনের মৌখিক সমর্থনও পেয়েছিল, কিন্তু ছেলের বাবা ও মেয়ের বাবা পরামর্শক্রমে ১ লক্ষ টাকা মহর ধার্য করেন। বিয়ে পড়ানোর সময় ছেলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুরুব্বীদের চাপে তা মেনে নেয়। কিন্তু তা পরিশোধের সামর্থ্য তার নেই। এদিকে কাবিন নামায় ১ লক্ষ টাকা লেখা। এখন ছেলে কিভাবে মহর আদায় করবে বা কি পরিমাণ আদায় করলে হবে?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী, যেহেতু আপনার বন্ধু বিয়ে পড়ানোর সময় এক লক্ষ টাকা মহর ধার্য করাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছেন, সেহেতু উক্ত মহর আদায় করা আপনার বন্ধুর উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং একসাথে আদায় করতে না পারলেও আস্তে আস্তে আদায় করে দিতে

হবে। আর যদি স্ত্রীর কাছ থেকে মহরের কিছু অংশ পরিশোধ করে অবশিষ্ঠ অংশ মাফ চেয়ে নেয় এবং স্ত্রীও খুশী মনে মাফ করে দেয়, তাহলে সে পরিমাণ মহর মাফ হয়ে যাবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:১০২ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:২৬৩]

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে মহর বেশী ধরার একটা বাতিক শুরু হয়ে গিয়েছে। ছেলের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না করেই বিরাট অংকের মহর ধার্য করা হয়ে থাকে। ছেলেরা তা আদায়ে সামর্থ্য হয় না বা আদায়ে সচেষ্ট হয় না। এভাবে মহর ধার্য করা সুন্নাত তরীকার খিলাফ। শরী'আতের বিধি মতে, ছেলের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহর ধার্য করা কর্তব্য। মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম রৌপ্য। যার মূল্য বর্তমান বাজার দর হিসাবে আনুমানিক মাত্র ছয় শত টাকা হয়। গরীবদের জন্য এরকম মহরই ধার্য করা উচিত। মহরে ফাতেমী গরীবদের জন্য নয়। বরং তা অবস্থাশালীদের জন্য।

যদি মহর বেশী ধরা হয়, তবে বেশী আদায় করাই ওয়াজিব হবে। ছেলে রাযী না থাকলে মজলিসের মধ্যেই জানিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী মারা গেলে মহরের টাকা কে পাবে?

জিজ্ঞাসাঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরই উক্ত মহিলা মারা যান। ঘটনাক্রমে মহরানা আনাদায় থাকে। মহিলার কোন সন্তানদি নেই। কোন উত্তরাধীকারও নেই। এখন তালাকদাতা স্বামী যদি কোন প্রকার নিজের সাওয়াবের আশা না করে ঐ মৃত মহিলার পক্ষ থেকে মহরানার টাকাগুলো কোন মসজিদ নির্মাণের কাজে বা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন, তবে মহরানা আদায় হবে কি-না? যদি না হয়, তবে কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে?

জবাবঃ মহিলার কোন ওয়ারিশ থাকলে সে উক্ত টাকা পাবে। মহিলার মহরানার টাকা তার উত্তরাধিকার কেউ না থাকায় নিজের দায়িত্ব থাকায় এবং মহিলাকে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যতে মসজিদে বা মাদরাসায় দান করে দিতে পারে। তাতে কোন অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য যে, সন্তানহীন স্ত্রীর অর্ধেক সম্পদের ওয়ারিশ তার স্বামী। এ হিসাবে অর্ধেক মহর সদকা করলেই চলবে। (হিন্দিয়াঃ ১/৩০৩)

মহর আদায় না করা

জিজ্ঞাসাঃ বিবাহ করার পর আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার স্ত্রীর মহর আদায় করতে পারিনি। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে উক্ত মহর আদায় করার নিয়্যাত আমার ছিল। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী আমার সাথে স্বীকার করেছে যে, সে অমুক ব্যক্তির সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে। তার এ অপকর্মের কথা আমার শ্বশুরকে জানালে তিনি এসে খোলা তালাকের মাধ্যমে আমার নিকট থেকে তার মেয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তখনো মহরের কোন কথা উঠেনি। এমতাবস্থায় মহর আদায় না করার দরুন আমি গুনাহগার হব কি-না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ বর্ণনানুযায়ী আপনি মহর আদায় না করলে গুনাহগার হবেন। কেননা, বিবাহের পর একবার সহবাস হলেই স্বামীর পূর্ণ মহর আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তালাকের সময় যেহেতু আপনি কোন চুক্তি করেননি, সুতরাং, উক্ত মহিলার নিকট থেকে আপনি কিছুই পাবেন না, কিন্তু স্ত্রী পূর্ণ মহরের হকদার হয়ে গিয়েছে।

[প্রমাণঃ হিদায়াহ ২:৩২৪ ফাতাওয়ায়ে শামী ৩:১০২]

আমাদের দেশে প্রচলিত ধার্যকৃত মহর আদায়ের বিশুদ্ধতম পন্থা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে বিয়ে-শাদীতে মহর ধার্যের যে প্রচলন বিদ্যমান আছে, যেমন, ৩০ হাজার বা ৫০ হাজার বা ১ লক্ষ টাকা, তা আদায়ের বিশুদ্ধতম নিয়মনীতি কি?

জবাবঃ বিয়ের সময় মহর নগদ আদায় করার কথা থাকলে নগদ আদায় করে দিতে হবে। তার আগে বিধি বাধা দিলে বিবির কাছে যেতে পারবে না। সম্পূর্ণ বা আংশিক যে পরিমাণ নগদ আদায় করার কথা থাকবে, সে পরিমাণই নগদ আদায় করে দিতে হবে। মহর যদি নগদ পরিশোধের শর্ত ছাড়া বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। তবে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আদায় করতে চেষ্টা করবে। কারণ, অন্যান্য ঋণের মতো এটাও একটা ঋণ যা আদায় না করলে, বান্দার হক নষ্ট করা হয় এবং এটা এমন এক গুনাহ যা বিবি মাফ না করলে, আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না। উল্লেখ্য, বিয়ের সময় যদি কারো মহর পরিশোধ করার নিয়্যাত না থাকে, তাহলে সে কিয়ামতের দিন যিনাকারী হিসাবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

[প্রমাণঃ আততারহীব ওয়াততারহীব ৩:৪৮ আল-বাহরুর রায়িক ৩:১৭৮]

মহরে ফাতেমীর পরিমাণ

জিজ্ঞাসাঃ মহরে ফাতেমী কি? এবং তার পরিমাণ বর্তমান বাজারে কত টাকা?

জবাবঃ হুযূর ﷺ স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা রা. যিনি সমস্ত জান্নাতী মহিলাদের সর্দার, তাঁর বিবাহের সময় যে মহর নির্ধারিত করেছিলেন, উহাকেই মহরে ফাতেমী বলে।

মহরে ফাতেমীর পরিমাণঃ মহরে ফাতেমী পাঁচশত দিরহাম অর্থাৎ একশত সোয়া একত্রিশ তোলা রূপা। বর্তমান বাজারে (প্রায়) ছয়শত

টাকা তোলা হিসাবে (প্রায়) ৮০,০০০/= (আশি হাজার টাকা)। বর্তমানে কেউ ফাতেমী দেনমহর দিতে চাইলে উক্ত পরিমাণ রূপা বা তার বাজার মূল্য দিতে হবে। মহরে ফাতেমী শুধুমাত্র সামর্থ্যবান স্বামীর জন্য সুন্নাত। সকলের জন্য নয়, বরং অন্যদের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী কমপক্ষে দশ দিরহাম যার বর্তমান বাজার দর হিসাবে (প্রায়) ১৫০০/= (পনেরশত টাকা) দিলেও বিবাহ দুরস্ত হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬:৪৪৫ জাওয়াহিরুল ফিকহ ২:৪২৪ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৩০২ বদায়েয়ুস সানায়ে ২;২৭৫]

মহরের সর্ব নিম্ন পরিমাণ

জিজ্ঞাসাঃ মধ্যম শ্রেণীর একজন মহিলার কি পরিমাণ মহর হওয়া উচিত ? সর্বনিম্ন মহরের পরিমাণ কত? বিবাহের সময় পুরা মহর আদায় করা জরুরী কিনা?

জবাবঃ সাধারণত বিবাহের সময় কন্যার কর্তৃপক্ষ ও বর পরস্পরে মিলে যে মহর ধার্য করে, সেটাই মেয়ের মূল মহর। এক্ষেত্রে মহর কম বা বেশী ধার্য করার সম্পূর্ণ অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। তবে মহরে মিছল থেকে কম ধার্য করা উচিত নয়। অর্থাৎ মেয়ের বোন, ফুফু- ফুফাতো বোন ইত্যাদি এদের কারো মহরের সমান ধার্য করবে। এর থেকে কম ধরবে না। অবশ্য মহরে মিছল ধার্য করার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য, সম্পদ, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, কুমারীত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে সমান সমান হতে হবে। এসব গুণগত বিষয়ে ব্যতিক্রম হলে, মহরে মিছলের মধ্যেও ব্যতিক্রম হবে।

অধিক পরিমাণে মহর নির্ধারণ জায়িয আছে। তবে খুব বেশী পরিমাণ মহর নির্ধারণ করা বা স্বামীর সামর্থ্যের বাহিরে মহরে ধার্য করা বাঞ্ছনীয় নয়। অনুরূপ ভাবে একবারে সামান্য বা তুচ্ছ পরিমাণ মহর ধার্য থেকেও

শরী'আত নিষেধ করেছে। তবে সর্বনিম্ন মহর কত হবে, সেটাও শরী'আত নির্ধারণ করে দিয়েছে, অর্থাৎ দশ দিরহাম। হাদীসে আছে, হুযূর ﷺ বলেন, দশ দিরহামের কম মহর ধার্য করা যাবে না। বর্তমান বাজারে হিসাবে দশ দিরহামের পরিমাণ হল ২ তোলা সাড়ে ৭ মাশা। অর্থাৎ আড়াই ভরি রৌপ্য বা তার সমমূল্য। প্রতি দিরহাম= ৩ মাশা ১-৫/১ রতি। ৮ রতিতে ১ মাশা, ১২ মাশায় ১ তোলা। এই হিসাবে দশ তোলা সাড়ে ৭ মাশা (আড়াই ভরি) রূপা বা সমমূল্য টাকা সর্বনিম্ন মহর ধরা হবে। রূপার দাম বাজারে থেকে জেনে নিবেন।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৮৩২ আযীযুল ফাতাওয়া ৪৫১ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮: ২৩০, ৮:২৬৪]

বিবাহের সময় তাৎক্ষণিকভাবে সম্পূর্ণ মহর আদায় করা জরুরী নয়। বরং কিছু অংশ পরেও আদায় করা যায়। তবে বিবাহের সাথে সাথে পুরা মহর আদায় করে দেয়াই উত্তম। একান্ত যদি কিছু পরিমাণ বাকী থাকে, তাহলে তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হলে, যেমন ১মাস, ১বছর বা পাঁচ বছর ইত্যাদি, তবে উক্ত সময়সীমার মধ্যেই আদায় করে দিতে হবে। আর যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাকী থাকে, তাহলে সেটাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করে দিবে। মনে রাখবে এটা একটি দেনা। আদায় ছাড়া এর থেকে মুক্তি পাবে না। অপারগ বা অক্ষম অবস্থায় পাওনাদার যদি মাফ করে দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। আর যাদের কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের সময় সমুদয় পাওনা মহর আদায় করে দিতে হবে।

[প্রমাণঃ আলমগীরী /৩০২ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:২১৬/২১৯/২৭৫]

তালাকের পর স্ত্রীর প্রাপ্য

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে মহর ছাড়া অতিরিক্ত টাকা-পয়সা দিতে হবে কিনা?

জবাবঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে মহর ছাড়াও ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে খোরপোষ এবং বাসস্থান দিতে হবে। তবে যদি উক্ত স্ত্রী অবাধ্য হয়, অর্থাৎ দুর্ব্যবহার করে, বদ চলন চলে, তাহলে সে এগুলো পাবে না। মহর পাওনা থাকলে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

[প্রমাণঃ আলমগীরী ১:৫৫৭ হিদায়া ২:৪৪৩ শামী ৩:৫০৫-৫০৬ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১০:৩৪৯ বাদায়িউস সানায়ি ৪:১৬ কিফায়াতুল মুফতী ৬:৩৭৭]

মহর দেয়ার উদ্দেশ্য

জিজ্ঞাসাঃ মহর দেয়ার উদ্দেশ্য কি? মহর কেন দেয়া হয়? এ ব্যাপারে অনেক জায়গায় তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সঠিক ফায়সালা কি?

জবাবঃ স্বামী বিবাহ বন্ধনের সময় স্ত্রীর সম্মানার্থে মহরের বিনিময়ে স্ত্রীর বিশেষ একটি অংগের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করে। তাই ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিকোন থেকে মহরকে বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য ফরয করা হয়েছে।

[প্রমাণঃ তাফসীরে মাযহারী ২:২১২ হিদায়া ২:৩২৩ পৃঃ]

বিবাহের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কুপ্রথা

কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ বিয়েতে আনুষ্ঠানিকতা করা কি? প্রচলিত নিয়ম কমিউনিটি সেন্টারে চেয়ার ও ডাইনিং টেবিলে বসে খাওয়া হয়, এটি জায়িয কিনা?

জবাবঃ বিবাহ দ্বীনদার আত্মীয়-স্বজন বা দ্বীনদার লোকদের মজমায় হওয়া সুন্নাত। পরহেজগার ও দ্বীনদার লোকদের যত বড় মজমা হবে বিবাহ ততই বরকত হবে। আর এ মজমা মসজিদে হওয়া আরেকটি সুন্নাত।

বিবাহ উপলক্ষ্যে শরী'আতের দৃষ্টিতে মেয়ের পিতার উপর বিবাহের অনুষ্ঠান করার কোন দ্বায়িত্ব নেই। বরং সুন্নাহ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর স্বামী তার সামর্থ্য অনুসারে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবদেরকে ওলীমা খাওয়াবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো ওলীমা অনুষ্ঠানে যেন শরী'আত পরিপন্থী কোন কাজ না হয় এবং অতি আড়ম্বর না হয়। কারণ হাদীসে পাকে স্বল্প ব্যায়ের বিবাহকে অতি বরকতপূর্ণ বলা হয়েছে।

আমাদের দেশে বরযাত্রীদের কনের বাড়ীতে গিয়ে খাওয়ানো যে প্রথা প্রচলিত আছে এবং এ ব্যাপারে যে বাধ্যবাধকতা আছে তা সম্পূর্ণ নাজায়িয।

[ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭:৩১৮]

বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে কমিউনিটি সেন্টারে ভাড়া করে বিবাহের যে অনুষ্ঠান করা হয় এতে শরী'আত পরিপন্থী অনেক কাজ সংঘটিত হয়। যেমন, টাকার অপচয়, বেপর্দাভাবে মহিলাদের সমাগম, গান-বাদ্য ইত্যাদি। কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ অনুষ্ঠানের সবচাইতে আপত্তিকর বিষয় হচ্ছে, এতে সাধারণত যশ ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে, অথচ

হাদীস শরীফে এ উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার জন্য মারাত্মক শাস্তি হওয়ার কথা উল্লেখ্য আছে। এর আরেকটি জঘন্যতম দিক হচ্ছে, এধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত মানুষকে আল্লাহ তা'আলার (যিকির) স্বরণ থেকে অমনোযগী করে দেয়। আর যে সকল কাজ যিকরুল্লাহ থেকে অমনযোগী করে দেয়, হাদীস শরীফে সেগুলোকে জুয়া অখ্যা দেয়া হয়েছে। কাজেই এ সকল অনুষ্ঠান মোটেও জায়িয হতে পারে না। (ইসলামী শাদী ২৩১-২৩২)

তবে ওলীমা অনুষ্ঠানের জন্য নিজ বাড়ীতে স্থান সংকুলান না হলে অপারগতার কারণে কমিউনিটি সেন্টারে ওলীমা অনুষ্ঠান করা জায়িয হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা উল্লেখিত শরী'আত পরিপন্থী কোন কাজ সহ অন্য কোন নাজায়িয বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে।

[সূরা মায়িদা ৯১, লুকমান ১৮, আয়াত ৩১, সুনানে বাইহাকী ৬:১০০, কাশফুল খাফা ২:২২৭, মিশকাত ২:২৫৫, ২৭৮, ২৬৮, ইসলামী শাদী ২৩২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭:৩১৮]

বর-কনের হাত ও দাড়িতে মেহেদী লাগানো

জিজ্ঞাসাঃ পুরুষের হাতে মেহেদী লাগানো জায়িয কিনা? বিয়ের সময় বর-কনে উভয় মেহেদী লাগিয়ে থাকে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি? সাদা দাড়ীতে বা চুলে মেহেদী লাগানো ঠিক কিনা?

জবাবঃ পুরুষের জন্য সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যে হাতে বা গায়ে মেহেদো ব্যবহার করা জায়িয নয়। বরং মাকরূহ। তবে যদি কোন ঔষধ হিসাবে যেমন, হাত বা পায়ে ঘা হওয়ার কারণে ব্যবহার করে তাহলে মাকরূহ হবে না। এমনিভাবে পুরুষের জন্য সাদা চুলে বা দাড়িতে মেহেদী লাগানো জায়েয। আর মহিলাদের জন্য হাতে, পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা

সর্বাবস্থায় জায়িয। বিয়ের সময়, শুধু মহিলারা মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে। বর বা পুরুষরা পারবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫:৩৫৯ ফাতাওয়া রশীদিয়া, ৪৭১]

বিবাহ অনুষ্ঠানে বাজনার আয়োজন করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামের একজন মুফতী সাহেব কিছুদিন আগে বয়ানে বললেন, বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা জরুরী এবং তা করা না করা হলে, উক্ত বিবাহ হারাম হয়ে যাবে। এতদসংক্রান্ত বর্ণনা বুখারী শরীফে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ্য করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ মুসলমানদের বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনার আয়োজন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এমনকি যারা উক্ত কাজকে হালাল বা জায়িয বলে মনে করেন, তাদের ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা, গান-বাদ্য শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। আর হারাম কাজকে হালাল বা জায়িয মনে করলে ঈমান চলে যায়। সুতরাং মুসলমানদের এরূপ হারাম কাজ বর্জন করা অপরিহার্য। যারা এরূপ কাজ করে তারা ফাসিক। আর যে ব্যক্তি গান-বাজনার অনুমতি দেয় সেও নিঃসন্দেহে ফাসিক। এমন ব্যক্তির জন্য ইমামতী করা মাকরূহ তাহরীমী।

অতএব, যারা গান-বাজনা করে অথবা গান-বাজনা করার অনুমতি দেয়, তাওবা না করলে, এমন লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত। আর মুসলমানদের এ ধরনের বিবাহ অনুষ্ঠান বর্জন করা উচিত।

অবশ্য ছোট শিশুদের দ্বারা কোন প্রকার বাদ্য বাজানো ছাড়া শালীন অর্থবোধক কবিতা বা গযল আবৃত্তি করা যেতে পারে। আর হাদীসে কেবল এতটুকুরই অনূমতি দেয়া হয়েছে।

প্রশ্নে বর্ণিত নামধারী আলেম সম্ভবতঃ উক্ত হাদীসের অর্ধ না বুঝে উল্টা ফাতাওয়া দিয়েছেন। এ ধরনের লোকদের থেকে সাধারণ মুসলামানদের দূরে থাকা ঈমানী দায়িত্ব।

[প্রমাণঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৭৪৬ সূরাহ লুকমান ৬ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৭:২৫-২৭]

বিয়েতে বৌভাত ও মেয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে প্রচলিত রিওয়াজ আছে, বিবাহ অনুষ্ঠানে বর পক্ষ অনেক লোকজন নিয়ে মেয়ের বাবার বাড়ীতে বরযাত্রী হিসেবে যায়। সেখানে ভাল ভাল উন্নত মানের খানাপিনার ব্যবস্থা হয়। মেয়ের বাবা অক্ষম হলেও সামাজিকতা ও মান সম্মানের ভয়ে উক্ত অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মেয়ের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজনেরা বরকনের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী নিয়ে আসে। এরপরে রয়েছে ছেলের বাড়িতে বৌ-ভাতের অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে ছেলে পক্ষের আত্মীয়রা নানা ধরনের উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে। এটা একটা নিয়মে পরিনত হয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত খাওয়ার অর্থই হল কোন কিছু উপহার দেয়া। উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে,

(১) বরের পক্ষ থেকে ১০০/৫০ করে মেয়ের বাড়ীতে বরযাত্রী যাওয়া কি জায়িয?

(২) বরের বাড়ীতে বৌভাতের অনুষ্ঠান কি জায়িয?

(৩) উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মেহমানদের দেয়া উপহার কি যৌতুকের শামিল?

(৪) শরী'আতে ছেলের পক্ষ থেকে যে ওলিমা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, তা কোনটি?

(৫) শরী'আতের বিবাহের অনুষ্ঠান কিভাবে করতে হবে? যেমন- বিবাহের কালিমা, বৌ তুলে আনা, বর-কনের গোসল অনুষ্ঠান, বৌভাত অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

জবাবঃ (১) শরী'আতে বরযাত্রীর অনুষ্ঠানের নামে কোন অনুষ্ঠান নেই। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম যে, বরের সাথে ১০০/৫০ জন বরযাত্রী যাবে। তাদের উন্নতমানের খানা-পিনার ইন্তেজাম মেয়ের বাবার কাধে পড়বে, সামর্থ্য থাক বা না থাক, প্রথা হিসাবে মেয়ের বাবা বাধ্য হয়ে তাদের খানাপিনার ইন্তেজাম করে থাকে। অনেক সময় লোকেরা খানার ব্যাঘাত হলে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। এসবই শরী'আত পরিপন্থী কাজ। বরং মেয়ের বাবার সামর্থ্য থাকলেও তার বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হবে না। তবে অল্প সংখ্যক লোক বরের সাথে পরামর্শদাতা হিসেবে বা সাহায্যকারী হিসেবে যেতে পারে। মেয়ের বাবা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাওফীক অনুযায়ী খাওয়াতে পারে।

(২) বরের বাড়ীতে ওলিমা শুধু জায়িয নয়, বরং সুন্নাত। তবে তাকে বৌভাত না বলে ওলিমা বলা উত্তম।

(৩) ওলিমার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মেহমানদের দাওয়াত দিয়ে আনা হয়, তারা স্ব- ইচ্ছায় আসে না। এখন তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে এনে খাওয়ানোর পর তাদের নিকট থেকে উপহার আদায় করা যৌতুকে শামিল না হলেও তা আদায় করা জায়িয হবে না। কেননা, এটা পরোক্ষভাবে খাওয়ার প্রতিদান উসুল করা হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এটা

প্রথা হিসাবে বা লোক দেখানোর উদ্দেশে দিচ্ছে। কাজেই এ ধরনের উপহার আদায় না করাই উচিত।

(৪) প্রথম রাত্রে স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপনের পর, স্বামী নিজের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, ফকির-মিসকীন এবং মেয়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজনদেরকে দাওয়াত করে খানা খাওয়াবে। এটাই ওলিমা। তবে সামর্থ্যের অধিক খ্যাতি অর্জনের লক্ষে বিরাট আকারে আয়োজন করা অনুচিৎ।

(৫) শরী'আত মত বিবাহের নিয়ম হল, তাতে বেশী জাঁকজমক করবে না। নাম দামের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করবে না। খুবই সাদাসিদে ভাবে বিবাহ হতে হবে। যেই পরিমাণ মহর আদায় করার সামর্থ্য থাকে, ঐ পরিমাণ মহর নির্ধারিত করা সুন্নাত। তবে ১০ দিরহামের (বর্তমান বাজর দর অনুযায়ী আনুমানিক পাঁচশত টাকার) কম মহর ধার্য্য করবে না। ইজাব কবুলের দ্বারাই বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের আগে অভিভাবকের জন্য মেয়ে থেকে ইজাযত নেয়া সুন্নাত। কন্যাকে বলা হবে যে, অমুকের কাছে এত টাকা মহর ধার্য করে তোমাকে বিবাহ দিচ্ছি। তুমি রাযী আছো? মেয়ের পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর কাজী সাহেব বিবাহের খুৎবাহ পড়বেন। অতঃপর ওলী বরের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবেন। বর কবুল করবেন।

বিবাহ-শাদীতে বর-কনের গোসল ও হলুদ দেয়ার প্রথা, তা নিয়ে বেপর্দা ক্ষীর খাওয়ার উৎসব, নতুন বধুকে বরণ করতে মাত্রাতিরিক্ত ধুম-ধাম, বেপর্দার সাথে পুরুষ-মহিলার সংমিশ্রণ প্রভৃতি শরী'আত বিরোধী কাজ।

জামাইকে পাটায় উঠানো, উভয়কে মিষ্টি মুখ করে তামাশা করা বরের হাত পায়ে মেহেদী লাগান, রং ছিটা-ছিটি, সকলের সামনে তাদের শোকরানা নামাযের প্রদর্শন ইত্যাদি সবই কু-প্রথা ও গর্হিত কাজ।

শরী'আতে এ সবের কোন ভিত্তি নেই। এ সমস্থ প্রথা নাজায়িয ও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭:৩১৮, ৩৮৬, ৩৮৭ ইসলামী শাদী ২৩৮:২৪০]

"বিবাহ তো একবারই হয়" একথার অসারতা

জিজ্ঞাসাঃ অনেক মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর তারা আর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে চায় না। অনেকে এ কথাও বলে থাকে যে, বিবাহ তো একবারই হয়। সুতরাং দ্বিতীয় বিবাহর প্রশ্নই উঠে না। এ সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন যে, "তোমরা বিবাহহীন বিধবা তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের বিবাহ দিয়ে দাও" (সূরা নূর ৩২/ আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ৩:৩১৯)

হযরত উমর ফারুক রা.-এর মেয়ে হযরত হাফসা রা. যখন বিধবা হলেন, তখন তিনি নিজের মেয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উসমান রা.-এর নিকট নিজের মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করেন। অবশ্য পরবর্তীতে হযরত নবী করীম ﷺ নিজেই হাফসা রা.-এর বিবাহের প্রস্তাব করেন। এবং তখন তাঁর সহিত বিবাহ হয়ে যায়। উল্লেখিত হাদীস দ্বারা শরী'আতের বিধান পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুরুব্বীদের তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এটাই আল্লাহ ও

রাসূলের ﷺ নির্দেশ। তবে কোন বিধবার যদি ইয়াতিম বাচ্চা থাকে এবং অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেলে, তাদের দেখা-শুনা ও তালীম-তরবিয়্যত বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা হয়, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ ইয়াতীম বাচ্চাদের লালন-পালনের খাতিরে বিধবা মহিলার জন্য অন্যত্র বিবাহ না বসার অনুমতি আছে।

"বিবাহ একবারই হয়"-এটা একটি শরী'আত বিরোধী জঘন্য কথা। এটা আসলে হিন্দুয়ানী নিয়ম। হিন্দুদের বাতিল ধর্মমত হিসেবে এ ধরনের কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইসলামে এমন কোন কথা নেই। বরং একজন মহিলা যদি একাধিকবার বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হয়, ইসলামে তার জন্যও বিবাহ বসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ, হতে পারে পরবর্তী বিবাহের বদৌলতে তার কোলে এমন সন্তান জন্ম নিবে, যে শুধু নিজের পিতামাতার চেহারা নয়, বরং পুরা জাতির চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিবে। আল্লাহর বান্দাগণ তার থেকে অনেক ধরনের খেদমত ও সেবা পাবে। অন্যত্র বিবাহ না করলে সে মহিলা এসব ফায়দা থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু সে বাবা-ভাইদের পেরেশানীর কারণ হবে এবং নিজের দ্বীনদারী ও ইজ্জত-আবরু সংকটের সম্মুখীন করে ফেলবে। এটা কখনো উচিৎ নয়। বরং দ্বীনদার পাত্র পাওয়ার সাথে সাথে সম্মতি দেয়া উচিৎ। যদিও সে ব্যক্তি গরীব হোক না কেন।

"বিবাহ একবার হয়" কথাটি একে তো হিন্দুয়ানী কথা, দিতীয়তঃ এর মধ্যে সূক্ষভাবে আল্লাহকে দোষারোপ করা হয়, যা ঈমানের জন্য বড়ই ঝঁকিপূর্ণ। দোষারোপ এভাবে হয় যে, উক্ত কথার দ্বারা তারা বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একজন স্বামী দিয়ে বিনা অপরাধে তাকে নিয়ে গেলেন। এটা তার উপর আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ হলো না।

(নাউযুবিল্লাহ) কত বড় মারাত্মক কথা। একথা পরিষ্কারভাবে বললে তো ঈমানই চলে যাবে। তাই এরূপ কথা মুখে আনাই উচিত নয়।

[প্রমাণঃ তাফসীরে কুরতুবী ১২: ২৩৯]

খোরপোষ/লালন-পালন

স্বামীর অজান্তে ফসল বা সম্পদ বিক্রি করে সন্তানের প্রয়োজন মিটানো

জিজ্ঞাসাঃ আমি স্বামীর অজান্তে স্বামীর বিভিন্ন ফসল বা সম্পদ বিক্রি করে সন্তানদের প্রয়োজন দেই। যদিও আমার স্বামী সন্তানদের প্রয়োজনীয় খরচের টাকা দেয়, তবুও অধিক সচ্ছলতার জন্য আমার পক্ষ থেকে উক্ত টাকা আমি স্বামীর অজান্তে সন্তানদের দিয়ে থাকি। স্বামীর উক্ত টাকা অন্য কাউকে দেই না। এটা জায়িয হবে কি না?

জবাবঃ সন্তানরা যদি নাবালিগ হয় এবং স্বামী সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় খরচাদি ঠিকমত বা পুরোপুরি না দেন, তবে শুধু সে অবস্থায়ই আপনি স্বামীর ফসল-সম্পদ বিক্রি করে সন্তানদের প্রয়োজনীয় খরচাদি দিতে পারবেন। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যেহেতু আপনার স্বামী সন্তানদের প্রয়োজনীয় খরচাদি দিচ্ছেন, তাই আপনার জন্য স্বামীর সম্পদ বা ফসলাদি বিক্রি করে সন্তানদের খরচাদি দেয়া জায়িয হবে না। আর যদি সন্তানগণ বালিগ হয়, তাহলে চাই স্বামী তাদের প্রয়োজনীয় খরচাদি দেন, বা না দেন, আপনার জন্য স্বামীর ফসলাদি বিক্রি করে সন্তানদের খরচাদি দেয়া জায়িয হবে না।

তবে কথাবার্তা ও আচরণের ভাব-ভঙ্গি ও ইশারা-ইঙ্গিতে স্বামীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি ও সম্মতি পাওয়া গেলে সর্বাবস্থায় তা জায়িয আছে।

[প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ১:২৯৪]

বিধবা মাতার খোরপোষ

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ধনবান ছেলের বিধবা মাতার ভরণ-পোষণের জন্য মাসে ১০০০ টাকা দিলে মা সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু ছেলে তা দিত না, যার কারণে মা অসুন্তুষ্ট হন। অপরদিকে ছেলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মাদরাসা করে দেয়ার কারণে তার পরকালীন কোন উপকার হবে কি?

জিজ্ঞাসাঃ উক্ত ধনবান ব্যক্তির মাতার ভরণ-পোষনের নিজস্ব ব্যবস্থা না থাকলে তার খরচাদি বহন করা তার জন্য ওয়াজিব। বৈধ সমস্ত কাজে তার মায়ের হুকুম মান্য করাও অপরিহার্য্য। এর বিপরীত করা মায়ের নাফরমানীর শামিল ও হারাম। তবে পিতা-মাতার অনুসরন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করা যাবে না। উক্ত ব্যক্তি মায়ের ভরণ-পোষণের যিম্মাদারী পালন না করলেও তার নেক কাজের জন্য আখিরাতে সাওয়াব পাবে, তবে মাকে কষ্ট দেয়ার কারণে বা তার হক আদায় না করার কারণে আযাবের সম্মুখীন হবে। হ্যাঁ, মা যদি সচ্ছল থাকেন, তাহলে তার খরচ দেয়া ছেলের জন্য জরুরী নয়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৫:২২০ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৮:৮৬১ খালাসূতুল ফাতাওয়া, ২:৬৪]

বিবাহের বিবিধ মাসাইল

ভালবাসা ও বিবাহের শপথ করা

জিজ্ঞাসাঃ দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ছেলে ও মেয়ে তাদের গভীর ভালবাসাকে বাস্তবে রুপ দানের উদ্দেশে যদি এরূপ শপথ করে যে, যদি আমরা অন্যকে বিবাহ করি তাহলে যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বেহেশত হারাম করে দেন। কিন্তু কন্যার আত্মীয়-স্বজন উক্ত ছেলের সঙ্গে তাদের মেয়েকে বিবাহ দিতে সম্মত নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিবাহের ব্যাপারে হলফের মাধ্যমে এভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া যায় কি? যদি এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া বৈধ হয়, আর পরে এ বিবাহ বাস্তবায়িত না হয়, তবে কসমের কাফফারা দিতে হবে কি ? কাফফারা আদায় করতে হলে, তা কে আদায় করবে? এবং এরূপ ভালবাসা কতটুকু শরী'আতসম্মত?

জবাবঃ যদি হলফের মধ্যে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করে থাকে যে, যদি আমরা অন্য কাউকে বিবাহ করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের উপর বেহেশত হারাম করে দেন, তাহলে এ দ্বারা হলফ বা কসম হবে না। সতরাং , যদি তাদের মধ্যে বিবাহ না হয়, তাহলে কাফফারা দিতে হবে না। তবে এ ধরনের বেহেশত না পাওয়ার মত স্পর্শকাতর সাংঘাতিক বিষয়কে নিজেদের নগণ্য স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত করে এভাবে কসম খাওয়া মারাত্মক অন্যায়। ঈমানের জন্যও আশংকাজনক।

কিন্তু তারা উভয়ে কসমের মধ্যে যদি বলে থাকে,আল্লহর কসম যদি অন্য কাউকে বিবাহ করি,তাহলে যেন আল্লাহ আমাদের উপর বেহেশত হারাম করে দেন। তাহলে এভাবে বলার দ্বারা কসম হয়ে যাবে এবং যদি তাদের মধ্যে বিবাহ না হয়,তাহলে উভয়ের উপরই কাফফারা আরোপিত হবে।

কোন বেগানা মহিলার সাথে কোনরুপ ভালবাসা করা জায়েয নয়। যদি পর্দা রক্ষা করে ছেলে-মেয়ের সাথে কথা-বার্তা বলে, তবুও তা জায়েয নয়। তেমনিভাবে একজন বেগানা মহিলার সাথে প্রেমপত্র বিনিময় করাও শরী'আতের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। এমনকি কোন মহিলার নিকট পায়ে হেঁটে যাওয়া অথবা মনে মনে তার কল্পনা করাও মারাত্মক অন্যায়। এসবই পরোক্ষ যিনার মধ্যে শামিল। এ প্রকারের জঘন্য অপরাধ থেকে তাওবা করা জরুরী এবং এ ধরনের হলফ করা কখনো জায়েয হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া হিনদিয়্যাহ,২:৫৫,২:৫২ আল মাবসূত,৮:১৩৫ হিদায়া,২:৪৮০ মুসলিম শরীফ,২:৩৩৬ ফাতাওয়া রহীমিয়া,১:৩৫]

সন্তান মায়ের গর্ভে সর্বোচ্চ দুই বছর থাকে

জিজ্ঞাসাঃ "একটি মাসিক পত্রিকায় মে- ২০০০ ইং সংখ্যার জিজ্ঞাসার জবাবে লিখেছে যে, স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যে যদি কোন সন্তান প্রসব হয় এবং ইতিমধ্যে উক্ত মহিলার অন্য কোথাও বিবাহ না হয়ে থাকে তাহলে মৃত স্বামী থেকেই এই নবজাতক সন্তানের নসব ও বংশ প্রমাণিত হবে।"

সাধারনতঃ একটি সন্তান জন্ম নিতে ৯ মাস ১০ দিন সময় লাগে। আর পুরো দুই বৎসরে কমপেক্ষ দুটো হওয়ার কথা। দয়া করে উক্ত কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে পরবর্তী সংখ্যায় জানালে খুশি হবো।

জবাবঃ গর্ভধারনের সময় সাধারণত নয় থেকে দশ মাস হলেও সবোর্চ্চ দুই বছর পর্যন্ত গর্ভধারনের বিষয়টিও সম্ভব এবং পরীক্ষিত। এটাকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই।

একটি হাদীসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেন, কোন সন্তান তার মাতৃগর্ভে ২ বছরের অধিক সময় অবস্থান করে না। এই হাদীস দ্বারা

সন্তান মাতৃগর্ভে ২ বছর অবস্থান করে না। এই হাদীস দ্বারা সন্তান মাতৃগর্ভে ২ বছর অবস্থান করতে পারে বলে প্রমাণিত হয় এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তা সম্পূর্ণ স্বীকৃত বিষয়। সুতরাং এ কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক। [প্রমাণঃ তাফসীরে মাযহারী, ৮:৪০৪ হিদায়া, ২:৪৩৩-৪৩৪]

বিবাহের জন্য পাত্রী দেখার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ মেয়ে দেখে পছন্দ হলে, বিবাহ করবে এবং পছন্দ না হলে বিবাহ করবে না- এরূপ মানসিকতা নিয়ে কোন ছেলে কোন মেয়েকে দেখা ও তার সাথে কথা বলা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয কি-না?

জবাবঃ বিয়ের আগে শরী'আতসম্মত ভাবে কনে দেখেতে হলে, তার নিয়ম এই যে, প্রথমে দীনদারী ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে মনঃপুত হওয়ার পর শুধু বর নিজেই বেশী জানাজানি না করে কোন বাহনা বা সুযোগে মেয়েকে দেখে নিবে। অথবা নিজের নির্ভরযোগ্য কোন মহিলাকে পাঠিয়ে খবর জেনে নিবে। এছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য বরের পক্ষে কনে দেখা শরী'আত সিদ্ধ নয়। চাই বরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যেমন, পিতা কিংবা অন্য কেউ হোন না কেন। তাদের কেউ বরের পক্ষে কনে দেখলে, অবশ্যই তাকে গুনাহগার থেকে হবে। আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বরের জন্য বিয়ে করার পুরাপুরি ইচ্ছা করার পর কোন বাহানায় মেয়েকে দেখা শরী'আতে অনুমতি আছে। কনে দেখার পর যদি অনিবার্য কোন কারণে সে বিয়ে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে বরকে গুনাহগার হতে হবে না। কিন্তু বিয়ে না করার প্রত্যয় নিয়ে যদি বিয়ে করবো- এমন বাহনায় কোন নারীকে শুধু দেখার সুযোগ গ্রহণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তাহলে অবশ্যই তাকে এহেন জঘন্য কর্মের দায়ে গুনাহগার হতে হবে।

উল্লেখ্য, বিয়ের আগে জীবন সঙ্গীনীকে কোন বাহনায় এক নযর দেখে নেয়া শরী'আতে মুস্তাহাব, জরুরী নয়। অবশ্য বিভিন্ন দেশে ঘটা করে মেয়ে দেখার যে পদ্ধতি চালু আছে, এটা শরী'আতে প্রমাণিত নয়। মোদ্দাকথা, শরী'আতে কোন বাহানায় দেখা প্রমাণিত আছে। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে দেখা বা দেখানোর প্রমাণ শরী'আতে নেই। কারণ - এভাবে ঘটা করে দেখানোর পর যদি কোন কারণবশতঃ বিবাহ না হয়, তাহলে ঐ মেয়েকে বিবাহ দেয়া রীতিমত বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে অন্যরা মেয়ের ব্যাপারে নানা রকম সন্দেহের মধ্যে পড়ে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৩:২১২ মুসলিম শরীফ,১:৪৫৬ আবূ দাউদ শরীফ, ১:২৮৪]

বিবাহ খুতবা পড়ার সময় ও পড়ার তরীকা

জিজ্ঞাসাঃ বিবাহের খুতবা ঈজাব কবুলের আগে, না পরে ? দাঁড়িয়ে, না বসে পড়া সুন্নাত ?

জবাবঃ সুন্নাত তরীকা হলো- বিবাহের মজলিসে প্রথমতঃ খুতবাহ পড়বে। তারপর ঈজাব এবং কবুল করানো হবে। কাজেই বিবাহের খুতবা ঈজাব-কবুলের আগে হবে। খুতবাহ সমূহের মধ্যে আসল তরীকা হলো, দাঁড়িয়ে পড়া। তবে জুম'আর খুতবাহ ব্যতীত অন্য খুতবাহ যদি কেউ বসে দেন, তাহলে কোন অসুবিধা নাই। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:১০৪ ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৩৭৫ খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১:২০৫ ইছালায়ে খুতুবাত ৩:২৫০ আলমগীরী ১:১৪৬ মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ৯৪:৩০৫]

ইজাবের দ্বারা বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ আজকাল অনেক ইউনিভার্সিটিতে দেখা যায় যে, দুই তিন জন বন্ধু এক সাথে বসে একজন মেয়েকে সামনে নিয়ে এরূপ বলে যে, বন্ধু তুই স্বাক্ষী আমি একে বিয়ে করেছি। এভাবে বিবাহ করা শরী'আত অনুযায়ী বৈধ হবে কি-না? আরো দেখা যায় যে, কিছু দিন পর লেখাপড়া শেষ করে দু'জন নিজ নিজ যায়গায় চলে যায়। তাদের ব্যাপারে শরী'আত কি হুকুম রাখে, তা জানালে খুবই উপকৃত হব।

জবাবঃ বিবাহের শর্তগুলোর মধ্যে বিশেষ শর্ত হল, ঈজাব, কবুল এবং দু'জন মুসলমান সজ্ঞান সাবালক স্বাক্ষীর ঈজাব- কবুলের শব্দ শুনতে পাওয়া। যদি এ শর্তগুলো পাওয়া যায়, তাহলে শরী'আত অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং এ মেয়ের বিবাহ অন্য কারো সঙ্গে আর জায়েয হবে না। আর যদি এ শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে বিবাহ সহীহ হয় না। উল্লেখিত প্রশ্নের বর্ণনায় যেহেতু মেয়ের পক্ষে থেকে 'কবুল' বলার উল্লেখ নেই, তাই এরূপ বিবাহ সহীহ হবে না।

উল্লেখ্য যে, অভিভাবক ব্যতিত ছেলে মেয়েদের এভাবে বিবাহ করাও শরী'আতের দৃষ্ঠিতে গর্হিত কাজ। বিবাহ মুরুব্বীদের মাধ্যমে হওয়া উচিৎ। কারণ তারাই সন্তানের কল্যান বেশি বুঝেন, ইংরেজদের অনুকরণে বর্তমান ছেলে-মেয়েরা যেভাবে নিজেরা বিবাহ করেছে, তা মুসলমানদের জন্য মোটেই সমীচিন নয়। তাছারা একজন বেগানা মেয়েকে সামনে এনে এমন আচারণ করা চরম বেপয়াপনা ও গুনাহের কাজ। তাই এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাওবাহ- ইস্তিগফার করা উচিত।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দেশের জেনারেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অধিকাংশগুলো বেহায়াপনার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে যেখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে শিক্ষার নামে সভ্যতাকে

জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। এ ধরনে প্রতিষ্ঠানে কোন বিবেকবান ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে পাঠাতে পারে না। তেমনিভাবে কোন বালেগ ছেলে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না। বিশেষ করে মেয়েদের তো এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া মোটেই জায়েয নয়। সুতরাং, যে সব স্কুল, কলেজ ও ইউনির্ভাসিটিতে সহশিক্ষা চালু রয়েছে, মুসলিম ছেলে-মেয়েদের জন্য সেগুলোতে ভর্তি হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে দুরে থাকা উচিত। অন্যথায় বেহায়াপনা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে তার একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত এ প্রশ্নেই বিদ্যমান রয়েছে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ২:২৮৬ আদ দুররুল মুখতার, ৩:৯-২১-২২ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২৬৮-২৬৯ তাতার খানিয়া- ২:৬১১ বাদায়িউস সানায়ি, ২:২২৯ দারুল উলূম,৭:৭৮-৮০ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭:৩৮৩]

একসাথে অধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি না দেয়ার কারণ

জিজ্ঞাসাঃ ইসলাম পুরুষকে চারটি স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। অথচ মহিলাকে এক সাথে একের অধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি কেন?

জবাবঃ মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করে নির্ধারিত কিছু নিয়ম-নীতি বলে দিয়েছেন। সে নিয়ম অনুযায়ী চললে, প্রকৃত কামিয়াবী এবং তার থেকে সুফল লাভ করার আশা করা যায়। অন্যথায় তা হবে বিপর্যয়বাহী ভয়াবহ ও মারাত্মক ক্ষতিকর। বিবাহ-শাদীর ব্যাপারেও পুরুষকে এক সাথে চারটি বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে আর মহিলাদেরকে এক সঙ্গে মাত্র একজন স্বামীর সাথে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মহিলাকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। এর কারণ হল- স্বাভাবিকভাবে একজন পুরুষ এক সাথে চার জন স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এবং চার জন স্ত্রী থেকে তার একক ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানের পিতা একজনই হবে এবং মাতাও

একজনই হবে। ফলে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিষ্কলুষ ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি একজন স্ত্রী একসাথে কয়েকজন পুরুষের সাথে ঘর-সংসার করতে প্রয়াসী হয়, তবে তাতে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধায় সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ একজন সুস্হ বিবেক সম্পন্না মহিলা জন্মগতভাবেই একাধিক স্বামীর সাথে থাকা পছন্দ করে না এবং এটাকে তার নিজের বিবেক ও রুচির পরিপন্থী মনে করে। দ্বিতীয়তঃ একজন মহিলা একসাথে একাধিক স্বামীর সাথে ঘর সংসার করলে, তাদের উভয়ের জরুরত পূর্ণ করতে সে সক্ষম নয়। তৃতীয়তঃ একজন মহিলা চারজন স্বামীর সাথে যৌন মিলনে আবদ্ধ হলে, সন্তানের পিতৃত্ব অরক্ষিত হয়ে যায় এবং সে কার ঔরসের গণ্য হবে, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে সন্তানের নসব বা বংশ পরম্পরা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ তা সন্তানের এবং অমূল্য সম্মান-যা পাওয়া তার জন্মগত অধিকার। তা ছাড়া চারজনের সাথে মিলনের দ্বারা মহিলার ভিন্ন ভিন্ন চারটি সন্তান জন্মগ্রহণও অসম্ভব। কারণ-তার ধারণ ক্ষমতা সীমিত মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত তারা হায়ওয়ান-জানোয়ার নয়। তাই তাদের বংশ পরিচিতি রক্ষা করা জরুরী হওয়ার তাগিদে একজন রমনী একাধিক স্বামীর ঘর করতে পারে না। যে সকল মহিলারা বিধর্মী আইনের ছত্রছায়ায় একাধিক স্বামীকে সঙ্গ দিচ্ছে, তাদের সন্তানদের পিতৃ ঠিকানা থাকে না। এভাবে আগাছা-পরগাছায় তখন সমাজ ভরে যাবে এবং সম্ভ্রান্ত বংশধারা লুপ্ত হবে। আজকের ইউরোপ এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

বংশসূত্র প্রমাণিত করণ

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তির বিবাহের পাঁচ মাস পর তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করে। এ সন্তানের বংশসূত্র নির্ণয়ের পদ্ধতি কি হবে? উল্লেখ যে, বর্তমানের এই স্বামী-স্ত্রীর সাথে আগে থেকেই ভালবাসার সম্পর্ক ছিল।

জবাবঃ ইসলামী বিধান মুতাবিক বিবাহের ছয় মাস পর বা এর চেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কারো স্ত্রী কোন সন্তান প্রসব করলে সে সন্তান উক্ত স্বামীর ঔরসজাত সন্তান হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং উক্ত স্বামী থেকেই এ সন্তানের বংশসূত্র নির্ণয় করা হবে। পক্ষান্তরে বিবাহের পর ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন স্ত্রী সন্তান প্রসব করে, তাহলে এ সন্তান উক্ত স্বামীর ঔরসজাত সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ সন্তান অবৈধ সন্তান। আর অবৈধ সন্তানের বংশসূত্র তার মা থেকে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সুতরাং, বর্ণানা অনুযায়ী উক্ত সন্তান অবৈধ সন্তান হবে এবং তার বংশসূত্র মা থেকে নির্ণয় করা হবে।অবশ্য স্বামী যদি এ সন্তানকে নিজের বলে দাবী করে তাহলে পিতা থেকে বংশসূত্র প্রমাণিত হবে।[ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১:৫৪০ আল-মাবসূত, ৬:৫৪ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১:৫৩৬ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম, ৭:১১২]

স্বামী নিরুদ্দেশ হলো স্ত্রীর করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামী বিধান মতে, কোন মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেলে তার ৯০ বছর বয়সের সময় মৃতের হুকুম দেয়া হয়। এখন কথা হল, কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর গায়েব হয়ে গেল। অথবা বিদেশ চলে গেল। ৭/৮ বৎসরের মধ্যে কোন খোঁজ খবর নেই, অথবা লোকমুখে শুনা যায় সে জীবিত আছে, কিন্তু স্ত্রীর সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ নেই। এখন ঐ স্ত্রীলোকটি অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে কিনা? যদি বসতে না পারে তবে তার জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী অন্য কোন ফায়সালা আছে কি?

জবাবঃ কোন লোক নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার যদি ৭/৮ বৎসরের মধ্যে তার কোন সংবাদ পাওয়া না যায়, তাহলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তার সম্পদ বন্টনের জন্য তার বয়স ৯০ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেমন কেউ ৭৫ বছর বয়সে নিখোঁজ হলে, তার জন্য আর মাত্র ১৫

বছর অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য তার স্ত্রী তার জন্য কতদিন অপেক্ষা কররে, এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের উলামায়ে মুতাআখখিরীন ইমাম মালিক (রঃ)-এর মাযহাবের উপর ফাতাওয়া দিয়েছেন। এ কারণে এ মাসআলায় ইমাম মালিকের (রঃ) মাযহাবই হানাফী মাযহাব বলে বিবেচিত। সেটা হচ্ছে স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্ত্রী মুসলিম জজ বা শর'ঈ পঞ্চায়েতে মুকাদ্দামা দায়ের করবে এবং স্বাক্ষীদের দ্বারা একথা প্রমাণ করবে যে, ঐ ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়েছিল, পরে ঐ ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছে। অতঃপর মুসলিম কাজী জজ/পঞ্চায়েতও সাধ্যানুযায়ী খোঁজ খবর নিয়ে দেখবে। তালাশ করার করার পর পাওয়া সম্ভব না থাকলে, তার স্ত্রীকে মুকাদ্দামা দায়ের করার পর থেকে চার বছর অপেক্ষা করতে বলবে। এ চার বৎসরের মধ্যে তার যদি কোন খোঁজ-খবর পাওয়া না যায়, তাহলে মহিলার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত জজ/-পঞ্চায়েত কর্তৃক স্বামী নিখোঁজ হওয়ার উপর মৃত্যুর ফায়সালা দিয়ে দিবে। অতঃপর তার স্ত্রী চার মাস ১০ দিন ইদ্দতে মউত পালন করবে। ইদ্দত পালন করার পর অন্য জায়গায় বিবাহ বসতে পারবে। চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তার পুনরায় বিচ্ছেদের আবেদন করা উত্তম [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:৩৯৬, আযীযুল ফাতাওয়া ৫২৯ আল হিলইয়াতুন্নাজিয়া, ৬৯-৭০]

তবে লোক মুখে যদি উক্ত ব্যক্তির জীবিত থাকার খবর পাওয়া যায় তাহলে স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ না থাকলে এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খোরপোষ না দিলেও তাকে নিখোঁজের পর্যায়ে গন্য করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন হবে। [প্রমাণঃ আল হীলাতুন্নাজিযা, ৮৩]

কাবিন রেজিষ্ট্রি ও উকিল বাবার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের বিয়েতে যে কাবিন রেজিষ্ট্রি করা হয়, এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত? শরী'আতে কাবিন রেজিষ্ট্রি করার কোন নিয়ম আছে কিনা? অনেক জায়গায় দেখা যায়, বিবাহের সময় উকিল বাবা বানায় এবং বিবাহের পর উক্ত উকিল বাবার সাথে মেয়ে বে-পর্দাভাবে দেখা সাক্ষাত করে এটা শরী'আতে জায়েয হবে কিনা?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে বিবাহের সময় সরকারী রেজিষ্ট্রারে কাবিন রেজিষ্ট্রি করা বা বিবাহের বিস্তারিত বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করে রাখা জরুরী কিছু নয়। শুধু কেবল স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে মহর ধার্য করে ইজাব-কবুলের দ্বারাই বিবাহ সহীহ হয়ে যায়। তবে রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে কাবিন রেজিষ্ট্রি করা জায়েয আছে। শরী'আতে এতে কোন নিষেধ নেই [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম,৭:৮৫ মাহমূদিয়া, ৩:২৫৭ ইমদাদুল মুফতীনঃ ৫২৫ আল বাহরুর রায়িক ৩:৭৮]

বিবাহের সময় ছেলে বা মেয়ের পক্ষে থেকে উকিল নিয়োগ করা জরুরী নয়। বরং মেয়ের ওলী মেয়ের সম্মতিক্রমে মেয়ের পক্ষে থেকে স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে মহর ধার্য করতঃ ছেলের নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিলে এবং ছেলে কবুল করলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তবে যদি মেয়ের পিতা ও ওলী বিবাহের জন্য মেয়ের পক্ষ থেকে মেয়ের সম্মতিক্রমে অন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করে এবং সে মজলিসে স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং ছেলে তা কবুল করে, তাহলেও সে বিবাহ সহীহ হবে। তবে বিবাহের পর উকিলকে উকিল বাবা ডাকা বা এ বিবাহকে কেন্দ্র করে তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তার সামনে বেপর্দাভাবে যাওয়া আসা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ না-জায়েয। বিবাহ কার্য

সম্পাদনের পরই তার উকালতী শেষ। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ২:২৪০ আযীযুল ফাতাওয়া ৪৩৭ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৫:২৪৯]

নিজেকে পবিত্র রাখতে পারলে তার জন্য বিবাহ না করার হুকুম কি

জিজ্ঞাসাঃ কোন যুবক বা যুবতী নিজেকে পবিত্র রাখতে পারলে, তার জন্য বিয়ে না করা জায়েয আছে কিনা?

জবাবঃ সাধারণ অবস্থায় বিবাহ করা হুযূর ﷺ-এর সুন্নাত। সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম হয়ে যিনার মধ্যে পড়ার প্রবল ধারণা হলে, বিবাহ করা ওয়াজিব। হাদীসে হুযূর ﷺ বলেছেন, তোমরা মুহাব্বতকারিনী ও বেশী সন্তানদায়িনী মহিলাদেরকে বিবাহ কর। কেননা- তোমাদের আধিক্য নিয়ে কিয়ামতের দিন আমি অন্যান্য উম্মত সকলের উপর গর্ব করব।" তিনি আরো বলেছেন "বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে আমার এ সুন্নাত থেকে বিমুখ হল, সে আমার তরীকার উপর নেই।" কাজেই হুযূরের ﷺ প্রত্যেক উম্মতের উচিৎ-হুযুর ﷺ-এর সুন্নাত পালনে তৎপর হওয়া এবং এ উম্মতের বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া।

শরী'আত যেখানে নিজেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে, সে ক্ষেতে বিবাহ না করে নিজেকে পবিত্র রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ- মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। তিনিই জানেন যে, তার বান্দা কিভাবে পবিত্র থাকতে পারবে। তিনিই জানেন- বান্দার দুর্বলতা কোথায়? তারই পরিপ্রেক্ষিতে যাবতীয় নির্দেশাবলী দিয়েছেন। তবে যারা শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম বা আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে, বিবির হক আদায় করতে পারবে না, তাদের জন্য 'উজর' দূর হওয়া পর্যন্ত বিবাহ নিষেধ। সে ক্ষেত্রে রোজার মাধামে তারা নিজেকে সংযত রাখবে। [প্রমাণঃ আবূ দাউদ শরীফ ২৮০ এমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৮৯]

তাবীয-কবজ দ্বারা বিবাহ আটকিয়ে রাখা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মেয়ে কিংবা পুরুষকে তাবিজ-কবজ বা কুফরী কালাম দ্বারা বিবাহ ত্যাগে বাধ্য করা, অথবা তাবীজ-কবজ দ্বারা ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ে আটকিয়ে রাখা এবং অপর পক্ষের অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা?

জবাবঃ কুফরী কালাম দ্বারা কোন বৈধ উদ্দেশের জন্যও তাবীজ করা হারাম। তবে কাউকে ক্ষতি না করে জায়েয উদ্দেশের জন্য কুরআনের আয়াত বা হাদীসের শব্দ দ্বারা লিখা তাবীজ ইস্তিমাল জায়েয আছে। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত সুরত সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয, কারণ-দুশমনী করে একজনের ছেলে বা মেয়ের বিবাহ বন্ধ করে রাখা এরং তাদেরকে পেরেশান করা হারাম, তাছাড়া নিজের গরজে তাবিজ করার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে-অপরপক্ষ স্বাভাবিকভাবে রাযী নয়। এক্ষেত্রে তাবীজ করে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে রাযী করান জায়েয হবে না। [প্রমাণঃ এমদাদুল ফাতাওয়া, ৪:৮৯]

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা চাই

জিজ্ঞাসাঃ (১) আমাদের সমাজে দেখা যায়, বিয়ের ব্যাপারটা খুব কঠিন করে রাখা হয়েছে। যেমন, বিভিন্ন রকম সামাজিকতা পালন করা, আর্থিক সচ্ছলতা এবং বড় বোনকে বিয়ে দেয়া হয়নি বলে ছোট ভাই-বোনের বিয়েতে অনেক বিলম্ব করা। এসব কারণে পিতাও অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের বিবাহে বাধা দান করে। উপরোক্ত কারণে আমি সময়মত বিয়ে করতে পারিনি, যার জন্য আমার অনেক অন্যায় কাজের শিকার হতে হয় যেমন হস্তমৈথুন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আমার জানার বিষয় হল (ক) বিয়ের ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে কতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছেন (খ) উপরের

বিভিন্ন বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে আমি কিরূপ বয়সে বিয়ে করতে পারতাম? এখন কি বিয়ে করতে পারব? যদি পারি, তাহলে কিভাবে? (গ) চরিত্র রক্ষার্থে উপরের বাধা-নিষেধের ব্যাপারে ইসলাম কী নীতি গ্রহগ করেছে?

(২) জনৈক ব্যক্তি চাকুরীজীবী তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। বড় ভাইয়ের আগে তিনি নিজে বিয়ের প্রস্তাব রাখেন। বড় ভাই অবিবাহিত থাকার কারণে তার পিতা রাযী ছিল না। কিন্তু পরে তিনি আগেই বিয়ে করে নিয়েছেন। এ জন্য তার পিতা মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন এবং তাকে বাড়ি উঠতে দিচ্ছেন না। এরূপ বিয়ে করাটা কি ইসলামের দৃষ্টিতে দোষণীয়? আর তাকে বাড়িতে না উঠতে দেয়া কি পিতার ঠিক হয়েছে?

জবাবঃ (১) (ক) যদি কোন ব্যক্তির পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, সাথে সাথে সে নিজে স্ত্রীর মহর ও ভরণ-পোষণ আদায়ে ক্ষমতা রাখে এবং স্ত্রীর সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার যোগ্যতাও থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর বিবাহ করা ওয়াজিব। এক্ষেতে ইসলাম ছেলেদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। সুতরাং, মাতা-পিতাকে জানিয়ে তাদের সম্মতিতে বিবাহ করতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু তারা যদি এ ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর যদি পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা না থাকে এবং উপরোল্লেখিত শর্তগুলোও মওজুদ থাকে, তাহলে বিবাহ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এক্ষেত্রেও মাতা-পিতার অনুমতি ও পরামর্শক্রমে বিবাহ করা ভাল। যদি তারা রাযী না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে ইসলাম ছেলেদের বিবাহ করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

(খ) আপনি যেহেতু বিবাহ না করার দরুণ গুনাহের কাজে লিপ্ত, তাই পিতার বাধা-নিষেধ ও বাহানাকে উপেক্ষা করে বিবাহ করতে পারতেন। এখনও বিবাহ করতে পারেন, বরং আপনার জন্য অবিলম্বে বিবাহ করা অত্যন্ত জরুরী। আপনার বিবাহ করার পদ্ধতি এই যে, আপনি কারো মাধ্যমে আপনার পিতাকে বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, সামাজিকতা পালন করা, বিপুল পরিমাণ অর্থের অধিকারী হওয়া, ছোট বড় বোনদেরকে বিবাহ দিয়ে পরে বিবাহ করা ইত্যাদি শরী'আতে কোন জরুরী বিষয় নয়। এগুলো সম্পূর্ণ মুর্খতা ও কু-প্রথা মাত্র। যদি পিতাকে বুঝানোর পর তিনি রাযী হয়ে যান তাহলে ভালো। অন্যথায় পিতার বাধা উপেক্ষা করেই বিবাহ করে নিন।

(গ) চরিত্র রক্ষার্থে পিতার বাধা সত্বেও বিবাহ করা জরুরী। পিতা-মাতা শরী'আতের গন্ডির মধ্যে থেকে কোন হুকুম করলে তা মান্য করা জরুরী। কিন্তু শরী'আতের বরখেলাপ হুকুম করলে তা মান্য করা জায়েয নয়। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে- "আল্লাহর নাফরমানী করে কোন মাখলূকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা জায়েয নয়।" [বুখারী, ২:৬২২/মিশকাত শরীফ, ৩২১]

আর পিতার জন্য এক্ষেত্রে বাঁধা দেয়াও ঠিক নয়। কেননা, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন, "সন্তান যখন বিবাহের উপযুক্ত হয়, তখন বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বিবাহ করানো পিতার কর্তব্য। আর এমন অবস্থায় যদি পিতা সন্তানদের বিবাহ শাদীর কাজ সমাধা না করে, তাহলে তারা কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হলে, পিতাও ঐ গুনাহের মধ্যে শামিল হবে" সুতরাং, ইসলামী নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত বয়সে ছেলেদের বিবাহ করানো পিতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আদায় না করে বরং বিবাহ করতে বাধা দেয়া পিতার জন্য চরম মূর্খতা ও গুনাহের কাজ।

উল্লেখ্য সে, হস্তমৈথুন হারাম ও লা'নত যোগ্য পাপ। যারা এরকম করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি করবেন না এবং তাদের আঙ্গুলগুলো গর্ভবর্তী হবে এবং তারা চরম অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। তাই আল্লাহর দরবারে খালিস তাওবা করা আপনার জন্য জরুরী। আর আপনার জন্য উচিত ছিল হস্থমৈথুন না করে লাগাতার রোযা রাখা। কেননা হাদীস শরীফে আছে এক্ষেত্রে রোযা রাখা প্রবৃতি দমনের উত্তম পন্থা।[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ২:২৬৭-২৭২ সূরা মু'মিন ৩-৪ মিশকাত, ২:৩২১ শামী, ৩:৬ আযীযুল ফাতাওয়া,৪৬৬, রহীমিয়া,৫:২২৫]

(২) বড় ভাই বিবাহ না করলে ছোট ভাই বিবাহ করতে পারবে না- এমন কোন বিধান শরী'আতে নেই। এটা সম্পূর্ণ মূর্খতা ও একটি কু-প্রথা মাত্র। তাই জনৈক চাকুরীজীবীর এ মুহূর্তে বিবাহ করাটা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন প্রকার দোষণীয় নয়। আর এ জন্য পিতার উক্ত ছেলেকে বাড়ীতে না উঠানো ঠিক হয়নি। এমনকি এজন্য পিতা মনক্ষুণ্ণ হওয়ার অধিকারও রাখেন না। কারণ সন্তান বালিগ হওয়ার পর তাকে বিবাহ করানো পিতার কর্তব্য ছিল। হাদীস শরীফে আছে- "যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন অভিভাবকের কর্তব্য হল তার ভাল নাম রাখা এবং আদব বা সুন্নাত শিখানো। অতঃপর যখন সে বালিগ হয়, তখন তার বিবাহের কাজ সম্পন্ন করা। আর যদি বালিগ হওয়ার পরও তাকে বিবাহ না করায়, আর ঐ সন্তান যদি এ সংক্রান্ত কোন গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলে অভিভাবকও তার ঐ গুনাহের অংশীদার হবে" [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২:২৬৭, ২৭১ ও ৩২১ দূররে মুখতার,৩:৬ ফাতাওয়া শামী ২:২৮৩ বাদায়িউস সানায়ি, ২:২২৮ ফাতাওয়া রহীমিয়া,৫:২৫৭]

বিবাহ পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বিবাহ পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ বিবাহ পড়িয়ে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে হাদিয়া হিসেবে তা প্রদান করলে। দাতা এটা প্রদান করা জরুরী মনে করতে পারবে না। তেমনিভাবে একবারে না দিলে অথবা পরিমাণে কম দিলে গ্রহিতা মনক্ষুণ্ণ হতে পারবে না। তাছাড়া পারিশ্রমিক হিসেবেও টাকা দেয়া-নেয়া জায়েয আছে। তবে পারিশ্রমিক হিসেবে দিলে বিবাহের আগে অবশ্যই টাকার পরিমাণ নির্ধারিত করে নিতে হবে এবং বিবাহ কার্য সম্পাদন করার জন্য যে পক্ষ তাকে নিয়ে আসবে, তাদের সেই টাকা দেয়া জরুরী হবে। অন্য পক্ষের উপর নয়। [প্রমাণঃ আল ফাতাওয়া হিনদিয়্যাহ, ৩:৩৪৫ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৩:৩৭২]

অবৈধ ভালবাসা

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন সরকারী চাকুরীজীবী মানুষ, আমি এক মেয়েকে ভালোবাসতাম। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ আমি তাকে ভালোবাসতাম। কিন্তু হঠাৎ তার বিয়ে হয়ে যায় মা-বাবার পছন্দে। বর্তমানে সে তার স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করছে কিন্তু আমি এখনো বিয়ে করি নাই। আমি তার চিন্তা করতে করতে দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছি। সে এখনো আমার কাছে আসতে চায়। আমি আপনাদের সাজেশন এর অপেক্ষায় আছি।

জবাবঃ শরী'আতের আলোকে বিবাহের আগে বেগানা কোন মেয়েকে ভালবাসা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। এর মাধ্যমে বেগানা নারী-পুরুষের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, প্রেমালাপ, প্রেমনিবেদন ও প্রেমপত্র বিনিময় ইত্যাদি যা ঘটে থাকে সবই নাজায়েয ও হারাম। যদি দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা নাও করে তবুও অন্ততপক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরে একে

অপরকে মনে মনে কল্পনা করে মনে তৃপ্তি অনুভব করে। এতে অন্তরের যিনা হয় যা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম।

সুতরাং, আপনার জন্য দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত উক্ত মেয়ের সাথে ভালবাসা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয হয়েছে। বর্তমানে ঐ মেয়েটি স্বামীর ঘরে চলে গেছে অথচ এখনো আপনি তার চিন্তায় ব্যস্ত। দিন দিন তার চিন্তায় শেষ হয়ে যাচ্ছেন। এটা আসলে আপনার এক প্রকার বোকামীও বটে।

অন্যের বিবাহ থেকে আপনার প্রেমের টানে তার ফিরে আসা এবং আপনার জন্য তাকে বিয়ে করার চিন্তাভাবনা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে। বরং এ মুহূর্তে আপনার উচিৎ কালবিলম্ব না করে দীনদার কোন মহিলাকে বিয়ে করা। এতে আপনার পেরেশানী লাঘব হবে ইনশাল্লাহ। আপনি ইচ্ছাপূর্বক কখনো তার কথা মনে আনবেন না। আর যখনই সে মেয়ের কথা মনে পড়ে নিমোক্ত দু'আটি কয়েকবার পড়ে নিবেন।

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরের কু-মন্ত্রণাকে আপনার ভয় ও যিকরে রুপান্তরিত করুন। এবং আমার সাহস ও ইচ্ছাকে আপনার ভালবাসা ও মর্জির দিকে ধাবিত করুন।

সাথে সাথে আগের নাজায়েয প্রেম ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল গুনাহ থেকে খাঁটি মনে তাওবা করুন। [প্রমাণঃ বাওয়াদিরুন নাওয়াদির, ৭০০ মুসলিম, ২:৩৩৬]

বেগনা মহিলাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা

জিজ্ঞাসাঃ দীনের কাজ মহিলা অঙ্গনে করতে গিয়ে কোন মহিলার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং পিতার সামনে ইসলামী সম্পর্কের জন্য মেয়েকে কুবুল বা রাযী করানো হয়, তবে ঐ পুরুষটি কি ঐ মহিলার জন্য

হালাল হয়ে যায়। অনুগ্রহপূর্বক আগামী সংখ্যায় উত্তর দিবেন, নতুবা ফিতনার সম্ভাবনা আছে।

জবাবঃ নিজে দীনের উপর কায়েম থেকে দীনের মেহনত বা অন্যের কল্যাণ করতে হবে। দীনের আহকাম থেকে হটে গিয়ে দীনের মেহনত বা অন্যের উপকার করা জায়েয নেই। বিজ্ঞ ও পরহেযগার আলেমদের পরামর্শক্রমে সম্পূর্ণ শর'ঈ পদ্ধতিতে মহিলা অঙ্গনে দীনের কাজ করলে বেগানা মহিলার সাথে আন্তরিকতার সুযোগ আসত না। তাছাড়া দীনের কাজ করতে গিয়ে কোন হারাম কাজে জড়িত হলে তা হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং, মহিলা অঙ্গনে দীনের কাজে করতে গিয়েও গায়রে মাহরাম (অর্থাৎ যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয নাই) মহিলার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক হয়ে গেলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা নাজায়েয এবং অন্তরের যিনার মধ্যে শামীল। যার জন্য উভয়কেই আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে।

শরী'আতের একমাত্র বিবাহের দ্বারা মহিলা পুরুষের জন্য হালাল হয়। আর বিবাহের জন্য শর্ত হল দু জন মুসলমান পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে স্বাক্ষী রেখে ছেলে-মেয়ের ইজাব ও কবুল হতে হবে। এবং স্বামী-স্ত্রীকে কি পরিমাণ মহর দিবে তা ঠিক করে নেওয়া চাই। বর্ণিত ঘটনায় তথা পিতার সামনে মেয়েকে কবুল বলানো বা রাযী করানোর ঘটনায় পিতাকে যদি একজন স্বাক্ষী ধরা হয়। তাহলে মাত্র একজন স্বাক্ষীর এবং স্ত্রীর কবুলের বর্ণনা আছে। কিন্তু অপর স্বাক্ষী ও স্বামীর ইজাবের বর্ণনা নাই। বাস্তবে যদি এইভাবে হয়ে থাকে তাহলে এটাকে বিবাহ বলা যায় না এবং এর দ্বারা ঐ মেয়ে হালাল হবে না। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৮:৩৯ হেদায়া, ২:৩০৬]

ভালবাসা করা জায়েয কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ ভালোবাসা দুই প্রকার, (১) ইশকে হাকীকী অর্থাৎ প্রকৃত ভালোবাসা যা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে হয়ে থাকে। (২) ইশকে মাজাযী অর্থাৎ কৃত্রিম ভালবাসা, প্রচলিত এই ভালবাসা যা সাধারণত পুরুষ -মহিলার মাঝে হয়ে থাথে।

প্রকৃত ভালবাসা যা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হয়ে থাকে, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এ ধরণের ভালোবাসার কারণে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। হক্কানী আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গদের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করে এ ধরনের ভালবাসা অর্জন করা আমাদের সকলের জন্য কর্তব্য।

দ্বিতীয় প্রকার ভালবাসা অর্থাৎ পুরুষ-মহিলার পরস্পর যা হয়ে থাকে, এটা যদি বৈধ ভাবে হয় যেমন পিতা-মাতার সাথে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তাহলে এটাও জায়েয এবং জরুরী। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এর হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু প্রেম ভালবাসা যা সাধারণতঃ বেপর্দার কারণে অবৈধ ভাবে ছেলে-মেয়ের মধ্যে হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। এর কেউ দেখা-সাক্ষাৎ প্রেমালাপ-প্রেমপত্র বিনিময় সবই নাজায়েয ও হারাম। যদি কেউ দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা নাও বলে তবুও অন্ততপক্ষে প্রেমিক-প্রেমিকাকে মনে মনে কল্পনা করে আনন্দ অনুভব করে যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। সর্বদা তার ধ্যানে মগ্ন থাকার দরুণ শরী'আতের বিধান লংঘনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও মস্তিস্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর হক আদায় করতে ব্যর্থ ও লজ্জিত হয়। হাদীস শরীফে আছে মানুষের অন্তরও যিনা করে। এবং তা এভাবে যে, সে মনে মনে প্রেমাস্পদকে চায় ও কল্পনা করতে থাকে। অতএব, প্রচলিত প্রেম-ভালবাসা সম্পূর্ণরূপেই অবৈধ, নাজায়েয ও হারাম। এ প্রেম জায়েয বা বৈধ হওয়ার কোন উপায়ে নেই। অনেকে যে লাইলী-মজনু ও শিরী-

ফরহাদ প্রভৃতির উপমা টেনে প্রেমকে বৈধ করতে সচেষ্ট হয় এটা নিতান্তই জাহালতী ও মূর্খতা।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারাঃ১৬৫ মায়িদা,৫৪নিসা, ১৯ বাওয়াদিরুন নাওয়াদির২:৬৯৮ মিশকাত শরীফ- ২৬৯ আপকে মাসাইল আওর উনকা হল, ৮:৪৮]

শরী'আতের দৃষ্টতে একাজন আদর্শ স্বামী

জিজ্ঞাসাঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে যেমন স্বামী গ্রহণ করা উচিত?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে পাত্র দীনদার থেকে হবে। দীনদারী ব্যতীত বৈবাহিক হুকুম আদায় করা সম্ভব হয় না। পাত্র দীনদার না হলে, আর যত গুণহ থাকুক না কেন অথবা যত ডিগ্রিধারী হোক না কেন এবং যত সুন্দর হোক না কেন, তার নিকট কোন দীনদার মেয়ে কখনো সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমায়েছেন- তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি বিবাহের পয়গাম দেয়, যার দীনদারী এবং চরিত্র সুন্দর হওয়া সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত, তার নিকট তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দাও। এমতাবস্থায় যদি তোমরা বিবাহ না দাও, তবে দুনিয়াতে বড় ফিতনা-ফাসাদ নেমে আসবে (তিরমিযী শরীফ)। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, পাত্র দীনদার হওয়া জরুরী। নতুবা কোন মেয়ের জন্য তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা বা তার নিকট মেয়ে বিবাহ দেয়া বিপদজনক। দীনদারী বলতে শুধু নামায-রোযাই শেষ নয়। বরং দীনের মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটা তার মধ্যে পুরাপুরি থাকতে হবে। যেমন- (১) সহীহ আকীদা সম্পন্ন হতে হবে। (২) ইবাদত তথা নামায, রোযা ইত্যাদির মাসআলা জেনে সেগুলোর পাবন্দ আমলদার হতে হবে। (৩) মু'আমালাত অর্থাৎ

রিযিকের ব্যাপারে হালাল-হারামের বিবেচনা জ্ঞানসম্পন্ন ও পরহেযগার হতে হবে। (৪) মু'আশারাত অর্থাৎ কাউকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বরং সকলের হক আদায় করার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। (৫) আখলাক চরিত্র সুন্দর হতে হবে, আত্মার রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

এ বর্ণিত-পাঁচটি গুণের প্রত্যেকটি পাত্রের মধ্যে থাকতে হবে। যদি তার মধ্যে কোন একটা পাওয়া না যায়, তাহলে তার দীনদারী পরিপূর্ণ সাব্যস্থ হবে না। যেমনঃ সুদর্শন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার নাক, কান, চোখ, সবই সুন্দর ও যথানুরূপ। আর যদি সবই ঠিক থাকে, কিন্তু শুধু চোখ অন্ধ হয় বা নাক কাটা হয়, তাহলে তাকে-সুদর্শন বলা হয় না। এমনি ভাবে দীনদার তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে বর্ণিত সমস্ত গুণাবলী মওজুদ থাকবে। এ সমস্ত গুণের সমষ্টি তার ভিতর না থাকলে, প্রকৃত মুমিন মুসলমান হওয়া যায় না। [প্রমাণঃ ইসলামী শাদী, ৯৭ তিরমিযী ১:২০৭]

স্বামী-স্ত্রী একত্রে ইসলাম গ্রহণের পর করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় কোন পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তাদের পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে কি?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত নও মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর পূর্ববর্তী বিবাহ বহাল রয়েছে। সুতরাং নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই। [প্রমাণঃ। ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৩৩৮দুররুল মুখতার,৩:১৮৬]

দুই বিবাহের দুই স্বামীর অধিকারীণী পরকালে কার সাথে থাকবে

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করল এবং অবশেষে দ্বিতীয় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইন্তেকাল করল। এখন প্রশ্ন হল-মহিলা এবং তার প্রথম স্বামী ও দ্বিতীয় স্বামী জান্নাতে প্রবেশ করলে,

প্রথম স্বামী তার স্ত্রীকে চাইবে, দ্বিতীয় স্বামীও তার স্ত্রীকে চাইবে, এখন একজন মহিলাকে দুইজন পুরুষ কিভাবে নিবে?

জবাবঃ এ ব্যাপারে হাদীসে দু'ধরণের বর্ণনা এসেছে-

(১) মেয়েটি তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে থাকবে।

(২) মেয়েটিকে ইখতিয়ার দেয়া। হবে। সে তার ইচ্ছামতে যে কোন স্বামীকে গ্রহণ করতে পারবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আব্দুল হাই লখনুবী, ১:১০৪] "মরনেকে বাদ কেয়া হোগা" ৩৪৭]

অবিবাহিত অবস্থায় মারা যাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ বিয়ে করা ফরয, কিন্তু অনেক পুরুষ মহিলা বিয়ে না করে মারা যায়। তারা গুনাহগার হবে কি না?

জবাবঃ কামরিপু স্বাভাবিক থাকলে, তার জন্য বিবাহ করা সুন্নাত। যে ব্যক্তি সুন্নাত ত্যাগ করবে, তার সম্পর্কে নবী ﷺ ইরশাদ করেন "ঐ ব্যক্তি আমার তরীকার উপর নেই।" (মিশকাত) আর কামভাব হলে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল হয়, যেমন- কু-দৃষ্টি করতে থাকে বা মারাত্মাক অন্যায়ের প্রবণতা দেখা দেয়। সেক্ষেতে যদি স্ত্রীর খোরপোষ দেয়ার সামর্থ্য থাকে, তবে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। যদি সে এ ক্ষেত্রে বিবাহ না করে, তাহলে সে মহাপাপী হবে। আর যদি খোরপোষের সামর্থ্য না থাকে, তাহলে রিপু দমনের জনা রোযা রাখবে। [কানযুল উম্মাল ৭:৪৪৪ শামীঃ ৩/৬]

বিবাহের উপঢৌকনের মালিক কে হবে?

জিজ্ঞাসাঃ বর যাত্রা ও বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মেহমানগণ যে উপঢৌকন প্রদান করে থাকেন এর প্রকৃত মালিক কে? বর না কনে? না

তারা উভয়ে? তেমনিভাবে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হওয়ার সময় বর্তমানে পিতার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হয় এবং এতে অংশগ্রহণকারী মেহমানগণ বর বা কনের না, লিখে উপঢৌকন দিয়ে থাকেন এর মালিক কে হবে?

জবাবঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে যে সব উপঢৌকন বা উপহার সামগ্রী উঠে থাকে, সেগুলোর মধ্য থেকে যদি কোনটি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উপঢৌকন প্রদানকারী সন্তুষ্টিচিত্তে তা প্রদান করেনি। বরং সামাজিক চাপে পড়ে অথবা চক্ষু লজ্জায় পড়ে সেটা দিয়েছে, (উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সাধারণতঃ এরূপই হয়ে থাকে।) তাহলে উক্ত উপহার সামাগ্রী মালিককে ফেরত দিতে হবে। কেননা, অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। আর যদি সন্তুষ্টচিত্তে উপহার সামগ্রী প্রদান করে এবং তাতে এমন কোন চিহ্ন বা নিদর্শন থাকে, যার দ্বারা এর মালিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাহলে সে-ই এ উপহার সামগ্রীর মালিক হবে। যেমন উপহার সামগ্রীতে যদি বর কা কনের নাম লেখা থাকে, তাহলে যার নাম লেখা থাকবে, সেই মালিক হবে। আর যদি কারো নাম লেখা না থাকে, তাহলে উপহার দাতাকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে যে, তিনি এ উপহার সামগ্রী কাকে দিয়েছেন? যদি উপহার সামগ্রী প্রদানকারী সম্পর্কে জানা না যায়, তাহলে উভয়ে উক্ত উপহার সামগ্রীর মালিক হবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এ ধরনের অনুষ্ঠানে যেভাবে উপঢৌকন দেয়া হয় তা শরী'আতের দৃষ্টিতে খুবই আপত্তিকর। সুতরাং দীনদার লোকদের এ ধরনের লেন-দেন থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা উচিত। তাছাড়া বর্তমানে সেভাবে বরের কাছে বহু সংখ্যক লোকজন জড়ো করে মেয়ের বাবার বাড়ীতে যাওয়ার মধ্যে শরীক হয়, বুযুর্গানে দীন এটাকে ডাকাতি বলে

আখ্যায়িত করেছেন। কাজেই এর থেকে পরহেয করা জরুরী। (কিতাবুল ইমান পৃঃ১০৯) [প্রমাণঃ সূরা বাকারাঃ ১৮৮ রাদ্দুল মুহতার, ৪:২৮২ ফাতাওয়ায়ে হিনদিয়্যাহ্, ৩:৩৮৩ ইসলামী শাদী ২০৬]

দুগ্ধ পান

উত্তেজিত অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো

জিজ্ঞাসাঃ স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা বা উত্তেজিত অবস্থায় দুই বৎসরের মেয়ের গায়ে যদি হাত লাগে বা সে দুধ পান করতে চেষ্টা করে এবং মা সন্তানকে ঐ অবস্থায় দুধ পান করায় তাতে কোন ক্ষতি আছে কি-না?

জবাবঃ সন্তান ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হওয়া উচিত। সন্তান দুধ পান করা অবস্থায় সহবাসে লিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে সন্তান নির্লজ্জ হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত অবস্থায় ছোট মেয়ের উপর হাত পড়লে, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। বা হুরমতে মুছাহারা সাবিত হবে না। স্ত্রীও হারাম হবে না।

কারণ হুরমতে মুছাহারা সাবিত হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হল-যার উপর হাত লাগবে, আকর্ষণ বা শাহওয়াত তারই উপর হতে হবে এবং তার বালিগা হওয়া বা বালিগার নিকট বর্তী হওয়া জরুরী। মোদ্দাকথা মেয়ের বয়স নয় বৎসরের বেশী হতে হবে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৫:৮৪ ফাতাওয়া শামী ৩:৩৭]

দুগ্ধপান করানোর সর্বোচ্চ সীমা

জিজ্ঞাসাঃ শিশুকে মহিলার দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ সময়সীমা কতদিন? নির্ধারিত সময়ের পর দুধ পান করালে দুগ্ধ সম্পর্কের দরুন পরস্পরে বিবাহ হারাম হবে কি-না?

জবাবঃ দুধ পান করানোর শেষ মেয়াদ কত দিন, এ ব্যাপারে ফুকাহাগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। তবে সর্বোচ্চ দুই বছর ধরাটাই সতর্কতার দাবী। দুই বছর পর সন্তনকে দুধ পান করানো উচিত নয়। বরং অনেকের

নিকট তা হারাম। কিন্তু সর্বোচ্চ আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পান করালে, দুগ্ধ সম্পর্ক প্রমাণিত হবে এবং পরস্পরের বিবাহ হারাম হবে। কিন্তু আড়াই বৎসরের পরে দুধ পান করানোর দ্বারা দুগ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে না এবং পরস্পরের বিবাহও হারাম হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া ৩:২৩২ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৮:৩৭০ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:১২৮ ইমদাদুল মুফতীন কামেল ৭১৮]

সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো

জিজ্ঞাসাঃ (ক) আজকাল অনেক মহিলা সন্তানকে বুকের দুধ পান করতে দেয় না। (খ) অনেক মহিলা পরকীয়ায় পড়ে কিংবা ভিন্ন কোন মতলবে নিজের স্বামীকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলে। (গ) স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, আড্ডা দেয়। এই জাতীয় মহিলার সম্পর্কে ইসলামের কী বিধান রয়েছে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

জবাবঃ (ক) শিশুকে স্তন্যদান মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুণ স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে। এবং যত সময় পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে, স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার ভাতা বা বিনিময় নিতে পারবে না। কেননা এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব। [প্রমাণঃ সূরা বাকারা, ২৩৩ মাআরিফুল কুরআন, ১:৫২৫]

(খ) কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন-"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। [প্রমাণঃ সূরা নিসাঃ ৯৩]

(গ) মহিলাদের জন্য বিনা ঠেকায় সাধারণভাবে ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ। এছাড়া অন্য পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, অযথা কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ কবীরা গুনাহ ও হারাম। আর একটা কবীরা গুনাহই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট। মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ পাক মহিলাদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খতার যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।" সুতরাং অন্য পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তাই যখন হারাম তখন তাদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর তো প্রশ্নই উঠে না। আজকাল ইংরেজী তা'লীমের দরুন এ ধরনের বহু কুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে। [প্রমাণঃ সূরা আল-আজহাবঃ ৩৩,৫২]

নিজের স্ত্রীর দুধ পান কারা

জিজ্ঞাসাঃ নিজের স্ত্রীর সন্তান হওয়ার আগে বা পরে দুধ খাওয়া জায়েয আছে কি-না?

জবাবঃ সন্তান হওয়ার আগে বা পরে স্ত্রীর দুধ পান করা নাজায়েয ও হারাম। হ্যাঁ, সহবাসের সময় উত্তেজনা বশতঃ স্ত্রীর স্তন শুধু মুখে নিলে গোনাহগার হবে না। এমতাবস্থায় মুখে দুধ চলে গেলে, থুথু ফেলে দিতে হবে। খাওয়া জায়েয হবে না। [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৩:২২৫ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৮:৩৯২-৩৯৩ আহসানুফাতাওয়া, ৮:১২৭]

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণ করে তাওবা করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি ‘লাইগেশন’ করলো। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা কিভাবে তাওবা করলে ঐ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে?

জবাবঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্বতি গ্রহণের লক্ষ্য নানা প্রকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা ও সুখী সংসার গড়া। যার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, এটা গ্রহণ না করলে, মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে না। অথচ এ বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ পাকের রাযযাকিয়াতের (রিযিকদাতা হওয়ার) আকীদা অস্বীকার করা হয় যা কুফর বা ঈমান বিধ্বংসী। সুতরাং, এরূপ বিশ্বাস নিয়ে কেউ যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে তাহলে তার জন্য জরুরী হলো কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটিসহ খাঁটি ভাবে তাওবা করা। অবশ্য যদি স্ত্রীর শারীরিক অক্ষমতা বা নবাগত শিশুর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন আশংকার কারণে স্থায়ীভাবে লাইগেশন করে থাকে তাহলে তাতে ঈমান নষ্ট হবে না। তবে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করে আল্লাহ প্রদত্ত একটি যোগ্যতাকে চিরতরে বন্ধ করে ফেলার জন্য গুনাহগার হবে এবং এর জন্য তাকে খাঁটি মনে তাওবা করতে হবে। [প্রমাণঃ শামী ৩:১৭৩ ফাতাওয়া রাহীমিয়া, ২:২৩৪]

যে সমস্ত কারণে জন্ম বিরতিকরণ বৈধ

জিজ্ঞাসাঃ কোন কোন কারণে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? ধরুন, একটি মহিলার অবস্থা এমন যে, যদি

মহিলাটি গর্ভধারিণী হয়, তাহলে তার বিরামহীন রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে কি-না?

জবাবঃ যে সব পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেগুলো প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্তঃ (১) স্বায়ী জন্মনিরোধ। (২) অস্থায়ী জন্মনিরোধ।

স্বায়ী পদ্ধতিঃ এমন কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা, যাতে সন্তান গর্ভধারণ ক্ষমতা চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

অস্থায়ী পদ্ধতিঃ এমন পদ্ধতি গ্রহণ, যাতে সাময়িকভাবে সন্তান গর্ভধারণ বন্ধ থাকে, গর্ভধারণ ক্ষমতা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এতে পুনঃসন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের লক্ষ্য নানা প্রকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে-জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা ও সুখী সংসার গড়া। যার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, এটা গ্রহণ না করলে, মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য ও বাসস্থান প্রভৃতির ভারসাম্য রক্ষা পাবে না। অথচ এ বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাযযাকিয়াতের(রিযিকদাতা হওয়ার) অস্বীকার করা হয়, যা কুফর এবং ঈমান বিধ্বংসী। কারণ- আল্লাহ তা'আলা শুধু মানুষ নয়, সকল মাখলুকের রিযিকের জিম্মাদারী নিজের উপর রেখেছেন। কোন মাখলুকের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেননি। রিযিক কোন মানুষের চেষ্টা, তদবীর ও পরিকল্পনা গ্রহণের উপর ছাড়েন নি। মানুষ রিযিক অন্বেষণের দায়িত্ব হিসেবে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু কে কতটুকু পাবে, এটা তার চেষ্টা-তদবীরের উপর নির্ভর করে না, বরং এটা খোদায়ী ফায়সালার উপর নির্ভরশীল। এ আক্বীদা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ব্যতিক্রম কোন বিশ্বাস রাখা কুফর।

[সূরা বনী ইসরাইল ১৮, সূরা কাসাস-৮২, সূরা আনকাবূত-৬২ আয়াত]

আল্লাহ তা'আলা যে পরিমাণ মাখলুক সৃষ্টি করেন, সেই পরিমাণ রিযিকের অবশ্যই ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীতে যে অভাব অনটন দেখা যায়, তা রিযিকের স্বল্পতার দরুণ নয়। বরং রিযিকের ইসলামী বণ্টন ব্যবস্থার অনুপস্থিতির দরুন। তাই দরিদ্রতার অজুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তবে শরী'আতে ব্যক্তিগত বিভিন্ন উযর-অসুবিধার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ জায়েয আছে। উযর- স্থায়ী হলে, স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। আর উযর অস্হায়ী হলো অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। যেমন- কোন ভদ্র মহিলার এমন বিশেষ কোন অসুস্থতা আছে যে, সন্তান ধারণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং সন্তান পেটে আসলে, তার মারা যাওয়ার আশংকা আছে। এ ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম দীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তেমনিভাবে কোন মহিলার স্বাস্থ্যহানী বা নানান রোগ-বালাই বা ঘন ঘন অনেক বাচ্চা হওয়ায় তাদের লালন-পালনে বেশী অসুবিধা হওয়ার বা কোন মায়ের বুকের দুধের অভাবে সন্তানের জীবন নাশের সম্ভাবনা ইত্যাদি উযর বা কোন সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ অবৈধ নয়। সে ক্ষেতে সমস্যা দূর হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন একটি পদ্ধতি মুসলিম দীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এমন পদ্ধতি হতে হবে, যা গ্রহণ করতে গিয়ে কোন হারামের মধ্যে (যেমন- সতর খোলা ইত্যাদিতে) যেন লিপ্ত হতে না হয়। ট্যাবলেট ও ইনজেকশন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে।

[প্রমাণঃ সূরা আন'আম, ১৫১, সূরা বনী ইসরাইল ৩১, সূরা হুদ ৬, সূরা মায়িদাহ ৮৭, মিশকাত শরীফ ৩৬৭, বুখারী, ২:৭৫৯, ফতহুল বারী, ৯:৯৫, ফাতাওয়া শামী,৩:১৭৬, ফাতাওয়া শামী, ৬:৪২৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া, ২:২৩৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪:২০৪]

অসুস্থতার দরুন জন্মনিয়ন্ত্রন করা

জিজ্ঞাসাঃ প্রায় দু'মাস যাবত ঋতুস্রাব হয় না। সম্ভবতঃ গর্ভে সন্তান রয়েছে। এ দিকে আমার শারীরিক অবস্থাও ভাল না। এমতাবস্থায় সন্তান নিলে, আমার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে এবং আমার স্বামীও এমতাবস্থায় বাচ্চা নিতে নিষেধ করেছে। এখন শরী'আতের দৃষ্ঠিতে আমার কি করণীয়?

জবাবঃ আপনি কোন দীনদার পরহেযগার ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করবেন। ঐ ডাক্তার যদি আপনার ব্যাপারে একথা বলে যে, সন্তান নিলে আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে আপনার গর্ভ ১২০ দিন অর্থাৎ চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গর্ভপাত করতে পারবেন। আর আশংকাজনক অবস্থা ছাড়া গর্ভের সন্তান নষ্ট করাও না জায়েয।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬:২৫৫ ইমদাদুল মুফতীন, ৯৭৫ ফিকহুল ইসলামী ১:৩৪৬]

সংসার ছোট রাখার জন্য সন্তান বন্ধ রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে দেখা যায় যে, প্রায় বাড়ীতে পরিবার ছোট রাখার জন্য অনেকে সন্তান বন্ধ রাখেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে এটা ঠিক কিনা ও নবী করীম ﷺ-এর আমলে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছিল কিনা?

টেলিভিশনের মধ্যে অনেক মাওলানা সাহেবরা বলেন যে- জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয-এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের রায় কি?

জবাবঃ আমাদের দেশের প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যেমন অপারেশন, বড়ি ও কনডম ইতাদি পদ্ধতি যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব-অনটনের ভয়ে এবং ছোট ও সুখী পরিবার গড়ার লক্ষ্যেই হয়ে থাকে, যা

কুরআন-হাদীসের সরাসরি বিরোধিতা এবং "আল্লাহই সমস্ত মাখলুকের রিযিক দাতা" -এ বিশ্বাসের চরম পরিপন্থী। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- "তোমরা দরিদ্রতার কারণে সন্তানদেরকে মেরে ফেলো না। আমি তোমাদের রিযিক দেই" অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- "তোমরা অভাবের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করব। তোমাদের রিযিকেরও ব্যবস্থা করব।"

তবে হ্যাঁ স্ত্রীর রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে সাময়িক বন্ধ রাখার মাসআলা কোন মুফতী থেকে বিস্তারিত হালত বলে জেনে নিবেন।

নবী করীম ﷺ-এর যামানায় বর্তমান প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল না। তবে বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে "আযলের" কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আযল ও বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনেক দিক দিয়ে পার্থক্য রাখে। যেমন আযল কোন নিশ্চিত পদ্ধতি নয় অপর দিকে প্রচলিত প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিত পন্থা। আযল ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে করা হতো। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতি, ছোট ও সুখী পরিবার গড়ার স্বপ্নে করা হয় যা একেবারে অমূলক ও নাজায়েয। (আযল বলা হয়-সহবাস অবস্থায় নিস্খলনের মুহূর্তে বীর্য বাহিরে ফেলা।)

আযলকেও নবী ﷺ পছন্দ করেননি এবং উলামায়ে কিরাম অপছন্দনীয় বলেছেন। তবে কেউ ব্যক্তিগত বিশেষ উযরে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল করতে পারে। আমাদের দেশের রেডিও-টেলিভিশনে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে তথাকথিত কিছু সংখ্যক নামধারী মাওলানা সাহেবরা পাইকারী ভাবে যে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয হওয়ার পক্ষে আলোচনা করেন, তার কোন অস্তিত্বই কুরআন-হাদীসে নেই। তারা অবশ্যই দুনিয়ার কিছু মাল

উপার্জনের জন্য মহল বিশেষের মর্জি মাফিক কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রত্যেক যমানায় এ ধরনের কিছু আলেম-উলামা ছিলেন যাদেরকে উলামায়ে সু বা দুনিয়াদার আলেম বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের আলেমদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। সুতরাং, আপনারা তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না।

মূলতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে এবং মুসলিম সমাজে যিনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে মুসলমানদেরকে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে আল্লাহর গযবে ফেলার উদ্দেশে চালু করেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের গণতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ কথাটা বুঝার মত লোক নেই। এ সুযোগে অমুসলিমদের (ফরমায়েশ) হুকুম ও চাপের মুখে আমাদের দেশের প্রত্যেক সরকারের ছত্রছায়ায় এটা রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার করা হয়ে থাকে এবং এর জন্য কিছু লোভী দুনিয়াদার মৌলভীও তারা ভাড়া করে এনে কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে এমন হারাম পদ্ধতি জায়েয করার অপচেষ্টা চালায়। সুতরাং, সাধারণ মুসলমান ভাইদের জন্য এসব দুনিয়াদার মৌলভী থেকে দূরে থাকা ঈমানী দায়িত্ব।

তালাক/তালাকের শর্তাবলী

পূর্বে যিনাকারীনী ছিল বলে নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান

জিজ্ঞাসাঃ আমার এক বন্ধু নতুন বিয়ে করেছেন। বিয়ের আগে জানা ছিল, মেয়েটি সতী। কিন্তু বিয়ের পরে জানতে পারল যে, তার স্ত্রী অসতী বা যিনাকারীনী। আমার বন্ধু এ খবর জানতে পেরে স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়। এটা তার জন্য শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ স্বামী যে জানতে পারলো যে, তার স্ত্রী যিনাকারীনী ছিল-এর সঠিক ভিত্তি কি? যে তথ্যের ভিত্তিতে স্ত্রীকে যিনাকারীনী মনে করছেন, তার উপর কতটুকু নির্ভর করা যায়? শরী'আতের দৃষ্টিতে যিনাকারীর স্বীকারোক্তি বা চার জন পুরুষ স্বাক্ষীর চাক্ষুশ দেখার দ্বারা যিনা প্রমাণিত হয়। এ ক্ষেত্রে কি তা হয়েছে? ২/১ জনের কথার ভিত্তিতে তার স্ত্রীকে যিনাকারীনী বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ যারা এরূপ খবর দিচ্ছে, তাদের কোন গরয বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং- এ সমস্ত খবরের প্রতি কান দেয়া উচিত নয়। এমন কি যদি শরী'আত সম্মতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বাস্তবিকপক্ষে সে মেয়েটি যিনাকারীনী ছিল, কিন্তু পরে সে খালিস দিলে তাওবা-ইস্তেগফার করে নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে, এখন আর ঐ ধরনের কোন দোষ তার মধ্যে নেই- বরং নিজেকে পর্দায় রাখে এবং স্বামীর কথামতই চলে, সে ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য ভাল যে, তাওবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন বলে বর্ণনা যখন হাদীসে পাওয়া যায়, তখন তিনিও সে পুরাতন ঘটনার কারণে স্ত্রীকে কু-নযরে না দেখে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তাতে করে তিনিও বিভিন্ন বিচ্যুতিতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা পাওয়ার আশা করতে পারেন। তিনি নিজে চিন্তা করলে দেখবেন তিনিও আল্লাহর দরবারে অনেক গুনাহ করেছেন সেগুলোর প্রতিও খেয়াল করা দরকার। অনেক স্বামীর এ ধরনের

বদ অভ্যাস থাকে যে, খামাখা স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে টানা-হেচড়া করে। এটা মোটেও ঠিক নয়। এটা অশান্তির বীজ এবং সংসার ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। তবে হ্যাঁ, উক্ত অভিযুক্ত মেয়েটির চলাফেরা যদি বিয়ের পরেও মার্জিত না হয়, বরং বেপর্দা বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং স্বামীর অবাধ্য হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উক্ত মহিলাকে সংশোধন করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তালাক দেয়া জায়েয হবে।

[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ৩/৭,৮]

আধা পাগল বাক্তিকে তালাক প্রদান

জিজ্ঞাসাঃ কোন সময় ভাল আবার কোন সময় পীগলামী, এমন ব্যক্তি, স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক হবে কি-না?

জবাবঃ যদি ঐ ব্যক্তি পাগল থাকা অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তালাক হবে না। আর যদি ভাল থাকা অবস্থায় তালাক দেয়, এরপর পাগল হয়ে যায় তাহলে তালাক পতিত হবে। আর যদি সর্বক্ষণ পাগল থাকে তাহলে তার তালাক পতিত হবে না।

[প্রমাণঃ কাওয়ায়িদুল ফিকহ, ১:৭৪ আহসানুল ফাতাওয়া, ৫:১৩০]

ডাকযোগে তালাকনামা প্রদান

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি বিবাহ করার পর তার স্ত্রীকে নিয়ে ৩/৪ বছর ঘর-সংসার করে। এরপর কোন এক বিষয়ে উভয়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হলো উক্ত স্বামী স্ত্রীকে তার বাবার বাড়ীতে রেখে আসে এবং কিছুদিন পর ডাকযোগে ‘তালাকনামা’ প্রেরণ করে। তালাকনামায় স্বামীর স্বাক্ষর সহ আরো তিনজন ব্যক্তির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। পরে উক্ত তালাকনামা দিয়ে স্ত্রী পক্ষের লোকজন কোর্টে মামলা দায়ের করে। পরিশেষে সে

১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার বিনিময়ে উক্ত মামলা মীমাংসা করে ফেলে। পরবর্তীতে একদা সে তার স্ত্রীর সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করে বলে আমি তোমাকে মৌখিক কোন তালাক দেইনি বরং কাজী সাহেবের হাতে লিখিয়ে তা পাঠিয়ে দিয়েছি মাত্র। বর্তমানে স্ত্রী পক্ষের লোকেরা "মৌখিক তালাক ব্যতীত তালাক গ্রহণযোগ্য নয়"- একথার উপর ভিত্তি করে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট সোপর্দ করতে রাজী এবং স্ত্রীও স্বামীর নিকট যেতে আগ্রহী। এখন প্রশ্ন হল উক্ত স্ত্রী স্বামীর নিকট যেতে পারবে কি-না?

জবাবঃ প্রশ্ন উল্লেখিত সুরতে যদিও স্বামী মৌখিকভাবে উচ্চারণ না করে কাজী সাহেবের মাধামে লিখিয়ে তালাক দিয়েছে, এতেও তালাকদাতার স্ত্রীর উপর তালাক পড়ে গেছে। [ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১০:৩৭৮]

লিখিতভাবে দেয়া তালাকের সংখ্যা ও বিবরণ প্রশ্নে উল্লেখ না থাকায় এখন উক্ত স্ত্রী স্বামীর নিকট যেতে পারবে কি-না? বা কিভাবে যেতে পারবে? এর চুড়ান্ত সমাধান দেয়া সম্ভব হলো না।

মনে মনে তালাক

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি (একা একাই) মনে মনে অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে আমি যেই মেয়েকে বিবাহ করব, সেই মেয়েই তালাক। তাহলে কি তালাক হয়ে যাবে? যদি তালাক হয়ে যায়, তাহলে কি অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করার ব্যবস্থা আছে?

জবাবঃ মনে মনে তালাকের কথা কল্পনা করলে তালাক হয় না। সুতরাং, ঐ ব্যক্তি যে কোন মহিলাকে বিয়ে করবে সে মহিলার উপর উক্ত কথা মনে মনে বলার দ্বারা কোন ধরনের তালাক পতিত হবে না। তবে এ ধরনের কু-চিন্তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। আর এ কথা বলা যে, "অনিচ্ছাকৃতভাবে" এটা বোধগম্য নয়। এরূপ তো হতে পারে না।

উল্লেখ্য, মুখে উচ্চারণ করে এরূপ কথা বললে ঐ ব্যক্তি প্রথমবার যে মেয়েকে বিবাহ করবে তার উপর এক তালাকে বায়েন পড়ে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। অবশ্য বিবাহের সকল শর্তসহ বিবাহ দোহরায়ে নিলে উক্ত মেয়ে তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

[মিশকাত ১:১৮, আদদুররুল মুখতার ৩:২২৬, আলবাহরুর রায়িক ৩:২৩৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯:৪১]

তালাকে ছরীহ/কিনায়া

জবরদস্তি করে মেয়ের মাধ্যমে ছেলেকে তালাক দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় একজন যুবক ছেলে ও একজন যুবতী মেয়ে ভালবাসা করে উভয়ে মিলে কাজী অফিসে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরে যখন মেয়ের অভিভাবকরা জানতে পারলো, তখন তারা রাজী হল না, তারা মেয়েকে জোর-জবরদস্তি করে অন্য কাজীর নিকট গিয়ে তালাকে তাফবীয দিয়ে দেয়। প্রশ্ন হল তাদের এ বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? আর মেয়ের অভিভাবকগণ জবরদস্তি করে মেয়ের মাধ্যমে ছেলেকে তালাক দিয়ে দিয়েছে, তা শুদ্ধ হয়েছে কি? উল্লেখ্য যে, এখনও ঐ মেয়ে ছেলের সাথে বন্ধনে আসতে চায়। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকগণ আসতে দিতে চায় না। প্রশ্ন হল-যদি ঐ মেয়ে আসে, তাহলে ছেলের সাথে নতুনভাবে বিবাহ পড়াতে হবে কি-না?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি যুবক-যুবতীর মধ্যে কুফূ বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ বংশগতভাবে এবং দীনদারী ও পেশাগত দিক দিয়ে ছেলে যদি মেয়ের থেকে নীচু না হয়, তাহলে পিতা-মাতা রাজী হোক, বা নারাজ হোক বিবাহ সহীহ হবে। তবে তা মেয়েটির জন্য নিতান্তই গর্হিত কাজ বিবেচিত হবে। তথাপি শরী'আত পরিপন্থী কোন কারণ না থাকলে, এমতাবস্থায় পিতা-মাতা নারাজী প্রকাশ না করে বরং মেনে নেয়াই শ্রেয়। কারণ বালেগ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ দেয়া অভিভাবকের কর্তব্য ছিল। হাদীস শরীফে আছে- যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন পিতা-মাতার (বা অভিভাবকের) কর্তব্য হল- তার ভাল নাম রাখবে এবং ভালো আদব শিখাবে। অতঃপর যখন সে বালেগ হবে, তখন তার বিবাহের কাজ সম্পন্ন করবে। আর যদি বালেগ হওয়ার পরেও বিনা উযরে তাকে বিবাহ না

করায়, তারপর ঐ সন্তান যদি এ সংক্রান্ত কোন গুণাহে লিপ্ত হয়, তাহলে ঐ গুণাহের অংশীদার সেই পিতা-মাতা বা অভিভাবকও হবে।

প্রশ্নে বর্ণিত মেয়ের পক্ষের লোকেরা মেয়ে দ্বারা তার স্বামীকে যে তালাক তাফবীয প্রদান করেছে, তা সহীহ হয়নি। কারণ- তালাকে তাফবীয পতিত হওয়ার জন্য যে শর্ত আছে, তা পাওয়া যায়নি। তাই এখন নতুনভাবে বিবাহ পড়াতে হবে না। তাকে নিয়ে ছেলে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে অভিভাবককে রাজী-খুশী করানো তাদের কর্তব্য। কিন্তু যদি মেয়ে তার চেয়ে নীচু বংশের ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে অভিভাবকগণের অসম্মতিতে তাদের বিবাহ সহীহ হবে না। কাজেই সে অবস্থায় মেয়ের জন্য উক্ত ছেলের সাথে বিবাহ বিহীন ঘর-সংসার করা হারাম হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, ৫:২৫৭ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৮:১৮৫ ইমদাদুল মুফতীন, ৫৫১]

উল্লেখ্য, মেয়ের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশ হল-মেয়ে নিজের মুরুব্বীগণকে বাদ দিয়ে ইচ্ছামত পছন্দের স্থানে বিবাহ বসবে না। এর খেলাপ করা তার জন্য মারাত্মক অপরাধ ও নিন্দনীয় কাজ। অপরদিকে মুরুব্বীগণকে বলা হয়েছে যে, তারা মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে তার পছন্দের বাইরে বাধ্য করবে না। বরং এমন ছেলের সাথে মেয়েকে বিবাহ দিবে যে ছেলের প্রতি মেয়েটি মনে-প্রাণে রাজী আছে। যদি এ ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের বংশগত, দীনদারী ও পেশাগত কোন মানহানীর বিষয় না থাকে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া, ৫:২৫৭ ফাতাওয়া শামী ৩:৩১৭]

স্ত্রীকে এক তালাক, দু'তালাক ও বাইন তালাক বলা

জিজ্ঞাসাঃ আমার স্বামী আমাকে এক তালাক, দু' তালাক, বাইন তালাক বলল। একথার দ্বারা আমার উপর কয় তালাক পতিত হয়েছে।

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত কথার দ্বারা আপনার উপর তিন তালাক পড়ে আপনি তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছেন। স্বামীর কর্তব্য হলো ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনার খোরপোষ দেওয়া ও মোহরানা দাবি আদায় করে আপনার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাওয়া।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯:৩১০]

নিজ স্ত্রীকে"তুমি আমার জন্য হারাম" বলা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের বিয়ের বয়স ৬ বছর। এক বছর যেতে কোন একদিন শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আমার স্ত্রীকে আমি বলে ফেলেছিলাম তুমি আমার জন্য হারাম। অনেক দিন পরে বুঝতে পারলাম আমার এই কথাটা বলা ঠিক হয় নাই। আমি ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি। অতঃপর একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বিবাহ দোহরিয়ে নেয়ার কথা বলায় আমি তাই করেছি। কাজটি সঠিক হয়েছে কি-না?

জবাবঃ বর্ণিত সুরতে আপনার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পড়ে আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। অতঃপর আলেম সাহেবের কথা অনুযায়ী বিবাহের সকল শর্তসহ পুনরায় বিবাহ দোহরিয়ে থাকলে তা সঠিক হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে আপনি এ স্ত্রীর ক্ষেত্রে আর মাত্র দুই তালাকের মালিক থাকবেন। কখনো দুই তালাক দিলেই মোট তিন তালাক হয়ে এ স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ন হারাম হয়ে যাবে।

[রদ্দুল মুহতার ৩:৪৩৩]

তিন তালাক

ঝগড়ার সময় তিন তালাক দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ একদা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন আমি আমার স্ত্রীকে রাগের বশীভূত হয়ে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলেছি। কিন্তু আমি কারো নাম নেইনি। স্ত্রীর নাম নেইনি। স্ত্রীর মা-বাবার নামও নেইনি। আমার এ তালাক পতিত হয়েছে কি-না? তালাক পড়ে থাকলে, এখন আমার কী উপায়?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে উক্ত স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণ রূপে হারাম হয়ে গেছে। স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার সময় প্রদত্ত তালাক পতিত হওয়ার জন্য স্ত্রীর বা স্ত্রীর মা-বাবার নাম নেয়ার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে স্পস্ট তালাক শব্দ দ্বারা-তালাক দিলে নিয়্যতের প্রয়োজন হয় না। তালাক পতিত হয়ে যায়। আর রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক পড়ে যায়। সুতরাং ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর খোরপোষ দিতে হবে এবং মোহরানার দাবী বাকী থাকলে তা আদায় করে দিতে হবে।

[প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার, ৩:২৪৪/২৪৯ ইমদাদুল মুফতীন, ৫৯৩ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৯:৪৯,৭৯,২৯২]

প্রকাশ থাকে যে, স্বামীর জন্য উক্ত তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে শর'ঈ হালালা ব্যতীত দ্বিতীয় বার গ্রহণ করার আর কোন পথ নেই। শর'ঈ হালালা হচ্ছে- তিন হায়েয পরিমাণ সময় ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই মহিলা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বসবে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে যৌন মিলন হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেছায় তালাক দিলে, অথবা সেই ২য় স্বামী মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালনের পর উভয়ে রাজী থাকলে, বিবাহের সকল শর্ত সাপেক্ষে উক্ত

স্ত্রীকে ১ম স্বামী গ্রহণ করতে পারে। উল্লেখিত সুরত ছাড়া তাদের ঘর-সংসার করার আর কোন পথ নেই। [প্রমাণঃ হিদায়া, ২:৩৯৯ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৪৭৩]

তিন তালাকের বিধান

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে তিন তালাকের মাধ্যমে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেন। এভাবে চার মাস অতিবাহিত হলে পুনরায় হালালা ব্যতিরেকে উক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করেন। উল্লেখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই যে, ইসলামে এ ধরনের কোন বিধান আছে কি? আর এমন ব্যক্তি যদি কোন মসজিদের ইমাম হন তাহলে এরূপ ইমামের পিছনে মুসল্লীদের নামায আদায় করা সহীহ হবে কি ?

জবাবঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিন তালাক দেয়ার পর শর'ঈ হালালা ব্যতীত উক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং তাদের ঔরসজাত সন্তানও জারয সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের যৌন মিলন যিনা হিসেবে বিবেচিত হবে। বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি যিনা তথা জঘন্যতম কবীরা গুনাহে লিপ্ত বিধায় সে ফাসিক, আর ফাসিক ব্যক্তির ইমামতীর হুকুম ইমামতির পর্বে বর্ণিত হয়েছ। [প্রমাণঃ সূরা বাকারাহ: ২৩০ হিদায়াহ, ২:৩৯৯ মিশকাত শরীফ-২:২৮৪]

জিজ্ঞাসাঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিবাহের আকদ করতে পারবে কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে মহিলাদের ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিবাহের আকদ করা নাজায়েয ও হারাম। এমনকি বিবাহের আলোচনা করাও তার জন্য নিষেধ। তবে ইদ্দতের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর

বিবাহের আকদ করায় কোন অসুবিধা নেই। [সূরা বাকারাহ ২২৮ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:১৮]

স্ত্রীকে রাজ-আতের পর তালাক প্রদান

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে কাজীর মাধ্যমে ২ তালাক প্রদান করে এবং রাজা'আত করে ৮/১০ বছর সংসার করেন এর পর আবার ২ তালাক প্রদান করেন। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি স্ত্রীকে রাজা'আত করতে পারবে কি? দলীল সহ জানালে খুশি হব।

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত বক্তব্য অনুযায়ী আগে দুই তালাক দেওয়ার পর স্বামী মাত্র আর এক তালাকের মালিক ছিল। অতঃপর যখন পুনরায় দুই তালাক দিল তখন এর একটি আগের দু-টির সাথে যোগ হয়ে তার স্ত্রীর উপর মোট তিন তালাক পতিত হয়ে উক্ত স্ত্রী স্বামীর সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। তালাকের পর থেকে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হারাম এবং মেলামেশা করলে তা যিনায় পরিণত হবে। তাই তাদের তাড়াতাড়ি অবশ্যই পৃথক হয়ে যতে হবে। আর উক্ত মহিলার ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ তিন হায়িয, আর গর্ভবর্তী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার খোর-পোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। মোহর আদায় না করে থাকলে অতিসত্ত্বর তা আদায় করে দিতে হবে।

[প্রমাণঃ দারুল উলূম ১০/১৫৮]

স্ত্রী স্বামীকে তিন তালাক দিলে

জিজ্ঞাসাঃ এক লোক রেজিষ্ট্রী কাবিন করে ঈজাব-কবুল করে এক মেয়েকে বিবাহ করে। তাদের মাঝে কুফু বিদ্যমান ছিল। রেজিষ্ট্রীতে শর্ত লাগিয়ে বলা হয় যে, "স্বামী-স্ত্রীর উপর অন্যায়-অত্যাচার করলে বা উপযুক্ত খোরপোষ না দিলে বা নিরুদ্দেশ থাকলে স্ত্রী তালাকের অধিকারী

হয়ে স্বামীকে তালাক দিতে পারবে।” মেয়ের পরিবার উক্ত বিবাহ মেনে না নেয়ায় তাদের পরামর্শে মেয়ে স্বামীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়। এখন উক্ত তালাক আদৌ হবে কি-না? হলে কয় তালাক হবে? তারা আবার ঘর-সংসার করতে চাইলে তার বিধান কি? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

জবাবঃ ইসলামী শরী‘আত তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীকে প্রদান করেছে। স্ত্রীকে নয়। তবে যদি স্বামী স্ত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে বা কোন শর্ত ছাড়া তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দেয় তাহলে প্রথমোক্ত সুরতে শর্ত পাওয়া গেলে, দ্বিতীয় সুরতে যে কোন সময় স্ত্রী স্বামীর দেওয়া অধিকার বলে নিজের জন্য তালাক গ্রহণ করতে পারে। তবে কোন অবস্থায় স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। দিলেও বেকার গণ্য হবে। আর প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী স্ত্রী যেহেতু নিজের জন্য তালাক গ্রহণ না করে স্বামীকে তালাক দিয়েছে। তাই সে তালাক পতিত হয়নি। তাই তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ঘর-সংসার করতে পারবে।

[হিদায়া ২:৩৭৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯:৪২]

তিন তালাক দিয়ে হালালা ব্যতীত বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার এক মেয়ের সাথে অপর একটি ছেলের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। তাদের পরস্পরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু অভিভাবকগণ মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। পরে পূর্ববর্তী ছেলে, অর্থাৎ যার সাথে এ মেয়ের ভালবাসা ছিল, সে উক্ত মেয়েকে চিঠি দিলে সে স্বামীর বাড়ী থেকে চলে আসে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়ে দেয়। এর তিন বছর পর শর‘ঈ বিধান মুতাবিক হালালা ব্যতীত পূর্ববর্তী স্বামীর নিকট মেয়ের অভিভাবক তার

সন্তুষ্টিতে পুনরায় বিবাহ দিয়ে দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের মাঝে সহবাসের দ্বারা কি যিনার গুনাহ হবে? যদি তা-ই হয় তাহলে এর জন্য দায়ী কে হবে? এখন করণীয় কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে তিন তালাকের পর শর'ঈ হালালা ব্যতীত স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার ও দেখা সাক্ষাত করা সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং, এরূপ বিবাহের পর সহবাসের দ্বারা যিনার গুনাহ হবে। আর এজন্য স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অভিভাবক সকলেই দায়ী হবে। আর পূর্বোল্লেখিত ছেলে উক্ত মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখার জন্য এবং পত্র দ্বারা বিপথগামী করার কারণে জঘন্য গুনাহগার হবে। এখন করণীয় হচ্ছে, অবিলম্বে তাদেরকে পৃথক করে দেয়া এবং শর'ঈ হালালার পর বিবাহ দুহরানো। [প্রমাণঃ সূরা বাকারা আয়াতঃ ২৩০]

একই বৈঠকে তিন তালাকের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমার আব্বা আমার আম্মাকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যে রাগান্বিত অবস্থায় অনেক মানুষের সামনে একই বৈঠকে তিন তালাক দেন। উল্লেখ্য যে আম্মাও তালাক চেয়েছিলেন। আব্বা হানাফী সমাজের মসজিদে ইমামতী করেন। কিন্তু আম্মা-আব্বা উভয়েই এখন বলেন, তালাকের নিয়্যত ছিল না এবং লা-মাজহাবী মৌলভীদের কাছ থেকে শোনা যায় যে, এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়। তাই ইদ্দতের মাঝখানে বিনা তাহলীলে শুধু তাওবাহ পড়ে তারা সংসার করছেন। আব্বা-আম্মা উভয়েই তালাকের মাসআলা বাদ দিয়ে অন্য সকল ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হচ্ছে,

(১) চার মাযহাবের কোন মাযহাবে বিনা তাহলীলে শুধু তাওবাহ পড়ে নেয়া জায়েয আছে কি-না?

(২) যদি বিনা তাহলীলে তাওবাহ পড়ে ঘর-সংসার করে, তাহালে মুসলমান থাকবে কি-না?

(৩) তার বালেগ সন্তান মাদরাসায় পড়লে তার জন্য এমন মাতা-পিতার সাথে উঠা-বসা এবং তাঁদের থেকে খরচ নিয়ে পড়া যাবে কি-না? অনুগ্রহপূর্বক উত্তর দিয়ে ফিৎনা থেকে বাঁচাবেন।

জবাবঃ (১) কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দেয় তাহলে উক্ত স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। শর'ঈ হালালা ব্যতীত উক্ত স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার কোন পন্থা চার মাযহাবের কোন মাযহাবে নেই। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের ফাতাওয়া একই রকম।

(২) উক্ত ব্যক্তি যদি বিনা তাহলীলে উক্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করে তাহলে উক্ত স্বামী-স্ত্রী হারাম ও যিনার মধ্যে লিপ্ত আছে। তাদের উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও মেলামেশা সবই যিনা ও হারাম হয়েছে। অবশ্য এ কারণে তারা মুসলমান থেকে খারিজ হবে না। মারাত্মক ফাসিক বলে গণ্য হবে।

(৩) প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরী তাদের সন্তানদেরকে দীনী শিক্ষা দেয়া। যাতে করে তাদের অন্তরে খোদা ভীতি সৃষ্টি হয়। যেমনিভাবে তাদের তাওহীদ এবং ঈমান শিক্ষা দেয়া জরুরী। সুতরাং যদিও উক্ত ব্যক্তি ফাসিক, এমন লোকের সন্তানরা, যদি মাদরাসায় লেখা-পড়া করে তাহলে তাদের পিতা থেকে লেখা-পড়ার খরচ নেয়া জায়েয হবে। কিন্তু সন্তানদের জন্য উচিত হবে তারা যেন তাদের আব্বা-আম্মাকে বুঝিয়ে বলতে থাকেন যে, আপনারা শর'ঈ হালালা করার পর বিবাহ দোহরিয়ে

নেন। যাতে করে তারা যিনার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারেন। [প্রমাণঃ সূরায়ে বাক্বারা ২৩০ আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আর বা'আ, ৪:৩৪১ মিশকাত শরীফ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১:৪৭৩ ও ২:২৭২ আল-মাবসূত, ৬:৮ দুররে মুখতার,৫:৬৮৭]

"তুমি যদি বাবার বাড়ী যাও তাহলে তিন তালাক বললে"

জিজ্ঞাসাঃ আমার গ্রামে এক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলল, "তুমি যদি তোমার বাবার বাড়ী যাও তাহলে তিন তালাক"। বর্তমানে স্ত্রী তার বাবার বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রীর জন্য তার বাবার বাড়ী যাওয়ার কোন পথ আছে কি?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত স্ত্রী বাবার বাড়ী যাওয়া মাত্রই তার উপর তিন তালাক পতিত হবে এবং স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তিন তালাক থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে এই যে, স্বামী এ মুহূর্তে স্ত্রীকে এক তালাকে বায়িন দিয়ে দিবে। আর এ তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী তার বাবার বাড়ী যাবে। তখন ইদ্দত পালিত হওয়ায় সে আর উক্ত স্বামীর স্ত্রী থাকবে না। সুতরাং, এমতাবস্থায় তালাক পতিত হওয়ার শর্ত পাওয়া গেলেও স্ত্রী বিদ্যমান না থাকায় তার উপর তালাক পড়বে না। পরে স্বামী উক্ত স্ত্রীর সাথে দুই জন স্বাক্ষীর সামনে নতুনভাবে মোহর ধার্য করে-বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। তারপরে স্ত্রী বাবার বাড়ীতে গেলেও স্বামীর আগের কথার কারণে তার উপর কোন প্রকার তালাক পড়বে না।

[প্রমাণঃ হিদায়াহ, ২:৩৮৫, ২:৩৯৯ জাওয়াহিরুল ফিক্বহ, ৪:২৩১]

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সংসারকারী স্বামীর সঙ্গে লেনদেন

জিজ্ঞাসাঃ একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর পুনরায় তার সঙ্গে সংসার করছে। এমন ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেন এবং মেলামেশা করা কতটুকু উচিত হবে?

জবাবঃ যদি কোন মুসলমান তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষে শরী'আতের হুকুম মুতাবিক অন্যত্র বিয়ে করে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর যৌন মিলনান্তে বিচ্ছেদের পর ইদ্দত পালনের শেষে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা ছাড়াই তার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে আরম্ভ করে, তাহলে তাকে সমাজ থেকে বয়কট করতে হবে। তার সঙ্গে কোন প্রকার উঠা-বসা, সৌজন্য সাক্ষাৎ জায়েয হবে না। এতে যেন সে অপারগ হয়ে তাওবা করতে বাধ্য হয় এবং বিবিকে পৃথক করে দেয় বা শরী'আত নির্দেশিত পন্থা গ্রহণ করে।

[প্রমাণঃ সূরা আন'আম ৬৮ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪:২৮৭]

এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন তালাক বললে

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তির শ্বশুর বাড়ীর সাথে তার পিতার মনোমালিন্য ছিল। (এখনো আছে)। ঘটনাক্রমে ঐ ব্যক্তির পিতা তার শ্বশুর বাড়ীর লোকজনকে কটাক্ষ করে কথা বলায় ছেলে বাবার ব্যবহারে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে, এবং এক পর্যায়ে ছেলের মুখে উচ্চারিত হয়, "এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন তালাক।" এ ঘটনার পর তারা জনৈক মৌলভী সাহেবের কাছে যায়। ঐ মৌলভী সাহেব (যিনি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকও বটে) তাওবাহ পড়িয়ে বিবাহ দোহরিয়ে আগের মতই ঘর সংসার করার নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য যে, 'তালাক শব্দ বলার সময় স্বামী তার স্ত্রী বা অন্য কারো নাম উল্লেখ করেনি। তাছাড়া স্ত্রীর সাথে স্বামীর কোন প্রকার মনোমালিন্য ছিল না'। তালাক শব্দ উচ্চারণের সময় নিয়্যত

কি ছিল? এ প্রশ্নের জবাবে স্বামী জানায় যে,স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না; বরং বাবার সাথে রাগ করেই সে এসব বলেছে ,

এখন প্রশ্ন হচ্ছে (১) স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়েছে কি? হলে কত তালাক? (২) বিবাহ দোহরানো শুদ্ধ হয়েছে কি? (৩) স্বামী-স্ত্রী ঘর-সংসার অক্ষুন্ন রাখতে চায়। এমতাবস্থায় তাদের করণীয় কি?

জবাবঃ বর্ণনানুযায়ী তালাকদাতা যদি কসম করে বলে যে, আমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না, তাহলে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না। সেক্ষেত্রে বিবাহ দোহরানোর কোন প্রশ্ন আসে না। বিবাহ দোহরানো ছাড়া তাদের জন্য ঘর-সংসার করা বৈধ হবে। কিন্তু তালাকদাতার একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনার অন্তরে কি ছিল? আপনি কাকে তালাক দিয়েছেন? তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তাই আমাদেরকে ফাঁকি দিলেও আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।

সুতরাং, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা যদি থেকে থাকে তাহলে আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পড়ে গিয়ে উক্ত স্ত্রী আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এখন শর'ঈ হালালা ব্যতীত আপনার জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না এবং ইদ্দত পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে। আর মোহর আদায় না করে থাকলে তা আদায় করতে হবে। এখন যদি আপনার পুনরায় ঘর-সংসার করতে চান তাহলে তার জন্য শর'ঈ হালালা করা জরুরী।

শর'ঈ হালালার সুরত হলোঃ স্ত্রী প্রথম স্বামীর ইদ্দত (তিন হায়েয) পালন করবে। অতঃপর স্বেচ্ছায় বিনা শর্তে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বসবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যৌন মিলনের পর যদি উক্ত স্বামী মারা যায় বা স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে উক্ত স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন করবে।

এখন যদি আপনারা উভয়ে বিবাহের সকল শর্তসহ বিবাহ দোহরিয়ে নেন তাহলে আপনাদের জন্য ঘর-সংসার করা বৈধ হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৮:৬৪ ফাতাওয়া শামী,৩:২৯৬ হিদায়া, ২:৪৪৩ সূরা বাকারাহ, আয়ত, ২৩০]

এক তালাক, দুই তালাক আর যদি দেই তিন তালাক তাহলে কি করবি?

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি অর স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বলে ফেলল যে, এক তালাক, দুই তালাক, আর যদি দেই তিন তালাক তাহলে কি করবি ? এ কথাকে কেন্দ্র করে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে যে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হল যে, এরূপ কথা বলার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী তালাক হয়ে গিয়েছে কি-না ? আর যদি তালাক হয়ে থাকে, তাহলে কয় তালাক হয়েছে?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী তালাক প্রদানকারীর স্ত্রীর উপর দুই তালাকে রাজঈ পড়ে গেছে। কেননা, উক্ত ব্যক্তির এক তালাক, দুই তালাক বলার সাথে সাথে তার স্ত্রীর উপর দুই তালাক পড়ে গেছে এবং তৃতীয় তালাকটি শর্ত সাপেক্ষে উচ্চারণ করায় তিন তালাক হয়নি। মোটকথা, এক্ষেত্রে দুই তালাক হয়েছে। এখন স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দতকালীন রাজা‘আত অর্থাৎ মৌখিকভাবে বলে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করে নিতে পারে। অন্যথায়, ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে দুই তালাকে বাইন হবে। সেক্ষেত্রে বিবাহের সকল শর্তসহ নতুনভাবে বিবাহ পড়ানো ছাড়া স্ত্রীকে গ্রহণ করা যাবে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ-পোষনের দ্বায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তাবে এবং আগে মোহর পরিশোধ করে না থাকলে তাও পরিশোধ করতে হবে।

[প্রমাণঃ হিদায়াহ, ২:৩৯৪ ফাতাওয়া শামী,৩:২৮১ হিদায়াহ, ২:৩৮৫ ও ৪৪৩]

কথা কাটাকাটির সময় এক, দুই, তিন তালাক বললে

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেবের পুত্র তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বলে- "এক, দুই, তিন তালাক, যা এখন।" কিছু লোক এ মর্মে বলে যে উক্ত স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়নি। কারণ স্বামীর নিয়্যত এবং কাকে তালাক দিয়েছে, তা সুনির্দিষ্ট নয়। তবে অর্ধিক সতর্কতার জন্য তারা পুনরায় বিবাহ পড়ানোর পরামর্শ দেয়। এ নিয়ে এলাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল- (ক) উক্ত স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়েছে কি-না? (খ) তালাক হয়ে থাকলে- উক্ত ইমামের পিছনে নামায পড়া যাবে কি-না? (গ) যারা এরকম সিদ্ধান্ত দেয়, তাদের প্রতি শরী'আতের হুকুম কি? উল্লেখ্য যে, উক্ত ফায়সালা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী রীতিমত ঘর সংসার করছে এবং ইমাম সাহেবও এতে কোন আপত্তি করছেন না।

জবাবঃ (ক) বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম সাহেবের ছেলের স্ত্রীর উপর তিন তালাক পড়ে উক্ত স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গিয়েছে। কেননা, স্পষ্টভাবে তালাক শব্দ উচ্চরণের ক্ষেত্রে তালাকের নিয়্যতের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে যদিও স্বামী তার স্ত্রীর নাম নেয়নি, তথাপিও তালাক পড়ে গেছে। কারণ স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটির পর্যায়ে তালাকের কথা বললে, স্ত্রীকেই তালাক দেয়া বুঝায়।

(খ) ইমাম সাহেবের যদি স্বীয় পুত্রের তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করাতে কোন আপত্তি না থাকে তাহলে তিনি ফাসিক বলে গণ্য হবেন। আর ফাসিকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। অবশ্য

পিতার নিষেধের পরও যদি পুত্র না মানে, তাহলে পিতার উপর অর্থাৎ ইমামের উপর কোন অভিযোগ আসবে না। এবং তার ইমামতি সহীহ হবে।

(গ) যে সমস্ত লোকেরা বলছে তালাকের নিয়্যত না করলে বা কাউকে তালাক দিয়েছে তা সুনির্দিষ্ট না হলে তালাক পতিত হয় না, তারা দীন ও শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ। না জেনে সিদ্ধান্ত দেয়া তাদের জন্য অন্যায় হয়েছে। এজন্য তাদের উচিত- নিজেদের ভুল স্বীকার করে তাওবা করে নেয়া।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত ভুল ফয়সালা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে থাকলে, কাল বিলম্ব না করে এখনই তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে। কেননা, বর্তমানে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ, সবই হারাম এবং মেলামেশা যিনা হচ্ছে। সুতরাং, তাদের পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯:৪৯-৮০ হিদায়া, ২:৩৫৯, ২:৩৯৯]

গর্ভবতী অবস্থায় তিন তালাক

জিজ্ঞাসাঃ এক ব্যক্তির স্ত্রী আট মাসের গর্ভবতী। এমতাবস্থায় তার স্বামী কথা প্রসঙ্গে তার স্ত্রীকে তিন তালাকে বাইন দিয়েছে। এ অবস্থায় তাদের শরী'আত অনুযায়ী করণীয় কি?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর তিন তালাক পড়ে উক্ত স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। সুতরাং, গর্ভবর্তী স্ত্রীর বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার খোরপোষ এবং মোহরানা দাবী বাকী থাকলে তা পরিশোধ করে দেয়া ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য। শর'ঈ হালালা ব্যতীত উক্ত স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করার আর কোন পথ নেই। উল্লেখ্য, অনেকে

মনে করে থাকে যে, গর্ভ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পড়ে না; অথবা রাগ হয়ে তালাক দিলে তালাক পড়ে না কিংবা স্ত্রীকে না শুনিয়ে বা স্বাক্ষী রেখে তালাক দিলে তালাক পড়ে না -এসবই ভুল ধারণা। বরঞ্চ উল্লেখিত সব ক্ষেত্রেই তালাক পড়ে যায়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:২৫১ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৪৯ বাদায়েয়ুস সানায়ে, ৩:১৮৭ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৯:২৫৯]

ঝগড়ার সময় তিন তালাক দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আজ থেকে ৫ বছর আগে আমার স্বামী আমাকে বিয়ে করে। আজ থেকে কয়েক মাস আগে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আমাকে বলেছে- "আমি তোকে এক তালাক দিয়ে দিলাম, তুই বেরিয়ে যা। তোর সঙ্গে এখন আর আমার কোন সম্পর্ক নেই।" একটু থেমে বললঃ "যা তোকে দুই তালাক দিয়ে দিলাম। তোর মুখ দেখাও পাপ, তুই আমার কেউ না।" যা "তোকে তিন তালাক দিয়ে দিলাম। তোকে মুক্ত করে দিলাম, তুই যে দিকে খুশি চলে যা।" এরপর সে চুপচাপ ঘরে ফিরে আসে। একদিন পর বলে-।"রাগের মাথায় কি সব বলেছি, ঐ সব নিয়ে মন খারাপ করো না। এমনটি আর হবে না। আমাকে ক্ষমা করে দাও। এরপর আমরা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করি। কিন্তু কিছু থেকে কিছু হলে সে বলে- তোকে তো কবেই তালাক দিয়ে দিয়েছি। তুই এখনো থাকিস কেন? তুই যাসনা কেন? তুই চলে গিয়ে আমাকে মুক্তি দে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন তার সঙ্গে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক আছে কি-না? কিংবা তালাক হয়ে থাকলে তা বৈধ করার পন্থা কি? আমাদের আড়াই বছরের ১টি পুত্র সন্তানও রয়েছে।

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী আপনার উপর তিন তালাক পতিত হওয়ায় আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক তখনই সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। উক্ত ঘটনার পর থেকে স্বামীর সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা সব কিছুই হারাম হয়েছে। উক্ত তিন তালাকের ঘটনার পরই আপনার পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী ছিল। কেননা- এখন সে আর আপনার বৈধ স্বামী নয়। আপনি তার স্ত্রী নন। উভয় উভয়ের জন্য হারাম হয়ে গেছেন। এখন শর'ঈ হালালা ব্যতীত তার সঙ্গে আপনার ঘর-সংসার করার কোন পথ নেই। শর'ঈ হালালার সুরতঃ স্বামীর সঙ্গে সর্বশেষ দৈহিক মিলনের পর ইদ্দত (তিন ঋতু) পালন শেষ করে, নতুন করে অন্য কারো সাথে আপনার বিবাহ হতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনও হতে হবে। তারপর দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দিলে বা তিনি মারা গেলে, তার তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত পালন করার পর আপনি ও প্রথম স্বামী উভয়ের সম্মতিতে বিবাহের সকল শর্তসহ নতুন করে বিবাহ করলে প্রথম স্বামীর সাথে আপনার ঘর-সংসার করা বৈধ হবে। তাছাড়া তার সঙ্গে ঘর-সংসার করার আর কোন বৈধ পন্থা নেই।

[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ৩:৫২২-২৩ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯:২৯০, ১০:৩৪৬]

হীলা বিবাহ এর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান সমাজে লক্ষ্য করা যায়, স্ত্রীর সাথে ঝগড়া ফাসাদ করে বিবিকে তালাক দেয়। তারপর আবার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে নিতে চায়, তখন হীলার নামে চুক্তি ভিক্তিক কারো নিকট স্ত্রীর বিবাহ হয়। ১ দিন তাকে রেখে বিবাহকারী চুক্তি অনুযায়ী বিবিকে তালাক দেয়, তারপর আগের স্বামী তাকে আবার তার ইদ্দত শেষে বিবাহ করে নেয়। এ বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে কি ? কোন সাহাবী রা. এ ধরণের হীলা বিবাহ

করেছেন কি? এখানে আরেকটি বিষয় হলো, রাগ করে তালাক দিলেন স্বামী আর হীলা দিতে হয় স্ত্রীকে।অন্যায় একজনের, সাজা অন্যজনের কেন?

জবাবঃ তিন তালাকের পর কোন মহিলাকে আগের স্বামীর নিকট পুনরায় বিবাহ বসতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা শরী'আতে নেই বরং এরূপ শর্ত সাপেক্ষে কারো সাথে বিবাহ দেয়া যে- সহবাসের পর এই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিবে এটা শরী'আত সম্মত নয়। বরং এটা লানতের কাজ। হাদীস শরীফে এরূপ হালালা করনেওয়ালা ও করানেওয়ালা উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। অবশ্য নাজায়েয ও গুনায়ের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ এমন করলে আগের স্বামীর জন্য সে স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল হবে এটা ভিন্ন কথা।

আর সাহাবাহে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা-কাজের যথাযথ অনুসরণ-অনুকরণ করতেন। আর তিনি যে কাজ অপছন্দ করতেন সাহাবাগণ রা. তার ধারে কাছেও যেতেন না। সুতরাং যেই কাজের উপর রাসূল ﷺ লানত করেছেন সেই কাজ সাহাবাদের মধ্যে সংঘঠিত হতে পারে না।

স্ত্রী প্রকৃতপক্ষে স্বামীর জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বহু বড় নেয়ামত। আর আল্লাহর বিধান হল যে, যদি কেউ তার নিয়ামতের অবজ্ঞা করে তাহলে তার থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেন। যেই নিষ্ঠুর স্বামী স্ত্রীর সামান্য ত্রুটির কারণে রাগ হয়ে তার স্ত্রীর উপর তিনটি তালাক দিল। অথচ এক সাথে তিন তালাক দেয়া জরুরী নয় বরং এক সাথে তিন তালাক দেয়া হারাম এবং রাগের মাথায় তালাক দেয়া হারাম যদিও তা পড়ে যাবে। সে স্বামী আল্লাহর হুকুম অমান্য করল। আল্লাহ পাক এরূপ নিষ্ঠুর না শোকর স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রীকে হারাম করে দিলেন এটা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর

শাস্তি নয় বরং স্বামীরই শাস্তি। সে প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে বঞ্চিত হলো। তার সংসার নষ্ট হল, সুখ শান্তি শেষ হলো।

ছেলেমেয়ের পেরেশানী ও বদ দু'আ কুড়াল, গালী শুনল এবং শ্বশুর পক্ষের ঝগড়ায় শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। সুতরাং, এটা স্বামীর জন্যে মারাত্মক শাস্তি।

আর শরী'আত স্ত্রীকে তিন তালাকের পর সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে প্রকারান্তরে স্ত্রীকে নির্দেশ দিল যে, যেই নিষ্ঠুর স্বামী তোমার সামান্য অন্যায়টুকু বরদাস্ত করলো না বরং তার তিনটা গুলিই তোমার বুকে মেরে দিল। এরূপ নিষ্ঠুর না শোকর যালিম স্বামীর নিকট তোমার থাকার দরকার নেই বরং তুমি অন্য কোন নেক বান্দার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। [সূরা বাকারা আয়াত ২৩০, মিশকাত ২৮৪]

খোলা তালাক

স্ত্রী কতৃক স্বামীকে ডিভোর্স করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি বিবাহ করেছি দশ বছর হয়েছে। আমার ঘরে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিছুদিন আগে জানতে পারলাম যে, ইতি পূর্বে আমার স্ত্রীর আরেকটি বিবাহ হয়েছিল এবং সে তার পূর্ববর্তী স্বামীকে কোর্টে তালাক দিয়েছে। তার পরই আমার সাথে বিবাহ হয়েছে। আমার প্রশ্ন হল যে, আমার সাথে তার বিবাহ সহীহ হয়েছে কি-না ?

জবাবঃ শরী'আতে তালাক দেয়ার অধিকার একমাত্র স্বামীকে দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক গ্রহণ করার অধিকার দেয়, তাহলে স্ত্রী নিজের উপর স্বামীর দেয়া ইখতিয়ার অনুযায়ী তালাক গ্রহণ করতে পারে। যাকে তালাকে তাফবীয বলা হয়।

স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হয় বা শর'ঈ কোন দোষে দোষী প্রমাণিত হয়, যার ফলে স্ত্রী তার সাথে ঘর-সংসার করতে অপারগ হয়, তাহলে স্ত্রী মুসলিম জর্জের নিকট বা মুফতী বোর্ডের নিকট মুকাদ্দামা দায়ের করবে। তার পর জর্জ বা মুফতী বোর্ড ইসলামের বিধান অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবে। মোটকথা, স্বামীর তালাক দেয়া ছাড়াও বিবাহ বিচ্ছেদের কতিপয় পন্থা আছ। তবে স্ত্রী স্বামীকে কোন অবস্থায় তালাক দিতে পারে না। আর স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেয়া হলেও তা বেকার বলে গণ্য হবে।

এখন আপনার স্ত্রী আগের স্বামী থেকে কিভাবে তালাক নিয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণ জানতে হবে অন্যথায় আপনার সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ জায়েয হয়েছে কি-না, এসব ব্যাপারে ফায়সালা দেয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং, আপনি এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত অবগত করে তারপর হুকুম জেনে নিন।

[প্রমাণঃ সূরা নিসাঃ ৩৪ তাফসীরে রুহুল মা'আনী ৩:২৩ হিদায়া, ২:৩৭৬ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯:৪২ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:৪৩৭, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১:৩২৮]

স্ত্রীর দুধ পান করলে তালাক হবে কি?

জিজ্ঞাসাঃ কোন স্ত্রীর স্বামী পানির পিপাসায় ছটফট করছে। কিন্তু ধারে কাছে কোথাও পানি নেই। থাকলেও পানের অযোগ্য। এ অবস্থায় স্ত্রীর নিজ স্তন থেকে দুধ বের করে স্বামীকে পান করাল, এখন স্বামীর জন্য স্ত্রী কি হারাম হবে ? শরী'আতের হুকুম কি ?

জবাবঃ স্ত্রীর দুধ পান করা জায়েয নাই। বরং গুনাহের কাজ। তবে এতে স্ত্রী হারাম কিংবা তালাক হয় না। প্রশ্নোক্ত জরুরতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর দুধ পান করলে আশা করা যায় গুনাহ হবে না। (হিন্দিয়াঃ ১/৩৪৩)

তালাকের তাফবীয

বিবাহের আগে তালাক প্রদান

জিজ্ঞাসাঃ এক মেয়ের সাথে জনৈক ব্যক্তির ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন সে উক্ত মেয়ের সাথে এই বলে অঙ্গীকার করে যে, যদি আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করি তাহলে সে তালাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, সে এক মসজিদের ইমাম। মসজিদের কিছু সংখ্যক মুসল্লী তার এ ভালবাসা ও অঙ্গীকারের বিষয়টি জানেন। এখন সে অন্যত্র বিবাহ করেছে এবং যে মেয়েকে সে ভালবাসত তার ও অন্যত্র বিবাহ হয়েছে। এমতাবস্থায় এ ইমাম সাহেবের বিবাহ কতটুকু বৈধ হয়েছে? তার এরূপ আচরণের কারণে তার পিছনে মুসল্লীগণের নামায কতটুকু সহীহ হয়েছে এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের উপায় কি? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ কোন বেগনা মহিলার সাথে কোন প্রকার ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয নয়। যদিও তা পর্দা রক্ষা করে করা হয়। বরং তার সাথে কথাবার্তা ও দেখা সাক্ষাৎ ও চিঠি-পত্র আদান-প্রদান করা যিনার অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে তার জল্পনা-কল্পনা অন্তরে স্থান দেয়াও মারাত্মক অপরাধ এটা অন্তরের যিনার মধ্যে শামিল।

প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, সে শর্ত করেছিল উক্ত মেয়েকে বিবাহ না করে অন্য কাউকে বিবাহ করলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু সে উক্ত শর্ত পালন না করে অন্য মেয়েকে বিবাহ করায় তার স্ত্রীর উপর তালাক বায়িন পড়ে গিয়ে উক্ত স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, এখন উক্ত মহিলার সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলা মিশা ঘর-সংসার কিছুই জায়েয নয়। তবে যদি সে পুনরায় বিবাহের সকল শর্ত সহ বিবাহ দোহরিয়ে নেয় তাহলে উক্ত মহিলার সাথে ঘর-সংসার করা জায়েয হবে।

আগেই উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, কোন মহিলার সাথে কোন প্রকার ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা বা অবৈধ সম্পর্ক রাখা হারাম। যদি কেউ এরূপ করে তাহলে সে ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। আর ফাসিকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। সুতরাং, এমন শ্রেণীর কোন লোককে ইমাম নিযুক্ত করা বা তাকে উক্ত পদে বহাল রাখাও নাজায়েয।

সুতরাং, প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যদি উক্ত নাজায়েয প্রেম ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করা হতে তাওবা করে বিরত না থাকে , তাহলে উক্ত ইমামকে বরখাস্ত করে তার স্থানে একজন পরহেযগার আলেমকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দান করা মসজিদ কমিটির জন্য জরুরী। তবে এক্ষেত্রে ইমামকে বরখাস্ত করতে গিয়ে যদি ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়, তাহলে উক্ত ইমামের পিছনে নামায আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে গুনাহর সকল দায়িত্ব ইমামের যিম্মায় থাকবে।

[প্রমাণ: মুসলিম শরীফ ২:৩৩৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১:৩৫ হিদায়াহ ২:৩৮৫, ৩৮৬ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৪১৫ হালবী কাবীর ৫১৩ আল-মাকসূত ১:৪০ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৪:৩৭১]

স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ মাসিক রাহমানী পয়গাম মার্চ ৯৭ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর কলামে দেখতে পেলাম, স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিলেও স্ত্রীর তালাক বেকার হিসাবে গণ্য হবে।

এখন প্রশ্ন হল যদি এটা কোন কাজে না আসে, তবে এ তালাকের অর্থ কি? স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দেয়ার পরেও যদি সে তালাক দিতে না পারে, তবে তালাকে তাফবীয কি কাজে লাগে?

জবাবঃ মাসিক রাহমানী পয়গাম মার্চ ৯৭ সংখ্যা লিখিত মাসআলা সম্পূর্ণ সঠিক। হয়ত আপনার মূল বিষয়টি উপলব্ধি করার ব্যাপারে ব্যতিক্রম হয়েছে। যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিয়ে থাকে তাহলেও স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না। দিলে তা বেকার বলে গন্য হবে। কারণ পুরুষ কখনো তালাক হয় না। কিন্তু যদি স্ত্রী স্বামীকে তালাক না দিয়ে বরং নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণ করে, তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। অতপর ইদ্দত পালন শেষে সে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে। অর্থাৎ তাফবীযের অর্থ- তালাক গ্রহণের অধিকার, তালাক দেয়ার অধিকার নয়। তাই সেক্ষেত্রে স্ত্রী এভাবে বলবেনা যে, তাফবীযের ক্ষমতা বলে আমি তাকে (স্বামীকে) তালাক দিলাম। বরং এভাবে বলবে যে, তাফবীযের ক্ষমতা বলে আমি আমার নফসের উপর তালাক গ্রহণ করলাম। এরপরও পরিষ্কার ভাবে না বুঝলে, কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট সরাসরি জিজ্ঞাসা করে নিন।

[প্রমাণঃ হিদয়া,২:৩৮৪ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১০,৩৩,৩৪]

তালাক শর্তের সাথে মুয়াল্লাক্ব করলে

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি রাগ করে তার স্ত্রীকে বলল- যদি তুমি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে অমুক বাড়ীতে যাও তবে তোমার উপর এক তালাক পতিত হবে। আর যদি উক্ত বাড়ী থেকে কোন কিছু এনে আমার ঘরে রাখ, তবে তোমার উপর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত স্ত্রী এখনো উক্ত বাড়ী থেকে কিছু আনেনি- এমনকি সেখানে যায়ওনি। তবে ভবিষ্যতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এখন স্বামী যদি স্ত্রীকে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়ে অনুমতি প্রদান করে তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি?

জবাব: বর্ণানা মুতাবেক এ মুহূতে স্বামী আগের কথা প্রত্যাহার করে অনুমতি দিলেও কোন লাভ হবে না। কারণ শর্ত সাপেক্ষে তালাক পড়ে যাবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোখনো অনুমতি ব্যতিরেকে অমুকের বাড়ীতে গেলে, তার উপর তালাক পড়বে এবং সে বাড়ী থেকে কোন কিছু আনলে দ্বিতীয় তালাক পড়বে। সুতরাং উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা ব্যতিত তালাক থেকে বাচার কোন ব্যবস্থা নেই।

[প্রামাণঃ মিশকাত শরীফ, ২:২৮২ হিদায়াহ, ২:৩৮৫ দারুল উলূম ১০:৮৯, ১০:৫৫ মাহমূদিয়া ১০:৪০৯]

স্বামী স্ত্রীকে বলল তোর ভাইয়ের সাথে কথা বললে তুই তালাক

জিজ্ঞাসাঃ আমার বড় ভাই একদিন তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে বলেছে- তোর ভাইয়ের সাথে কোন দিন দেখা করলে ও কথা বললে, তুই তালাক হয়ে যাবি। এই কথার পর তার স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে দেখাও করেছে এবং কথাও বলেছে। এখন তার কি হবে?

জবাবঃ যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কোন শর্তের উপর তালাক দেয়, তাহলে যখন শর্ত পাওয়া যাবে, তখন উক্ত স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। বর্ণনা মতে, যেহেতু শর্ত পাওয়া গিয়েছে সেহেতু তার উক্ত স্ত্রীর উপর এক তালাক রাজ'ঈ পড়েছে। তবে ইদ্দতের ভিতর মৌখিকভাবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। ইদ্দত পালন হয়ে গেলে বিবাহের সকল শর্ত সহ দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তাকে বরণ করে নিতে পারবে। হালালার প্রয়োজন হবে না।

[প্রমাণঃ হিদায়া২:৩৮৫ দারুল উলূম, ১:৬১,৬৩,৯১ আলমগীরী ১:৪২০ হিদায়া২:৩৯৫]

واذا اضافه الي شرط وقع عقيب الشرط الهدايه \

শর্ত সম্বলিত তালাকের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমি আমার স্ত্রীকে শর্ত দিয়েছিলাম যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পর পুরুলের সাথে সাক্ষাত করেত পারবে না। যদি তা কর, তাহলে তোমার উপর এক তালাক হবে। সুতরাং, বেপর্দায় কস্মিনকালেও চলাফেরা করবে না। উল্লেখ্য যে আমি পরপুরুষের সামনে কেবলমাত্র স্ত্রীর হাতার কব্জা ও টাখনুর নীচের অংশটুকু দেখানোর অনুমতি দিয়েছিলাম। সুতরাং, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আমার স্ত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরের কোন অংশ পর পুরুষকে দেখায়, তাহলে শরী'আতের ফয়সালা কি?

জবাবঃ বর্ণনা মুতাবিক আপনার স্ত্রী যদি তার শরীরের কোন অংশ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন পর পরুষকে দেখায়, তাহলে আপনার স্ত্রীর উপর এক তালাকে রাজ'ঈ পড়ে যাবে। এক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়সীমার ভিতরে আপনার জন্য তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি উক্ত সময়ের মাঝে রাজা'আত না করেন অর্থাৎ তার আগের কথা প্রত্যহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেন তাহলে বিবাহের সকল শর্তসহ বিবাহ দোহরানো ব্যতিত উক্ত স্ত্রী আপনার জন্য হালাল হবে না। উল্লেখ্য যে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে তার ভরণ-পোষণ দিতে হবে। আর মোহর আদায় করে না থাকলে তাও আদায় করে দিতে হবে। আরও উল্লেখ্য আপনি স্ত্রীকে তার হাত ও পায়ের একাংশ পর পুরুষের সামনে খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছেন এটা সহীহ নয়। ফিৎনার যমনায় ঐসব অংশ ঢেকে রাখা কর্তব্য।

[প্রমাণ: হিদায়াহ, ২:৩৮৫/২:৪৪৩]

শর্তের সাথে তালাকের দিলে

জিজ্ঞাসাঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আমার অনুমতি ব্যতীত আমার বাড়ী আসতে পারবে না। যদি আস তাহলে তালাক বলে গণ্য হবে। স্বামী তাকে একথা বলেনি যে তোমাকে তালাক দিলাম। এছাড়া এ অঙ্গীকার তিনজন লোকের সামনে লিখেছিল। কিন্তু ঐ চিঠি স্ত্রীর হাতে পড়ে নাই এবং স্ত্রী অনুমতি নিয়ে স্বামীর বাড়িতে আসে। এ ব্যাপারে শর'ঈ ফায়সালা জানতে ইচ্ছুক?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে, উক্ত স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হয়নি। কারণ যে শর্তের সাথে তালাকের সংশ্লিষ্ট করেছিল, সে শর্ত (অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে স্বামীর বাড়ীতে আসা) পাওয়া যায়নি। সুতরাং কোনরূপ তালাকও পড়েনি বিধায় উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে কোন অসুবিধা নেই।

(হিদায়াঃ ২/৩৮৫)

যিহার

নিজ স্ত্রীকে মা বলে ডাকা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কেউ রাগের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে মা ডেকে ফেলে, তবে শরী'আতের ফয়সালা কি? তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে কি না ?

জবাবঃ রাগের বশবতী হয়ে স্ত্রীকে মা ডাকতে স্ত্রীর উপর কোন প্রকার তালাক পড়বে না। স্বামী সেই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে স্ত্রীকে মা বলা কোন জ্ঞানীর জন্য শোভা পায় না। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ। সুতরাং, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবে। বলে থাকলে তাওবা করে নিবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রশীদিয়া, ৪৬৪]

স্ত্রীকে মা ডাকা এবং তার বুকের দুধ পান করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার স্বামী একদিন হঠাৎ আমাকে মা বলে ডাক দেয়। এমন কি আমার বুকের দুধ খেয়ে ফেলে। এখন আমাদের কি করণীয় আছে ?

জবাবঃ স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে মা বলাতে স্ত্রীর উপর কোন প্রকার তালাক পড়ে না এবং স্ত্রী হারামও হয় না। তবে স্ত্রীকে মা বলায় অন্যায়। এর জন্য তাওবা করবে এবং ভবিষ্যত আর কখনো এরূপ বলবে না।

আড়াই বছর বয়সের মধ্যে মহিলার দুধ পান করলে তার সাথে দুধের সম্পর্ক কায়েম হয়। কাজেই প্রশ্নে বর্ণিত দুধ পান দ্বারা দুধের এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় নাই। যা দ্বারা দুধছেলে বা দুধমেয়ে বলা যায়। সুতরাং, এতে আপনার বিবাহ বন্ধন নষ্ট হবে না। তবে এ কাজে আপনার সম্মতি না থাকলে আপনার স্বামী, আর আপনার সম্মতি থাকলে এর দ্বারা আপনারা দু'জন গুনাহগার হয়েছেন। সুতরাং আপনাদের তাওবা করা জরুরী। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩:২২৪]

ইদ্দত

ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলার স্বামী ইন্তেকালের পর ঐ মহিলা ৪ মাস যদি ইদ্দত পালন না করে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে তার এ বিবাহ শুদ্ধ হবে কি না?

জবাবঃ গর্ভবতী না হলে, কোন মহিলা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ৪ মাস ১০ দিনের আগে অথবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়ার আগে অর্থাৎ ইদ্দত পালন না করে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বসে, তাহলে তার বিবাহ সহীহ হবে না। [প্রমাণঃ রদ্দুল মহুতার ৩:৫১৯]

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামীর বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ কোন লোকের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ঐ লোক কতদিন পর বিবাহ করতে পারবে? আর যদি শালীকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে কতদিন পরে বিবাহ করতে পারবে?

জবাবঃ পুরুষ লোকের কোন ইদ্দত নেই। সুতরাং কোন পুরুষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পরেই ঐ পুরুষ কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে। শালীকে বিবাহ করতে চাইলেও এ হুকুম। তেমনি ভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরপরই অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। তবে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর শালীকে বিবাহ করতে চাইলে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর করতে হবে। [প্রমাণঃ আদ্দুরুল মুখতার ৩/৫০৩]

ইদ্দতের সময় সাজসজ্জা ত্যাগ করা জরুরী

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে, যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায়, তবে তার দেহের সমস্ত অলংকারাদি এমনকি নাকফুল পর্যন্ত

খুলে ফেলতে হয় এবং সকল প্রকার সাজসজ্জা ত্যাগ করতে হয়। পুনরায় সে আর তা ব্যবহার করতে পারে না। শরী'আতে ওর হুকুম কি?

জবাবঃ বিধবা স্ত্রীলোক ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ গর্ভবতী হলে, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত; গর্ভবতী না হলে ৪ মাস ১০ দিন পর্যন্ত) ঐ ঘরেই ইদ্দত পালন করবে, যে ঘরে স্বামীর মৃত্যুর সময় সে বসবাস করতো। ঐ ঘর থেকে খাওয়া-দাওয়া, উযু-গোসল ইত্যাদি জরুরত ব্যতীত কখনও বের হতে পারবে না। তবে শর'ঈ উযর দেখা দিলে বের হতে পারবে। যেমনঃ মারাত্মক অসুখের কারণে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের নিকট যেতে পারবে ইত্যাদি। আর ঐ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মৃত স্বামীর স্ত্রী সব ধরণের সৌন্দর্য, অলংকারাদি, রেশমী কাপড়, গাঢ় লাল রঙ, কুসুমী রং, গোলাপী রং, ইত্যাদি রং-এর কাপড়-চোপড় পরিহার করবে। এটা তার স্বামীর বিরহের শোক পালনের জন্য নির্ধারিত নিয়ম। তবে এ সকল কাপড়-চোপড় অনেক পুরাতন হয়ে থাকলে, ব্যবহার করতে পারবে। অনুরূপভাবে সুরমা, তৈল, লিপিস্টিক ও খুশবু ইত্যাদি পরিহার করবে। তবে শর'ঈ উযর বশতঃ সুরমা ও তৈল ব্যবহার করতে পারবে। যেমনঃ চোখে ব্যথা হলে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। মাথা ব্যথা করলে তৈল ব্যবহার করতে পারবে। উল্লেখিত নির্দিষ্ট দিনের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী শরী'আত সম্মত এ সকল সৌন্দর্য গ্রহণ বা ব্যবহার করতে পারবে। তখন নাকফুল ব্যবহারেও কোন দোষ নেই। উল্লেখ্য, বর্ণিত হুকুমটি বিধবার জন্য খাস নয় বরং তালাকে বায়েন বা তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের বেলায়ও প্রযোজ্য। [ফাতাওয়া রাহীমিয়া, ৫: ৩৯৯ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৮:১৫৯]

তালাকের বিবিধ মাসাইল

অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কেউ যদি নিজ স্ত্রী থাকা অবস্থায় উক্ত স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসজাত ছেলের বিবির সাথে অপকর্ম করে, তবে তার স্ত্রী তালাক হবে কি-না এবং তার ছেলের বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে কি-না?

জবাবঃ যদিও এটা হারাম ও যিনা এবং মহাপাপ। এর জন্য ইসলামী হুকুমাতে পাথর মেরে এমন অপরাধীকে হত্যা করার বিধান আছে। আর ইসলামী হুকুমাত না থাকলে সমাজের দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে এরূপ অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার এবং তাদের তাওবা করা জরুরী। আর উভয় পরিবারে যেন প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে পর্দা রক্ষা করে চলতে পারে, সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। তবে এর জন্য তার স্ত্রী হারাম হবে না এবং তার স্ত্রীর ছেলের বিবিও হারাম হবে না। [রুদ্দুল মুহতার ৩:৩২]

তালাক দেয়ার পর একত্রে বসবাস করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লিখিতভাবে তালাক দেয়ার পর তারা উভয়ে একত্রে বসবাস করছে এবং যৌন সম্ভোগও করছে। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

জবাবঃ কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে লিখিতভাবে তালাক প্রদান করে, তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। স্বামী যে কয় তালাক দিবে, স্ত্রীর উপর ঐ ক' তালাকই অর্থাৎ এক/ দুই/ তিন তালাক পতিত হবে। আর স্বামী যদি তালাকের সংখ্যা উল্লেখ না করে, শুধু তালাক শব্দ লিখে দেয়, তাহলে স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে।

এখন তালাকের হুকুম লক্ষ্য করুনঃ

(ক) যদি এক তালাক বা দুই তালাক দেয় এবং উক্ত তালাকের সাথে বায়িন ইত্যাদি শব্দ সংযুক্ত না করে, তাহলে স্ত্রীকে ইদ্দতের ভিতর মৌখিকভাবে গ্রহণ করলেই চলবে। বিয়ে দোহরানো বা হালালা করার প্রয়োজন হবে না। তবে ইদ্দত চলে গেলে, বিয়ের সকল শর্তসহ বিয়ে দোহরানো জরুরী।

উল্লেখ্য, বর্ণিত এক তালাক বা দুই তালাক জমা থাকবে। এখন স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে গিয়ে ভবিষ্যতে আর কখনো তালাক দিলে এ তালাক সেই এক/ দুই তালাকের সাথে সংযুক্ত হবে এবং তার হুকুম বর্নিত হবে।

(খ) উক্ত এক তালাক বা দুই তালাকের সাথে যদি বায়িন বা এ ধরণের কোন শব্দ যোগ করে, তাহলে স্ত্রীর উপর এক/ দুই তালাকে বায়িন পড়বে এবং সেক্ষেত্রে ইদ্দতের ভিতরে বা পরে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে সকল শর্তসহ বিয়ে দোহরানো ছাড়া স্ত্রীকে গ্রহণ করার কোন পথ নেই।

(গ) আর যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলে, চাই এক সাথে বা আলাদা করে বলুক এবং চাই উক্ত তালাকের সাথে বায়িন বলুক বা নাই বলুক, তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক মুগাল্লাযা পড়ে যাবে। উক্ত স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। শর'ঈ হালালা ব্যতীত উক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করার আর কোন পথ নেই। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৯:১৭১]

স্বামীকে কাফির ও হারামী বলা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক স্ত্রী ঝগড়ার সময় তার স্বামীকে বললো, তুমি কাফির, হারামী। এইরূপ বলার পর উক্ত স্ত্রী তার স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে কি-না? বা তাদের বিবাহে কোন প্রকার ত্রুটি হয়েছে কি-না?

জবাবঃ স্ত্রী উক্ত কথা বলার দ্বারা তার উপর কোন প্রকার তালাক পড়ে নাই। সুতরাং, স্বামী তার উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। তবে স্ত্রী এইরূপ কথা বলার দরুণ তাকে তাওবা করতে হবে। কারণ- কোন মুসলমানকে কাফির বলা হারাম। তেমনিভাবে বিনা দলীলে হারামী বলা অপবাদ হওয়ার কারণে এটাও তার জন্য হারাম। বিশেষ করে স্বামী ইযযত-সম্মানের পাত্র। যে কোন বিষয়ে কথা কাটাকাটি বা মনোমালিন্য হতে পারে। কিন্তু তার জন্য স্বামীকে গালি দেয়া যাবে না। কারণ- গালী দেয়া শরী'আতে সম্পূর্ণ হারাম। বিশেষতঃ স্বামীর ইযযত রক্ষা করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব।

পিতা-মাতার অবাধ্য স্ত্রীর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমি বিয়ে করেছি বিগত কয়েক মাস পূর্বে। আমার স্ত্রী বিয়ের পর থেকে আমার আব্বা ও আম্মার কথা শুনছে না। এমন কি আমার খুমন যেভাবে চায়, সেভাবেও চলছে না। কয়েক বার বিচার করার পরও সে শুধু ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছে। কয়েকবার ক্ষমা করা হয়েছে। তারপরও ঠিক হচ্ছে না। আমি এখন স্ত্রীর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি?

জবাবঃ বৈধ কাজে স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর যিম্মায় ওয়াজিব। স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেও মুরব্বী হিসাবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর খেদমত করাও ভাল। তবে স্ত্রীকে তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর খেদমতে বাধ্য করার অধিকার স্বামীর নাই। সুতরাং, আপনার আনুগত্যের জন্য বার বার বুঝানোর পরেও যদি আপনার সহীহ বুঝ বা পরামর্শ না মানে, আপনার পিতা-মাতার মান ইযযত রক্ষা করছে না, সে জন্য ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হল, প্রথমে তাকে কুরআন-হাদীস দ্বারা তার কর্তব্য ও ভুল দিক বুঝিয়ে দিন। আপনি নিজে না পারলে কোন আলেমের সহযোগিতা নিবেন। এ নসীহতেও কাজ না হলে আপনি তার থেকে

বিছানা পৃথক করবেন। এটেও কাজ ণা হোলে হালকা শাস্তিও দিতে পারেন। এতেও কাজ না হলে উভয় পক্ষের দু'জন মুরব্বীকে বসিয়ে তাদের মাধ্যমে ঘটনা নিষ্পত্তি করে নিন। এতেও ফায়দা না হলে তালাক দেয়া আপনার জন্য বৈধ হবে।

তালাক দেয়ার নিয়মঃ স্ত্রী যখন পবিত্র থাকবে অর্থাৎ হায়েয শেষ হয়ে পাক হবে এবং আপনি তার থেকে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকবেন, তখন শুধু ১টি তালাক দিবেন এ কথা বলে যে, আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম। এর সাথে বায়েন ইত্যাদি বলবেন না। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর খোরপোষ ও মোহরান দাবী আদায় করে নিবেন। এ সুরতে ইদ্দতের ভিতরে বা পরে যদি স্ত্রী অনুতপ্ত হয় বা সংশোধন হয়ে আপনার নিকট থাকতে চায়, আর আপনিও গ্রহণ করতে চান, তাহলে সহজে তা করতে পারবেন।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৯:৩৮-৩৪/ রদ্দুল মুহতার/ নফউল মুফতী, ৩৪০]

দস্তখত দ্বারা তালাক

জিজ্ঞাসাঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হওয়ায় উভয় পক্ষের অভিভাবক এসে তাদেরকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য চাপ দেয় এবং উভয়ের নিকট হতে শুধু দস্তখত নিতে নেয়। তবে মুখে তালাক সম্পর্কিত কিছু উচ্চারণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ হবে কি-না?

জবাবঃ জিজ্ঞাসায় বর্ণিত পন্থায় দস্তখত নেয়ার দ্বারা স্ত্রী তালাক হবে না। কেননা, তালাকের জন্য স্বামীর মুখে 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করা অথবা লিখে দেয়া জরুরী। আর এখানে উক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্য হতে কোন

একটিও পাওয়া যায়নি। [প্রমাণঃ আল-বাহরুর রায়িক্ব ৩:২৪৬ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:৩৮৪]

তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি দীনের উপর পুরোপুরি ভাবে না থাকা একজন মহিলাকে বিবাহ করল। অতঃপর সে সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও তাকে দীনের পথে আনতে না পেরে অবশেষে উক্ত মহিলাকে তালাক দিয়ে দিল। এরপর কনে পক্ষের লোকজন মানুষের বিভিন্ন সমালোচনার কারণে উক্ত মহিলাকে আবার তালাকদাতা স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে দিতে চায়। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

জবাবঃ উক্ত ব্যক্তি যদি তাকে স্পষ্ট ভাষায় এক তালাক অথবা দুই তালাক দিয়ে থাকে, তাহলে ইদ্দত শেষ হয়ে থাকলে, বিবাহের সকল শর্তসহ বিবাহ দোহরানো দ্বারা তার সাথে ঘর-সংসার করা যাবে। হালালার প্রয়োজন হবে না। এক তালাক বা দুই তালাক বায়েন দিয়ে থাকলেও এই একই হুকুম। কিন্তু যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে থাকে তাহলে বায়েন বলে থাকুক বা নাই বলে থাকুক, শর'ঈ হালালা ব্যতীত উক্ত স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার আর কোন পথ নেই।

[সূরা বাকারাহ, ২৩০ হিদায়াহ, ২:৩৯৯]

কুরআন হাতে নিয়ে স্ত্রীকে শাস্তি না দেয়ার কসম করা ও কসম ভঙ্গের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মারধোর করে বেহাল অবস্থা করে ফেলানোর পর কুরআন হাতে নিয়ে বলেছে- "আমি যদি আর কখনো তোমার গায়ে হাত তুলি, তাহলে আমি আমার মায়ের সঙ্গে যিনা করি"।

উপরোক্ত অঙ্গীকারের পরেও সে যখন তখন তার স্ত্রীকে অমানুষের মত মারধোর করছে। এমন ব্যক্তির জন্য ইসলাম কি বিধি-বিধান আরোপ করেছে এবং তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে কি না?

জবাবঃ কুরআন হাতে নিয়ে অঙ্গীকার করা কসম গন্য করা হয় না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী কুরআন নিয়ে অঙ্গীকার করা স্বামীর জন্য কসম হয় নাই।[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ১৪:৩১৫ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের]

স্ত্রীকে মারধোর করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কোন ভাল মানুষ তা করতে পারে না। স্ত্রীর অপরাধের কোন এক পর্যায় শরী'আত প্রহারের অনুমতি দিলেও মহানবী ﷺ তার কোন ভদ্র উম্মতের জন্য এটা পছন্দ করেন নি। তাই এমন ব্যক্তিকে কোন ক্রমই ভদ্র বলা যায় না। বরং সে মস্তবড় জালেম। কারো ভাগ্যে এমন স্বামী পড়ে গেলে, তাকে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। বিশেষতঃ স্বামীর মন মেযাজের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে এগুতে হবে।

বর্ণানুযায়ী কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে স্বামী যে উক্তি করেছে, এমন উক্তি অবাঞ্ছিত। এর জন্য তাওবা করতে হবে এবং আর কখনো এমন উক্তি করবে না।

কোন আলেমকে গালী দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি কোন আলেমকে গালী দেয়, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হবে কিনা?

জবাবঃ কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে বিনা কারণে অন্যায়ভাবে গালিগালাজ করলে ঈমান হারা হয়ে যায় না। ঈমানদার থাকে। তবে

গুনাহগার হয়। হুযুর ﷺ বলেছেন - কোন মুসলমানকে গালী দেয়া বা সমালোচনা করা ফাসিকী কাজ এবং ঝগড়া হানাহানী করা কুফুরী কাজ। [বুখারী শরীফ ১:১২]

পক্ষান্তরে শুধুমাত্র আলেমে দীন ও ইলমে দীনের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অবজ্ঞা ঘৃণা তাচ্ছিল্য ও তিরস্কার সূচক মনোভাব নিয়ে কোন আলেমকে গালী দিলে গালীদাতার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুনতাদ বেঈমান সাব্যস্ত হবে। নতুনভাবে কালিমা পড়ে এরূপ ব্যক্তির ঈমান দোহরাতে হবে। বিবাহিত হলে ঈমান গ্রহনের পর তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নতুন ভাবে পুণঃ স্থাপন করা জরুরী হবে। তেমনিভাবে আগে ফরজ হজ্জ করে থাকলে তা আবার দোহরাতে হবে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ১:৩৯ আল-আশাবাহ ওয়ান্নাযায়ির]

শ্বাশুরীর সাথে যিনা করলে

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে শ্বাশুড়ীর সাথে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে কি-না?

জবাবঃ কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, অথবা কামভাব সহকারে তার যৌনাঙ্গের ভিতরাংশের দিকে তাকায়, তখন এই পুরুষের জন্য উক্ত মহিলার মাকে বা মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। আর পূর্ব থেকেই যদি বিবাহ করে থাকে, তাহলে সেই স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।সুতরাং শ্বাশুড়ীর সাথে যিনা কারণে তার আপন স্ত্রীও তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। আর কোনদিন হালাল হবে না। এখন মাসআলা জানার পরই তাদেরকে পৃথক হয়ে যেতে হবে এবং শ্বাশুরীর সাথে যিনা করার পরই তাদের স্বামী- স্ত্রী হিসাবে যতদিন দেখা-সাক্ষাৎ, মিল-মিশ হয়েছে

এ সবই নাজায়েয ও যিনা হয়েছে। পৃথক হওয়ার পর ইদ্দত পালনের পর উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ২:৩০৯ আহসানুল ফাতাওয়া, ৫:৪৫৪ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৭:৩২৭ ইমদাদুল মুফতী]

শালিকার সাথে যিনা করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি নিজের স্ত্রী থাকাকালীন স্ত্রীর বোনের সাথে অবাধে মিলামিশা করে। এমনকি তার সঙ্গে সহবাসও করে। আমি কয়েকজনে আলেমের নিকট শুনেছি যে , এতে তার স্ত্রী তালাক হবে। আবার কেউ বলেন তালাক হবে না, যিনার গুনাহ হবে, কোন কথাটা কতটুকু সঠিক - কুরআন ও হাদিসের আলোকে জানতে চাই।

জবাবঃ শালিকার সঙ্গে যিনা করায় যিনাকারীনী উভয়ে মারাত্মক গুণাহগার হয়েছে। সে জন্য উভয়কে খালিছ দিলে তাওবা করতে হবে। এবং পর্দার হুকুম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কোন অবস্থাতে ঐ মেয়ের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা যাবে না। তবে এ অন্যায়ের কারণে ঐ ব্যক্তির বৈধ স্ত্রী তালাক হবে না। অবশ্য শালিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকার পর শালিকার এক হায়েয শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকতে থাকবে। তার পরে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা সব কিছু জায়েয হবে।

[প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৩:৩৪ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৭:৫০২]

লেন-দেন, ব্যবসা- বাণিজ্য

ডলারের ব্যবসার শর‘ঈ হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে ব্যবসা করার জন্য সিঙ্গাপুরে যায় এবং সেখান থেকে ডলার কিনে নিয়ে আসে। সেই ডলার বাংলাদেশের লোকদের নিকট নব্বই টাকা অথবা কিছু কম বা বেশী টাকায় বিক্রি করে। তাতে অনেক সময়ই লাভ হয়, আবার লোকসানও হয়। শরী‘আতের দৃষ্টিতে এভাবে ব্যবসায় করা বৈধ কি-না?

জবাবঃ দেশী নোট থেকে বিদেশী নোট ভিন্ন ধরনের হওয়ার কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে তা কম-বেশী করেও বেচা কেনা করা জায়েয। যেমন এক ডলার দিয়ে কেউ বাংলাদেশী ১২০ টাকা গ্রহণ করলো, এটা জায়েয। এক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয়ের সময় অন্ততঃ এক পক্ষের টাকা হস্তগত হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে সিঙ্গাপুরে থেকে ডলার কিনে এনে এদেশীয় টাকায় কম-বেশীতে ব্যবসা করা জায়েয । স্মর্তব্য যে, সরকারী বৈধ আইনের প্রতি লক্ষ্য রাখাও কর্তব্য। তাই ডলার ক্রয়-বিক্রয়ের সরকারী নিয়ম কানুনের প্রতিও খেয়াল রাখা চাই ।

তবে একই দেশের টাকার লেন-দেনের বেলায় কম-বেশী করা যাবে না। যেমন- বাংলাদেশী ১০০ টাকার নোট নিয়ে কেউ ৯০ টাকা গ্রহণ করলো, এটা জায়েয নয়। দেশী ছেঁড়া বা ত্রুটিপূর্ণ টাকা পরিবর্তন করাও বেচা-কেনার মধ্যে শামিল । সুতরাং ১০০ টাকার ছেঁড়া নোট দিয়ে ৯০ টাকা গ্রহণ করা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। এজন্য উভয়ে গুনাহগার হবে। সুতরাং, উক্ত নোটের বদলে ১০০ টাকাই ফেরত নিতে হবে ।

(প্রমাণঃ জাওয়াহিরুল ফিকহ ৪:৩৪৭, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ২:২৩২, মাজাল্লাতু ফিকহিল ইসলামী, ৪: ৬০০)

দায়িত্বে অবেহেলাকারীর চাকুরীর টাকা দিয়ে ব্যবসা করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি চাকুরীতে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তার বেতনের টাকা দিয়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে আমার জন্য ব্যবসা করা জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ আপনার জন্য উক্ত চাকুরীজীবির বেতনের টাকা দ্বারা লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা করা জায়েয হবে এবং ব্যবসায় অর্জিত লভ্যাংশ আপনার নিজের কাজে ব্যয় করা সম্পূর্ণভাবে জায়েয ও হালাল হবে। কিন্তু উক্ত চাকুরীজীবির লভ্যাংশের সম্পূর্ণ টাকা তার জন্য হালাল হবে না। বরং সে ব্যক্তির বৈধ বেতনের টাকার লভ্যাংশই কেবল তার জন্য হালাল হবে। তার জন্য উচিত, যে পরিমাণ ডিউটি ফাঁকি দিয়েছে, সে পরিমণ টাকার মূল মালিককে ফিরিয়ে দেয়া। ফিরিয়ে দেয়া একান্ত সম্ভব না হলে, সাওয়াব পৌছানোর নিয়্যতে তার পক্ষ থেকে সেই পরিমাণ টাকা গরীব-মিসকিনেকে দান করে দিবে। কারণ, চাকুরীতে পুরাপুরি ডিউটি না করে পুরা বেতন নেয়া তার জন্য জায়েয হয়নি। এতে নিজের হালাল মালের সাথে হারাম মাল মিশ্রিত হয়ে গেলে প্রবল ধারনা অনুযায়ী হারামের পরিমাণ ঠিক করে তার আসল মালিককে ফিরিয়ে দেয়াই শরী'আতের নির্দেশ । নতুবা হারাম মাল হালাল মালকে ধ্বংস করে দিবে।

(প্রমাণঃ জাদীদ মাসাইল ২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫:৩৪৯)

বাকীতে বেশী দামে বিক্রয়

জিজ্ঞাসাঃ আমরা কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি সমিতি করেছি। সদস্যগণের মাসিক চাঁদা বিশ টাকা। প্রতি মাসের সঞ্চয়ের টাকা আমরা বিনিয়োগ করে থাকি। বিনিয়োগের পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, বিনিয়োগ

গ্রহণকারী বাজার থেকে তার পছন্দনীয় দ্রব্যটি সমিতিকে দিয়ে নগদ মূল্যে ক্রয় করিয়ে সেখানেই সে বাকীতে নির্দিষ্ট মেয়াদে সমিতি থেকে বেশী মূল্যে কিস্তিতে ক্রয় করে থাকে। বিনিয়োগের এই পদ্ধতি জায়েয হবে কি-না ? এর সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ বিনিয়োগ গ্রহণকারী বাজার থেকে তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য নিজে না কিনে সমিতির লোকদের মাধ্যমে ক্রয় করিয়ে তাদের হেফাজতে নেয়ার পর সমিতি হতে পুনরায় নতুনভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বাকীতে কিছু বেশী মূল্য ক্রয় করলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা জায়েয আছে। ক্রেতা বিক্রয়মূল্য চাই এক সাথে পরিশোধ করুক বা কিস্তিতে পরিশোধ করুক এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে সমিতির লোকজন উক্ত মাল খরিদ করে নিজ দায়িত্বে না নিয়ে যদি বিনিয়োগ গ্রহণকারী নিকট তথা অন্যের নিকট বাকীতে বেশী দামে বিক্রি করে তাহলে তা জায়েয হবে না।

(প্রমাণঃ হিদায়াহ ৩:৪৫, আযীযুল ফাতাওয়া ৬৩৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪০)

কিস্তিতে মেশিন ক্রয় করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করতে চাই। কিন্তু, অর্থ সংকটের দরুণ একবারে টাকা দিয়ে ক্রয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কিস্তিতে বাটার ফ্লাই কোম্পানী থেকে ক্রয় করা জায়েয হবে কি-না? উল্লেখ্য যে, নগদ ক্রয় থেকে কিস্তিতে করলে মূল্য বেশী দিতে হয়।

জবাবঃ বাজার দরের চেয়ে বেশী টাকা দিয়ে কিস্তিতে জিনিষ ক্রয় করা জায়েয আছে। তবে যদি বিক্রয়ের সময় শর্ত স্বরূপ এমন বলে যদি এক মাসের বাকীতে নেন তাহল ৩০০০/= (তিন হাজার টাকা)। আর তিন মাসের বাকীতে নিলে ৩৫০০/= (তিন হাজার পাঁচশত টাকা)। অথবা

বিক্রয়ের সময় যদি বলে বাকীতে ৩৫০০/= আর নগদ নিলে ৩০০০/= টাকা। অতঃপর ক্রেতা মাল নিয়ে গেল। অথচ বাকীতে, না নগদ নিল, ১ মাসের বাকীতে নিল না তিন মাসের বাকীতে নিল তা সিদ্ধান্ত করে মূল্য চূড়ান্ত করে মাল নিয়ে নেয়, তাহলে তা জায়েয হবে। যেমন, সিদ্ধান্ত হলো যে, এ জিনিষ বাকীতে এত টাকা মূল্যে বিক্রয় হবে এবং ক্রেতা তাতে সম্মতি প্রকাশ করলে উক্ত লেন-দেন বৈধ হবে। যদিও তা নগদের চেয়ে বেশী মূল্য হয়। সুতরাং, আপনি চুক্তিভিত্তিক মূল্য চূড়ান্ত করে বেশী মূল্যে বাটার ফ্লাই মেশিন বা অন্য কোন জিনিস কিস্তিতে ক্রয় করতে পারেন।

(প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৩:১৩৬, তিরমীযী হাদীস নং ১৩৩১)

বাকী টাকা গাভী ক্রয় করে দুধের দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা

জিজ্ঞাসাঃ সমিতির পক্ষ থেকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার বিনিময়ে গাভী ক্রয় করে কোন ব্যক্তিকে দেয়া হলো যে, প্রতিদিন সকাল বিকাল আশি টাকা লিটার হিসেবে দুধ দিয়ে গাভীর টাকা পরীশোধ করবে। উল্লেখিত সুরত শরী‘আত সম্মত কি-না?

জবাবঃ আপনি গরু বিক্রির যে সুরত উল্লেখ করেছেন যে, গাভীর নির্দিষ্ট দাম ঠিক করে বাকীতে বিক্রি করার পরে ক্রেতার নিকট থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে নিদিষ্ট পরিমাণ দুধ দিয়ে গাভীর মূল্য পরিশোধ করবে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শরী‘আত সম্মত নয়। কেননা, শরী‘আতে এমন শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ। যাতে ক্রেতা বা বিক্রেতার অতিরিক্ত ফায়দা হাসিল হয়। আপনাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেহেতু এমন শর্ত আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমান দুধ দিয়ে মূল্য পরিশোধ করবে। অথচ বাজারে এক লিটার দুধের মূল্য আশি টাকার কম বেশী হতে পারে। অতএব, আপনাদের উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না।

তবে ক্রেতার কাছ থেকে বৈধভাবে কিস্তিতে টাকা গ্রহণ করতে চাইলে প্রতিদিন বা প্রতিমাসে কত টাকা দিতে হবে তা নির্ধারিত করে দিবে। তারপর যদি ক্রেতা টাকার পরিবর্তে বাজারদর হিসেবে দুধ দিয়ে কিস্তি শোধ করে, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তাতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩:৩৩২)

কিস্তি আদায়ে দেরী করলে

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের একটি সমিতি থেকে কোন মালের মূল্য কিস্তিতে আদায় করার ভিত্তিতে বাকীতে বিক্রয় করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় কিস্তি ঠিক মত আদায় করে না। ২/৩ মাস দেরী করে ফেলে। এতে করে সমিতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এখন দেরী বন্ধে কোন ধরণের ব্যবস্থা নেয়া যায়?

জবাবঃ অনাদায়ী কিস্তিগুলোতে নতুনভাবে লাভ কিংবা জরিমানা নেওয়া যাবে না। বরং যারা প্রকৃত সংকটের কারণে সময়মত কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছে না তাদেরকে সংকট শেষ হওয়া অবধি সুযোগ দেওয়া আপনাদের জন্য কর্তব্য। আর যারা বিনা কারণে সময় মত পরিশোধ করে না তাদের উপর সামাজিক ভাবে বৈধ কোন চাপ প্রয়োগ করে তাদের থেকে টাকা আদায় করা যাবে।

অবশ্য সক্ষম হয়েও সময়মত কিস্তি পরিশোধে অবহেলার পথ বন্ধ করার উদ্দেশে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। সমিতির তত্ত্বাবধানে একটা কল্যাণ ফান্ড তৈরী করতে পারেন। যে ফান্ড সমিতির মালিকানায় গণ্য হবে না। যখন কারো নিকট মাল বিক্রয় করবেন তখন তাদের থেকে লিখিত নিয়ে নিবেন-সে যদি ঠিক মত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করে তাহলে এ পরিমাণ টাকা কল্যাণ ফান্ডে জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে কিস্তি পরিশোধে দেরী করলে কল্যাণ ফান্ডে টাকা জমা দিয়ে দিবে। সে

ফান্ড থেকে দুঃস্থ মানবতার সেবা করা হবে। (সূরা বাকারাঃ ২৮০, ফিকহী মাকালাত ১:১২৯-১৩০)

দীর্ঘ মেয়াদী বাকীতে কোন জন্তু ক্রয় করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ মেয়াদের বাকীতে বর্তমান বাজার মূল্য হতে একশত টাকা বেশী দরে পাঁচ মন ধান ক্রয় করল। বিক্রেতার নিকট থেকে মাল বুঝে নেয়ার আগেই উক্ত ব্যক্তি অন্যের নিকট সেই পাঁচ মন ধান বাজার ক্রয়মূল্য হতে মন প্রতি একশত টাকা কমে বিক্রয় করল এবং দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার নিকট থেকে মাল বুঝে নিল। উভয়ের ক্রয়-বিক্রয় শরী'আতের বিধান মুতাবিক জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ কোর জিনিষ বাকীতে বিক্রি করার কারণে বর্তমান বাজার দর থেকে তার মূল্য বেশী ধার্য করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। তবে এর জন্য মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা মানবতাবিরোধী।

এ হিসেবে প্রথম ব্যক্তির ক্রয় সঠিকই হয়েছে। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, তন্মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে এই যে, বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতার ক্রয়কৃত বস্তুটি বুঝে নিতে হবে। তারপর নিজে রাখতে পারে বা অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে উক্ত জিনিষ বুঝে নেয়ার আগে কারো কাছে বিক্রয় করলে তা শুদ্ধ হবে না। তাই এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তির বিক্রয় শরী'আত মুতাবিক শুদ্ধ হয়নি। আর এ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করার পন্থা হল যে, প্রথমত উক্ত পাঁচ মন ধান বিক্রেতার নিকট থেকে প্রথম ক্রেতার হস্তগত হতে হবে। অত:পর নতুন ভাবে লেন-দেন সাব্যস্ত করে অন্যের নিকট তা বিক্রয় করতে হবে। (প্রমাণঃ শামী ৫:১৪৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৬:২৯১, বেহেশতী যেওর ৫:১৭)

ফাসিদ, বাতিল ও মাকরূহ লেন-দেন

মাছ ছাড়া পানিতে বাসকারী অন্য প্রাণী বিক্রি করে টাকা নেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ ব্যাঙ ও কাকড়া ইত্যাদি বিক্রি করে টাকা নেওয়া জায়েয কি-না?

জবাবঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মাছ ব্যতীত পানিতে বসবাসকারী সকল প্রকারের প্রাণীই খাওয়া নিষেধ। আর যেগুলো খাওয়া নিষেধ এবং তার দ্বারা জায়েযভাবে উপকৃত হওয়ার কোন পথ থাকে না, তার ক্রয়-বিক্রয়ও নাজায়েয। পানি জগতের মাছ ভিন্ন অন্য প্রাণীর বিক্রয়ের ব্যাপারে আমাদের ফুকাহাগণ উল্লেখ্য করেছে যে, পানিতে বসবাসকারী মাছ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী দ্বারা যদি হালালভাবে উপকৃত হওয়ার কোন পদ্ধতি থাকে, তাহলে সেগুলো বিক্রয় ও সেটার পয়সা গ্রহণ করা জায়েয হবে। আর যেগুলো দ্বারা হালালভাবে উপকৃত হওয়ার কোন পথ না থাকে, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয। উল্লেখিত মাসআলা অনুযায়ী ব্যাঙ-কাকড়া যেহেতু মাছের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা দ্বারা হালালভাবে উপকৃত হওয়ার কোন পথ জানা যাচ্ছে না। এজন্য ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি বিক্রি করা নাজায়েয এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা গ্রহণ করা নাজায়েয। (প্রমাণঃ আল-মাবসুত ১১:২৫৫, ফাতাওয়া আলমগীরি ৩:১১৪)

দাম নির্ধারণ না করে বিক্রি

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় ধান-চাল বিক্রির একটা বিশেষ নিয়ম চালু আছে, যেমনঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্রেতা ব্যক্তিকে ধান দিয়ে দেয়া হলো এবং বলা হলো, কার্তিক মাসে যে মূল্যে ধান বিক্রি হবে, সে মূল্যে আমার ধানের টাকা পরিশোধ করবেন। এ ধরনের বিক্রি শরী'আত অনুযায়ী বৈধ কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে যে কোন ক্রয়-বিক্রয়ের সময়েই মালের পরিমাণ এবং মূল্য চুড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা জরুরী। উল্লেখিত পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ে যেহেতু ধান-চালের মূল্য চুড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়নি তাই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না।

তবে অন্যান্য বৎসরের সাথে তুলনা করে সে অনুপাতে কার্তিক মাসে ধানের মূল্য যা হতে পারে তা ক্রয়-বিক্রয়ের সময়েই চুড়ান্ত করে ধান বিক্রি করলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে।

বিক্রেতার কাছেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের সমিতির একজন সদস্য সাড়ে তিন শতাংশ জমি ক্রয় করার পর ঋণী হয়েছেন। তার কাছ থেকে আমরা দেড় শতাংশ জমি মৌখিক ভাবে নগদ ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করি এবং একই মজলিসে তার নিকট বাকিতে ৩১ হাজার টাকায় বিক্রি করি। তিনি তিন মাস পর ১ হাজার টাকা লাভসহ ৩১ হাজার টাকা দেন। অবশ্য আমরা জানি, তিনি উক্ত টাকা দিয়ে শুধু ঋণ পরিশোধ করেছেন। তারপর তিনি যে কোন উপায়ে সমিতির টাকা লাভসহ পরিশোধ করেন। উপরোল্লিখিত নিয়মে আমাদের টাকা বিনিয়োগ এবং মুনাফা অর্জন করা শরী'আতের বিধান মতে জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ উল্লেখিত পদ্ধতিতে জমি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয়েছে। কেননা, জমি কবজা করার পূর্বেও বিক্রি করা জায়েয আছে। তবে বেচা-কেনার পর জমিনটা দেখে চৌহদ্দী বুঝে নিয়ে তার পরে ঐ ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করলে, তা উত্তম হতো।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত পদ্ধতি তখনই জায়েয হবে যখন বাস্তবেই ক্রয় বিক্রয়ের ইরাদায় তা করা হবে। বাস্তবে ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য না হয়ে শুধু মৌখিক জমা-খরচ হলে বাড়তি মুনাফা সুদে পরিণত হবে।

একই ব্যক্তি ক্রেতা-বিক্রেতা হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমরা দশজন সদস্য মিলে 'বীরপুর আল-ফালাহ' নামে একাট সমিতি গঠন করেছি। এতে আমরা মাসিক মাথাপিছু কিছু চাঁদা জমা করি। জমাকৃত টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করি। বিনিয়োগ নিম্নলিখিত নিয়মে করে থাকি-

আমাদের একজন সদস্য টাকার জন্য আবেদন করে। আমরা তাকে ৮০০ টাকা মণ দরে গুড় কিণে ৮৫০ টাকা দরে তারই নিকট বিক্রির অনুমতি দিয়ে ২০ মণ গুড় হতে ১০০০ (এক হাজার টাকা) লাভ করি। আমরা অন্য কোন সদস্য তার সাথে যাই না বা মাল ক্রয় করতে সাহায্য করি না। উক্ত ব্যবসা শরী'আত মুতাবিক শুদ্ধ হবে কি-না?

জবাবঃ আপনারা যে ভাবে ক্রয়-বিক্রয় করছেন, তা সহীহ হয়নি। কেননা, উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে একই ব্যক্তিকে ক্রেতা ও বিক্রেতা হতে হয়। আর এটা জায়েয নয়।

কারণ, উক্ত ব্যক্তি প্রথমে আপনাদের পক্ষ থেকে ৮০০ (আট শত) টাকা দরে গুড় ক্রয় করল। পরে ৮৫০ টাকা দরে নিজের কাছ থেকে নিজে ক্রয় করল। এর দ্বারা একই ব্যক্তি ক্রেতা এবং বিক্রেতা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয়নি।

তবে জায়েয হওয়ার একটা ভাল পদ্ধতি আছে। তা হল যে, আপনাদের পক্ষ থেকে যে কোন ব্যক্তি উকীল হয়ে বাজার থেকে গুড় ক্রয় করবে। তারপর উক্ত উকীল অন্য কোন ব্যক্তির নিকট চাই আপনাদের সদস্য

হোক বা অন্য কেউ যে বাকীতে ৮৫০ টাকা দরে কিনতে চায়, তার নিকট ৫০ টাকা লাভে বাকীতে বিক্রি করবে। তাহলে এ লাভ গ্রহণ জায়েয হবে। (প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর, ৩:১৯৭)

একই জিনিস বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি করা

জবাবঃ আমি একজন দোকানদার। আমার দোকানে ১টা পাউডারের মূল্য ৪২ টাকা লেখা আছে। এখন এক কাষ্টমারের কাছে ৪২ টাকা চাওয়াতে সে দরাদরি করে ৪০ টাকা বলল। আমি তাকে দিলাম। এরপর আমার এক বন্ধু ঐ পাউডার নিতে এল। আমার বন্ধু বিধায় আমি তার কাছে ৩৮ টাকা বিক্রি করলাম। আবার আমার দুলাভাই ঐ একই পাউডার নিতে এলো তার কাছে ৩৬ টাকা বিক্রি করলাম। এখন প্রশ্ন হলো, একই পাউডার ৩ লোকের কাছে তিন রকমের দামে বিক্রি করলাম। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ উক্ত তিন ব্যক্তির কাছে তিন রকম মূল্যে বিক্রি করা জায়েয হবে। তবে বিক্রির সময় যদি আপনি একথা বলেন যে, ৪২ টাকা আমার কিনা দাম, তাহলে মিথ্যা বলার গুনাহ হবে। কারণ এর চেয়ে কম দামে আপনি কিনেছেন। আর মিথ্যা না বলে আপনার মাল যার কাছে যত দামে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারেন। তবে বাজারদর বা ন্যায্য মূল্য থেকে বেশী রাখবেন না। দোকানের আপনি একা মালিক হলে, ন্যায্য মূল্য থেকে কম মূল্যেও বেচতে পারেন। কিন্তু অন্য শরীক হলে তাকে না জানিয়ে ন্যায্য মূল্যের থেকে কমে বিক্রি করতে পারবেন না।

ইয়াতীমের মাল দ্বারা ব্যবসা করা

জিজ্ঞাসাঃ নাবালেগ ইয়াতীম-মিসকীনদের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে তার লভ্যাংশ খাওয়া জায়েয আছে কি-না?

জবাবঃ জায়েয নয়। কোন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে ইয়াতীমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না। তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছেঃ তার ধন-সম্পদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং ইয়াতীম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করা। (প্রমাণঃ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ২২৯)

অবৈধভাবে উপার্জিত টাকা দান করা

জিজ্ঞাসাঃ একজন ইমাম সাহেব ওয়াযের মাহফিলে বললেন, হারাম রোযগারের টাকা দিয়ে কোন ধরনের ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর কাছে কবুল হবে না এবং যারা অসৎ পথে টাকা রোযগার করতেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, আমি লন্ডনে থাকি এবং সেখানে আমার একটা রেষ্টুরেন্টও আছে। সেই রেস্টুরেন্টে আমি মদও বিক্রি করি। আর এই মদের টাকা দিয়ে আমি সদকা, যাকাত ও কুরবানী-সব কিছুই আদায় করে আসছি। এসব কি তাহলে সহীহ হচ্ছে না?

জবাবঃ মদের ব্যবসায় উপার্জিত অর্থ দ্বারা এমনিভাবে অসৎ পথে উপার্জিত হারাম টাকা দিয়ে কোন ইবাদত যেমন যাকাত, কুরবানী ও দান-সদকাহ ইত্যাদি করলে, তা কবুল হবে না।

এ ধরনের টাকা তার আসল মালিক বা তার ওয়ারিশদের নিকট তালাশ করে পৌঁছানো জরুরী। খুঁজে না পেলে বা মালিক জানা না থাকলে কিংবা অন্য কোন কারণে দেয়া সম্ভব না হলে নিজের জন্য সাওয়াবের নিয়্যত না করে তা গরীব, ফকীর-মিসকীনদেরকে দিয়ে দিতে হবে যাতে মূল মালিক সাওয়াব পান। ইসলামের দৃষ্টিতে মদ ব্যবসা অবৈধ, তা যে কোন দেশেই হোক না কেন। যেখানে মদকে একাধিক আয়াত ও হাদীস দ্বারা

কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে কিভাবে মদ ব্যবসা হালাল হতে পারে? নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া অনুযায়ী দারুল হরব তথা ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম বেদীনদের দেশেও মুসলমানদের মদ ব্যবসা নাজায়েয। (প্রমাণঃ মাজাল্লাতুন ফিকহিল ইসলামী ২:২৪৬, আযীযুল ফাতাওয়া ১:৬৪৭)

ঔষধের দোকানে কনডম ইত্যাদি বিক্রি করা

জিজ্ঞাসাঃ ঔষধের দোকানে পরিবার-পরিকল্পনা সংক্রান্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি কনডম ও ইনজেকশন ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের বিধান হলো, যে জিনিস জায়েয ভাবে ব্যবহারের কোন সুরত নেই, তার বেচা-কেনা হারাম ও নিষিদ্ধ। যেমন, মদ, শুকর ইত্যাদি। আর যে জিনিস জায়েয আছে ব্যবহার করা যায়, হারাম কাজে সহায়তার ইরাদা না থাকলে তা বেচা-কেনা জায়েয আছে, যদিও কেউ তা খরীদ করে নাজায়েয কাজে ব্যবহার করে। যেমনঃ আঙ্গুর বেচা-কেনা জায়েয আছে, যদিও কেউ এটা খরিদ করে মদ তৈরী করে।

সন্দেহ নেই যে, প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতিতে পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পূর্ন নাজায়েয ও হারাম। তবে মুসলমান, দীনদার-পরহেযগার অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে ক্ষতির আশংকাজনক অবস্থায় বিজ্ঞ মুফতীগণের ফাতাওয়ার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অপারগতার ক্ষেত্রে সাময়িক জন্মনিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন জায়েয আছে। সেই হিসাবে শরী'আতে বর্ণিত নীতির আলোকে ঔষধের দোকানে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি, কনডম, প্লাষ্টিক কয়েল ও ইনজেকশন ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় মৌলিকভাবে জায়েয। তবে এগুলো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফার্মেসী ওয়ালাদের

সাধ্যানুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। যাতে কোন অবিবাহিত লোক এগুলো খরীদ করে যিনার দরজা প্রশস্ত না করতে পারে এবং বিবাহিত লোকেরাও আলেম-উলামা ও দীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে একান্ত অপরাগতা ব্যতীত এগুলো ব্যবহার করতে না পারে। বর্তমানে একদিকে সমাজে নারী-পুরুষের সহ অবস্থান ও সকল ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, অপরদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ পদ্ধতি সমাজকে ব্যাপকভাবে যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে আযাব-গযবের দ্বার প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এ সমাজ আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে যেতে পারে, আর হচ্ছেও। এ সবই মুসলমানদের ধর্মীয় অসচেতনতার সুযোগে হিন্দু, ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মুসলিম জাতির অবস্থায় সৃষ্টিতে সুদূরপ্রসারী গভীর নীল- নকশার পরিণতি। ধর্মহীন কর্মশিক্ষা, সহশিক্ষা, চাকুরীর সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অবাধ উপস্থিতি, মেয়েদের অবাধ বিচরণ, অশ্লীল নভেল, নাটক, মোবাইল, ইন্টারনেট, টেলিভিশন, ভিসিআর, এনজিওদের প্রতারনা ফাঁদ, নারী মুক্তি আন্দোলন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এসব তাদের নীল-নকশার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। মুসলিম মিল্লাত যদি দুশমনদের এসব ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করে এগুলোর প্রতিকার করতে সক্ষম না হয়, তাহলে অচিরেই এ সমাজ ধ্বংস হয়ে কাফির-বেদীনদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হবে। উলামাগণের দায়িত্ব হক কথাগুলো পৌঁছে দেয়া।

স্টক ব্যবসা করা

জিজ্ঞাসাঃ খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ ধান, গম ইত্যাদি জিনিসের স্টক ব্যবসা সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র অধিক মুনাফার আশায় ইহতিকার বা স্টক করা শরী'আতের দৃষ্টিতে মাকরূহে তাহরীমী এবং

বড়ই অপছন্দণীয় ও আল্লাহর নারাযীর কাজ। অব্যশ্য শুধুমাত্র জমা রাখলেই শরী'আতের দৃষ্টিতে ইহতিকার বা স্টক বলা যায় না। বরং শরী'আতের দৃষ্টিতে ইহতিকারের ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ "মানুষ বা প্রাণীদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও জিনিসপত্র সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে ক্রয় করে এমনভাবে জমা করে রাখা যে, বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তেও (অর্থাৎ যখন উক্ত মালের অভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের কষ্ট হয়) আরো বেশী মুনাফার আশায় বিক্রয় না করাকেই ইহতিকার বা স্টক বলা হয়।

ইহতিকার-এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে যে, মাল আটকিয়ে রেখে জিনিসপত্রের মূল্য প্রচুর বৃদ্ধি পেলে বা দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেলে, মানুষ প্রাণীদের দুঃখ ও কষ্টকে হাতিয়ার বানিয়ে নিজে লাভবান হবে। শরী'আতে তা নাজায়েয। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ কর্তৃক উৎপাদিত প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও জিনিসপত্র জমা করে রাখে বা দূরবর্তী এলাকা যেখান থেকে সাধারনতঃ সংশ্লিষ্ট এলাকায় খাদাসামগ্রী ও জরুরী জিনিসপত্র আসে না, সেখান থেকে ক্রয় করে এনে জমা করে রাখে বা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও জিনিসপত্র ছাড়া অন্য জিনিসপত্র (যা মৌলিক প্রয়োজনে পড়ে না এমন জিনিস) জমা রাখে, তাহলে সে ব্যক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে মুহতাকির বা স্টককারী গণ্য হবে না। তবে উল্লেখিত অবস্থায়ও যদি মানুষ কিংবা প্রাণীদের বিশেষ প্রয়োজনে দেখা দেয়, তাহলে সম্পদ আটকিয়ে না রেখে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা ইসলাম ও মনুষ্যত্বের দাবী । (প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৩:২১৩, ১৪ , আল বাহরুর রায়িক ৮:২০১ ২০২ , ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:১৯)

টিভি-অডিও ইত্যাদি বিক্রি করা ও তার ব্যবসা

জিজ্ঞাসাঃ টিভি, অডিও- ভিডিও এবং ঐ সংক্রান্ত ক্যাসেটের দোকান দেয়া ও তার ব্যবসা পরিচালনা করা মুসলমানদের জন্য জায়েয হবে কি?

আর যদি হারাম হয়ে থাকে এবং কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করে উক্ত ব্যবসা পরিচালনা করে, তবে পিতা-মাতার উপর করণীয় কি?

জবাবঃ প্রচলিত টিভি ভিসিআর ও ভিডিও ইত্যাদি যেহেতু নাজায়েয খেলাধুলা ও গান-বাজনা এবং নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনীর মাধ্যম এবং সেগুলোতে চরিত্র বিধ্বংসী নারী-পুরুষের অশ্লীল কথা বা ছবি ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম; তাই টিভি, ভিসিআর, ভিডিও ইত্যাদির দোকান দেয়া বা ব্যবসা করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। অশ্লীল বা চারিত্রিক ক্ষতিকর, কদর্য গানের ক্যাসেট, কিংবা বাদ্য সংযুক্ত গানের ক্যাসেটের ব্যবসা করাও জায়েয নয়। কিন্তু ওয়ায, তিলাওয়াত, বাদ্যবিহীন নাত-গযল ইত্যাদির ক্যাসেট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে।

যদি কোন সন্তান পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গুনাহের ব্যবসায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে বাধা প্রদান করা পিতা-মাতার উপর ফরয। যদি সন্তান না মানে বা চাপ সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে উপদেশ নসীহতের সিলসিলা জারী রাখবে এবং তার উপার্জন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:২৭২, মিশকাত শরীফ ১:২৪২)

পানির ভিতরের মাছ বিক্রি ও তার বিক্রয় লব্ধ টাকা

জিজ্ঞাসাঃ বিলের মধ্যস্থিত খাদ অথবা পুকুরের পানিতে রেখে মাছ বিক্রয় করা হলে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে কি? যদি তা-বৈধ না হয়, তাহলে উক্ত মাছের বিক্রয়লব্ধ টাকা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

জবাবঃ বিলের খাদ অথবা পুকুরের পানিতে রেখে মাছ বিক্রি করার যে নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয

নয়। কেননা, পুকুরের পানিতে বিক্রিত মাছের পরিমাণ সম্পর্কে অনুমানভিত্তিক ধারণা হলেও নিশ্চিতরপে উক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় না। অথচ বিক্রিত মাছের পরিমাণ, প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ক্রেতার জন্য আগেই নিশ্চিত হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওযার পূর্বশর্ত। সুতরাং, বিলের খাদ অথবা পুকুরের মাছ পানিতে রেখে বিক্রয় করা জায়েয হবে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এমন কাজ করলে গুনাহগার হবে ।

সুতরাং, সেই অবস্থায় বিক্রিত পণ্য মজুদ থাকলে তা ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নেয়া জরুরী। কিন্তু যদি পন্য ক্রেতার নিকট মজুদ না থাকে অথবা ক্রেতা তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে তাহলে বিক্রেতার জন্য উক্ত টাকা হালাল হবে। অবশ্য ভুলের জন্য তাওবা করা জরুরী ।

উল্লেখ্য সে, পুকুরের মাছ বিক্রির সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে জেলে দ্বারা মাছগুলো ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর মূল্য নির্ধারণ করে যে কোন ব্যক্তির নিকট তা বিক্রি করতে পারবে।

মুজারিব ব্যবসার টাকা নিজে খরচ করার পর তার থেকে লাভ নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি কিছু টাকা ২ জনকে ব্যবসা করার জন্য দিয়েছে- এ শর্তে যে, লভাংশের ৬০% মালিকের, আর বাকী ৪০% ভাগ টাকা ব্যবসায়ীর। এখন প্রথম ব্যক্তি তাঁর প্রাপ্ত টাকা দিয়ে ব্যবসা করে লভ্যাংশের নির্ধারিত অংশ মালিককে যথারীতি দিয়েছে। কিন্তু অপর ব্যবসায়ী তার প্রাপ্ত টাকা ব্যবসায়ী কাজে না লাগিয়ে নিজের পারিবারিক খাতে ব্যয় করে ফেলেছে। তাই সে লভ্যাংশের কিছুই দিতে পারেনি। এদিকে মালিক প্রথম ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের উপর ভিক্তি করে দ্বিতীয় ব্যবসায়ী থেকেও ঐ পরিমাণ লভ্যাংশ (তাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে)

গ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন হল- মালিক দ্বিতীয় ব্যবসায়ী থেকে যে টাকা লভ্যাংশ হিসেবে গ্রহণ করলো, শরী'আত মতে বৈধ কি-না?

জবাবঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে ৬০% লাভ নেয়া তখনই জায়েয হবে, যখন সে প্রাপ্ত টাকা ব্যবসার কাজে ব্যয় করবে। আর যদি ব্যবসার কাজে ব্যয় না করে নিজের পারিবারিক কাজে ব্যয় করে তাহলে এটাকে ঋণ ধরা হবে। যদিও দাতা ঋণ হিসেবে দেয়নি। আর ঋণ দিয়ে লাভ নেয়া হারাম। সুতরাং, দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে লাভ নেয়া জায়েয হয়নি। অবশ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে অন্যায়কারী ও গুনাহগার হবে।

ঋণ গ্রহীতার নিকট বেশী দামে ফরম বিক্রয় করা

জিজ্ঞাসাঃ আমরা কজন মিলে একটি সমিতি গঠন করেছি। এ সমিতিটি আমরা ইসলামী শরী'আত মুতাবেক পরিচালনা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এদিকে আমরা ব্যবসার উদ্দেশে সমিতির নামে কিছু ফরম ছাপিয়েছি এবং আমরা এরূপ নিয়ম করেছি যে, কোন ব্যক্তি ৫০/- টাকা দিয়ে একটি ফরম ক্রয় করলে সমিতির পক্ষ থেকে তাকে ১০০০/-টাকা ঋণ দেয়া হবে। এমনিভাবে যে কেউ যত ফরম জন্য আবেদন করুক না কেন, প্রতি হাজারের জন্য ৫০/- টাকা দিয়ে ফরম ক্রয় করলে উক্ত মেয়াদের জন্য তাকে প্রয়োজনীয় টাকা ঋণ দেয়া হবে ।

এমনিভাবে সমিতির পক্ষে থেকে কেবল মালের উপরেও ঋণ দেয়া হয়। যেমন কউকে ১০,০০০/- টাকা দেয়া হল যে, আপনি উক্ত টাকা দিয়ে একটি গাভী ক্রয় কবেন এবং ছয় মাস পর আপনি সমিতিতে ১১,০০০/- টাকা পরিশোধ করবেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ লেন-দেন শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয কি-না? যদি জায়েয না থাকে, তাহলে এ যাবত যে টাকা মুনাফা হয়েছে উক্ত টাকাগুলো এখন কি করতে হবে।

জবাবঃ সমিতির পক্ষ থেকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ১০০০/- টাকার জন্য ৫০/- টাকার ফরম ও প্রতি হাজারে ৫০/- টাকা বর্ধিত করে ফরম বিক্রি করা সুদেরই নামান্তর, যা সম্পূর্ণ হারাম। তবে ফরম ছাপাতে যে খরচ হয়েছে- ইনসাফ মত তা গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নেই এবং এক ব্যক্তি এক লেন-দেনে একটিই ফরম কিনবে।

আর কোন মাল ক্রয়ের জন্য ঋণ দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ঋণগ্রহণকারীর নিকট থেকে লাভ গ্রহণ করাও সুদ। ঋণ গ্রহীতাকে "আপনি ১০,০০০/- টাকা দিয়ে একটি গাভী ক্রয় করবেন" বলার দ্বারা তাকে ঐ টাকা ঋণ দেয়া হলো। সুতরাং তার নিকট থেকে অতিরিক্ত ১০০০/- টাকা মুনাফা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। বরং এর হালাল ও বৈধ পন্থা হল প্রথমে সমিতির পক্ষ থেকে কোন মাল ক্রয় করে নিজেদের দায়িত্বে নিত হবে অতঃপর গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বাকীতে কিছু বেশী দামে বিক্রয় করা যাবে এবং এ পন্থায় যা লাভ হবে, তা গ্রহণ করা জায়েয হবে । প্রশ্নে বর্ণিত দু টি পন্থায় লাভের অংশ সুদ হিসেবে গণ্য হওয়ায় যাদের নিকট থেকে উক্ত টাকা নেয়া হয়েছে, তাদের নিকট সে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

(কাওয়ায়িদুল ফিকহ, ৩০২ ও ৪৯২ ফাতাওয়া শামী, ৪:১৭৫ ইমদাদুল মুফতীন ৮৫৯ আল-বাহরুর রায়িক ৬:১১৪)

ধোকা-প্রতারণা ও দালালী

দালালী ব্যবসার শর'ঈ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ দালালী ব্যবসা জায়েয কি-না? কোন ব্যক্তি তার মহাজনকে বলল- "আমি আপনার অমুক মাল বিক্রি করে দিব, আমাকে এত টাকা দিতে হবে।" উক্ত মাল বিক্রি করে দিয়ে টাকা গ্রহণ করা হালাল হবে কি? এরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের নিকট থেকে দালালী গ্রহণ করা জায়েয কি-না?

জবাবঃ দালালের জন্য তার মেহনত ও কর্ম অনুপাতে উভয়ের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়টাই জায়েয আছে। তবে দালালী ব্যবসা জায়েয হতে হলে, কতগুলো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। দালালের পারিশ্রমিক কাজের আগেই উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করতে হবে। যেমন দালাল বলবে, আমি আপনার এ জমিটা বিক্রি করে দিতে পারলে আমাকে ১০০০ টাকা দিতে হবে। জমিওয়ালা তাতে সম্মতি প্রকাশ করলো। সেক্ষেত্রে এ লেন-দেন জায়েয হবে। তেমনিভাবে দালালীর পারিশ্রমিক তার মেহনত অনুযায়ী থেকে হবে। যাতে করে ধোকাবাজী বা যুলুমের পন্থায় সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে অনেক বেশী টাকা উসুল করতে না পারে। কারণ- ধোকা দেয়া ও যুলুম করা উভয়টাই হারাম। খরিদ্দারের সাথে চুক্তির ক্ষেত্রে এ দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে তার থেকেও দালালীর বিনিময় গ্রহণ জায়েয হবে। (প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতিন ৮৬৪,৮৬৫)

চুক্তিভিক্তিক গোপন রোগের চিকিৎসা করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ডাক্তারের একটি বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল ১০০% গ্যারান্টি সহকারে চিকিৎসা প্রদান করা হয়, বিফলে মূল্য ফেরত। আমি একটি

গোপন রোগে ভুগছিলাম। সুতরাং, তার নিকট গিয়ে অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিলে তিনি ৯০০০/- টাকা দাবী করেন। আমি তাতে সম্মত না হলে তিনি ৬০০০/- টাকায় আমার চিকিৎসা করাবেন এবং রোগ সম্পূর্ণ ভাল হবে এই আশ্বাস প্রদান করলেন। বহু কষ্টে আমি ৬০০০/- টাকা সংগ্রহ করে তার নিকট গেলে তিনি সামান্য ঔষধ দিয়ে অত্যন্ত কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করে আরো ৩০০০/= দেয়ার কথা বলেন। উত্তরে আমি কিছু বলার সুযোগ পাইনি। এদিকে আমার অসুখও ভাল হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত ডাক্তার আমার নিকট ৩০০০/- টাকা প্রাপ্য কি-না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী কথিত ডাক্তার আপনার নিকট কোন টাকা পাবেন না। কারণ, তার শর্তপূর্ণ হয়নি। বরং রোগ নিরাময় না হওয়ার দরুন আপনি তার কাছ থেকে ৬০০০/- টাকা ফেরত পাবেন। তার নিকট থেকে উক্ত টাকা উদ্ধার করার জন্য যে কোন ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করার অধিকার আছে।

উল্লেখ্য যে, গোপন রোগের গ্যারান্টি সহ চিকিৎসার বহুল প্রচলিত প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে আপনি বড় রকমের অপরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছেন । আপনার রোগ সম্পর্কে আধুনিক যুগের চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা রাখেন, এমন কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। হতে পারে বাস্তবে সেটা কোন রোগই নয়।

তাছাড়া কোন ডাক্তারের জন্য এভাবে গ্যারান্টিসহ চিকিৎসা করা জায়েযই নয়। কারণ, ডাক্তাররা তো কেবলমাত্র সঠিক রোগ নিরূপন করে সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করতে পারেন। এর বেশী কিছু তাদের অধিকারে নেই। অর্থাৎ সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা হলেই রোগ নিরাময় হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। ঔষধের প্রয়োগের পর প্রতিক্রিয়া হওয়া না হওয়া সেটা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ফায়সালার উপর

নির্ভরশীল। তবে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা করানো নবী ﷺ-এর সুন্নাত। তাই সুন্নাত মনে করে ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো কর্তব্য। কিন্তু ফলাফলের ব্যাপারটি সর্বাবস্থায় আল্লাহপাকের উপর সোপর্দ করতে হবে। (প্রমাণ: সূরা মায়েদা-১)

দেশ-বিদেশ চাকুরীর জন্য লোক সরবরাহ করে কমিশন গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ সরকারী লাইসেন্সধারী রিক্রুটিং এজেন্ট বৈধভাবে চাকুরী দিয়ে বিদেশে লোক প্রেরণের জন্য লোক-সরবরাহ করে। এজেন্ট মালিকের নিকট থেকে কমিশন/দালালী বাবদ অর্থ নেয় বা চাকুরী প্রাপ্ত লোকের নিকট থেকে এজেন্টের অনুমতিক্রমে অর্থ নেয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা বৈধ হবে কি ?

জবাবঃ প্রশ্ন বর্ণিত সুরতের এজেন্সীর ব্যবসা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হবেঃ

(ক) এজেন্সীর পারিশ্রমিক কাজের পূর্বেই উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করেতে হবে।

(খ) তেমনিভাবে এজেন্সীর পারিশ্রমিক তার মেহনত অনুযায়ী থেকে হবে।

(গ) সর্বোপরি ধোকাবাজী, মিথ্যা, প্রতারণা, ওয়াদা খিলাফী ও যুলুম থেকে দূরে থাকতে হবে।

ধোকার মাধ্যমে ব্যবসা করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ফ্যাক্টরী নতুন ধরনের বাটখারা তৈরী করে। যা ঐ বাটখারার আসল ওজনের চেয়ে কিছু কম হয়ে থাকে। যদি কোন দোকানদার ঐ বাটখারাগুলো এই বলে বিক্রি করে যে, এর মধ্যে কিছু

কম আছে। এইভাবে ঐ দোকানদারের জন্য ঐ কম ওজনের বাটখারা বিক্রি করা জায়েয হবে কি না?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ব্যবসা সম্পূর্ণরুপে হারাম । কারণ- যদিও দোকানদার সাহেব বলে বিক্রি করেন যে, এটাতে কম আছে। কিন্তু এর দ্বারা ক্রেতাদের-ধোকা দেরার ব্যাপারে সহযোগিতা করা হচ্ছে। অথচ রাসূলে পাক ﷺ ধোকা থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "যে ব্যক্তি ধোকা দেয়, সে আমার তরীকার উপর নেই।" (প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ২:২ তিরমিযী শরীফ, ২:২৪৫)

মুরাবাহা/বাইয়ে সালাম ও মুযারাবা

ব্যাংকের মাধ্যমে মাল খরীদ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে কিছু মাল খরীদ করি। এর সুরত হল- ইসলামী ব্যাংকের লোক ক্রেতার পছন্দমত দোকানদারের গুদামের ভিতর মালামাল রাখা অবস্থায় চিহ্নিত ও নির্ধারিত করে মালামাল ক্রয় করে লেন-দেন সমাধা করে এবং দোকানদারের মুকাবেলায় ঐ চিহ্নিত করা মাল আমার নিকট মুরাবাহা বিক্রি করে ঐ জায়গায় রেখে বুঝিয়ে দেয়। এরপর ঐ মাল আমি ডেলিভারী নেই ইহা ঠিক আছে কি-না? কোন কোন সময় ঐখানে রাখা অবস্থায় আমি মাল বিক্রি করি। ইহা ঠিক আছে কি? যদি এ সব সুরত জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে আগে এ ধরনের লেন-দেন করনেওয়ালার ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ বাস্তবেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি সরাসরি ব্যাংকের পক্ষ থেকে মাল ক্রয় করার পর বুঝে নিয়ে আপনার নিকট পৃথক চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করলে প্রশ্নে বর্ণিত ব্যবসাটি শরী'আতের বিধান মতে জায়েয আছো। তবে শর্ত হল ব্যাংক দোকানদারের কাছ থেকে যত টাকা দিয়ে মাল ক্রয় করেছে তার সঠিক মূল্য বলে এবং লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রি করতে হবে। আর যদি ব্যাংকের লোকেরা মাল কিনে বুঝে নেয়ার আগে আপনার নিকট বিক্রি করে বা আপনাকে মাল ক্রয় করে নেয়ার জন্য টাকা বা চেক দিয়ে দেয় তাহলে এ ক্রয়- বিক্রয় জায়েয হবে না।

(ইমদাদুল মুফতীন, ৮৪৪ ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ও তিজারত, ১৪১ জাদীদ ফেকহী মাবাহিস, ৩:৪১৫)

তিন হাজার টাকার চেক আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন লোক তার তিন হাজার টাকা দামের ব্যাংক চেক নগদ দুই হাজার পাঁচশত টাকায় বিক্রি করেছে। এটা তার জন্য জায়েয হয়েছে কি-না?

জবাবঃ টাকা-পয়সার এই লেন-দেন অর্থাৎ বেচা-কেনা বা ভাঙ্গানো যেহেতু বাইয় সরফ বা টাকা পয়সার বেচা-কেনা যার জন্য শর্ত হল (ক) উভয় দিক সমান হতে হবে, কম বেশী করলে জায়েয হবে না। (খ) উভয় দিক থেকে নগদ পরিশোধ করা অথচ উল্লেখিত লেন-দেনে চেকের টাকা নগদ হচ্ছে না এবং উভয় দিক সমান নয়। সুতরাং, উহা জায়েয হবে না এমন কি উক্ত সুরতে তিন হাজার টাকার চেকের স্থলে দুই হাজার পাঁচশত টাকার চেক হলেও একদিকে বাকী হওয়ায় উক্ত লেন-দেন সহীহ হবে না। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া আব্দুল হাই, ২:১৩৬)

টাকা ভাঙ্গিয়ে কিছু নগদ ও কিছু পরে নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ টাকা ভাঙ্গানোর সময় অনেক ক্ষেত্রে লেন-দেন পূর্ন হয় না। অর্থাৎ, যিনি খুচরা করে দিচ্ছেন, তিনি হয়ত সম্পূর্ন টাকা এক সঙ্গে দিতে পারেন না। কিছু টাকা পড়ে নিতে বলেন। খুচরা টাকা অনেক সময় খুব জরুরী হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এ ধরনের লেন-দেনের মধ্যে কোন অসুবিধা আছে কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে খুচরা ভাঙ্গানোও এক প্রকার টাকা-পয়সার বেচা-কেনা। সুতরাং, তা জায়েয হতে হলে, টাকা ভাঙ্গানোর সময় খুচরা টাকা পূর্নটাই একই মজলিসের মধ্যে পরিশোধ করা জরুরী। নতুবা কিছু বাকী থাকার কারণে এই লেন-দেন অবৈধ-নাজায়েয গন্য হবে। তবে উক্ত লেন-দেন বৈধ করার জন্য একটা পদ্ধতি এই অবলম্বন করা যেতে পারে যে, উক্ত নোটটি খুচরা দাতার নিকট আমানত রাখবে এবং তার

নিকট যে পরিমাণ খুচরা আছে, (যা ঐ নোটের চেয়ে কম) তা ঋণ হিসাবে নিয়ে নিবে। পরে সুযোগ মত ঋণ পরিশোধ করে আমানত ফিরিয়ে নিবে। ২য় আরেকটি পদ্ধতি হল, শুরুতেই খুচরা দাতা যে পরিমাণ খুচরা দিতে পারবে, সেই পরিমাণের মধ্যে লেন-দেন স্থির করবে এবং নোটের অবশিষ্ট টাকা খুচরা দাতার নিকট আমানত রাখবে। (হিদায়া ৩:৮৮ ফাতাওয়ায়ে শামী ৫;২৫৭)

ব্যাংক থেকে বাইয়ে মুরাবাহার সঠিক পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামী ব্যাংক বাইয়ে মুরাবাহা নামে আমার নিকট মাল বিক্রি করে, তার পরে লাভ সহ তাদের পাওনা টাকা চুক্তিকৃত সময় থেকে এক বছর পরে দিলেও ব্যাংক মানিয়া নেয়। ইয়া ঠিক আছে কি-না?

জবাবঃ মুরবাহার ভিত্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আগের ক্রয় মূল্য সঠিকভাবে ধরতে হয় । তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নিয়ে বিক্রি করতে হয়। তেমনি আগের ক্রয় বাকীতে হয়ে থাকলে তাও প্রকাশ করা জরুরী। আর আনুসাঙ্গিক খরচ মূল্যের সাথে সংযোজন করা হলে সে ক্ষেত্রে পুরাটাকে ক্রয় মূল্য না বলে মোট এত টাকা বাকীতে মুরাবাহা করা জায়েয আছে। তবে বাকীর পূর্ণ মেয়াদ, আর কিস্তির ভিত্তিতে হলে প্রতি কিস্তির মেয়াদ ও পরিশোধযোগ্য মূল্যের পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ই নির্ধারণ করে নিতে হবে। কোন কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাকীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বিক্রেতা কোন আর্থিক জরিমানা উসুল করতে পারবে না। ইসলামী ব্যাংক যদি উল্লেখিত নিয়মে আপনার কাছে মুরাবাহার নামে মাল বিক্রি করে তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের এ লেন-দেন জায়েয আছে। আর এ শর্তের কোন একটি যদি না মানে তাহলে তাদের এ লেন-দেন জায়েয হবে না।

(আদ্‌দুররুল মুখতার, ৫:১৩৪ রদ্দুল মুহতার ,৫:১৩৩ হিদায়া, ৩:৬০ জাদীদ ফেকহী মাবাহিস, ৩:৪১১-৪১৬)

বাই'য়ে সালাম তথা নগদ টাকায় বাকী মাল ক্রয়ের সঠিক পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে ধান ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ, অর্থ লগ্নির একটি রিওয়াজ প্রচলিত আছে যে, বর্তমান বাজারে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) মনে করুন, প্রতি মণ ধানের মূল্য ৩৫০ টাকা। কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতাকে ৫০০০ টাকা দিল এই শর্তে যে, ধানের মৌসুমে (অগ্রহায়ন/ পৌষ মাসে) ঐ ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ১২৫ টাকা মণ দরে ৪০ মণ ধান দিবে অথচ তখন প্রতি হাজারে টাকার বিনিময়ে ৬ মন করে ধান বাজারে বিক্রি হয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত পদ্ধতিতে ধান ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি?

জবাবঃ প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়কে শরী'আতের পরিভাষায় বাই'য়ে সালাম (নগদ টাকায় বাকীতে মাল ক্রয়) বলা হয়। যার সংজ্ঞা হল- দাম নগদ পরিশোধ করা এবং পরে নির্দিষ্ট সময়ে মাল গ্রহণ করা। বাই'য়ে সালাম সহীহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

(১) নগদ কত টাকার বিনিময়ে কি মাল-দ্রব্য দেয়া হবে, তার নাম নির্ণয় করতে হবে।

(২) উক্ত মালের প্রকার বা ধরণ বর্ণনা করতে হবে।

(৩) মালের গুণাগুণ বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ উন্নত মানের, না মাঝারী ধরনের মাল হবে, শুকনা নাকি শুকানো ছাড়া তার বর্ণনা থাকবে।

(৪) মালের পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে।

(৫) দ্রব্য মাল কোন দিন, কোন সময়, কোথায় হস্তান্তর করা হবে, তা নির্ণয় করতে হবে।

(৬) যে মালের ব্যাপারে বাই'য়ে সালাম হবে, সে মালটি লেন-দেনের দিন থেকে পরিশোধের দিন পর্যন্ত বাজারে মজুদ থাকতে হবে।

উল্লেখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে এ ধরনের লেন-দেন জায়েয হবে। উল্লেখ্য, আজকাল অনেকেই উল্লেখিত শর্ত অমান্য করে বাই'য়ে সালাম করে থাকেন। এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এতে উভয়ে সুদী কারবারের গুনাহে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং, উল্লেখিত শর্তসমূহ অক্ষরে অক্ষরে মানা সম্ভব না হলে, এ ধরনের লেন-দেন করা জায়েয হবে না। (হিদায়া, ৩:৯৫)

শেয়ার ব্যবসা

শেয়ার ব্যবসার লভ্যাংশ বন্টনের পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ আমরা দু'জন শেয়ার ব্যবসা করি। এর মধ্য থেকে আমার শুধু টাকা এবং শ্রম। আর অপরজনের দোকান এবং টাকা। কিন্তু তার কোন শ্রম নেই, এদিক দিয়ে দোকানের ভাড়া পূর্ণ লভ্যাংশ থেকে দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর অবশিষ্ট টাকা উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন হয়ে থাকে। এ ধরনের বন্টনে শরী'আতের দৃষ্টিতে ফায়সালা কি?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত ব্যবসাটিতে উভয়ের পুঁজি সমান হলে শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি অপরজনের পুঁজি অর্ধেকের কম হয় তাহলে তাকে অর্ধেক লাভ দেওয়ার শর্ত ব্যবসা সহীহ নয়। কেননা, যে শ্রম দিবে না তার লভ্যাংশ পুজিঁর আনুপাতিক অংশের চেয়ে বেশী ধার্য করা জায়েয নাই।

(দুররে মুখতার ৪:৩১২ শমী ৪:৩১২ তাকরীরাতে রাফেয়ী-৭১ ইমদাদুল ফাতাওয়া৩:৫১৭)

শেয়ার ব্যবসা জায়েয কি-না? জায়েয না হলে, যার কাছে পূর্বে থেকে ক্রয় করা আছে, এখন তিনি উহা কি করিবেন?

জবাবঃ (ক) যে কোন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো সে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হারাম বা অবৈধ কারবার যেমন মদ তৈরীর কারখানা, সুদী ব্যাংক বা বীমা কোম্পানী ইত্যাদির জন্য না হওয়া বরং মূল কারবার সম্পূর্ণ হওয়া সেমন বস্ত্রকল, সুতার কল বা অটোমোবাইল শিল্প ইত্যাদি।

(খ) Face value তথা গায়ের মূল্যে চেয়ে কম বেশীতে শেয়ার বেচা কেনা জায়েয হওয়ার জন্যে প্রথম শর্তসহ দ্বিতীয় শর্ত হলো কোম্পানীর স্থায়ী সম্পত্তি যেমন মেশিন, বিল্ডিং বা কোন কাচাঁমালও থাকতে হবে যাতে নগদ অর্থ সমপরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে ও অবশিষ্ট মূল্য অন্য সম্পদের বিনিময়ে হলে সুদ হওয়ার আশংকা মুক্ত হওয়া যায়।

তেমনি ভাবে উক্ত সুরতে শেয়ারের বিক্রয় মূল্য কোম্পানীর নগদ ক্যাশ ও উসুলযোগ্য ঋণের সমষ্টি থেকে বেশী হতে হবে।

(গ) যদিও কোম্পানীর মূল কারবার হারাম নয় বটে, কিন্তু কোন কোন আনুসাঙ্গিক পর্যায়ে তারাও শরী'আত পরিপন্থী লেন-দেন করে থাকে যেমন সুদভিত্তিক লোন গ্রহণ করে থাকে এবং পরিবর্তিতে সুদের বা অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে ও সুদ গ্রহণ করে। (আজকাল কোম্পানী সাধারণত এমনই হয়) তাহলে কোম্পানী যেহেতু আনুষাঙ্গিক পর্যায়ে হিসাবে শেয়ার হোল্ডারের উপরেও এর দায়িত্ব বর্তাবে । তবে দু'টি কাজ করলে এ দায়িত্বে এড়ানো সম্ভব হবে।

প্রথম কাজ: কর্তৃপক্ষকে সুদের খারাবী বুঝাতে হবে। সুদভিত্তিক লেন-দেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে এবং এ জাতীয় লেন-দেন বন্ধের দাবী জানাতে হবে। যদিও তার এ দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। আর বাৎসরিক জেনারেল মিটিংয়ে এ দাবী জানানোর মোক্ষম সুযোগ।

দ্বিতীয় কাজ: প্রতিবাদ ও বন্ধের দাবী করা সত্বেও যদি কর্তৃপক্ষ সুদী লেন-দেন বর্জন করে তাহলে মুনাফা বন্টনের সময় আয়-ব্যয়ের তালিকা দেখে বা যে কোন উপায়ে সুদী লেন-দেনের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার আনুপাতিক হার জেনে নিবে এবং লাভের অংশ থেকে সে পরিমাণ অর্থ

নিজে ব্যবহার না করে সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই গরীবদেরকে দিয়ে দিবে।

(ঘ) যে সকল কোম্পানীর মূল কারবার হারাম নয় বলে জানা সত্বেও যাবতীয় লেন-দেন শরী'আত সম্মত হয় বলে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া যায় সে সব কোম্পানীর শেয়ার একমাত্র অংশীদার হয়ে মুনাফা লাভের উদ্দেশে ক্রয় করা যাবে। পুঁজি লাভের উদ্দেশে কেনা-বেচা করা যাবে না। কারণ পুঁজি লাভের উদ্দেশে হলে স্বল্প সময়ে শর্ত নাম্বর "গ" এ বর্ণিত কাজ দ্বয়ের উপর আমল করা সম্ভব হবে না।

(ঙ) সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য বাকী রেখে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কমিশন আদায়ের শর্তেই শেয়ার ক্রয় করা যাবে পরবর্তিতে পরিশোধ যোগ্য মূল্যের উপর সুদ দেয়ার শর্তে নয়।

(চ) শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বেচা-কেনার সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন করা, যেমন কেউ শেয়ার ক্রয় করার পর অন্যের নিকট তা বিক্রয় করতে চাইলে প্রথমে তা পুরোপুরি ভাবে নিজের মালিকানায় ও আয়ত্বে আসা জরুরী।

এসকল শর্তাবলীর ভিত্তিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

তাই কোম্পানীর শেয়ার গ্রহণে আগ্রহীদের করণীয় হচ্ছে প্রথমে কোম্পানীর কার্যক্রম ও তার সকল খুটিনাটি বিষয় এবং নিয়ম-কানুন কোন বিজ্ঞ মুফতীর সহায়তায় ভালভাবে অবহিত হওয়া। অতঃপর যদি উপরোক্ত শর্তাবলী পরিপন্থী কোন বিষয় না পাওয়া যায় তাহলে শেয়ার গ্রহণ করা যাবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন কোম্পানীর সকল খুটিনাটি বিষয় অবহিত না হয়ে তার শেয়ার গ্রহণ জায়েয হবে না।

সম্মিলিত ব্যবসায় পুঁজি সমান হওয়া জরুরী নয়

জিজ্ঞাসাঃ আমরা দুই জন অনেক দিন যাবত শেয়ার ব্যবসা করে আসতেছি। ব্যবসাতে যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এ পরিমাণ টাকার ইনকাম দ্বারা আমার চলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এখন আমার প্রয়োজন আরো কিছু টাকা বিনিয়োগ করে ইনকাম বৃদ্ধি করা। কিন্তু আমার সাথে যিনি আছেন তার যে কোন অসুবিধার কারণে টাকা বৃদ্ধি করতে পারছে না। এমতাবস্থায় আমি যদি তাকে আমার সাথে অংশীদার হিসাবে রাখি তাহলে আমার অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে আমি চাচ্ছি আমার সাথের অংশীদারকে বাদ দিয়ে দিতে। কিন্তু তার যে টাকাগুলো আছে সেগুলো আমানত হিসাবে রেখে দিব এবং তার থেকে ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে নিব অথবা ঋণ হিসাবে নিয়ে নিব। তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হবে না। হ্যাঁ, এতটুকু করা হবে তার দোকানের ভাড়া যতটুকু তার থেকে কিছু বাড়ীয়ে দিয়ে দিব। এটা বৈধ হবে কি-না? অথবা বাড়তি টাকা দেওয়ার অন্য কোন বৈধ সুরত আছে কি-না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

জবাবঃ যৌথ/ পার্টনারশীপে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকল পার্টনারের পুঁজি সমান হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং, আপনাদের যৌথ ব্যবসায়কে বহাল রেখেই আপনি তাতে বাড়তি পুঁজি যোগ করতে পারবেন এবং পুঁজি অনুপাতে লাভও আপনি বেশী ধার্য করে নিবেন। তা না করে তার টাকা ঋণ হিসেবে নিয়ে তার উপর দোকানের ভাড়া কিছু বেশী দেওয়ার শর্ত করে টাকা নেওয়া ঠিক হবে না।

(প্রমাণঃ শামী, ৫:১৬৬ দুররে মুখতার, ৫:১৬৭ আলমগীরী, ৩:২০২-২০৩ শরহুল মাজাল্লা, ৩:২৭২)

ব্যাংক, বীমা-ইন্স্যুরেন্স

বীমাকৃত টাকার লভ্যাংশের বিধান

জিজ্ঞাসাঃ আমার বড় ভাই কোন এক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে বীমা করেন। প্রথম অবস্থায় ২৫২০/- টাকা জমা দেয়ার পর কিছু দিন আগে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে এক মেয়ে রেখে যান। কোম্পানীর বিধি মোতাবিক বর্তমানে উক্ত টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮০০০/- টাকা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে-বীমাকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকাগুলো সুদ হিসেবে গণ্য হবে কি-না? এবং উল্লেখিত টাকা মৃত ব্যক্তির ইয়াতীম সন্তানদের লালন পালনের জন্য খরচ করা বৈধ হবে কি-না?

জবাবঃ হ্যাঁ, বীমাকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকাগুলো সম্পূর্ণ সুদ হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং, বীমাকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকাগুলো গ্রহণ করে ইয়াতীমদের লালন-পালনের জন্য খরচ করা বৈধ হবে না। বরং সাওয়াবের নিয়্যত ব্যতীত সেগুলো গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে বীমাকৃত মূল টাকা অবশ্য উত্তরাধিকারীদের মাঝে তাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করা হবে এবং এতে দোষের কিছু নেই।

(প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:১৭০ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:১৩৩)

জীবন বা পণ্যের বীমা করা

জিজ্ঞাসাঃ জীবন ও অন্যান্য পণ্যের বীমা জায়েয আছে কি-না?

জবাবঃ আমাদের দেশের প্রচলিত বীমা শরী‘আত সম্মত নয়। নাম যা কিছু দেয়া হোক না কেন। আসলে বর্তমানে প্রচলিত বীমা সুদ ও জুয়ার

সমষ্টি মাত্র। তাই বীমা কোম্পানীতে অংশগ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়িয। তবে কেউ যদি সরকারী কানুন বা অন্য কোন কারণে বা বীমা বা ইনস্যুরেন্স করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার অপরাগতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে হাক্কানী মুফতী থেকে সেই অবস্থার হুকুম জেনে নিবে।

হ্যাঁ, যদি কোম্পানী সুদ-জুয়া সম্বলিত বীমার বর্তমান নীতিমালা পরিত্যাগ করে ইসলামী পন্থায় বীমা কোম্পানী করে, তাতে অংশগ্রহণ করতে দোষ নেই। বীমার ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করতে হবে ।

(রদ্দুস মুহতার, ৪: ১৭০ ইসলাম আওর জাদীদ মায়িশাত, ১৫৯-১৬৩ ইসলাম আওর জাদীদ দাওর কে মাসাইল, ১৯৮-২০৮)

ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখা

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক টাকা জমা রেখে তা থেকে মুনাফা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি-না? জনৈক ব্যক্তির নিকট শুনতে পেলাম যে, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ইসলামী ব্যাংক এর শরী'আহ বোর্ডের প্রসিডেন্ট। এ বিষয়টি কতটুকু সত্য?

জবাবঃ শরী'আত মুতাবিক লেন-দেনের নামে যেসব ব্যাংক আমাদের দেশে কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলো অধিকাংশই সুদের সাথে জড়িত। তবে কোন ব্যাংক সুদী কারবারের সাথে কিছুটা কম জড়িত। আর কোন ব্যাংক কিছুটা বেশী জড়িত। আর কোন কোনটা সম্পূর্ণ সুদভিত্তিক। সম্পূর্ণ সুদমুক্ত কোন ব্যাংক বাংলাদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই। মুযারাবা, মুরাবাহ ইত্যাদি যে সমস্ত লেন-দেন শরী'আতে বৈধ, তার প্রত্যেকটির বৈধতার জন্য বেশ কতগুলো শর্ত আছে। ইসলামের নামে যারা ব্যাংক পরিচালনা করছেন, তারা সকল ক্ষেত্রে সব শর্তগুলো রক্ষা

করেছেন না। যদিও তারা প্রচার পত্রে সহীহ মাসআলা প্রচার করেছেন। সুতরাং, তাদের অর্জিত মুনাফাকে পূর্ণ হালাল বলা যায় না। এ সব ব্যাংকের কারণে অনেক লোক অনিচ্ছাকৃতভাবে সুদের সাথে জড়িত হচ্ছে।

আর ইসলামী ব্যাংক-এর সাথে শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সঠিক নয়।

সুদের টাকায় জনসেবা করা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি ব্যাংকে জমাকৃত সুদের টাকা দিয়ে এমন টয়লেট বানায় যা ছোট-বড় ধনী-গরীব সবাই ব্যবহার করবে তা হলে জায়েয হবে কি-না? উক্ত টাকা যদি মসজিদ বা মাদরাসার কমিটিকে (সুদের কথা) জানিয়ে দিয়ে দেয়া হয়, তবে তা দ্বারা মসজিদ বা মাদরাসার জন্য বাথরুম তৈরি হবে কি?

জবাবঃ একান্ত ঠেকার কারণে ব্যাংকে চলতি একাউন্ট খোলা জায়েয আছে। সেভিংস একাউন্ট খোলা জায়েয নয়। তবে না জেনে কেউ খুলে থাকলে, জানার পর একাউন্ট পরিবর্তন করা উচিত এবং এরূপ ক্ষেত্রে তার একাউন্ট যে সুদের টাকা জমা হবে, তা নিজের কাজে খরচ করা জায়েয নয়। বরং উক্ত টাকা সাওয়াবের নিয়্যত না করে গরীব-মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবে।

উক্ত টাকা দিয়ে জনসাধাবণের ব্যবহারোপযোগী টয়লেট বানানো জায়েয হবে। তেমনিভাবে সুদের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসার বাথরুম তৈরি করাও বৈধ হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে- যেন নিজের ব্যক্তিগত কোন কাজে এবং মসজিদ ও তৎসংশ্লিষ্ট দেয়াল-বারান্দা ইত্যাদিতে সুদের টাকা ব্যয় না হয়।

(ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:১৯২, ৩:২৬১ মাজাল্লাতু ফিকহিল ইসলামী, ২:৪১৪, ৩৭৪ জাদীদ ফিকহী মাসাইল ২:২৮০ কিফায়াতুল মুফতী, ৮:৫৮-৫৯, ৬৩)

সুদী লোন দ্বারা কোন বস্তু ক্রয় করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে জমি ক্রয় করে এবং লোনের টাকা দিয়েই বাড়ী নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি লোন পরিশোধ করার পূর্বে সেই জমিন এবং বাড়ীর মালিক হবে কি না এবং লোন পরিশোধ করার পূর্বে সে ব্যক্তি উক্ত বাড়ীতে নামায আদায় করলে, সেই নামায সঠিক হবে কি না?

জবাবঃ উক্ত ব্যক্তি ঐ বাড়ীর মালিক হবে, এবং উক্ত ঘরে নামায আদায় করলে, তাও সহীহ হবে, লোনের টাকা পরিশোধ হোক, চাই না হোক; কিন্তু সুদভিক্তিক লোন নেয়া মহাপাপ ও হারাম। (ইমদাদুল মুফতীন ৮০০, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:১৯২)

শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যাংকে লেন-দেন

জিজ্ঞাসাঃ আমার স্ত্রী ব্যাংকে একাউন্ট খুলে এবং দরখাস্তের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ না করার আবেদন জানায় তার পরেও ব্যাংক সুদের কিছু অংশ দিয়ে দেয়। এখন এই টাকার ব্যাপারে কি করণীয়। তদ্রুপ আমার একাউন্টেও দরখাস্তের মাধ্যমে সুদ বন্ধ করে রেখেছি। এখন আমার কি করণীয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ অপরাগতা ছাড়া সুদী ব্যাংকে কোন হিসাব খোলাই জায়েয নেই। তবে জান-মালের নিরাপত্তার জন্য একান্ত ঠেকার কারণে সুদী ব্যাংকে কারেন্ট একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখা জায়েয আছে সুদী ব্যাংকে সেভিংস বা ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্ট খোলা জায়েয নয়। তবে না

জেনে কেউ খুলে থাকলে জানার পর একাউন্ট পরিবর্তন করা কর্তব্য এবং এরূপ ক্ষেত্রে তার একাউন্টে যে সুদের টাকা জমা হবে তা উঠিয়ে নিজের কোন কাজে খরচ করবে না। এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয বরং উক্ত টাকা সাওয়াবের নিয়্যত না করে গরীব-মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবে অথবা উক্ত টাকা জনসাধারনের ব্যবহারোপযোগী টয়লেট, পুল, পানির কল, মসজিদ মাদরাসার বাথরুম, সুয়ারেজ লাইন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করাও জায়েয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন নিজের ব্যক্তিগত কোন কাজে এবং মসজিদ ও মাদারাসার ঘর নির্মাণে সুদের টাকা ব্যয় না হয় ।

(প্রমাণঃ বজলুল মাজহুদ, ১: ৩৭ ফাতাওয়া রহীমিয়া, ২:১৯২ জাদীদ ফিকহী মাসাইল, ২:২৭৯ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ৪:২০৩)

সি সি লোন নেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। অথচ তেমন কোন টাকা আমার হাতে বর্তমানে নেই। তাই ব্যবসার ক্ষেতে সীমাহীন হিমশিম খাচ্ছি। ব্যবসার মধ্যে টিকে থাকা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মনস্থ করেছি-একটি সি, সি, লোন করিয়ে লক্ষাধিক টাকা নেব এবং একটু ভাল ভাবে ব্যবসা করবো। ব্যাংক থেকে সি, সি, লোন করলে এবং সে টাকা দিয়ে ব্যবসা করলে, শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি আছে কিনা? এ সম্পর্কে ইসলামের হুকুম কি?

জবাবঃ বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত ব্যাংক-ই সুদভিক্তিক; তাই ব্যাংক থেকে লোন নিলে, অবশ্যই তার সুদ দিতে হয়, চাই সেটা ব্যবসা-বাণিজ্যের লোন হোক বা হাউজ লোন হোক, অথবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে লোন হোক। আর সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে

স্পষ্ঠভাবে বর্ণিত হয়েছে-আল্লাহ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা আয়াত-২৭৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, সুদের লেন-দেনকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দেন। (সূরা বাকারা আয়াত-২৭৬)

তাছাড়া হাদীস শরীফে সুদ সম্পর্কে কড়া হুশিয়ারী এসেছে এবং সুদের শাস্তি খুবই মারাত্মক বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে হুযূর ﷺ বলেন, সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের হিসাবরক্ষক ও সুদের স্বাক্ষী সকলের উপর আল্লাহ পাকের লা'নত । হুযুর ﷺ আরো বলেন, গুনাহের ব্যাপারে এরা প্রত্যেকেই বরাবর। (মুসলিম শরীফ ২:২৭) কাজেই সুদভিত্তিক লোন নেয়া জায়েয নয়। তবে কেউ যদি সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে যায়, পরিবার সন্তানাদি নিয়ে খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থা না থাকে এবং সুদ বিহীন ঋণও কোন জায়গা থেকে না পায়, তাহলে তার জন্য অপারগ অবস্থায় জরুরত পরিমাণ সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করার অনুমতি আছে। অবশ্য তাকে ইস্তিগফার করতে হবে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ পরিশোধের ফিকির করতে হবে। উল্লেখ্য, সামান্য অসুবিধার কারণে নিজকে অপারগ মনে করে সুদী ঋণ নিবে না। বরং পূর্ণ অবস্থা উল্লেখ করে কোন হক্কানী মুফতী থেকে জেনে নিবে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪:২০৩, ৪:২৪৯)

ব্যাংকের জন্য ঘর ভাড়া দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ ব্যাংক চালানোর জন্য ঘর ভাড়া দেয়া জায়েয আছে কি-না?

জবাবঃ সুদী ব্যাংক চালানোর জন্য ঘর ভাড়া দেয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে উচিৎ না। কারণ, সুদী ব্যাংকের জন্য ঘর ভাড়া দেয়া একটি হারাম কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা না হলেও পরোক্ষ সহায়তা বটেই। সুতরাং, মুমিন মুত্তাকী

ব্যক্তি এরূপ কাজ কখনও করতে পারে না। (জাদীদ ফিকহী মাসায়িলঃ ২:২৪৭ ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪:৪৫০ নিযামুল ফাতাওয়া ২:২৯৯)

সুদী ব্যাংকের চাকুরীজীবিদের উপার্জন

জিজ্ঞাসাঃ আমার বাবা একজন ব্যাংকের ম্যানেজার। বিগত ১০-১২ বছর যাবত চাকুরিরত অবস্থায় আছেন। আমার বাবা শুধুমাএ সরকারী বেতন ব্যতীত অন্য কোন টাকা যেমন সুদ-ঘুষ মোটেও গ্রহণ করেন না। এখন অনেক লোক বলে থাকেন, ব্যাংকের টাকায় সুদ আছে। তাই তার বেতনের টাকা পবিত্র উপার্জন নয়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব মানুষকে এই বলে বুঝিয়ে থাকি, আমাদের এই বাংলাদেশে এমন কোন ক্ষেত্র-নাই যেখানে সুদের কিঞ্চিত আঁচড় নেই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন তার মাসিক মুজুরি বা বেতন সরকারীভাবে পেয়ে থাকে সেই টাকা যে উৎস থেকেই আসুক না কেন তা উক্ত ব্যক্তির জন্য হালাল হবে। আমার বক্তব্য সঠিক কিনা জানতে চাই।

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে সুদের লেন দেন একটি বড় ধরনের গুনাহ। এই সুদী লেন দেন কোন প্রকার সহযোগিতা করা বৈধ নয়। বরং হারাম। আর সুদী ব্যাংকে চাকুরীর পয়সাটা যে হারাম কাজেরই বিনিময়। হারাম কাজের বিনিময়ও হারাম। সুতরাং, সুদী প্রতিষ্ঠানে যেমন চাকুরী করা বৈধ হবে না, তেমনি তার বেতনও হালাল হবে না। জানা সত্ত্বেও অন্যদের জন্যে এ বেতন থেকে কোন অংশ ভোগ করা জায়েয নয়। তবে আপনার পিতা যদি শুধুমাত্র এ চাকুরীর উপর নির্ভর করে তাহলে তিনি এ মূহূর্তেই চাকুরী না ছেড়ে ইস্তেগফার করতে থাকবেন। এবং হালাল পন্থা তালাশ করতে থাকবেন। জীবিকা নির্বাহের মত কোন হালাল পন্থা পেলেই ব্যাংকের চাকুরী ছেড়ে নতুন উপার্জনের পথ গ্রহণ করবেন। ব্যাংকের চাকুরীর বেতন বাবদ গৃহীত টাকাগুলো বা তার সমপরিমাণ সাধ্যমত

সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়াই গরীবদেরকে ছদকা করতে থাকবেন। উল্লেখ্য আপনি যে যুক্তি পেশ করেছেন তা শরী'আতের দৃষ্টিতে ঠিক হয় নয়। (সূরায়ে মায়িদাহ -২ দুররে মুখতার, ৬:৫৫ আহসানুল ফাতাওয়া ৮:৯১)

সুদী ব্যাংকে চাকুরী

জিজ্ঞাসাঃ বিভিন্ন সুদী ব্যাংক যেমন জনতা, সোনলী, রূপালী, অগ্রণী, তথা যে সকল ব্যাংকে সুদ লেন-দেন হয়, সেগুলোতে চাকুরী করা জায়েয কি না? এবং উক্ত ব্যাংকসমূহে চাকুরির দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি না ? যদি তা হালাল না হয় তাহলে যারা হক্ব পথে থেকে হালালভাবে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতে চায়, তাদের জন্য উল্লেখিত ব্যাংকসমূহ চাকুরীরত ব্যক্তিদের ঘরে খাওয়া বা তাদের নিকট থেকে কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

জবাবঃ ইসলাম সুদকে অনুমোদন করে না। পবিত্র কুরআনে ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করতঃ ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন (সূরা বাকারা আয়াত-২৭৫)

সুদের ভয়াবহতা ও এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেছেন, "সুদ সংক্রান্ত গুনাহের তিয়াত্তরটি স্তর রয়েছে। তম্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হল নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।" (মিশকাত ১:২৪৬)

যেমনিভাবে সুদ হারাম ও নাজায়েজ হওয়ার কারণে ইসলাম সেটাকে অনুমোদন করে না, তেমনিভাবে সুদ ভিত্তিক কোন লেন-দেনে জড়িত হওয়া বা এ কাজে সাহায্য সহযোগিতা করাও জায়েয নয়। সুতরাং, যে সকল ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে সুদী কাজ-কারবার হয়, সেসব ব্যাংক বা

প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা বা সেগুলোর গ্রাহক হওয়া কিংবা অপারগতা ব্যতীত সেসব ব্যাংকে একাউন্ট খোলা কোনটাই জায়েয নয়।

সুদভিত্তিক ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে যারা চাকুরী করেন, গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার দরুন তারাও গুনাহগার হবেন এবং এর বিনিময়ে অর্জিত অর্থও হালাল নয় বরং হারাম। সে অর্থ দ্বারা কাউকে খাওয়ালে বা হাদিয়া দিলে অপরের জন্যে তা গ্রহণ করা জায়েয নাই। অবশ্য তার অধিকাংশ উপার্জন হালাল হলে বা হালাল অর্থ থেকে দাওয়াত বা হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করা যাবে। (অবশ্য তার যদি অন্য কোন হালাল উপার্জন থাকে এবং সেখান থেকে তাকে দাওয়াত বা হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করা যাবে।) (প্রমাণঃ সূরা মায়িদাহ, ২ মিশকাত শরীফ ২৪৪ আহসানুল ফাতাওয়া, ৭:২২ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৪:২৪২ ফাতাওয়া রাহীমিয়া, ১:১৯৪)

সুদ, ঘুষ ও জুয়া

সুদ সক্রান্ত হিসাব-নিকাশ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদেরকে স্কুল-কলেজে ব্যাংকের সুদের হিসাব-নিকাশ শিক্ষা দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই সুদ সংক্রান্ত হিসাব শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া বা টাকা/পয়সা নেয়া জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ যেহেতু সুদ সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অংক শিক্ষা। এ শিক্ষা ও শিখানোর দ্বারা সুদী লেন-দেন সরাসরি কোন সহযোগিতা হয় না। তাই সুদ সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ শিক্ষা দেয়া, শিক্ষা নেয়া বা শিক্ষকতা করে টাকা নেয়া কোনটাই না জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষকের উচিত এক্ষেত্রে সুদের অবৈধতা ও ভয়াবহতার আলোচনা করে এর প্রতি ঘৃণা জন্মানো।

(প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:১৬৮ আহাকমুল কুরআন, কৃত- আল্লামা থানভী,৩:৭৮)

বন্ধক রেখে সুদের উপর টাকা আনা

জিজ্ঞাসাঃ ব্যাংকে জমি অথবা ঘর বন্ধক রেখে টাকা এনে ব্যবসা করে ঐ টাকার সুদ প্রতি মাসে আদায় করা শরী‘আতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি-?

জবাবঃ কুরআন পাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বলা হয়েছে, “যারা সুদী লেন-দেন পরিত্যাগ না করবে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়।” (সূরা বাকারা-২৭৯) তাই শরী‘আতের দৃষ্টিতে কোন অব্যস্থাই সুদ গ্রহণ জায়েয নয়।

তবে একান্ত ঠেকা ও অপরাগতার সময় সুদ দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ যখন সুদভিত্তিক কর্য ছাড়া অন্য কোন কর্য না পাওয়া যায় এবং রোজগারেরও অন্য পথ না থাকে, এক কথায় সুদভিত্তিক কর্য ছাড়া আহারাদি, ভরন-পোষণ, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদির উপায়ান্তর না থাকে, তখন প্রয়োজন মাফিক সুদ ভিত্তিক কর্য ব্যাংক থেকে বা অন্য কোন ব্যক্তি থেকে নিতে পারবে। এর জন্য জমি বা ঘর বন্ধক রাখা যাবে। অপরাগতার কারণে গুনাহগার হবে না, তবে অবশ্য যখন ঠেকা থাকবে না, তখন সাথে সাথে সুদের লেন-দেন ছেড়ে দিতে হবে। তবে সুদ গ্রহণ করা সর্ব অবস্থায় হারাম। (প্রমাণঃ নিজামুল ফাতাওয়া, ১:৪৭২)

সুদ-ঘুষ খায় এমন আত্মীয়ের বাসায় খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার এক নিকটস্থ আত্মীয় ঘুষ খায়, এখন তাদের বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া আমার জন্য জায়েয হবে কি না এবং না খেয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়া আমার কি ঠিক হবে? এ অবস্থায় আমি কোন পথ অবলম্বন করবো?

জবাবঃ যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, উক্ত আত্মীয়ের অধিকাংশ উপার্জন হালাল, তাহলে আপনার জন্য আত্মীয়ের মনে কষ্ট না দিয়ে তাদের বাসায় যেয়ে খাওয়া-দাওয়া করা বা তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে। আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, অধিকাংশ মাল হারাম, তাহলে আত্মীয়ের বাসায় যেয়ে খাওয়া দাওয়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু আত্মীয়তা ছিন্ন না করে তাকে হিকমতের সাথে বুঝাতে হবে এবং তার জন্য দু'আ করতে হবে, যেন সে ঘুষ খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং হালাল রিযিকের উপর নির্ভর করে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫:৩৪৩ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৮:২৭২)

সুদখোর মায়ের বাড়িতে খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার মা সুদ খায়। অথচ আমি জানি সুদখোরদের জন্য আল্লাহ বিরাট আজাব রেখেছেন। আমি আমার মাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার মা তা থেকে বিরত হচ্ছে না। এ জন্য আমি রাগ করে কয়েকবার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। তবুও আমার মা তা থেকে বিরত হয়নি। এখন আমি বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া না করার কারণে আমার মা আমার উপর রাগ করে কথা-বার্তা বলেন না। এখন প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমার মাকে-খুশী করার জন্য আমি বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতে পারব কি না?

জবাবঃ সন্তানের জন্য পিতা-মাতার আনুগত্য করা বা তাদের আদেশ মেনে চলা ওয়াজিব। তবে তারা শরী'আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দিলে সন্তানের জন্য তা পালন করা জরুরী নয়, বরং তা মান্য না করাই জরুরী। কারণ কুরআন শরীফে সূরা লুকমানের ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ্য রয়েছে- "পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। এ ছাড়া একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- "সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে কোন মাখলূকের আনূগত্য করা যাবে না"। সুতরাং, নাজায়েয কাজের ব্যাপারে মায়ের হুকুম মান্য না করলে, আপনি গুনাহগার হবেন না।

আপনার মা যদি সুদ খায়, সুদের উপরই সংসারের খরচ নির্বাহ করে থাকে, তাই আপনার জন্য (আপনি আক্বেল, বালেগ এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হলে) মায়ের সুদী টাকার খানা খাওয়া আদৌ জায়েয হবে না। আপনার খানা-পিনা তার থেকে পৃথক করতে হবে। নতুবা আপনিও সুদখোর হিসেবে গুনাহগার হয়ে শাস্তির উপযোগী হবেন। তবে দুনিয়ার

জীবনে অবশ্যই পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ ও সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে। আর্থিক সহযোগিতা সহ যতদূর সম্ভব তাদের খিদমত করতে হবে। সাথে সাথে সুদ গ্রহণের মত জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আদবের সাথে নরম ভাষায় বুঝাতে হবে। কুরআনে কারীমের একাধিক আয়াতে সুদ খাওয়া, নেয়া-দেয়া হারাম ঘোষনা করা হয়েছে এবং এর উপর কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে হুজুর ﷺ সুদ দাতা, সুদ-গ্রহীতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষ্যদাতা সকলের উপর অভিশাপ করেছেন। (প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৪:২৪৪)

সুদ প্রদানের শর্ত ঋণ গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ আমার বড় ভাই বিদেশে যেতে চায় । এখন আমার নিকট টাকা নেই। তাই এক ব্যক্তির নিকট থেকে ২০,০০০ টাকা নিতে চাই। সে বলল- এক বৎসরে সাত হাজার টাকা লাভ দিতে হবে। তখন আমরা বললাম-আমরা লাভের উপর টাকা নিব না। তখন সে বলল, না, এটা লাভ হবে না, বরং এটা বর্গা হবে? কিন্তু সত্যিই কি এটা বর্গা হবে?

জবাবঃ বৎসরে সাত হাজার টাকা লাভ প্রদানের শর্তে বিশ হাজার টাকা ঋণ নেয়া জায়েয হবে না। কারণ তা সুদের মধ্যে শামিল, বর্গা নয়। আর সুদ নেয়া যেমন হারাম, তেমনি শর'ঈ উজর ব্যতীত দেয়াও হারাম। সুতরাং, সুদ দেয়ার ভিক্তিতে শর'ঈ উজর ছাড়া কয়য নেয়া জায়েয হবে না। যিনি বলেছেন যে, ওটা সুদ নয় বরং বর্গা শরী'আত সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। সুতরাং, তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া- ৬:২৯৩)

নির্দিষ্ট পরিমাণ লভাংশ দেয়ার শর্তে টাকা ঋণ দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ এক লোক এক ব্যবসায়ীকে দশ হাজার টাকা এ শর্তের উপর দিল যে আমার টাকার লভ্যাংশ থেকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা আমাকে দিবেন। আর বাকী টাকা আপনি নিবেন। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ বর্ণিত সুরত সুদের মধ্যে গণ্য হওয়ায় তা জায়েয হবে না। কারণ- এখানে যিনি ব্যবসা করতে টাকা দিয়েছেন, তিনি নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা উল্লেখ্য করেছেন যে, তাকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা দিতেই হবে। হয়তো এমনও হতে পারে কোন মাসে লাভই হয়নি। বরং লোকসান হয়েছে বা লাভ হয়েছে, কিন্তু ৪০০ টাকার কম। তখনো তাকে ৪০০ টাকা দিতে হবে। তার নিজের যেমন লাভ থাকবে না। সুতরাং এ ধরনের সুরত শরী'আতে জায়েয নয়।

এর জায়েয সুরত এই যে, যিনি ব্যবসা করার জন্য টাকা দিয়েছেন, তিনি এভাবে দিবেন যে এই টাকার লভ্যাংশের দুভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক আমাকে দিবেন- বাকীটা আপনার। আর লোকসান হলে, সেক্ষেতে উক্ত লোকসানের দায় পুঁজিদাতাই বহন করবে।

ছিঁড়া দশ টাকা দিয়ে নয় টাকা গ্রহণ করা

জিজ্ঞাসাঃ ছিঁড়া দশ টাকার নোট দিয়ে নয় টাকা-গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

জবাবঃ ছিঁড়া টাকা দিয়ে তার বিনিময়ে কম নেয়া বৈধ নয়। কারণ টাকা-পয়সার যে প্রকার লেন-দেন জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হল উভয় দিকে সমান হওয়া চাই এবং একই বৈঠকে লেন-দেন সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা

চাই। উল্লেখিত প্রশ্নে যেহেতু উভয় দিক সমান নয়, সুতরাং তা নাজায়েয। (ফাতাওয়া আলমগীরী ৩:২১৭ ফাতাওয়া শামী ৫:২৫৭)

জরিমানার টাকা সুদে লাগানো

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যিনা করার কারণে তার শাস্তির বদলে যে আর্থিক জরিমানা দিল। অর্থাৎ প্রতি জুতার/বেত্রাঘাতের পরিবর্তে ১০ টাকা করে দিল। পরে ঐ টাকা সুদে লাগানো হয়েছে। এখন ঐ সুদের টাকা কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি না? উল্লেখ্য, গ্রামের মধ্যে দু-দল হয়ে গিয়েছে। এক দল বলছে, এই টাকা দিয়ে ডেকোরেটরের জিনিসপত্র কিনে জনগণের স্বার্থে ভাড়া দেয়া হবে। আরেক দল বলেছে, এই টাকা দিয়ে মাদরাসার ইস্তিঞ্জাখানা তৈরী করা হবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে সঠিক সমাধান কি?

জবাবঃ হানাফী মাযহাব অনুযাযী কোন অন্যায়ের প্রেক্ষিতে আর্থিক জরিমানা উসুল করা জায়েয নয়। যদি কোথাও অন্যায়কারী থেকে জরিমানা উসুল করা হয়, তাহলে ঐ টাকা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কারণ এই টাকার মালিক সেই অন্যায়কারী। আর হাদীসে এসেছে- কোন মুসলমানের মাল তার অন্তরের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্যের জন্য হালাল নয়। (প্রমান: ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১৮৪ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৩৭২)

উপরন্তু সুদ কুরআন এবং হাদীস দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই একবার তো জরিমানা উসুল নাজায়েয হয়েছে, তার পরে আবার ঐ টাকা সুদী কারবারে লাগানো হয়েছে। দ্বিগুণ হারাম হয়েছে। বস্তুত এ জন্যই শরী'আতে ইলমে দীন অর্জন করা ফরয করা হয়েছে। কারণ- ইলম না থাকলে এভাবে একের পর এক ভুল হতে থাকে, অথচ বুঝতে পারে না।

এখন সুদে যে টাকা হয়েছে, ঐ টাকা অন্যায়কারী নিজের কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে উচিত হবে যার থেকে সুদ নেওয়া হয়েছে সম্ভব হলে তাকে ফেরত দেওয়া। অন্যথায় ঐ টাকা সাওয়াবের নিয়্যত না করে মসজিদের বা মাদরাসার ইস্তিঞ্জা খানার নির্মাণে দিয়ে দেয়া, বা সাওয়াবের নিয়্যত ব্যতিরেকে কোন গরীবকে দিয়ে দেয়া। উক্ত সুদের টাকা দ্বারা ডেকোরেটরের জিনিসপত্র ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে তা জায়েয হবে না।

বাড়ি ভাড়ার বিনিময়ে গৃহ ঋণ গ্রহণ করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যাংক যদি কাউকে বাড়ী করার জন্য এই শর্তের উপর ঋণ দেয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাড়ী নির্মাণে যে পরিমাণ টাকা ঋণ দেয়া হবে, ঐ পরিমাণ টাকাই ফেরত দিতে হবে এবং টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বাড়ীর যা ভাড়া আসবে, তা থেকে ঋণদাতাকে অংশ হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিতে হবে। উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী টাকা ঋণ এনে বাড়ী করা জায়েয হবে কি না? এবং ভাড়া থেকে নিদিষ্ট অংশ দেয়া সুদ হবে কিনা?

জবাবঃ প্রশ্নের বর্ণনা মতে ব্যক্তি বা ব্যাংকের সাথে বাড়ী নির্মাণকারীর যে চুক্তি হয়েছে, তা ঋণ বা ঋণের চুক্তি আর শরী'আতে ঋণ দিয়ে বেশী উসূল করা সুদ ও হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ঋণ দিয়ে লাভ -গ্রহণ করা বা বেশী নেয়া সুদ। সুতরাং, জায়েয লেন-দেন করতে হলে, ঋণদাতা ব্যক্তি বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রদেয় টাকা থেকে বেশী গ্রহণ করতে পারবে না। বাড়ী নির্মাণকারীও পরিশোধের বেশী দিতে পারবে না। মূল ঋণের থেকে বেশী লেন-দেন সুদ হবে এবং উভয়পক্ষ গুনাহগার হবে। (প্রমাণঃ বাদায়িয়ুস সানায়ি- ৭:৩৯৫)

তবে এ জাতীয় লেন-দেন জায়েয ভাবে করতে হলে এভাবে করতে পারে যে, ঋণ দাতা নিজের লোক দ্বারা বাড়ী তৈরীর সামগ্রী খরিদ করে একটু বেশী দামে নির্ধারিত সময়ের জন্য বাকীতে বাড়ী নির্মাণকারীর নিকট বিক্রি করে দিবে এবং বাড়ীওয়ালা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালের দাম পরিশোধ করে দিবে। (প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন, ৮৫৯ আল-বাহরুক রায়িক ৬:১১৪)

টাকার পরিবর্তে টাকা ও ধান

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় একটা নিয়ম চালু আছে, আশ্বিন মাসে ১০০০/- (এক হাজার টাকা) দিবে, সেই টাকার পরিবর্তে পৌষ মাসে ১ বস্তা ধান আর মাঘ মাসে আবার তাহার ১০০০/- (এক হাজার টাকা) ফেরৎ দিতে হয়। এখন কথা হল- এই টাকা যদি কেউ নেয় সে কি গুনাহগার হবে? আর যে দিবে সে কতটুকু গুনাহগার হবে ।

জবাবঃ আপনাদের এলাকায় যে নিয়ম চালু আছে এটা ইসলামী শরী'আতে বৈধ নয়। ১০০০/- টাকার পরিবর্তে ১০০০/- টাকাই পাবে। অতিরিক্ত যা নেয়া হয় সেটা সম্পূর্ণ সুদ। কারণ, হাদীসে এসেছে ঋণের বিনিময় যে লাভ নেয়া হয় তা সুদ। আর আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করেছেন। এটা জায়েয ভাবে করতে হলে বাইয়ে সালামের ৮টি শর্ত পূর্ণ করতঃ শুধু নির্ধারিত কয়েক বস্তা ধান নিবে। কোন টাকা ফেরত নিবে না। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৫:১৬৬)

ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি থেকে হাওলাত নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি ব্যাংক থেকে সুদের মাধ্যমে কিছু টাকা লোন নেয়। সেই লোনের টাকা আমি যদি তার থেকে হাওলাত নিয়ে আমার নিজের ব্যবসায় খাটাই, তাহলে সেটা আমার জন্য জায়েয হবে কি না? উল্লেখ্য-

সে আমার নিকট থেকে কোন প্রকার লাভ বা সুদ গ্রহণ করবে না; বরং মূল টাকাই তাকে ফেরত দিতে হবে।

জবাবঃ উক্ত ঋণ গ্রহিতা ব্যক্তির নিকট থেকে টাকা হাওলাত নিয়ে আপনার ব্যবসায় খাটানো জায়েয হবে। কারণ সে তো আপনার থেকে কোন লাভ বা সুদ নিবে না। তবে সে ব্যক্তি যদি বিনা অপারগতায় ব্যাংক থেকে সুদের উপর লোন নিয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। (প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ২:২৭ বাদায়িয়ুস সানায়ি ৭:৩৯৫)

গ্রামীণ ব্যাংক থেকে লোন নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ এদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের অসংখ্য সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকসহ আরো অনেক সংস্থা-গরীব লোকদেরকে সুদ ভিত্তিক লোন বা ঋণ দেয়। অনেকে ঠেকায় পড়ে ওদের থেকে ঋণ নেয়, অনেকে অর্থলোভে মিথ্যা ভাবেও ওদের থেকে ঋণ নেয়। আমার জিজ্ঞাসা, ওদের থেকে ঋণ নেয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয কি-না?

জবাবঃ ঋণ নেয়াটাই শরী'আতের দৃষ্টিতে নেহায়াত অপছন্দনীয়। পরিবার পরিজনের খাওয়া বা চিকিৎসার মত জরুরী দরকারে নিরুপায় হলে, ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আনন্দ-উৎসব কিংবা অনর্থক ব্যয় ও নাজায়েজ কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ নিষেধ। ঋণ দাতার জন্যও বেহুদা কাজে ও অন্যায় কাজের সহযোগিতা উদ্দেশে ঋণ দেয়া নাজায়েয। তাই ঋণ কি কাজে দিচ্ছে, এ ব্যাপারেও তাহকীক করা প্রয়োজন।

আর সুদের শর্তে ঋণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম। অবশ্য জরুরী দরকারে ঠেকায় পড়ে কেউ যদি একান্ত সুদবিহীন ঋণ কোথাও না পায়, তাহলে তার জন্য ঠেকা দূর করা পরিমাণ সুদভিত্তিক ঋণ নেয়া জায়েয হবে। তবে মিথ্যা বলে আত্মতুষ্টি বা পয়সা বাড়ানোর জন্য যারা খৃষ্টান এন.জি.ও বা

মিশনারীদের থেকে সুদভিত্তিক লোন বা ঋণ নিচ্ছে, তারা উল্লেখিত গুনাহ ছাড়াও আরো কয়েকটি গুণাহে কবীরা করছেঃ (ক) ধোকা ও মিথ্যার আশ্রয়, (খ) বিনা অপরাগতায় সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ, (গ) বেদীনদের করুণাধীন হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং তাদের উচিৎ মাসআলা জানার সাথে সাথে ঐ লোন ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেয়া। আর যারা অপারগ হয়ে নিচ্ছে, তাদেরও উচিত ছিল, যদি একান্ত সুদের শর্তে ঋণ নিতেই হয়, তাহলে এমন ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে নেয়া যারা অন্ততঃ কখনো ঈমান হরণ করার চেষ্টা চালাবে না। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, বৃটেন, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ড-এর যে সব সেবা সংগঠন সেবার নামে এদেশে কাজ করছে, তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের শুধু সেবা করা নয়; বরং তারা একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুসলমানদের ঈমান হরণ ও এ দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের ন্যায় একটি খৃষ্টরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তারা এদেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। তাদের এই উদ্দেশ্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য এখন তারা সাহায্য-সহানুভূতি সরকারীভাবে না দিয়ে এদের মাধ্যমে দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছে। এরা মসলার ব্যবসা করতে এসে নিকট অতীতে পুরা ভারতবর্ষের শুধু মালিক নয়, বরং বিধানদাতা সেজে বসেছিল। প্রায় দু-শ বছর এদেশের মুসলমানদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। অসংখ্য উলামাকে শহীদ করেছিল। সে ইতিহাস বড়ই করুণ। দ্বিতীয়বার তারা সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে এসেছে। তবে শুধু পলিসি বদল করেছে। যাতে মুসলমানগণ তাদের পুরাতন দুশমন দেখে চিনতে না পারে ।

যা হোক, তারা তাদের উদ্দেশের পথে অনেক এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের মুহুর্তে এদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল আড়াই লাখ।

বর্তমানে তাদের সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৫ লাখে। বিগত চেয়ারম্যান নির্বাচনে অনেক এলাকা থেকে তাদের লোক ইলেকশন করেছে। আর এসব এনজিওগুলো তাদের সংশ্লিষ্ট সমর্থকদেরকে তাকীদ করে বলে দিয়েছে তাদেরকেই ভোট দিতে অন্য কোন প্রার্থীকে ভোট না দিতে। এমনিভাবে জাতীয় নির্বাচনেও তারা লোক সেট করার চিন্তা ভাবনা করছে। যাতে করে তাদের নিজস্ব লোক সংসদ সদস্য হয়ে, মন্ত্রী মিনিস্টার হয়ে খৃস্টরাজ্যের পথ সুগম করতে পারে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে তারা জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক লোকদের সমন্বয়ে একটা রাজনৈতিক দল তেরী করতে সমর্থ হয়েছে। এভাবে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং সামনের পরিস্থিতি এমন জটিল আকার ধারণ করতে যাচ্ছে যে, কোন সরকারও তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার ক্ষমতা রাখবে না। যে-ই বলতে যাবে, তার দেশ ছাড়া হয়ে ভিন্ন দেশে পাড়ি জমাতে হবে। বর্তমানে এরা প্রচুর জমি খরিদ করে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অফিস নামের কেল্লা তৈরি করে চলছে। অস্ত্রে নয়, বুদ্ধি আর প্রচারণার মাধ্যমে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া যে সব গরীবদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিচ্ছে, ভবিষ্যতে অনাদায়ে এসব গরীবদের জমিনের মালিক হতেও এরা চেষ্টা করে। এসব কথা সামনে রেখে মুসলমানদের উচিত এসব এন,জি,ওর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, এদের সেবায় প্রলুব্ধ না হওয়া। নতুবা এদের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ না হওয়া। নতুবা এদেশের ভবিষ্যৎ বড়ই তিমিরাচ্ছন্ন হবে, যা সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা কল্পনাই করতে পারবে না। এদের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকলে, খুব তাড়াতাড়ি এদেশের অবস্হা টলটলায়মান হতে বাধ্য। যেমন ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ায়। অনেক দীনদার মুসলমান না বুঝে এদের সমর্থন করে থাকে যে, এরা গরীবদের খুব সাহায্য করছে। এ সাহায্য তো আর কেউ করছে না। ঐ সব দীনদার ভাইদের খিদমতে

আরজ, মনে করুন, আপনি বড়ই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। এক লোক আপনাকে এক গ্লাস পানি দিয়ে উপকার করতে তৈয়ার, কিন্তু আপনার একান্ত বন্ধু বলল যে, ঐ পানিতে ঘুমের ওষধ মিশ্রিত আছে, তখন সাময়িক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আপনি কি ঐ পানি পান করে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সর্বস্ব হারাতে তৈরী হবেন? নাকি ঐ পানি গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন? তেমনিভাবে ওরা এদেশের স্বাধীনতা ও মুসলমানদের ঈমানের বদলে সেবা করছে, সেই সেবা গ্রহণ করা কতটুকু উচিত হবে, তার ফায়সালা বিবেকবান মানুষদের উপরই ন্যস্ত। ইন্দোনেশিয়া মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দেশ। সেখানে খৃস্টান মিশনারীদেরকে বাংলাদেশের ন্যায় সেবার অবাধ সুযোগ দেয়া হয়েছিল যার পরিণতিতে সেবার নামে প্রতারণা করে খৃষ্টানরা হাজার হাজার সরলপ্রাণ মুসলমানদের খৃষ্টাণ বানিয়েছে। যার কারণে এখন সে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্নের পথে। বিশ্ব মুসলিমের দরবারে সে দেশকে বাঁচানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণ যদি সচেতন না হয়। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন গ্রুপে যদি খৃষ্টানদের লাগাম চেপে না ধরেন এবং নিজেদের ক্ষমতার মোহে এদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে কথা না বলেন, বরং এদের সেবার নামে প্রতারণাকে দেশের কল্যাণ এবং তাদের কৃতিত্ব ভাবতে থাকেন, তাহলে এরা ইন্দোনেশিয়ার মত এদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিবে। এদেশের মুসলমান দ্বিতীয়বার ইংরেজদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হবে, এর জন্য ক্ষমতাসীনরা ইয়াসির আরাফাতের মতই দায়ী হবেন, যে নিজের দেশ ও জাতিকে পদ ও অর্থের লোভে ইয়াহুদ ও নাসারাদের নিকট বিক্রয় করে, বাবাক হাফীয ও নজীবুল্লাহর মত ইসলামের দুশমনদের দালালী করে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ।

প্রাইজ বন্ডের পুরষ্কার

জিজ্ঞাসাঃ প্রাইজ বন্ডের 'ড্র' বাবদ যে পুরষ্কার দেয়া হয়, তা জায়েয কিনা?

জবাবঃ প্রাইজ বন্ড ক্রয় বিক্রয়ে যদিও আসল টাকা নষ্ট হয় না। পুরষ্কার না পাওয়া গেলেও যে কোন সময় টাকা উঠানো যায়, তথাপি তা দ্বারা সুদ ও জুয়ার কাজে সহযোগিতা করার দরুন তা ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। প্রাইজবন্ডের পুরষ্কারের টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কারণ, উক্ত টাকা শরী'আতে বর্ণিত সুদের আওতায় পড়ে। অতিসত্ত্বর তা ফেরত দিয়ে নিজ টাকা ফেরত নিয়ে নিতে হবে। আর মাসআলা না জানার কারণে কেউ যদি প্রাইজ বন্ড কিনে থাকে এবং পুরষ্কার পায় তাহলে উক্ত টাকা সাওয়াবের নিয়্যত না করে গরীব লোকদের মাঝে বন্টন করে দিবে। (প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:২৯৭ নিযামুল ফাতাওয়া, ১: ৩৮-৩৯ নিযামুল ফাতাওয়া, ২: ৪০-৪১)

প্রাইজ বন্ড ও লটারী

জিজ্ঞাসাঃ (ক) ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাইজ বন্ড ও ডায়াবেটিক লটারী জায়েয কিনা?

(খ) টিভিতে প্রচারিত ইসলামী অনুষ্ঠান উজ্জীবন এ লটারীর মাধ্যমে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ণয় করা হয়। এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

জবাবঃ (ক) প্রাইজ বন্ড ও ডায়ারেটিক লটারীর পুরষ্কার গ্রহণ করা জায়েয নয়। বরং উক্ত পুরষ্কার সুদ ও জুয়ার মধ্য শামিল।

(খ) সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরনের জন্য লটারীর মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নির্ণয় করা জায়েয আছে এবং উক্ত সুরতে কোন অসুবিধা না থাকায় পুরষ্কার গ্রহণ করাও জায়েয আছে।

তবে মনে রাখতে হবে, টেলিভিশন রাখা, দেখা, দেখানো ও টেলিভিশনে কোন কিছু শুনা বা শুনানো নাজায়িয ও হারাম। কারণ- বর্তমানে টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে বেহায়া, অশ্লীন ও অবৈধ প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। যা সম্পূর্নরূপে শরী'আত পরিপন্থী। যেমন, প্রানীর ফিল্ম, ছবি-বাজনা, খেলা-তামাশা, নাচ-গান, বেগানা-বেপর্দা মেয়েলোক ও ছতরহীন খেলোয়াড়দেরকে দর্শন করা প্রভৃতি। টেলিভিশনের মালিকের আমলনামায় টেলিভিশন দেখার ও সকল দর্শকের গুনাহর সমপরিমাণ গুনাহ লিখা হবে। আর দর্শকের আমলনামায় তার একার গুনাহ লেখা হবে।

শরী'আত যে সমস্ত জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছে তা সর্বাবস্থায় হারাম। চাই দুনিয়ার কাজের জন্য হোক, চাই দ্বীনের কাজের জন্য হোক। দ্বীনের প্রচারের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোন হারাম কাজের সাহায্য নিতে বলে নি। তাছাড়া হারামের সাহায্যে কখনো দ্বীনের প্রচার হতে পারে না। বরং দ্বীনের দাফন হতে পারে। সুতরাং, ইসলাম প্রচারের স্বার্থে হলেও কোন জানদার প্রাণীর ছবি বা ভিডিও করা বা তা সিনেমা- টেলিভিশনে দেখানো নাজায়িয।

অবৈধ উপার্জনকারীর দান সদকা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি ঘুষ বা সুদের মাধ্যমে উপার্জন করে বলে জানা আছে। সে ব্যক্তি যদি মসজিদ মাদরাসা বা কোন দীনী প্রতিষ্ঠানে দান করে তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

জবাবঃ যদি এরূপ ব্যক্তির অধিকাংশ মাল হালাল হয় অথবা নির্দিষ্ট হালাল মাল থেকে দান করে বলে জানা যায় তাহলে তার দানকৃত টাকা মাদরাসা-মসজিদ ও দীনী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি তার অর্ধেক বা অধিকাংশ মাল হারাম হয় অথবা নির্দিষ্ট ভাবে হারাম অর্থই দান করে বলে জানা যায় তাহলে তার দানকৃত টাকা গ্রহণ করা যাবে না। (প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া,৮:১০৩)

ঘুষ দিয়ে চাকুরী গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়া কতটুকু পাপ। যে ঘুষ দিয়েছে এবং যে গ্রহণ করেছে, তাদের উভয়ের পাপ কি সমান হবে? যে ঘুষের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে, সে কতটুকু পাপ করেছে?

জবাবঃ ঘুষ নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম এবং কবীরা গুনাহ। আর সাধারণ অবস্থায় ঘুষ দেয়াও হারাম এবং কবীরা গুনাহ। তবে জান-মাল ও ইজ্জত থেকে জুলুম দূর করার জন্য বা বৈধ জিনিস রক্ষা করার জন্য অপারগ হয়ে ঘুষ দেয়ার অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে ঘুষ দাতা গুনাহগার হবে না, তবে ঘুষ গ্রহীতা সর্ব অবস্থায় গুনাহগার হবে। ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়ার ব্যাপারে শর'ঈ হুকুম হলো,

(ক) যদি আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয় এবং আর্থিক সংকটের কারণে চাকুরী করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং (খ) ঘুষ ছাড়া যদি কোন রকম চাকুরী না পাওয়া যায় এবং (গ) তার মধ্যে আবেদনকৃত পদের দায়িত্ব পালনের যথাযথ যোগ্যতাও থাকে, তাহলে তার প্রাপ্য হক ও অধিকার আদায়ের জন্য অপারগ অবস্থায় ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়ার অবকাশ আছে। এতে দাতার কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু গ্রহীতার মারাত্মক গুনাহ হবে। আর যদি উল্লেখিত শর্ত সমূহ না পাওয়া যায়, তাহলে ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়া

জায়েয হবে না। (প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ১:২৪৮ ইবনে মাযাহ্ শরীফ, ১৬৭)

ঘুষ দিয়ে বা প্রতারণা করে চাকুরী গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ আমি ১৯৯৩ ইং সনে মাস্টার্স পাশ করেছি। পাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত একটা চাকুরীর জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু সোজা পথে চাকুরী হচ্ছে না। কমপক্ষে ২৫/৩০টি মৌখিক পরীক্ষায় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলাম। তবুও চাকুরী হয়নি। আমার পেছনে কোন লোক নেই, কোন কিছু করার মত। অথচ অবৈধ পথ অবলম্বন করলেই চাকুরী হয়ে যায়। এদিকে আমার চাকুরীর বয়স আর মাত্র ৮ মাস রয়েছে। অপরদিকে আমার চাকুরী অত্যন্ত দরকার। এমতাবস্থায় ঘুষ প্রদান করে চাকুরী গ্রহণ করা জায়েয হবে কিনা? অথবা প্রতারনা করে চাকুরী গ্রহণ করা ঠিক হবে কিনা? অথবা কোন নারীকে বিয়ে করে চাকুরী নেয়া ঠিক হবে কিনা?

জবাবঃ সুদ-ঘুষ গ্রহণ শরী'আতের দৃষ্টিতে যেমনি হারাম, তেমনিভাবে সুদ-ঘুষ দেয়াও হারাম। ঘুষ দেয়া-নেয়া নাজায়েয হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ক্ষেত্রে দেয়া জায়েয। যেমন- বিশেষ অপরগতার ক্ষেত্রে জান, মাল বা অন্য কোন ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য বা জুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচার বা আত্মরক্ষার জন্য শরী'আত ঘুষ দেয়া জায়েয রেখেছে। এক্ষেত্রে দাতা গুনাহগার হবে না, কিন্তু গ্রহীতা গুনাহগার হবে। কারণ ঘুষ-গ্রহণ কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। সুতরাং, ঘুষ এড়িয়ে অন্য কোন হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলে, ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়া জায়েয হবে না। আর যদি ঘুষ ছাড়া কোন হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঘুষ দিয়ে চাকুরী গ্রহণ করা জায়েয হরে, যদি চাকুরী দাতা প্রতিষ্ঠানের

প্রদত্ত শর্তানুযায়ী নিজের মধ্যে যোগ্যতা থাকে। কিন্তু নিজের অযোগ্যতা লুকানোর জন্য ঘুষ দেয়া বা কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া জায়েয নয়।

কোন দীনদার নারীকে বিয়ে করার দ্বারা হালাল চাকুরীর ব্যবস্থা হলে, বিয়ে করে চাকুরী নেয়া বৈধ হবে। তবে শুধু চাকুরীর উদ্দেশেই বিয়ে করবে না। বরং শরী'আতের নির্দেশের ভিত্তিতে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করার নিয়্যতে দীনদার মেয়েকে বিয়ে করবে। চাকুরীর লোভে বদদীন বেপর্দা মেয়েকে বিবাহ করা ঠিক হবে না। কারণ এর দ্বারা কিছু পয়সার ব্যবস্থা হলেও নিজের দীনদারী বরবাদ হয়ে যাবে। একজন মুসলমানের নিকট তার দীনদারী সব কিছুর উর্ধ্বে।

ঘুষ দিয়ে বিল পাশ করানো

জিজ্ঞাসাঃ আলেম সাহেবদের মুখে শুনি ঘুষ খাওয়া ও দেয়া উভয়ই হারাম, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ তথা অন্য রাষ্ট্রেও ঘুষের কালো হাত থেকে বাঁচা দুস্কর। এমতাবস্থায় আমি একজন কন্টাক্টার ঘুষ না খেলেও কমপক্ষে ২ লাখ টাকার বিল পাশ করতে হলে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। অন্যথায় ৬ মাস-এক বছরেও বিল পাশ করানো সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দেয়া আমার জন্য জায়েয কি না? যদি না হয়, তবে এই জগতে বাঁচার কি উপায় আছে, যা ইসলাম সম্মত হবে।

জবাবঃ সুদ-ঘুষ গ্রহণ শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। কোন অবস্তায়ই ঘুষ গ্রহণ বৈধ নয়। তেমনিভাবে সুদ-ঘুষ দেয়াও হারাম। তবে শরী'আতে অপারগতার ক্ষেত্রে যেমন জান-মাল, ইজ্জত-আবরু, অন্য কোন ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য এবং নিজের থেকে জুলুম দূর করার জন্য ঘুষ দেয়ার অনুমতি আছে। এক্ষেত্রে দাতা গুনাহগার হবে না, কিন্তু গ্রহিতা গুনাহগার হবে। ঘুষের পয়সা গ্রহিতার জন্য সর্বাবস্থায়ই হারাম হবে। তবে

কাজ ঠিক মত না করে যদি অহেতুক বেশী বিল করেন, আর তা পাশ করানোর জন্য ঘুষ দিতে হয় তাহলে দেয়া নাজায়েয।

সুতরাং, প্রশ্নকারী যদি ঘুষ এড়িয়ে অন্য কোন হালাল উপায়ে তার বিল পাশ করানোর ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে তার জন্য ঘুষ দিয়ে বিল পাশ করানো জায়েয হবে না। আর যদি অন্য কোন হালাল উপায়ে বিল পাশের ব্যবস্থা সম্ভব না হয়, তাহলে তার ন্যায্য হক আদায়ের জন্য ঘুষ দিতে পারবে। তবে যেহেতু প্রশ্ন উল্লেখিত কাজে আপনার বর্ণনা মতে, সাধারণতঃ ঘুষ ছাড়া বিল পাশ হয় না, তাই সম্ভব হলে উক্ত কাজ না করে অন্য কোন হালাল ব্যবসা অন্বেষণ করে জীবিকা নির্বাহ করার ফিকির করা বাঞ্ছনীয়। (প্রমাণঃ আল-বহরুর রায়িক,৬:৪৪১)

বন্ধক, ইজারা, বর্গা

জমি, এগ্রিমেন্ট বা রেহান পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জমি এগ্রিমেন্ট বা রেহান দেওয়া হয়। এই শর্তে জমি এগ্রিমেন্ট রাখা হয় যে আমার এক বিঘা জমি ১০,০০০/- টাকার বিনিময়ে অন্য একজনকে অর্থাৎ টাকা দাতাকে ২/১ বৎসরের জন্য জমি ভোগ দখল করে খাওয়ার জন্য দিলাম। আমি যখন টাকা ফেরত দিব তখনই টাকা দাতা আমার জমি আমাকে বুঝিয়ে দিবেন। এই পদ্ধতিতে জমি এগ্রিমেন্ট বা রেহান দেওয়া জায়েয কিনা?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের লেন-দেন ও শর্তারোপ শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। এ পদ্ধতিতে জমি গ্রহণকারী যে ফসল লাভ করবে তা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। তাছাড়াও আমাদের দেশে জমি বন্ধক নেওয়ার এ জাতীয় যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে যথা প্রতি বছর মূল টাকা থেকে জমির খাজনা বা তার ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা কর্তন দিয়ে জমি ভোগ করা ইত্যাদি এ জাতীয় সব ধরণের মু'আমালাহ শরী'আতের দৃষ্টিতে সুদের কারবার ও নাজায়েয। কেননা, বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকের জিনিস ভোগ করা বা তার থেকে ফায়দা উঠানো সুদ ও হারাম। (প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ৬:৪৮২/ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৫৪)

জিনিসপত্র বা জমি বন্ধক রাখার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ কোন জিনিস যেমন সাইকেল, ঘড়ি, তলোয়ার অথবা জমি বন্ধক রাখার ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি? তা জানালে খুশী হব।

জবাবঃ ব্যক্তিগত কোন জিনিস যেমন সাইকেল, ঘড়ি, তলোয়ার অথবা জমি ইত্যাদি কারো কাছ থেকে কোন পাওনার বিনিময়ে এই শর্তের উপর বন্ধক রাখা যে, যতদিন উপরোক্ত হক বা পাওনা পরিশোধ না করবে,

ততদিন পর্যন্ত উক্ত জিনিস বন্ধক থাকবে এবং যখন সম্পূর্ণ প্রাপ্য বুঝিয়ে দিবে, তখন সম্পূর্ণ জিনিস সে ফেরত দিবে। এ ধরনের লেন-দেনকে শরী'আতে বৈধ ঘোষণা করেছে।

এখানে জেনে রাখা জরুরী যে, বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকের জিনিস ভোগ ব্যবহার করা বা তা থেকে কোন প্রকার ফায়দা হাসিল করা জায়েয নেই। (প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ, ২:৩১ ফাতাওয়া শামী ৬:৪৯৮ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৫)

জমি এগ্রিমেন্টের বৈধ পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী জমি এগ্রিমেন্ট রাখা জায়েয আছে কি-না? এগ্রিমেন্ট রাখার সহীহ,পদ্ধতি কি জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ প্রচলিত পন্থায় জমি এগ্রিমেন্ট রাখার অর্থ হচ্ছে, জমি বন্ধক রাখা। আমাদের দেশে জমি বন্ধক দেয়া-নেয়ার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে নিম্নরূপ- প্রতি বছর মূল টাকা থেকে খাজনা বা তার ক্ষতিপূরণ স্বরপ কিছু টাকা কর্তন দিয়ে জমি ভোগ করা অথবা বন্ধক গ্রহণকারী জমির ফসল খেয়ে যাবে, আর তার বিনিময়ে প্রতি বছর মূল টাকা থেকে স্বল্প পরিমাণ টাকা কমে যেতে থাকবে অথবা মোটেও কর্তন না দিয়ে জমি ভোগ করা। এ ধরনের সকল লেন-দেনই শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম। কেননা, বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকের জিনিস ভোগ করা বা তার থেকে উপকৃত হওয়া সুদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত।

এ ধরনের লেন-দেনে টাকা কর্য দেয়া হয়ে থাকে বলেই নাম মাত্র কিছু খাজনা আদায় বা একশত টাকা কর্তনের বিনিময়ে অনেক জমি ভোগ করার সুযোগ লাভ হয়। অথচ টাকা কর্য না দিয়ে এত অল্প টাকায় ঐ পরিমাণ জমি ভাড়া নেয়া সম্ভব ছিল না। হাদীস শরীফে আছে কর্যের

বিনিময়ে যে লাভ আসে, তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৪৮২ বাদায়িউস সানায়ি ৬:১৪৫ আযীযুল ফাতাওয়া ৬৬১ ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া ৫০৬)

তবে জায়েয পদ্ধতিতে এ ধরনের লেন-দেন করতে হবে প্রথমে জমি (ইজারা) ভাড়া স্বরূপ গ্রহণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে জমির মালিক থেকে বাৎসরিক ভাড়ার পরিমাণ ও সময়সীমা নির্ধারিত করে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া নিয়ে শর্তানুযায়ী নির্ধারিত বছর পর্যন্ত জমি ভোগ দখলের চুক্তি কররে। এক্ষেত্রে জমির মালিকের বেশী টাকার প্রয়োজন হলে এক সঙ্গে কয়েক বৎসরের ভাড়া ঠিক করে তাকে উক্ত বছর সমূহের টাকা অগ্রিম দিয়ে দিতে পারে।

(প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৪:৪১৩ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৩:৮১)

জমি বর্গা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় জমি বর্গা দেয়ার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহলো এই যে, জমির মালিক নিজে চাষাবাদ করতে না পারায়, অন্য একজন কৃষকের নিকট জমি এই শর্তে দেয় যে, জমিতে কৃষক চাষাবাদ করবে শ্রম দিয়ে এবং যাবতীয় খরচ বহন করবে। জমির উৎপন্ন ফসল কৃষক নিজে অর্ধেক রাখবে। আর বাকী অর্ধেক জমির মালিককে দিয়ে দিবে। এ পদ্ধতি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয কি-না?

জবাবঃ আপনার এলাকার জমি বর্গা দেয়ার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তা জায়েয। (প্রমাণঃ হিদায়া ৪:৪২৬)

পশুপাখী বর্গা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ পশু-পাখী বর্গা দেয়া জায়েয আছে কি-না? যদি জায়েয থাকে, তার নিয়ম কি?

জবাবঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী গরু-ছাগল ইত্যাদি ভাগে দেয়া জায়েয নয়। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মে যদি কেউ ভাগে দেয় এবং তাদের মধ্যে কোন গোলমাল না হয়, তাহলে তা নিয়ে বিবাদের দরকার নেই। কারণ, তা আমাদের মাযহাব অনুযায়ী জায়েয না হলেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতে জায়েয আছে। বর্তমানে উক্ত মু'আমলা ব্যাপক আকার ধারণ করার কারণে হযরত থানবী রহ. হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী ফাতাওয়া দিয়েছেন। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কেউ উক্ত মু'আমালা করতে চাইলে, তার নিয়ম এই যে, গরু দাতা অন্যকে বলবে আমার গরুটা তুমি এক বছর লালন-পালন কর। তোমাকে ৫০০ টাকা দিব। এর পরে ঐ টাকা না দিয়ে তার পরিবর্তে উভয়ের সন্তুষ্টির মাধ্যমে যদি গরুর বাছুর বা ছাগলের বাচ্চা দেয়, তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু প্রথমেই এই শর্ত করা যে, এক বছরে বাচ্চা আমার; অন্য বছরের বাচ্চা তোমার; এরূপ জায়েয নয়। (ইমদাদূল ফাতাওয়া ৩:৩৪২)

কড পদ্ধতিতে জমি লেন-দেন

জিজ্ঞাসাঃ কড়ে জমি লেন-দেন জায়েয কি-না? কত বলতে আমাদের দেশের সাধারণত নিম্নোক্ত রূপটিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি দশ হাজার টাকার পরিবর্তে এক বিঘা জমি কাউকে এই শর্তে ভোগ করতে দেয় যে প্রতি বছর ১০০/২০০ টাকা কর্তন করা হবে। তারপর যখন অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হবে তখন জমি ফেরত দেয়া হবে। এভাবে পাঁচ বছর ভোগ করার পর মূল টাকা থেকে ১০০০ টাকা কম ফেরত দিলে সে পুনরায় উক্ত জমি ফেরত পাবে।

জবাবঃ কড- আঞ্চলিক শব্দ। সাধারণতঃ এর দ্বারা আরবী ইজারাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। শরী'আত সম্মত পন্থায় যদি কডে অর্থাৎ ভাড়ায় জমি লেন-দেন হয়ে থাকে তাহলে তা জায়েয হবে। তবে আপনি যে পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন তা বৈধ তখনই বৈধ হবে, যখন কর্তনকৃত টাকার পরিমাণ জমির প্রকৃত ভাড়ার চেয়ে কম না হবে। প্রচলিত বাজার দর হিসেবে সাধারণতঃ একটা জমির বাৎসরিক যে ভাড়া হতে পারে সেই পরিমাণ টাকা প্রত্যেক বছর কর্তিত হতে হবে, তাহলে সে লেন-দেন জায়েয হবে। তা না করে তার পরিবর্তে নাম মাত্র ভাড়া হিসেবে বৎসরে দেড়-দু'শ টাকা কর্তন করা হলেই উল্লেখিত মু'আমালা দুরস্ত হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে ঋণের বিনিময়ে সুবিধা গ্রহণ করার দরুণ তা সুদী লেন-দেনের মধ্যে শামিল হবে। (প্রমাণঃ শামী ৬:৪৮২ কানযুল উম্মাল ৬:১২৪ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৫৪)

শ্রমিককে তার হস্তে কর্তিত ফসল থেকে মজুরী দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত পন্থা যে, যে সকল কিষাণেরা ক্ষেতের ফসল কেটে দেয় বা গাছের ফল পেড়ে দেয়, তাদেরকে ঐ কর্তিত ফসল বা ফল থেকে মজুরী হিসাবে একটা অংশ দেয়া হয়। শরী'আত মতে এর বিধান কি?

জবাবঃ এ ব্যাপারে আমাদের দেশের প্রচলিত সে পন্থা আছে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তা জায়েয নয়। কারণ, শ্রমিককে কর্তিত ফসল থেকে মজুরী দেয়া হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইজারায়ে ফাসিদা। তবে কর্তিত ফসলের কথা উল্লেখ না করে নির্ধারিত কাজের বিনিময়ে নির্ধারিত পরিমাণ ফসল বা ফল দেয়া সাব্যস্ত করলে এবং পরে কর্তিত ফসল বা ফল হতেই সে নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী দিলে নাজায়েয হবে না। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৪:৪৪৪ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৪:২৭৫)

মুসলমানের খৃষ্টান ভাড়াটে রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় জনৈক বাড়ীওয়ালা খৃষ্টান লোকদের নিকট বাড়ী ভাড়া দিয়েছে। বাড়িটির চার ভিটায় চারটি ঘর; ২টি খৃষ্টানদের নিকট ভাড়া দিয়েছে। তাদের এবং মুসলমানদের মাঝখানে কোন প্রকার পর্দা নেই। একই টিউবওয়েল ও একই পায়খানা তারা সকলে ব্যবহার করে। ছেলে-মেয়েদের খেলা-ধুলা, মেলা-মেশা তাদের সাথে হয়ে থাকে। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজে এভাবে খৃষ্টান ভাড়াটে রাখা জায়েয আছে কি-না?

জবাবঃ বর্তমানে খৃষ্টান-মিশনারীরা সেবার নামে কুরআন, সুন্নাহ ও দীন ইসলামের বিরুদ্ধে যে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। প্রতিদিনের পত্র প্রতিকায় তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে। তারা সেবার নামে অনেক সরল প্রাণ গরীব মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ভাবে ধোকা দিয়ে, প্রলোভন দিয়ে, অনেক ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করছে। ধ্রুব সত্য যে, অদুর ভবিষ্যতে তারা এ দেশকে খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশ করার জন্য পাঁয়তারা চালাচ্ছে। যেমন করেছে তারা লেবাননে।

কিছু সাহায্য-সহায়তা ও সেবার পরই তারা খৃষ্টান ধর্মের ফযীলত ও ইসলামের অসরতা বর্ণনা ও হুযূর ﷺ এর কুৎসা রটনা করছে। এমনকি তারা বলছে, "মুহাম্মদ ﷺ মূর্খ। তার ধর্মে কিছু নেই, তার ধর্মের প্রতি তার কোন আর্শিবাদ নেই। তাই মুসলমানরা গরীব। আরবের লোকেরা জাহিল ছিল বলে মুহাম্মদ ﷺ তাদেকে ধোকা দিতে পেরেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। আর ঈসা আ. এর আর্শিবাদ আছে তাই খৃষ্টানরা ধনী। কাজেই ধনী হতে চাইলে তোমরাও খৃষ্টান হয়ে যাও।" যারা তাদের সেখানে চাকুরী করে,

তাদেরকে জোরপূর্বক বাইবেল পাঠে বাধ্য করেছে। এহেন অবস্থায় এ সমস্ত সংস্থার কোন ধরণের সাহায্য- সহযোগিতা করা যেমন, এ সমস্ত খৃষ্টান লোকদের ঘড়-বাড়ী ভাড়া দেয়া তাদের নিকট জমি বিক্রি করা তাদের ষড়যন্ত্র মিশনে চাকুরী করা বা অন্য যে কোন ভাবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা ইসলামের দৃষ্টিতে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। বরং এদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা ইসলামের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। বরং এদেরকে সর্বোতভাবে বয়কট করা জরুরী। এতদ্ব্যতীত শর'ঈ উযর ছাড়া কাফিরদের সাথে উঠা বসা চলা ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, আত্মীয়তা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম।

মোটকথা, উক্ত বাড়ীওয়ালা খৃষ্টানদেরকে ঘর ভাড়া দিয়ে নাজায়েয ও হারাম কাজ করেছে। তাই তার জন্য ভাড়া চুক্তি বাতিল করা এবং অতীত নাজায়েয কৃতকর্মের জন্য খালিস দিলে তাওবা ও ইস্তিগফার করা অপরিহার্য। (প্রমাণঃ সূরা আল ইমরান ২৮, সূরা মুমতাহিনাহ ১ ইমদাদুল মুফতীন ১০২৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২৭১)

লেন-দেনের বিবিধ আহকাম

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা

জিজ্ঞাসাঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের টাকা বৈধ কি-না?

জবাবঃ শরী'আতে সুদের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বর্ণিত আছে। সেই সংজ্ঞা হিসেবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা সুদের আওতায় পড়ে না। উক্ত বর্ধিত টাকাকে পুরস্কার বলা হয়। তা গ্রহণ করতে কোন দোষ নেই। উল্লেখ যে, সুদের সংজ্ঞার আওতায় যত লেন-দেন শামিল হবে, তা সবই সুদের মধ্যে পরিগণিত হবে। যদিও আমাদের পরিভাষায় সেটাকে সুদ বলা না হয়। যেমন, ঋণদাতার জন্য বন্ধকের জমিতে ফসল লাগিয়ে তা নিজের ভোগ করা সম্পূর্ণ হারাম ও সুদের মধ্যে শামিল। অথচ আমাদের দেশে এটাকে সুদ বলা হয় না।

আর যে সমস্ত লেন-দেন সুদের ঐ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, সেগুলো সুদ বা হারাম হবে না। যদিও আমাদের পরিভাষায় সেগুলোকে সুদ নাম দেয়া হোক। যেমন- সরকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডে বর্ধিত অর্থ সুদের আওতায় পড়ে না। তাই তার অর্থ বৈধ ।

(প্রমাণঃ জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১:২১৫ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৫:১৪৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬০)

প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা আনা

জিজ্ঞাসাঃ আমি একটি আধা সরকারী সংস্থায় চাকুরী করি। সেখানে 'কনট্রিবিউটরী' প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে পেনশন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শুধু কর্মচারীর টাকাই বেতন থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা হয়। কর্মচারীরা এ টাকা থেকে ঋণ নিতে পারে এবং শতকরা হিসাবে সুদ

দিতে হয়। আমি লিখিত ঘোষনা দিয়ে রেখেছি যে, এ টাকা থেকে ঋণ নিলে কোন সুদ দিব না এবং দিচ্ছিও না। চাকুরী শেষে ফান্ডের জমা টাকায় লাভ হিসাবে যে সুদ দেয়া হবে, তাও নিব না। মাসিক মদীনায় গত জানুয়ারী ৯৬ সংখ্যায় প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে দেখলাম, গভর্ণমেন্ট প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় যে লাভ দেয়া হয়, তা হালাল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো ।

জবাবঃ বাধ্যতামূলক যে প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, তার লাভের টাকা গ্রহণ করা জায়েয। আপনার বেতন থেকে একটি অংশ কর্তন করে তার সাথে সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত যে টাকা যোগ করে দেয়া হয়, তাতে আপনার কোন প্রকার মালিকানা হাসিল হয় না বা উক্ত টাকার উপর আপনার কোন প্রকার মালিকানা হাসিল হয় না বা উক্ত টাকার উপর আপনার কোন হাত থাকে না বলে আপনার তরফ থেকে সুদী লেন দেন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ একথা বলা যায় না যে, আপনি নিজস্ব টাকা-পয়সা সুদ পাওয়ার আশায় ইচ্ছাপূর্বক জমা করেছেন। বরং আপনার ইচ্ছা ছাড়াই সরকার আপনার বেতনের কর্তিত কিছু অংশের সাথে টাকা বর্ধিত করে আপনাকে প্রদান করছে। সুতরাং, আপনার জন্য সে টাকা গ্রহণ করা জায়েয এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে এ বর্ধিত টাকাকে ইনআম বা পুরষ্কার বলা হবে, সুদ বলা হবে না। (প্রমাণঃ কাওয়াইদুল ফিকহ, ৩০২ ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৪৮)

অন্যের জন্য কেনা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি আমাকে বাজার থেকে একটি জিনিস ক্রয় করে এনে দিতে বলায় আমি তা ক্রয় করে এনে দিয়েছি। জিনিসের ক্রয় মূল্য ছিল সাড়ে তিনশত টাকা। সেক্ষেত্রে আমি তার নিকট উক্ত জিনিসের মূল্য চারশত টাকা প্রকাশ করে ক্রয় মূল্য থেকে ভাড়া ও পারিশ্রমিক বাবদ

অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা নিয়েছি। আমার জন্য এ টাকা নেওয়া জায়েয হয়েছে কি?

জবাবঃ আপনি উল্লেখিত জিনিসটা বাজার থেকে এনে দেয়ার জন্য ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে উকীল হয়েছেন। আর শরী'আতের দৃষ্টিতে উকীল মুয়াক্কিল এর পক্ষ থেকে আমানতদার হয়ে থাকে। আর আমনতের খিয়ানত করা হারাম। সে অনুযায়ী উল্লেখিত ব্যক্তির জন্য ৩৫০/= টাকা দিয়ে জিনিসটা ক্রয় করে তার নিকট উক্ত জিনিসের মূল্য ৪০০/= টাকা বলে ৫০/= টাকা হাতিয়ে নেয়া আমানতের খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। উল্লেখ থাকে যে, উকীল তার দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে। তবে সেটা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে বা পরে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে। সুতরাং আপনি এমন কাজ করে ফেলার দরুন অন্যায় করেছেন। তাই এখন আপনার করণীয় হল মালিকের ৫০/= টাকা ফেরৎ দেয়া। পথ খরচ লেগে থাকলে তা উল্লেখ করে নিয়ে নেয়া।

(প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ১:১৭ কানযুল উম্মাল,১:৯২ হিদায়া, ৩:১৬১-১৬৮ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৩:৩১৮)

কর্য আদায় না করলে কি হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক কর্মচারী আমার নিকট থেকে কিছু টাকা কর্য নেয়ার পর অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। আমি পত্র ও লোক মারফত বার বার তাগাদা দেয়া সত্বেও সে আমার টাকা পরিশোধ করেনি। উক্ত টাকার ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ আপনার পাওনা যদি দুনিয়াতে উদ্ধার করতে না পরেন, তাহলে কিয়ামতের দিবসে অবশ্যই পাবেন। যদি মাফ করে দেন তাহলে এর

বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকেও মাফ করে দিবেন বা এর চেয়েও অনেক গুণ বেশী দান করবেন। আর যদি পাওনা উসুলের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাও করতে পারেন। (প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ,২:৪৩৫)

অনৈসলামিক এনজিওর নিকট জমি বিক্রয় ও এসব এনজিওতে চাকুরী করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন অনৈসলামিক এনজিওর (যেমন, ব্রাক, আশা, প্রশিকা ইত্যাদি) নিকট জমি বিক্রয় করা বৈধ কি-না?

তেমনিভাবে এনজিওতে চাকুরী করা বা তাদেরকে কোন প্রকার সহযোগিতা করা বৈধ হবে কি-না?

জবাবঃ একথা মনে হয় আর নতুন ভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিওরা সেবার নামে এদেশের ধর্মপ্রান নিরীহ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে তাদের ঈমান ও স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টায় লিপ্ত। সুতরাং এমতাবস্থায়ও যদি কেউ অনৈসলামিক কোন এনজিওর নিকট জমি বিক্রি করেন অথবা বাড়ী ভাড়া দেন তাহলে এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের কাজে তাকে সহায়তা করা। অথচ আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে স্পষ্ট ভাবে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য অনৈসলামিক এনজিওর নিকট বাড়ী ভাড়া দেয়া বা জমি বিক্রয় করা জায়েয হবে না।

এসব এনজিওতে চাকুরী করা বা কোন রকম সহযোগিতা করাও জায়েয হবে না। তবে পূর্ব থেকে কেউ চাকুরীরত থাকলে এবং তার জীবিকা নির্বাহ উক্ত চাকুরীর উপরই নির্ভরশীল হলে সেক্ষেত্রে অন্য কোন বৈধ চাকুরী পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত চাকুরী করা যেতে পারে। সাথে সাথে

ইস্তিগফার ও হালাল জীবিকা উপার্জনের অন্য কোন পন্থা খুঁজতে থাকবে। অন্য কোন ব্যবস্থা হলেই অনৈসলামিক এনজিও এর চাকুরী ছেড়ে দিবে। (প্রমাণঃ সূরা মায়িদাহঃ ২)

শর্ত সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট ১ হাজার টাকা ঋণ চেয়ে ছিলাম। তখন সে শর্ত আরোপ করল যে, ওমুক মাসে নয়শত টাকা পরিশোধ করতে হবে, আর সঙ্গে দুই মন ধান দিতে হবে। এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

জবাবঃ এরূপ শর্ত সাপেক্ষে টাকা পয়সা লেন-দেন করা সুদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এখানে ঋণ দেওয়াতেই একশত টাকাই দুই মন ধান পাচ্ছে অথচ টাকা ঋণ প্রদানকারী যদি গ্রহীতার নিকট থেকে কিছু লাভ গ্রহণ করে তাহলে সেটা সুদ ও হারাম হবে। (প্রমাণঃ দুররে মুখতার, ৫:১৬৬ আযীযুল ফাতাওয়া, ১:৬৪৮ জাওয়াহিরুল ফিকহ, ৩:৩৮)

ভুলবশতঃ বাসের কন্টাক্টর হতে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ কিছুদিন পূর্বে বাসে যাত্রা করা অবস্থায় কন্টাক্টরকে এক টাকা ভাড়া নেওয়ার জন্য বিশ টাকা নোট দেই। এর পর ভুলবশতঃ কন্টাক্টর আমাকে ১৯/- টাকা পরিবর্তে ৯৯/- টাকা ফেরত দেয়। উল্লেখ্য যে ঐ মুহূর্তে সেদিকে লক্ষ্য করিনি বিধায় এ ভুল ধরা পড়েনি। সুতরাং, বর্তমানে আমি ঐ উদ্ভুত সমস্যার শরী'আত সম্মত বিধান জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ আপনি যে বাসের যাত্রী ছিলেন, যদি উক্ত বাসের নম্বর স্বরণ থাকে তাহলে তা খুঁজে বের করে প্রাপকের নিকট পোঁছে দিন। অন্যথায় টাকার মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশে বাড়তি টাকাগুলো কোন গরীবকে দিয়ে দিন। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২:৩৫৭)

ছোট ভাইয়ের কাছে ঋণী হলে ঋণ পরিশোধ করা জরুরী কিনা?

জিজ্ঞাসাঃ আমার এক আত্মীয় অনেকদিন আগে তার সহোদর ছোট ভাইয়ের নিকট থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। কিন্তু কোন শর্ত ছিল না। টাকাগুলো অনেক দিন হয়ে যাওয়ার পরও পরিশোধ করা হচ্ছে না। এমনকি বড় ভাই এর স্ত্রী পুত্রগণ বলতেছে যে, তাকে বড় ভাই শিশুকাল থেকে লালন-পালন করেছে, সেহেতু তার পাওনা টাকা না দিলেও চলবে। এখানে উল্লেখ যে, ছোট ভাই- বোনদের লালন-পালন বড় ভাই করেছে কারণ তাদের মা-বাবা ছিল না। প্রশ্ন হল- ঐ ধার করা টাকা বড় ভাইয়ের পরিশোধ করা কর্তব্য নয় কি?

জবাবঃ প্রশ্ন বর্ণিত তার সহোদর ভাই থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল উল্লেখিত কথা দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, বড় ভাই ছোট ভাই এর কাছে ঋণী। আর প্রত্যেক ঋণী ব্যক্তির জন্য ঋণ পরিশোধ করা জরুরী। কেননা ঋণ এটা বান্দার হক, বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ পাক মাফ করবেন না। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "শহীদদের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন কিন্তু ঋণ বা বান্দার হক মাফ করবেন না"।

সুতরাং ,বড় ভাইয়ের জীবিত থাকাবস্থায় ছোট ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করা জরুরী, জীবিত অবস্থায় পরিশোধ না করে যেতে পারলে ওসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব।

উল্লেখ্য, ছোট ভাইকে বড় ভাই বাল্যকালে তার প্রতি যে ইহসান করেছে এখন চাপ সৃষ্টি করে সেই ইহসানের বদলা নেওয়া উচিত নয় । তবে ছোট ভাই যদি বড় ভাইকে যিনি বাবা সমতুল্য তার খিদমতের নিয়্যতে সম্পূর্ণ ঋণ বা কিছু অংশ ছেড়ে দেন, তাহলে তিনি বিরাট সাওয়াবের অধিকারী

হবেন। তবে এটা সম্পূর্ণ তার নিজের ব্যাপার। (প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ১:৩০১ হিদায়া, ৪:৬৪২ কাওয়ায়িদুল ফিকহ ১:২৯৬)

গাছের ফল বিক্রয়

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে গাছের মধ্যে রেখেই যেভাবে আম বিক্রি হচ্ছে তা সকলেরই জানা আছে। এর মধ্যে কোন সুরত জায়েয এবং কোনটা নাজায়েয বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাবঃ গাছে আম তথা ফল বিক্রয়ের বিভিন্ন সুরত হতে পারে যথাঃ

(ক) ফল সম্পূর্ণ বেড়ে সারার পর গাছে রেখেই বিক্রি করে দেওয়া। শরী'আতের দৃষ্টিতে এ সুরত সম্পূর্ণ জায়েয।

(খ) সম্পূর্ণ বেড়ে সারার পূর্বেই বিক্রি করা বা একেবারেই গুঁটি অবস্থায় অথবা সব ফল এখনো গুঁটিও বেঁধে সারে নাই কিংবা মোটেও গুঁটি বাঁধে নাই বরং সবে মাত্র ফুল হয়েছে এমতাবস্থায় বিক্রি করে দেওয়া। অতঃপর রেওয়াজ মাফিক ফল হয়ে বড় হওয়া ও পরিপূর্ণ হওয়া অবধি ক্রেতা কর্তৃক গাছে রেখে দেওয়া ইত্যাদি এসব সুরত মূলতঃ ফাসিদ। তবে কোন অঞ্চলে এরূপ লেন-দেন যদি এত ব্যাপক হয়ে যায় যে, সাধারণ মানুষকে এর থেকে ফিরানো আর সম্ভব না হয় তাহলে উমূমে বালওয়া তথা ব্যাপক প্রচলনের কারণে তা বৈধ-বলেই গণ্য হবে।

(গ) আর যদি গাছে ফল আসার আগেই ফল বিক্রয়ের প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করে তাহলে হানাফী মাযহাব মতে তা জায়েয হওয়ার কোন সুরত নাই। অবশ্য মালেকী মাযহাব মতে **বাইয়ে সালাম** হিসাবে উক্ত লেন-দেন সহীহ হতে পারে। শর্ত হল পূর্ণ মূল্য নগদ পরিশোধ হতে হবে। বা অনূর্ধ্ব তিন দিনের বাকীর শর্তে করা যাবে। অবশ্য বাকীর কোন শর্ত

না করা হলে পরে যে কোন সময়েই পরিশোধ করা যাবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৮৭-৪৯০)

সামাজিকতা ও আচার-ব্যবহার

মাতা-পিতা, উস্তাদ ও স্বামী-স্ত্রীর হক সমূহ

মা-বাবার খিদমত করতে গিয়ে ফরজে কিফায়া ছেড়ে দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমরা পাঁচ ভাই ছয় বোন। আমি সবার ছোট। আমি ছাড়া সকলেই বিবাহ করেছে। বড় ভাইয়েরা জমি জমা ভাগ করে নিয়ে পৃথক হয়েছে। একমাত্র আমিই মা-বাবাকে নিয়ে সংসার করছি। মা-বাবা এখন অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তারা অন্য ভাই বোনের সংসারে যাবে না বিধায় আমি ব্যতীত তাদের আয়-রোজগার করার কেউ নেই ।

আমি হেফজ শেষ করে বর্তমানে মাদরাসায় জামা'আতে নাহবেমীরে পড়ছি। অপরদিকে আমাদের এলাকায় আলেমে দ্বীন একজনও নেই। ফলে দিন দিন মানুষ ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে। এই করুণ অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার জন্য আমি সদা প্রস্তুত। কিন্তু সংসারটা চলে খুব টানাটানির মধ্যে। তাই এখন যদি আমি পড়া লেখা ছেড়ে আয় রোজগারের জন্য যাই তাহলে ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে সারা জীবন আমাকে আফসোস করতে হবে। আর না গেলেও চলে না। এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত?

জবাবঃ পিতা-মাতার খিদমত করা সন্তানদের উপর ফরয। কুরআন হাদীসে এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, "ঐ ব্যক্ত ধ্বংস হোক যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার কাউকে পেল অথচ তাদের খিদমত করে জান্নাতে যেতে পারলো না। সুতরাং, আপনাদের সকল ভাইদের উপর অধিকার পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করা ফরয।

পক্ষান্তরে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা করাও ফরয। তা মাদরাসায় পড়ে হোক বা দ্বীনী কিতাব পড়ে হোক বা কোন হক্কানী আলেমের সাহচর্যে থেকে শিক্ষা করে হোক। তবে এ পরিমাণ শিক্ষা করা ফরয যে পরিমাণ না হলে নিজের দ্বীনের উপর চলা সম্ভব হয় না। আপনার হয়তো এ পরিমাণ ইলম অর্জন হয়েছে যার দ্বারা আপনি দ্বীনের উপর চলতে পারবেন। এখন যদি আপনার অপর ভাইয়েরা নিজ মা-বাবার সেবা-যত্ন না করে এবং একমাত্র আপনিই আপনার বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমতের একমাত্র সম্বল হন তাহলে আপনার উচিত হবে প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা বন্ধ রেখে আপনার পিতা-মাতার খিদমত করা।

অবশ্য পূর্ণ শরী'আতের আলেম হওয়া ব্যক্তিগত ভাবে কারো জন্য ফরযে আইন না হলেও পুরা এলাকাবাসীর উপর ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকায় এমন একজন বিজ্ঞ আলেম থাকা জরুরী, যিনি মানুষকে বিভিন্ন দ্বীনী সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম। পুরা এলাকায় এমন আলিম না থাকলে অত্র এলাকার সকলেই এ ফরয তরকের গুনাহগার হবে। তাই আপনাদের এলাকাবাসীর জিম্মায় জরুরী যে, তারা একাধিক বিজ্ঞ আলেম তৈরীর ফিকির করবে। এখন একটা সহজ পদ্ধতি হলো, আপনার ভাইয়েরা এবং এলাকাবাসী আপনার আম্মা ও আব্বার সাংসারিক খরচাদির ব্যবস্থা করবে। আর আপনাকে পরিপূর্ণ আলেম হওয়া পর্যন্ত উপার্জনের চিন্তামুক্ত করে দিবে। এছাড়া আরো একাধিক লোকদের দায়িত্ব তাদের সন্তানদেরকে দ্বীন শিক্ষার জন্য দ্বীনী কওমী মাদরাসায় পাঠিয়ে দেয়া। কারণ পূর্ণ এলাকা সামলানোর জন্য এলাকায় একাধিক আলেম থাকা জরুরী।

[সূরা বনী ইসরাঈল ২৩, মাআরিফুল কুরআন ৫:৪৬৩, মিশকাত ২:৪১৮, বাদায়ে ৭:৯৮, ফাতাওয়া শামী ১:৪৩, ৬:৪০৮]

প্রসঙ্গঃ হালাল উপার্জন এবং মা-বাবার আনুগত্য

জিজ্ঞাসাঃ আমার বাবা একজন উকিল। প্রতি মাসে সিভিল ও ক্রিমিনাল কেস করে ২০/২৫ হাজার টাকা রোজগার করে। কিন্তু আমার বাবা আমি ছোট থাকতে মাকে ভিন্ন করে দিয়েছে এবং পিতা ২য় বিবাহ করেছে কিন্তু মা আর ২য় বিবাহ করেনি। আমার বড় ভাই ওকালতী পড়ছে আর আমি পিতার ওকালতীর টাকা এবং একটি দোকান বিক্রির টাকায় গড়া একটি মুরগীর ফার্মে কাজ করি। এখন আমি ইসলাম মুতাবিক চলতে চাই। এজন্য আপনাদের থেকে কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান কামনা করছি।

১। ওকালতীর টাকা এবং দোকান বিক্রির টাকায় গড়া ফার্ম থেকে যে লাভ আসে তা সন্তানের জন্য হালাল না হারাম? অর্থাৎ পিতার হারাম টাকা সন্তানের জন্য হালাল কি?

২। পিতার ওকালতীর টাকা এবং ধার করে টাকা নিয়ে বা ওকালতীর টাকা ও ফার্মের টাকা দিয়ে যদি সন্তানকে বিদেশ পাঠায় তাহলে সন্তান বিদেশে গিয়ে যে অর্থ উপার্জন করবে তা হালাল হবে, না হারাম হবে?

৩। পিতা স্বচ্ছল, মাতা অসহায়। পিতার সাথে থেকে মাতাকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করলে পিতা বাধা দেয়। আর আমি চলে গেলে পিতা কষ্ট পাবে, এখন আমার করণীয় কি?

৪। ইসলামের দৃষ্টিতে ওকালতী কি? বর্তমানে মিথ্যা ও প্রতারণা ছাড়া ওকালতী করা যায় না। তাই এইভাবে অর্থ উপার্জন হবে তা কি পর্যায় পড়ে।

৫। আমি পিতার ফার্মে কাজ করতে চাই না, শুধু পিতার ভয়ে কাজ করি। আমার ধারণা অমনোযোগিতার সাথে কাজ করার কারণে পিতার সাথে

ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। তাই এই গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমি পিতা থেকে চলে আসতে চাই। এখন আসতে পারব কি-না ?

জবাবঃ (১ ও ৪) শরী'আতের দৃষ্টিতে মিথ্যা, প্রতারণা ও ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে কোন মামলা মোক্কাদ্দমায় যে ওকালতী করা হয়, সে ওকালতী ব্যবসা নাজায়েয হবে। তবে কেউ যদি মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে সত্য ও সঠিকভাবে মামলা মোকাদ্দমায় ওকালতি করে তাহলে সে ওকালতী ব্যবসা জায়িয হবে এবং এর দ্বারা অর্জিত অর্থ হালাল হবে।

আর নাজায়েয পন্থায় উপার্জিত অর্থ উপার্জনকারী এবং তার সন্তানের জন্য হালাল হবে না। সর্বাবস্থায় তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর মালিকের অবর্তমানের তার ওয়ারিশদেরকে দিতে হবে। মালিক বা তার ওয়ারিশ কাউকে না পেলে সে পরিমাণ অর্থ মালিকের সদকা করে দিতে হবে। তবে ওকালতীর টাকা এবং দোকান বিক্রির টাকায় গড়া মুরগীর ফার্ম থেকে যে লাভ আসে তা তার জন্য হালাল হবে। [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৪১৫, নিজামুল ফাতাওয়া ১:৩৭]

২। হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ ব্যয় করে কাউকে বিদেশ পাঠালে কাজটি নাজায়িয ও হারাম হবে বটে, তবে সে বিদেশে হালাল পথে অর্থ উপার্জন করলে সে অর্থ হালাল হবে, হারাম হবে না। সুতরাং হারাম উপায়ে অর্জিত মালামাল মালিককে বা তার ওয়ারিশকে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় হাশরের ময়দানে নেকী দিয়ে গুনাহ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করতে হবে। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:১৭০,৪:১৪৭]

৩। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কুরআন শরীফে পিতা মাতার উভয়ের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের সাথে কটূ ব্যবহার এবং তাদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আপনার

দ্বায়িত্ব হল, ব্যক্তিগত ভাবে আপনার মাতার জানি এবং মালী অর্থাৎ আত্মীক ও আর্থিক সব ধরনের সাহায্য সহযোগীতা করা এবং আপনার পিতার সাথে আদব ইহতেরাম বজায় রাখা এবং তার সাথে কোন খারাপ আচরন না করা। আপনার মাতার সাহায্য সহযোগিতা করতে পিতা যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে এর পরওয়া না করে আপনি আপনার মাতার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন এবং পিতাকে হেকমতের সাথে বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কারো সাথে কটূ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এর পরেও যদি মাতার সাহায্য সহযোগিতা করার কারণে পিতা আপনাকে তার কাছ থেকে চলে যেতে বলে, তাহলে চলে গিয়ে হলেও অসহায় মাতার সাহায্য সহযোগিতা করা আপনার কর্তব্য। [সূরা বনী ইলরাঈ:২৩, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম: ৫:৩২, মুসলিম শরীফ, ২:৩১২]

৫। পিতা যদি হারাম অর্থের দ্বারা ফার্ম বানায় তাহলে সে ফার্মে সন্তানের জন্য কাজ করা জায়িয হবে না। এক্ষেত্রে আদবের সাথে অপারগতা প্রকাশ করে সন্তানের জন্য ফার্মের কাজ ছেড়ে চলে আসা কর্তব্য। কিন্তু যদি পিতা হালাল অর্থের দ্বারা ফার্ম বানায় এবং সন্তানের সে ফার্মে কাজ করতে শর'ঈ কোন বাধা না থাকে তাহলে পিতার আদেশ অনুযায়ী সন্তানের সেখানে কাজ করা ওয়াজিব। পিতার হুকুম অমান্য করে ফার্মের কাজে অমনোযোগি হওয়া বা ফার্ম থেকে চলে আসা সন্তানের জন্য জায়িয হবে না। [সূরা মায়িদা:২, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৫:৪৬৪]

নামাযী ব্যক্তি মাকে কষ্ট দিলে শুধু নামায দ্বারা সে মুক্তি পাবে কিনা?

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক চাকুরীজীবি নামাযী ছেলে বিবাহের আগে মাসিক বেতন উঠিয়ে বিধবা মায়ের হাতে টাকা দিত। কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর উপর ভার

দিয়ে মা ও ভাই-বোনকে বলে, আজ থেকে তোমরা আমার কাছে কোন কিছুই চাইতে পারবে না। যা প্রয়োজন, আমার স্ত্রীর কাছে চাইবে। স্ত্রী দীর্ঘ দিন যাবত সকলের হাজত পূর্ণ করেছে। বর্তমানে ছেলেটির মাসিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা আয় ও ব্যাংকে জমাকৃত টাকা থাকা সত্ত্বেও ছেলেটি মায়ের চাহিদা পূরণ করে না। মা ছেলেকে কষ্টে লালন-পালন করায়, সেই ছেলের এহেন আচরণে মা এখন দুঃখ প্রকাশ করছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত ছেলে শুধু নামাযী হওয়ার দরুন কি পরকালীন শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে সামর্থ্য অনুযায়ী- মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ছেলের জন্য জরুরী। আর সমস্ত বৈধ কাজে মায়ের কথার অনুসরণ করা কর্তব্য। তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা হয়, এমন কাজে নয়। প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যেহেতু তার সামর্থ্য রয়েছে, সে জন্য তার করণীয় হচ্ছে, তার মাতাকে খুশী রাখা এবং নিজের পক্ষ থেকে মায়ের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরা করা। কারণ, আল্লাহ রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি শুধু নামাযী হওয়ার দরুন পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া তো দুরের কথা দুনিয়াতেই বিভিন্ন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, মাতা-পিতার অবাধ্য ছেলে বেহেশতে যাবে না।

অবশ্য সংসার পরিচালনার দায়িত্ব স্ত্রীর উপর অর্পণ করা দোষের কিছু নয়। নিজে না পারলে এটা করা যেতে পারে। হাদীসে এদিকে ইংঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তম স্ত্রী-স্বামীর মাল যথাযথভাবে হিফাজত করে। অবশ্য সাধ্যানুযায়ী পিতা-মাতার খিদমত ছেলে নিজের জিম্মায় করবে। [প্রমাণঃ বাদায়িউস সানায়ি, ৪৩০ পৃঃ, মা'আরিফুল কুরআন ৫:৪৬৪ পৃঃ তাফসীরে মাযহারী ৫:৪৩২ পৃঃ, মিশকাত শরীফ ২:৪২১]

আত্মীয়তার বন্ধন টিকিয়ে রাখা

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামে আত্মীয়তার বন্ধন টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার আত্মীয় কে? বা কারা? আর তাদের সাথে কিভাবে আত্মীয়তা বন্ধন- টিকিয়ে রাখতে পারি?

জবাবঃ এক্ষেত্রে আত্মীয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। সে হিসেবে কেউ হন নিকটাত্মীয়, আর কেউ হন দুর সম্পর্কের আত্মীয়। যেমন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, প্রমুখ হলেন নিকটাত্মীয়। আর অন্যান্যরা হলেন দূরের আত্মীয় যেমন- মামা, খালু, ফুফা ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা খুবই জরুরী। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, যেমন- সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুযোগমত যোগাযোগ রক্ষা করা, সামর্থনূযায়ী তাদের খিদমত করা, আপদে-বিপদে তাদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং যথাসম্ভব তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। তাদের জন্য দু'আয়ে খায়ের করা ইত্যাদি। আর আল্লাহ না করুন, যদি কখনো কোন কারণে তাদের কারো সাথে মনোমালিন্য হয়, তাহলে প্রথমতঃ নিজে আপোস করার চেষ্টা করতে হবে। এ পর্যায়ে কোন ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে নতুন ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সম্পর্ক ছিন্নকারী আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা জুড়ে রাখার বেশী ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কাছে ও দূরে অবস্থানের কারণে হক আদায়ে তারতম্য হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য এবং কার কি হক, তা জানার জন্য হাকীমুল উম্মত মুজাজ্জিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কর্তৃক লিখিত 'হুকুকুল ইসলাম' নামক পুস্তিকাটি দেখা যেতে পারে। [প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ২:১৩, মিশকাত শরীফ ২:৪১৯, তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলাহিমঃ ৫:৩২৭]

কি ধরনের আচারণে পিতা-মাতার অবাধ্য সাব্যস্ত হয়?

জিজ্ঞাসাঃ সন্তান তার মাতা-পিতার কোন ধরনের আদেশ অমান্য করলে এবং তাদের সাথে কি ধরনের আচার-আচরণ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান হবে সাবস্থ্য হয়?

জবাবঃ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম, যা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। কেননা, এ ব্যাপারে কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অনেক আয়াতে নিজের হক আদায়ের নির্দেশের সাথে পিতা-মাতার হক আদায় করতে বলেছেন এবং নিজের কৃতজ্ঞতার নির্দেশের সাথে সাথে মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সকল মুফাসসিরীন কিরাম ও ফুকাহায়ে ইজাম এর উপর একমত পোষণ করেছেন যে, সকল বৈধ কাজের মধ্যে পিতা-মাতার আদেশ সাধ্যমত পালন করা ওয়াজিব। আর তাদের আদেশ পালন না করা চরম অবাধ্যতা হিসেবে স্বীকৃত। তাই কেউ পিতা-মাতার কোন বৈধ আদেশ নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী না মানলে সেই ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান বলে বিবেচিত হবে। আর যদি তারা কোন দ্বীনী কাজের নির্দেশ করেন তখন তা অমান্য করলে আরো অধিকতর অবাধ্য সন্তান বলে গণ্য হবে। যেমন, কোন লোক তার ছেলেকে নির্দেশ করে যে, তুমি ইলমে দ্বীন শিক্ষা কর তখন উক্ত ছেলে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করল না, তাহলে তা পিতা-মাতার অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, এক সাহাবী যুদ্ধে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তার পিতা-মাতা তাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বারণ করেছিলেন, এ সমস্যা নবীজী ﷺ-কে অবগত করালে তিনি উক্ত সাহাবী রাযি.-কে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান না করে বললেন যে, তোমার

পিতা-মাতার খিদমতের জিহাদে শরীক হও। উল্লেখ্য, তখন নফীরে আম বা সকলের উপর জিহাদে যাওয়া জরুরী ছিল না। [মা আরিফুল কুরআন, ৫/৪৬৪]

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বৈধ কাজে, এমনকি নিজের চাহিদার বিপরীত হলেও পিতা-মাতার আদেশ পালন করা কতর্ব্য। [মুসলিম শরীফঃ ২:৩১৩, তাকমিলায়ে ফাতুহুল মলহিমঃ ৫:৩২৮]

মাতা-পিতার পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত

জিজ্ঞাসাঃ মাতা-পিতার পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত এবং স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রী বেহেশত একথা কুরআন-হাদীস সাম্মত কি?

জবাবঃ মাতা-পিতার পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত, এ বিষয়ে সহীহ বর্ণনা হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়। তবে স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত, এরূপ সরাসরি কোন হাদীস না থাকলেও এর ভাবার্থ হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তানের জন্য মাতা-পিতার বাধ্যগত হওয়া এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর বাধ্যগত হওয়া জরুরী ।

আর যদি মাতা-পিতা ও স্বামী আল্লাহ তা'আলার নাফরমান হয়, তাহলেও যতক্ষন পর্যন্ত তারা শরী'আতের বরখেলাফ কোন হুকুম না দেয় ততক্ষণ তাদের কথা মান্য করা জরুরী। আর যদি তারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের বরখেলাফ কোন হুকুম দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানা জরুরী। মা বাবার ও স্বামীর হুকুম মেনে আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করা কখনও জায়িয হবে না। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২:৪২১, সূরা আনকাবুত ৮, তিরমিযী শরীফ ১:২১৯]

মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধ

জিজ্ঞাসাঃ মাতা-পিতার ঋণ, সন্তানের পরিশোধ করা সম্ভব কি-না! যেমন, মা সন্তানকে দুধ পান করিয়েছেন বা লালন-পালন করেছেন। তেমনিভাবে সন্তানের প্রতি যদি মাতা-পিতা নারাজ থাকেন তাহলে সন্তানের করণীয় কি?

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা জন্মগত ভাবেই সন্তানের প্রতি মাতা পিতার স্নেহ-মমতা, মুহাব্বত ও ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন। তাই তো মাতা পিতা ছোট বেলা থেকেই কত কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে লালন-পালন করেন। সুতরাং সন্তানের জন্যও তাদের খিতমত করা এবং তাদের হক আদায় করা কর্তব্য। কিন্তু কোন মাতা পিতা সন্তানের উপর অনর্থক অসন্তুষ্টি হতে পারেন না। আর সন্তানকে ছোট বেলায় দুধ পান করানোর ঋণ পরিশোধ করার কথা কোন মা বলতে পারেন না। যদি কোন মা এমন বলেন তখন বুঝা যাবে যে, সন্তানের পক্ষ থেকে অবশ্যই তিনি কোন কষ্ট পেয়েছেন অথবা সন্তান তাদের হক্ব নষ্ট করেছে, তাই তারা এ সমস্ত কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যথায় কোন মা এমন কথা বলতে পারেন না। সুতরাং, এরূপ হয়ে থাকলে তাদের অসন্তুষ্টির মূল কারণ চিহ্নিত করে যদি তা শরী'আত সম্মত হয়, তাহলে অবশ্যই তা আদায় করে পিতা মাতাকে রাজী করে নেয়া জরুরী। আর যদি কোন পিতা মাতা তাদের স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ ধরণের দাবী করে থাকে তাহলে সন্তানের উপর তাদের খিদমত করা আর তাদের হকসমূহ আদায় করা ছাড়া আর কোন কর্তব্য নেই। নিম্নে তাদের জীবিত থাকা কালীন হক সমূহ উল্লেখ্য করা হল, সেগুলো পালন করতে থাকবেন। তাদের জীবিতাবস্থার হকসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। (২) তাদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা রাখা। (৩) তাদের আনুগত হওয়া। (৪) দাদের সেবা-যত্ন করা।

(৫) তাদের প্রয়োজন মিটানো। (৬) তাদের আরামের ফিকির করা। (৭) দূরে থাকলে মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ করা।

মারা গেলে তখনও তাদের সাতটি হক আছে, যা নিম্নরূপঃ

(১) তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা। (২) নেক কাজ করে তাদের জন্য সাওয়াব রিসানী করা। (৩) পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা। (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। (৫) তাদের ঋণ বা আমানত পরিশোধ করা। (৬) তাদের বৈধ অসিয়ত পূরণ করা। (৭) মাঝে মধ্যে তাদের কবর যিয়ারত করা। [প্রমাণঃ সূরা বনী ইসরাঈল ২৩, সূরা লোকমান ১৪, মিশকাত শরীফ ২:৪১৮]

পিতা-মাতা মারা যাওয়া পর অবাধ্য সন্তানের করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ কোন সন্তান যদি পিতা-মাতার নাফরমানী করে এবং এ অবস্থায় পিতা-মাতা মারা যায়, তখন সন্তানের জন্য করণীয় কি?

জবাবঃ সে অবস্থায় সন্তানের জন্য ককরণীয় হল, কুরআন তিলাওয়াত এবং দান সদকা করে পিতা-মাতার রূহের উপর সাওয়াব রিসানী করবে এবং আল্লাহর দরবারে পিতা-মাতার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবে। যদি পিতা-মাতার জিম্মায় কোন ফরয হুকুম থাকে তা আদায় করবে। যদি তার পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় প্রিয়জন থাকেন তাদের খিদমত করবে, খোঁজ খবর নিবে। যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে পিতা-মাতার পক্ষ থেকে নফল হজ্জ আদায় করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ পিতা-মাতা উক্ত সন্তানের উপর রাজী হয়ে যাবেন এবং আল্লাহর দরবারে পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান (ফরমাবরদার) গণ্য করা হবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করবে সে পিতা-মাতার যেন ঐ হক আদায়

করল যা তার জিম্মায় ছিল। [প্রমাণঃ মুসলিম ২:৩১৪, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ১:৩৮৭, তোহফাতুল আহওয়াযী ৪:৫২২, ফয়যুল কাদীর ২:৮৭]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক সমূহ

জিজ্ঞাসাঃ আমার স্ত্রীর সাথে আজ ৩/৪ বছর যাবত আমার মনোমালিন্য চলে আসছে। আমাদের মাঝে কোন মিলামিশাও হচ্ছে না। এ জন্য আমি খুব কষ্টে জীবন-যাপন করছি। স্ত্রী অশিক্ষিতা, সে অবশ্য নামায- রোযা আদায় করে। আমি জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি সব কিছু জানি । কিন্তু আমার কাছে প্রকাশ করে না। আমাদের পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। আমি কতদূর পিছিয়ে আছি। আমার করণীয় কি? পাপমুক্ত হতে পরামর্শ চাচ্ছি।

জবাবঃ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অনেক হক্ব রয়েছে। কুরআন ও হাদীস মন্থন করে হযরত থানভী রহ. যা বর্ণনা করেছে, তা নিম্নরূপঃ

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য হল: (১) সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর খোর-পোষ ও ভরণ-পোষণ দিতে অবহেলা না করা। (২) স্ত্রীকে দ্বীনী মাসআলা-মাসাইল শিখাতে থাকা এবং তাকে নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকা। (৩) মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়া। (৪) এবং তার অসাবধানতা ও বুদ্ধিমত্তার অভাবে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে ধৈর্য-ধারণ করা। কখনো শাসন ও সংশোধনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা ।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য হল: (১) যথাযথভাবে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা, আদব বজায় রাখা। তবে স্বামী শরী'আত বিরোধী কোন কাজ করতে বললে, অপারগতা প্রকাশ করা। (২) স্বামীর সামর্থ্যের অতিরিক্তি কোন বিষয়ে তার প্রতি খুব চাপ সৃষ্টি না করা। (৩) অনুমতি ছাড়া স্বামীর সম্পদ ব্যয় না করা। (৪) স্বামীর আত্মীয় ও আপনজনদের সাথে এমন ব্যবহার

না করা, যাতে তার মনে কষ্ট হয়। বিশেষতঃ স্বামীর মাতা-পিতাকে সেবার পাত্র মনে করে সম্ভাব্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও তাদের সেবা করা। স্ত্রীর অধিকার সমূহের মধ্য থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল তাকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া। যেমন, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা । [সূরা তাহরীমঃ ৬]

স্ত্রীর কাছে রাত যাপন করাও তার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, নিজ স্ত্রীকে আনন্দ দানের জন্য তার সাথে কখনো কখনো হাসি-ঠাট্টা করা এবং খোশগল্প করাও তার অধিকার । স্ত্রীকে দ্বীনী মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা দেয়া এটা আল্লাহর বিধান। তবে এতে কঠোরতা অবলম্বন করা যাবে না। তাকে বুঝানোর মাধ্যমে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে কেননা, তার সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করা আল্লাহর বিধান।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, স্ত্রী জাতিকে পাজরের বক্র হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাজরের মধ্যে সবচেয়ে বক্র হচ্ছে উপরের হাড়। সুতরাং তুমি যদি তাকে পুরোপুরি সোজা করতে চেষ্টা কর, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে অর্থাৎ, তালাক দিতে বাধ্য হবে। আর যদি কিছুই না বল, তাহলে বক্রই থেকে যাবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আপনার স্ত্রী সাথে মিলা-মিশা করতে হবে এবং তাকে ধৈর্যের সাথে বুঝাতে হবে যে, যাতে করে সে আপনার নিকট থেকে মাসআলা-মাসাইল শিখতে পারে এবং কিভাবে আপনার হক আদায় করতে হবে, তা জানতে পারে। [প্রমাণঃ হুকূকে মু'আশারাত ৬৫, ১১০ ও ১১১]

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক

জিজ্ঞাসাঃ বিয়ের পর স্বামীর উপর স্ত্রীর কতটি হক ওয়াজিব হয়? অলংকার দেয়া তার উপর ওয়াজিব কি না?

জবাবঃ বিয়ের পর স্বামীর উপর কতিপয় হক ওয়াজিব হিসেবে অর্পিত হয়। যেমন, স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র ও আলাদা বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, প্রতি চার মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার তার যৌন চাহিদা পূর্ণ করা, স্ত্রীকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো স্বামীর উপর ওয়াজিব। অলংকারাদি দেয়া তার উপর ওয়াজিব নয়, বরং জায়িয। [প্রমাণঃ হিদায়া ২:৪৩৭, হুকুকে মু'আশরাত ১৪]

স্ত্রী-স্বামীকে তুমি বলে সম্বোধন করা

জিজ্ঞাসাঃ স্ত্রী স্বামীকে তূমি বলে সম্বোধন করতে পারে কি না? যদি তুমি বলে সম্বোধন করে, তবে এতে কোন গুনাহ হবে কি না? আপনি ও তুমির মধ্যে পার্থক্য কি?

জবাবঃ স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে তুমি বলে সম্বোধন করতে পারে, তবে আপনি বলে সম্বোধন করা অধিক উত্তম। কারণ, তুমি শব্দ দ্বারা স্বভাবতঃই মায়া-মমতা প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে আপনি বলে সম্বোধন করাতে স্বামীর প্রতি মহব্বতের পাশাপাশি সম্মান প্রকাশ পায়। আর স্বামীর প্রতি মায়ার পাশাপাশি সম্মান প্রদর্শন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদ্দরুন হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা বৈধ হলে, স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হত নিজ স্বামীকে সিজদা করার জন্য। আপনি ও তুমির মধ্যে, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আপনি সর্বদা বড়দের শানে তার সম্মান প্রদর্শনার্থে ব্যবহার করা হয়। আর তুমি, বিশেষতঃ ছোটদের ক্ষেত্রে মায়ামমতা প্রকাশার্থে প্রয়োগ করা হয়। আর বড়দের ক্ষেত্রে কদাচিৎ মায়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য, শব্দের ব্যবহার একান্তই প্রথা ও পরিবেশের

উপর নির্ভরশীল। সে হিসেবে কোন এলাকা বা পরিবেশে যদি তুমি শব্দটি অসম্মানজনক হয়, তাহলে সেরূপ পরিবেশে স্ত্রী স্বামীকে আপনি বলেই সম্মোধন করবে, তুমি বলতে পারবে না।

অসদাচরণের কারণে স্ত্রীর বিছানা আলাদা করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার স্ত্রী আমার সাথে অসহ্যকর ব্যবহার করে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও নবীজির আদর্শ মোতাবেক চলার জন্য আদেশ করি কিন্তু সে তাতে কর্ণপাতই করে না। তাকে সঠিক, পথে চালানোর জন্য যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আমার ৪টি বাচ্চা আছে। তাই তাকে তালাক দেয়া সমস্যা। তাই তার এসব ব্যবহারের কথা তার অভিভাবকদেরকে জানিয়েছি। এখন আমি তার যাবতীয় ভরণ-পোষণ দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তার সাথে আমি রাত্রি যাপন বন্ধ রেখেছি এবং বলেছি, যেদিন সে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পুরাপুরি মানার এবং আমার বাধ্যগত হবার অঙ্গিকার করবে সেদিন আমি তার সাথে আপোষ হব উল্লেখিত পথ বেছে নেয়াতে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আমি অপরাধী কি না, জানতে চাই।

জবাবঃ বর্ণিত পরিস্থিতিতে আপনি যে পথ অবলম্বন করেছেন তাতে আপনি কোন অপরাধী নন এবং কোন গুনাহগারও হবেন না। কারণ কুরআনে পাকে বলা হয়েছে, কারো স্ত্রী যদি নাফরমান হয়ে যায়, অথবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথমে তাকে নরম ভাষায় বুঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তাহলে তার থেকে বিছানা পৃথক করে নিবে। যাতে করে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে গেল। আর যদি তারপরেও সে ফিরে না আসে। তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে

হালকা কিছু শাসন করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়।

যা হোক এ সাধারণ শাসনের মাধ্যমে যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে আর বাড়াবাড়ী করবে না।

আর যদি উল্লেখিত এই তিনটি পন্থা অবলম্বন করার পরেও সে সঠিক পথে ফিরে না আসে তাহলে উভয় পক্ষ থেকে দুইজন মুরব্বী (ইনসাফগার, মুত্তাকী ও নিরপেক্ষ) দিয়ে তাদের আপোষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর তাতেও যদি সফলকাম না হয়, তাহলে স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় এক বা দুই তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করে দিবে। শরী'আত কোন ক্ষেত্রে তিন তালাক দেয়ার প্রয়োজন রাখে নাই, যদিও তা বৈধ।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে আপনি যে পথ অবলম্বন করেছেন তা শরী'আত সম্মত পন্থাই। তবে তাকে বুঝাতে থাকুন। আল্লাহ চাহেন ভাল হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ সূরা নিসা ৩৪-৩৫ আয়াত, মা'আরেফুল কুরআন সংক্ষিপ্ত, ২৪৫-২৪৭, পৃষ্টা তাফসীরে মাযহারী ২:১০০০, সূরা নিসা ৩৪-৩৫]

স্ত্রী-পুত্রের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি দশ বার (১০/১২) বছর যাবৎ স্ত্রী-পুত্রের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রেখে একটি মসজিদের চাঁদা আদায় ও মসজিদটির উন্নয়নের কাজে রত আছে। তার এ কাজ শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু যথাযথ?

জবাবঃ উক্ত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সকল প্রকার ব্যবস্থা করে থাকে এবং স্ত্রী বৃদ্ধা না থাকলে তার

নিকট থেকে চার মাসে অন্ততঃ একবার গমন করে থাকে, তাহলে সে শরী'আতের বিধান লঙ্ঘন করেনি।

পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা না করে থাকে এবং স্ত্রী যুবতী হওয়া সত্ত্বেও প্রতি চার মাসে অন্ততঃ একবার করে গমন না করে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই শরী'আতের বিধান লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং, তার তাওবা করে উপরোক্ত হকসমূহ আদায় করতে হবে এবং অতীতের ভুলের জন্য তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আর স্ত্রী-পুত্রের উল্লেখিত হকসমূহ আদায় করার পর সে মসজিদের খিদমত আঞ্জাম দিবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া হিনদিয়াহ ১:৫৪ ও ৫৬০, ফাতাওয়া কাজীখান ১:৪২৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১৯৬]

স্বামীর পদতলে স্ত্রীর বেহেশত

জিজ্ঞাসাঃ রাহমানী পয়গাম অক্টোবর, ৯৯ সংখ্যায় কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার প্রবন্ধে লেখিকা ডঃ হালিমা লিখেছেন, (১) স্বামীর পায়ের নীচেই আল্লাহ স্ত্রীর জন্য বেহেশত নির্ধারণ করেছেন, এটা আমার মতে সঠিক নয়। বিধায় এর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

জবাবঃ স্বামীর পায়ের নীচেই আল্লাহ স্ত্রীর জন্য বেহেশত নির্ধারণ করেছে এ রকম কোন হাদীস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হ্যাঁ, হাদীসে এমন পাওয়া যায়, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি আমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম তাহলে মেয়েদেরকে বলতাম, তোমরা স্বামীদেরকে সিজদা কর। মূলতঃ এ সমস্ত কথা দ্বারা স্বামীর মর্যাদা ও অধিকারের গুরুত্ব বুঝানো হয়ে থাকে। এ কথাটিই স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য কেউ বলেছেন যে, হ্যাঁ স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত। নতুবা হুবহু এ ধরনের কথা হাদীসে নাই এবং লেখিকাও হাদীস বলে দাবী করেন নাই।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর হকের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি স্বামীকে নারাজ করে স্ত্রীর জান্নাতে যাওয়াও কঠিন হবে। তেমনিভাবে কোন স্বামীর জন্য স্ত্রীর হক নষ্ট করে বা স্ত্রীর উপর জুলুম করে বেহেস্তে যাওয়াও কঠিন হবে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ২:২৮২, মিরকাত- ৬:২৭২]

উস্তাদের জিম্মাদারীতে অবহেলা করা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন শিক্ষক ক্লাশের ১০ মিনিট আগে এসে অতি তাড়াহুড়ার মাধ্যমে ক্লাশ করেন। ছাত্ররা শিক্ষক থেকে যথারীতি উপকার লাভে সক্ষম না হয়। উল্লেখ্য যে, ক্লাশের পুরা সময় সীমা ৫০ মিনিট থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক নিয়মিত এরূপ করে যাচ্ছেন। আর এদিকে ছাত্ররা ক্লাশের ব্যাপারে কোন কিছু বললে, তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না, এমতাবস্থায় উক্ত শিক্ষকের জন্যে এ কাজ করা কতটুকু বৈধ হবে?

জবাবঃ স্কুল, কলেজ বা মাদরাসার কোন শিক্ষক, অথবা যে কোন চাকুরীজীবির জন্য এটা জায়িয নয় যে, তিনি তার চাকুরীর পূর্বশর্ত অনুযায়ী ডিউটির সময় সীমা থেকে কম ডিউটি করে পূর্ণ বেতন গ্রহণ করবেন। কারণ, নির্ধারিত সময়ের ডিউটি ও কাজের বিনিময়ে তাকে পূর্ণ বেতন দেয়া হয়। এমতাবস্থায় যদি তিনি পুর্ণ সময়টা নির্ধারিত কাজে ব্যয় না করেন তাহলে সে কাজে ফাঁকি দেয়া হল ও দায়িত্বে অবহেলা করা হল। এটা তার পক্ষে ধোকা ও খিয়ানত সাব্যস্থ হবে এবং তার জন্য পূর্ণ কাজ না করে পূর্ণ বেতন গ্রহণ করা জায়িয ও হালাল হবে না। সুতরাং, যে পরিমাণ ডিউটি তিনি ফাঁকি দিয়েছেন ঐ পরিমাণ টাকা কর্তৃপক্ষকে বা প্রতিষ্ঠানে ফেরৎ দেয়া তার জন্য জরুরী। নগদ টাকা ফেরত দিবেন, অথবা হিসাব মত যতদিন ডিউটি করেনি, নতুনভাবে বেতন না নিয়ে ততদিনের ডিউটি করে দিবেন। [মিশকাতঃ ১:১৭]

রাগ করে কথা না বলা

জিজ্ঞাসাঃ আমার এক আত্মীয় জমি জরিপ করার সময় আমাদের কিছু জমি রেকর্ড করে নেয়। পরবর্তীতে বহু কৌশলে অবশ্য সেই জমি উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জমি উদ্ধারকালে পরস্পরে তুমুল বাক-বিতণ্ডা ও উত্তম মাধ্যম হয়। এ ঘটনার পর থেকে আমরা তাকে সালাম দিলে সে সালামের উত্তর দেয় না। অথচ রাসূলে আকরাম ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী কোন-মুসলমানের ডাক্ষে অপর মুসলমানের সাথে ৩ দিনের বেশী সময় কথা বন্ধ রাখা যায় না, তাই আমি তাকে নিয়মিত সালাম দিয়েছি; কিন্তু সে এর কোন উত্তর না দেয়ায় তার সাথে কথা-বার্তা বলা আপাতত বন্ধ রেখেছি। তাতে আমার গুনাহ হবে কি?

জবাবঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে পার্থিব কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হলে তিন দিনের বেশী সময় কথা-বার্তা বন্ধ রাখা হারাম। কেননা, রাসূলে আরকাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাই এর সাথে তিন দিনের বেশী সময় কথা-বার্তা বন্ধ রাখা জায়িয নয়। তিন দিনের মধ্যে একজন অপর জনের সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম দিবে। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সালামের জবাব দেয়, তাহলে উভয়েই সওয়াবের মধ্যে শামিল হবে। আর যদি সে সালামের জবাব না দেয়, তাহলে গুনাগার হবে তবে এ ক্ষেত্রে সালাম প্রদানকারী সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে। এরূপ আরো অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলোতে এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তিকে কঠিন পরিণামের ধমকি দেয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে বলা যায়, আপনার আত্মীয় যদি কেবলমাত্র পার্থিব কোন কারণে আপনার সাথে কথা বন্ধ করে থাকেন, তাহলে সে হারাম কাজ করেছে। আর আপনি যেহেতু সালাম দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, এর দ্বারা আপনি দায়িত্ব

মুক্ত হয়েছেন। ফলে আপনার কোন গুনাহ হবে না। তবে আপনার জন্য সালাম দেয়া জারি রাখা উচিত। কারণ, হয়তবা এরূপ দেখে একদিন অর অন্তরও নরম হবে।

আর যদি কথা না বলার মধ্যে শর'ঈ কোন কারণ থাকে অথবা আপনার আত্মীয় যদি ন্যায় সংগতভাবে তাঁর স্বীয় প্রাপ্য অংশ রেকর্ড করে থাকে, আর আপনারা অন্যায়ভাবে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আপনাদের সতর্ক হওয়া ও সংশোধন হয়ে যাওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় আপনিও গুনাহগার হবেন। আর যদি উক্ত জমি অন্যায়ভাবে লিখে নিয়ে সেটাকে রেকর্ড করে থাকে, তাহলে ধোঁকাবাজীর জন্য আপনার নিকট তার মাফ চাওয়া উচিত। [প্রমাণঃ আবু দাউদ, ২:৬৭৩, মুসলিম শরীফ ২:৩১৬ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯:৩৩৮]

প্রতিবেশী ও জনসাধারণের হক

সুদের টাকা মসজিদ-মাদরাসা কিংবা গরীবদেরকে দান করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন লোক সুদের টাকা নিজে না নিয়ে মসজিদ, মাদরাসা বা কবরস্থানের জন্য দান করতে পারবে কি না এবং আত্মীয়-স্বজনের ভিতর কেউ গরীব থাকলে তাকে দিতে পারবে কিনা?

জবাবঃ সুদের টাকা, অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে উপার্জিত টাকা নিজের কাজে বা দ্বীনের কোন কাজে ব্যয় কবা জায়িয হবে না। সুদ দাতার ঠিকানা জানা থাকলে, অথবা সুদ দাতাকে পাওয়া গেলে, সুদের টাকা তাকে বা তার ওয়ারিশদেরকে ফেরৎ দিয়ে দিবে। তবে একান্তই সুদ দাতাকে পাওয়া না গেলে বা ফেরৎ দেয়া সম্ভব না হলে, টাকার মুল মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যতে তা গরীবদেরকে দান করে দিবে। নিজের সাওয়াবের জন্য দান করা জায়িয হবে না। উক্ত সুদী টাকার মালিক না হওয়ার ক্ষেত্রে গরীব মিসকীন বা জনহিতকর/কাজে, যেমন, মসজিদ-মাদরাসার পায়খানা পেশাবখানা নিম্নমানের কাজে ব্যয় করা যাবে। অনুরূপভাবে টিউবয়েল বসানো ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজেও ব্যবহার করা যাবে। [প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৭:৭০, নিজামুল ফাতাওয়া ২:৪৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৫:১৩৬, আলমগীরী, ৫:৩৪২, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ১:১৭৫]

রাস্তার দুই পার্শ্বে অবস্থিত গাছপালা কেটে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের সরকারী রাস্তার দুই পার্শ্বে অবস্থিত গাছ-পালার ফল, ছোট-ছোট ডাল ইত্যাদি কেটে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে কিনা?

জবাবঃ সরকারী রাস্তার পার্শ্বে যে গাছ-পালা লাগানো হয়, তা যদি সরকারের অনুমতিক্রমে কোন সাধারণ পাবলিক লাগিয়ে থাকে, তবে সেই গাছ-পালার ফল-মূল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি গাছ এবং গাছের ফল-মূল ইত্যাদি নিজ ব্যবহারে আনতে পারবে, অন্য কারো জন্য তা ব্যবহার করা জায়িয নয় ।

আর যদি ঐ গাছগুলো সরকারের নিজের হয়, তখন এর হুকুম প্রচলিত রীতি-নীতির উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ যদি সরকার এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে এর আয় সরকারী খাতে জমা করে, তাহলে সর্ব সাধারণের জন্য এগুলো ভোগ করা অবৈধ হবে। আর যদি সরকার এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ না করে এবং এ গাছগুলোর ফল মূল খেতে, অথবা ডাল ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হতে কাউকে বাধা না দেয়, তবে সাধারণ মানুষের জন্য এর দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৩:৩০, আলমগীরী, ২:২৯]

প্রসঙ্গঃ বিধর্মীকে সম্মান প্রদর্শন করার তরীকা

জিজ্ঞাসাঃ বিধর্মীকে সাম্মান দেখানোর তরীকা কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে বিধর্মীকে সালাম দেয়ার কোন বিধান নেই। তবে মুসলমান এবং বিধর্মীরা যদি একত্রে অবস্থান করে, তাদের সকলকে (পার্থক্য ব্যতিরেকে) সালাম করা জায়িয আছে। কিন্তু এ স্হলেও মনে মনে কেবল মুসলমানদেরই নিয়্যাত করবে। [প্রমাণঃ মিশকাত ২:৩৯৮)

দুনিয়ার চাকচিক্য ও বদদ্বীনী পরিরেশ থাকার কারণে আত্মীয়তা ছিন্ন করা

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক্কের প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু খালা, ফুফু, মামা, চাচা ও এ শ্রেণীর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের বাসায়

দুনিয়ার চাকচিক্য ও বদদ্বীনী পরিবেশ থাকার কারণে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে কি-না?

জবাবঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ও তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের দেখাশুনা করা, প্রয়োজনে তাদেরকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করা অত্যন্ত জরুরী। শরী'আতে এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেউ যদি দ্বীনের উপর না চলে তাহলে এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর অন্যরা যদি তাকে দ্বীনের পরিপন্থী কাজ থেকে নিষেধ করে থাকে, তাহলে তারা জবাবদিহীতার হাত থেকে রেহাই পাবে।

সুতরাং, একজন দ্বীনদার মানুষের জন্য ইসলামের বিধান হিসেবে আত্মীয়দের সাথে যে ধরনের আচার-আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পালনে সচেষ্ট থাকা অত্যন্ত জরুরী এবং উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে দাওয়াতের যে জিম্মাদারী রয়েছে, তা যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করতে হবে। কেউ যদি দ্বীনের উপর না চলে সেজন্য বিচলিত হলে চলবে না। তবে এতটুকু অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যেন তাদের সাথে নিজেও গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। বরং নিজেকে গুনাহের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তাদেরকে বুঝাতে হবে। আর যদি সেসব জায়গায় যাওয়ার দ্বারা নিজের গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার প্রবল ধারণা জন্মে, তাহলে চিঠিপত্র দ্বারা বা ফোনের সাহায্যে কিংবা অন্য কোনভাবে বুঝাতে হবে। [প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ, ২:১২]

কেউ কথা না বললে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক দ্বীনদার ব্যক্তির সাথে আমার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। কিছুদিন আগে সামান্য একটি কারণে তিনি আমার সাথে সম্পর্ক ছেড়ে

দিয়েছে। আমি সালাম করলে তিনি অগত্যা মুখ কালো করে সালামের জবাব দেন। কিন্তু আমি কথা বলতে চাইলে, তিনি পাশ কেটে চলে যান। আজ প্রায় দু'মাস থেকে তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছি। অথচ হাদীসে রয়েছে যে, কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে ৩ দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। তবে এখন আমার করণীয় কি? যদি চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পরে আমি তাঁর সাথে কথা বলা ছেড়ে দেই। তাহলে আমি কি উক্ত হারামের অন্তর্ভুক্ত হব?

জবাবঃ কোন মুসলমানের জন্য অপর ভাইয়ের সাথে দুনিয়ার কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তার সাথে তিন দিনের উর্ধ্বে কথা বলা বন্ধ রাখা হারাম, তা সত্য। হাদীসে এসেছে, কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের থেকে তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। এই হাদীসের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তি অন্যায় করেছে এবং আপনার উপর জুলুম করেছে। তবে আপনি যে সালাম দিচ্ছেন এবং কথা বলতে চেষ্টা করছেন, এতে আপনি দায়িত্ব মুক্ত হয়েছেন। আপনি গুনাহগার হবেন না। সুতরাং, ভবিষ্যতে সালাম জারী রাখবেন। হয়ত সে নিজের ভুল বুঝে সংশোধন হয়ে যাবে। আর যদি সে দ্বীনি কোন কারণে আপনার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকে তা জেনে নিয়ে আপনি সংশোধন হয়ে গেলে আশা করি আর কথা বন্ধ রাখবে না। [প্রমাণঃ মিশকাত ২:৪২৮, ও মিরকাত ৯:২৬৯]

হেবা, হাদিয়া দান-সদকা

অবৈধ উপার্জনের টাকা দান

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদ-মাদরাসায় যারা বড় অংকের টাকা দান করেন তাদের উপার্জন অধিকাংশই অবৈধ। এই অবৈধ উপার্জনের টাকা যারা দান করেন তারা কোন সাওয়াব পাবে কিনা?

তাদের দান ছাড়া দ্বীনি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করাও সম্ভব হয় না। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল ছাত্র দ্বীনি শিক্ষা লাভ করবে এর সাওয়াব কে পাবে?

জবাবঃ মসজিদ-মাদরাসায় যারা বড় অংকের টাকা দান করে তাদের উপার্জন অধিকাংশই অবৈধ আপনার এই দাবী ঠিক নয়। আর অবৈধ উপার্জনকারীদের টাকা ছাড়া মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ সম্ভব হবে না- এই দাবীও ঠিক নয়। বরং অসৎপথে উপার্জনকারীরাও সাধারণত মসজিদ মাদরাসায় হালাল উপার্জন থেকেই দান করার চেষ্টা করে। অবশ্য কারো ব্যপারে যদি জানা থাকে যে তার সমুদয় বা অধিকাংশ আয় অবৈধ কিংবা অবৈধ মাল থেকেই সে দান করতে তাহলে সেক্ষেত্রে মসজিদ-মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য উক্ত দান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা জরুরী। তাছাড়া মসজিদ-মাদরাসার কর্তৃপক্ষের জন্য এটাও জরুরী যে, সাধারণ জনগণ বিশেষ করে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদেরকে হারামের মৌলিক বিধানসহ দ্বীনী বিষয়ের ব্যাপারে সচেতন করা এবং তাদেরকে পূর্ণ দ্বীনের উপর আনার জন্য ফিকির জারী রাখা। আর হারাম মাল থেকে দান করে সাওয়াব অর্জনের প্রশ্নই আসে না; বরং জেনে শুনে সাওয়াবের উদ্দেশে হারাম মাল দান করলে ইমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। [প্রমাণঃ

ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫:৩৪২, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ১:১৭৫ আহসানুল ফাতাওয়া ৮:১০৩]

ছোট বাচ্চাদের সম্পদ সাংসারিক কাজে ব্যয় করা

জিজ্ঞাসাঃ ছোট বাচ্চাদেরকে আত্মীয়স্বজন কর্তৃক যে সমস্ত জিনিষ হাদিয়া দেয়া হয়, যেমন, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। তার পিতা-মাতা সেই টাকা-পয়সা সাংসারিক কাজে খরচ করতে পারবে কিনা এবং তার কাপড়-চোপড় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে পিতা মাতা বা অন্য মুরুব্বীগণ তা দান করে দিতে পারবে কিনা?

জবাবঃ ছোট বাচ্চাদেরকে আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কেউ যে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় হাদিয়া দেয় তার মালিক স্বয়ং ঐ বাচ্চাই। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা সন্তানদেরকে যে পোশাকাদি বানিয়ে মালিকানা দিয়ে দেন, তার মালিকও ঐ সন্তানরা। ছোট বাচ্চা যেমনিভাবে নিজের সম্পদ অন্যকে দিতে পারে না, অনুরূপভাবে ছোট নাবালিগ বাচ্চাদের সম্পদ তার মুরুব্বীগণও কাউকে দিতে পারবেন না বা দান করতে পারবেন না। এমনকি অন্য লোককে ঋনও দিতে পারবেন না। পিতা-মাতা বা মুরুব্বীগণ শুধু উক্ত সম্পদ হিফাজত করবেন। আর বাচ্চার বিশেষ প্রয়োজনে খরচ করতে পারবেন।

সুতরাং, উল্লেখিত অবস্থায় ছোট শিশুর সম্পদ, কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা পিতা বিনা অপারগতায় সংসারে ব্যয় করতে পারবেন না। এজন্য পিতার কর্তব্য যে, ছেলেদের ব্যবহারের জন্য যে সব জিনিষ পত্র দিবেন তা শুধু ব্যবহারের জন্যই দিবেন, মালিক বানিয়ে দিবেন না। যাতে প্রয়োজনের সময় অন্যকে দেয়ার অধিকার তার হাতেই থাকে। [প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার ৫:৬৯৬ বেহেস্তী জেওর ৫:৪৬]

ঋণী ব্যক্তির নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তির জন্য ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয হবে কি?

জবাবঃ শরী'আতে ঋণ দাতার জন্য ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয আছে তবে? তবে যদি সমাজে ঋণ গ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণ দাতার হাদিয়া গ্রহণ করার কোন রেওয়াজ থাকে অথবা ঋণ দাতা যদি গ্রহীতার কাছ থেকে (ঋণ দেওয়ার কারণে) কিছু পাওয়ার আশা রাখে, তাহলে ঋণ দাতার জন্য এরূপ হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয হবে না।

অন্যান্য সন্তানাদীর চেয়ে একজনকে বেশী সম্পদ দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ পঙ্গুত্ব বা উপার্জনের সামর্থ্যের অভাব বা স্বল্পতার কারণে কোন সন্তানকে পিতা-মাতার পক্ষ থেকে তার নির্ধারিত অংশের চেয়ে অন্যান্য সন্তানদের সম্মতিক্রমে বা সম্মতি ছাড়াই বেশী সম্পত্তি দেয়া যাবে কি না?

জবাবঃ শরী'আত সমর্থিত কারণ থাকলে, সম্পদ বন্টনের সময় পিতা-মাতা সন্তানদের মধ্যে বেশ-কম করতে পারে। প্রশ্ন উল্লেখিত সুরতে যেহেতু সন্তান পঙ্গূ বা উপার্জনের অক্ষম, তাই পিতা বা মাতার জন্য ঐ পঙ্গু রা মাযূর সন্তানকে, অন্যদের অংশের চেয়ে বেশী সম্পত্তি দেওয়া জায়িয হবে। এতে চাই অন্যান্য সন্তানদের সম্মতি থাক বা না থাক। কিন্তু যদি শর'ঈ কোন কারণ না থাকে, পঙ্গু বা মাযূর না থাকে, তাহলে সন্তানদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে কম-বেশী করা পিতা-মাতার জন্য জায়িয হবে না। বরং, ছেলে মেয়ে সকলকে সমান দেয়া কর্তব্য। কারণ এটা মীরাস নয় বরং হেবা। কাজেই ছেলে-মেয়েদের অংশ বরাবর হবে। এ সম্পর্কে একটি হাদীসের সারমর্ম হল, কিছু লোক সারা জীবন

আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মধ্যে মাশগুল থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময় ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অর্থাৎ কাউকে কম কাউকে বেশী দেয় এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় ওয়ারিশদেরকে মাহরূম করবে, মহান আলাহ তা'আলা তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৪, মুফিদুল ওয়ারিসিন ১২, দুররে মুখতার ৫:৬৯৬]

বিধর্মীকে হাদিয়া, উপহার দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন বিধর্মীর সাথে হাদিয়া, উপহার লেন-দেন করা মুসলমানের জনা জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ কোন বিধর্মীর সাথে উপহার-উপঢৌকন বা হাদিয়া লেন-দেন করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয নয়, তবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, মুহাব্বত, হৃদ্যতা নাজায়িয। কারণ একমাত্র মুমিনগণ মুমিনের বন্ধু হতে পারে, অন্য কেউ নয় (সূরা তাওবা, আয়াত- ৭১) তাই লক্ষ্য রাখতে হবে, এ সৌজন্য মূলক উপহার-হাদিয়া আদান প্রদানের পিছনে দ্বীন ধর্মের ক্ষতি সাধনের দুরভিসন্ধি যেন লালিত না হয়। পারস্পরিক সৌজন্যতার নামে তাদের কোন কূমতলব আঁচ করার পরও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা জায়িয হবে না।

[প্রমাণঃ আলমগীরী ৪:৪০৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৮১, ফাতাওয়া রাশিদিয়াহ ৫৮৫]

মহিলার জন্য ঝাড়-ফুকের ব্যবসা করা ও তার স্বামীর দান খয়রাত

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে এক ব্যক্তি রয়েছে, যার স্ত্রী ঝাড় ফুক (ফকিরী) ব্যবসা করে। তার দ্বারা নাকি বহুলোক উপকৃত হয়েছে। সে বৎসরে

বিভিন্ন সময়ে বাড়িতে যিকিরের আয়োজন করে। সেখানে সারা রাত ঢোল-বাদ্য বাজানো হয়, জিকির করা হয় এবং শিরণী বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর আয়ই তার সংসারের একমাত্র আয় নয়, তার (ব্যক্তির) নিজস্ব জমি জায়গা আছে এবং সেখানের ফসলও সংসারের আয়ের উৎস।

এখন প্রশ্ন হল, ঐ ব্যক্তি যদি গ্রামের মসজিদে কিছু দান খয়রাত করতে চায় তবে সেটা নেয়া জায়িয কিনা? এবং তার স্ত্রী যে ব্যবসা করে- সেটাও ইসলামের দৃষ্টিতে জায়িয কিনা?

জবাবঃ (ক) কুরআন হাদীসে বর্ণিত দু`আ দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা ও পারিশ্রমিক হিসেবে তার বিনিময় গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। তবে কুফুরী ও শিরকী বা শরী'আত বিরোধী মন্ত্র পড়ে তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা হারাম ও নাজায়িয এবং তার বিনিময় গ্রহণ করাও হারাম। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১৬৬, খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৪৫, ফাতাওয়া রশীদিয়া ৪৯, আবু দাউদ শরীফ ২:৫৪৪]

(খ) প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত মহিলার ঢোল-বাদ্য বাজানোর আয়োজন সম্পূর্ণরুপে হারাম ও নাজায়িয। আল্লাহর জিকিরের সাথে হারামের মিশ্রণ মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং, তার উচিত ঐ সমস্ত কাজ থেকে খালিস তাওবা করে ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলা।

(গ) উক্ত মহিলার স্বামীর টাকা মসজিদে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। তার স্ত্রীর উপার্জন তার উপার্জন বলে গণ্য হবে না। বরং, তার সম্পদ ও স্ত্রীর সম্পদ পৃথক। অবশ্য লোকটির কর্তব্য নিজের স্ত্রীকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা। সে যদি এ দায়িত্ব পালন না করে,

তাহলে তাকে বয়কট করা জায়িয হবে এবং তখন তার দান-খয়রাত গ্রহণ না করা জায়িয হবে।

ফারায়েয ও অসিয়্যত

মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারে অংশীদার হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ শর'ঈ বিধান মুতাবিক আমার ছোট বোনের বিবাহ সু-সম্পন্ন হওয়ার পর সেদিন রাতেই তার স্বামী ইন্তিকাল করেন। উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একাকিত্ব কোন সাক্ষাৎ হয়নি। এমতাবস্থায় স্বামীর মা ও ভাই-বোনের জীবদ্দশায় উক্ত স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে কি না? আর যদি সে উত্তরাধিকারিনী হয়, তবে কতটুকু প্রাপ্ত হবে? ধার্যকৃত মহর স্ত্রী প্রাপ্ত হবে কি-না? স্ত্রীর কোন ইদ্দত পালন করতে হবে কি-না?

জবাবঃ হ্যাঁ বর্ণনা অনুযায়ী, উক্ত স্ত্রী তার মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিনী হবে এবং এক্ষত্রে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারিনী হবে। এমনিভাবে সে মহর ধার্য করা হয়েছে, তা থেকে স্ত্রী অর্ধেক পাবে। এবং চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। [প্রমাণঃ সূরা নিসাঃ ১২, সূরা বাক্বারা ২৩৭, সিরাজীঃ ১৫, হিদায়াহ ২:৩২৪, ফাতহুল কাদীর ৪:১৪১, দুররুল মুখতার ৩:১০৩]

পালক পুত্রের মীরাস ও তার সাথে পর্দার বিধান

জিজ্ঞাসাঃ রহিমা নামী এক ভদ্র মহিলা রমজান নামক একজন ইয়াতীম ছেলেকে পালক পুত্র হিসাবে নিজের কাছে রাখে। পালক পুত্র হিসেবে নেয়ার সময় এফিডেভিটের মাধ্যমে অঙ্গীকার করে সে, রহিমা রমজানকে নিজ সন্তানের মত করে লালন-পালন করবে এবং তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অংশীদার হবে। উল্লেখ্য যে, রহিমার আরো চারটি সন্তান রয়েছে এবং এখনো, সে রমজানকে লালিত-পালিত করে চলছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছেঃ

(ক) রমজান রহিমার অথবা তার স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে কি-না? যদি মালিক হয় তবে কতটুকু সম্পত্তির মালিক হবে? আর যদি মালিক না হয় তাহলে কেন হবে না? (খ) তেমনিভাবে রমজান নিজে চেষ্টা করে যদি ধন-সম্পদের মালিক হয় তবে রহিমার পরিবারের সদস্যরা তার সম্পত্তির অংশ পাবে কি-না? (গ) রহিমার ভাতিজীর সাথে রমজানের বিবাহ বৈধ হবে কি-না?

জবাবঃ (ক) শরী'আতের দৃষ্টিতে পালিত পুত্র মিরাস বা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হয় না। সুতরাং রহিমা অথবা তার স্বামীর কোন সম্পত্তির ওয়ারিশ বা অংশীদার রমজান হবে না। (খ) তেমনিভাবে রহিমা বা তার পরিবারের সদস্যরা রমজানের নিজের সম্পত্তিরও অংশীদার হবে না। (গ) পবিত্র কুরআনে যাদের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে পালিত পুত্র তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রশ্নে উল্লেখিত রমজানকে পূত্র হিসেবে গণ্য করা সত্বেও সে রহিমার জন্য গাইরে মাহরাম তথা বেগানা ও পরপুরুষ হিসেবে গণ্য হবে এবং রমজানের বিবাহ রহীমার ভাতিজীর সঙ্গে তো বৈধ হবেই এমনকি সরাসরি রহীমার সাথেও রমজানের বিবাহ বৈধ হবে। যদি রহীমার স্বামী মারা যায় বা তালাক দিয়ে দেয়। সুতরাং, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকলে উভয়ের জন্য পর্দা করা ফরয। [প্রমাণঃ সিরাজীঃ ৬, সিরাজী ২৭, সূরা আহযাবঃ ৪, সূরা নিসাঃ ২৪]

সন্তানকে সম্পত্তি দান করে পুনরায় ফেরত নেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মাতা আমাদের সহোদর তিন ভাইকে নিজের সম্পত্তি দান করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সকলে উক্ত জমি ভোগ করার পর বড় ভাইয়ের অবাধ্যতা ও ভরণ-পোষণ না দেয়ার কারণে, মা তার সম্পত্তি কোর্ট মারফত পুনরায় ফিরিয়ে নেন। মা তাকে বহুবার সতর্ক করেন। কিন্তু তাতে সে মোটেও কর্ণপাত করেনি। অতঃপর তিনি

আমাদের দুই ভাইয়ের নামে তার জমি লিখে দেন। তখন থেকেই আমরা উক্ত জমি ভোগ করছি। উল্লেখ্য যে মা জীবিত থাকাবস্থায় মায়ের সাথে বড় ভাইয়েরও এ বিষয়ে মামলা-মুকাদ্দমা হয় এবং উক্ত মামলায় ভাই পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে, আমাদের দুই ভাইকে মা তার নিজের জমি লিখে দেয়া এবং আমাদের তা ভোগ করা বৈধ কি-না?

জবাবঃ জীবদ্দশায় যদি কেউ নিজ সম্পত্তি সন্তানদের মাঝে বন্টন করে দিতে চায়, তাহলে এটা যেহেতু মীরাছ নয়; বরং হেবা হিসেবে পরিগণিত, তাই ছেলে-মেয়ে সকলকে সমপরিমাণ দিতে হবে। সন্তানদের মাঝে হেবার ক্ষেত্রে কাউকে কম আর কাউকে বেশী এরূপ করা যাবে না। তবে কোন সন্তান যদি দ্বীনদার না হয় এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হয় তাহলে পিতা-মাতার জন্য তাকে সম্পত্তি না দেয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সকলের দ্বীনদারীও কর্মক্ষমতা সমান থাকাবস্থায় কাউকে কম আর কাউকে বেশী দেয়া ঠিক হবে না। সমষ্টিগত কোন জিনিসের হেবা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল যাকে যে পরিমাণ দেয়ার ইচ্ছা হয়, তা ভাগ করে সম্পূর্ণরূপে তার মালিকানায় দিতে হবে।

অতএব, উল্লেখিত বর্ণনা মুতাবিক যদি আপনার মাতা উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী স্বেচ্ছায় সকলকে সমান ভাগে হেবা করে থাকেন, তাহলে তার হেবা তথা দান করা সহীহ হয়েছে এবং আপনারা তিন ভাই উক্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। হেবা করার পর পুনরায় তা ফেরত নেওয়া যায় না। সুতরাং, দ্বিতীয়বার আপনার বড় ভাই থেকে সম্পত্তি ফিরিয়ে নিয়ে সেই অংশ আপনাদের দুই ভাইকে দেয়া জায়িয হয়নি এবং তিনি গুনাহের কাজ করেছেন। তাই এক্ষেত্রে আপনার মাতাকে গুনাহ থেকে নিষ্কৃত দেয়ার জন্য আপনাদের দুই ভাইয়ের কর্তব্য হচ্ছে, বড় ভাইয়ের অংশ তাকে

ফিরিয়ে দেয়া। কেননা, তার ভাগের সম্পত্তি ভোগ করা আপনাদের জন্য কোনভাবেই জায়িয হবে না। তবে আপনার বড় ভাইয়ের জন্য আপনার মায়ের সাথে এরূপ আচরণ করা মোটেই ঠিক হয়নি; বরং মারাত্মক গুনাহের কাজ করেছেন। এজন্য আল্লাহর নিকট তার তাওবা করতে হবে এবং মাতার জন্য দান-খয়রাত করে সাওয়াব পৌঁছাতে হবে এবং দু`আ করতে হবে [প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার, ৫:৭০৪, খুলাসতুল ফাতাওয়া ৪:৪০০ আল বাহরুর রায়িক্ব ৭:২৮৮ আহসানুল ফাতাওয়া ৭:২৫৪]

জীবিত অবস্থায় ওয়ারিশদের সম্পদ বন্টন করা

জিজ্ঞাসাঃ জীবিত অবস্থায় কেউ স্বীয় ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করতে পারবে কি-না?

জবাবঃ সম্পদ বন্টনের মাসআলা খুবই নাজুক। এ ব্যাপারে ভুল করলে বা কোন ওয়ারিশকে ঠকালে জাহান্নামের শাস্তির হুমকি এসেছে। এ জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। অথচ এ ব্যাপারে সাধারণ লোকের কথা বাদ দিলেও দ্বীনদার পরিবেশেরও যথেষ্ট উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।

স্বীয় জীবদ্দশায় সম্পদ বন্টন করতে শরী'আতে উৎসাহিত করেনি। বরং বলেছে এটা যেহেতু মীরাছ নয়, বরং হেবা; আর একান্ত কোন ঠেকার কারণে যদি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হেবা হিসেবে সম্পদ বন্টন করতে হয়, তাহলে ছেলে-মেয়ে সকলকে সমান দিতে হবে। ছেলে-মেয়েদের মাঝে বেশ-কম করা যাবে না, এটাই শরী'আতের ফায়সালা। অনুরূপ নিয়মে স্বামী সম্পদ বন্টন করতে চাইলে, স্ত্রীকে সন্তানদের সমান অংশ দিবে।

তবে শর'ঈ উজরের কারণে যদি কম-বেশী করা হয়, তাহলে তা জায়িয হবে। যেমন, একজন সন্তান অঙ্গহানির কারণে উপার্জন করতে পারে না;

তাকে জরুরত মত বেশী দেয়া যায়। তেমনিভাবে ছোট ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে বিয়ে শাদী করাতে পারেনি। অন্যদের জন্য এসব ব্যবস্থা করছে। তখন এই ছোট সন্তানকে বেশী দিতে পারে। তেমনিভাবে একজন সন্তান চরম অবাধ্য ও আল্লাহর নাফরমান। কোন প্রচেষ্টায় তাকে সু-পথে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তার ব্যাপারে এটাই প্রবল ধারণা যে, বাবার সম্পদ হাতে পেলে তার নাফরমানী আরো বৃদ্ধি পাবে। সে ক্ষেত্রে তাকে খাওয়া-পরার পরিমাণ দেয়া এবং তার চেয়ে বেশী না দিয়ে অন্য সন্তানদের তুলনায় তাকে কম দেয়া জায়িয হবে। এ ধরনের উজর না থাকলে, সকল আওলাদকে সমান দেয়া চাই। ফাতাওয়ার কিতাবে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পিতা স্বীয় জীবদ্দশায় শুধু ছেলেদেরকে সম্পদ দেয়, মেয়েদেরকে মোটেও দেয় না। আর কেউ কেউ আছে, মেয়েদেরকে দেয় কিন্তু ছেলেদের সমান মেয়েদেরকে দেয় না। এটা জুলুম এবং অন্যায়। এসব ক্ষেত্রে পিতা মনে করেন মেয়েদেরকে বলে রাজী করিয়ে নিবো। এটাও ঠিক নয়। তাতেও নিজের ঔরষজাত সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করা হলো না। কারণ, তারা কি এটা করবেন যে মেয়েদের বেশী দিবেন এবং ছেলেদের কম দেবেন তারপরে ছেলেদের বলে রাজী করে নিবেন? তাতো তারা কখনও করবেন না, তাহলে এই দুই চোখে দেখার কারণ কি? ছেলেও নিজের সন্তান, মেয়েও নিজের সন্তান। মেয়েকে বিয়ে দিলে কি সন্তান থাকে না? ছেলে সন্তানদের জন্য অনেক ফিকির করা হয়। কিন্তু মেয়ে সন্তানদের জন্য সেই পরিমাণ ফিকির করা হয় না কেন?

তারা শুধু দেখা-সাক্ষাতের সময় আদর-মুহাব্বত পাওয়ার উপযুক্ত; বাকি যিম্মাদারী শেষ, এর নাম কি দ্বীনদারী? উভয় ধরনের নাতী-নাতনীদের সমান ফিকির রাখা উচিত। আজকাল অধিকাংশ-লোকের প্রবণতা

হয়েছে- দুর্বলদের বঞ্চিত করার বা ঠকাবার। এজন্য বাবা ও তার ছেলে-সন্তানরা মিলে বুদ্ধি পরামর্শ করে যে, কিভাবে মেয়েদেরকে কম দিয়ে বা না দিয়ে পারা যায়; এটা নেহায়েত অন্যায়। কুরআনে কারীমের সূরায়ে নিসার বিভিন্ন আয়াতে মেয়েদের সঠিক হিসসা প্রদানের তাকীদ করা হয়েছে। ৭ নং আয়াতে কয়েকভাবে তাকিদ করা হয়েছে মেয়েদের মাহরূম বা ঠকানোর পথ বন্ধ করার জন্য। ১১ নং আয়াতে মেয়েদের অংশকে মূল ভিত্তি করে মীরাছ হিসেবে ছেলেদেরকে মেয়েদের ডাবল বা দ্বীগুন দিতে বলা হয়েছে। এখানে পুরুষদের হীসসাকে বুনিয়াদ বানানো হয়নি। অর্থাৎ এমন বলা হয়নি যে, মেয়েদের মীরাছ হিসেবে ছেলেদের অর্ধেক পাবে। বরং বলা হয়েছে যে, ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। এর দ্বারাও মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এরপর মেয়েদের ব্যাপারে টাল-বাহানা ঈমানদারীর পরিপূর্ণ খিলাফ। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী।

তবে একান্ত যদি মেয়েদের হিসসা ছেলেদের বৈধভাবে দেয়ার ইচ্ছা থাকে, যাতে কোন প্রকারের আপত্তি থাকে না, তাহলে তার পদ্ধতি হলো, মেয়েদের প্রাপ্য সম্পূর্ণ অংশ আলাদা করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাদেরকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে এবং তাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তারা তাদের ন্যায্য হিসসা গ্রহণ করার পরেও ভাইগণ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে আগের ন্যায় খোঁজ খবর ও খিদমত করে যাবেন। এর মধ্যে কোন প্রকার ক্রটি করবেন না। তখন যদি বোনেরা খুশী হয়ে ভাইদেরকে কিছু অংশ হাদিয়া হিসেবে দেয়, তাহলে সেটা ভাইদের জন্য হালাল হবে তবে সবটুকু ভাইদের দেয়া মুনাসিব হবে না। কারণ-তাদেরও তো সন্তান আছে। তারাও মায়ের থেকে নিশ্চয় কিছু পাওয়ার আশা রাখে। আরো উল্লেখ্য বর্তমানে মৌখিকভাবে যে বোনেরা ভাইদের খাতিরে

বাবার সম্পত্তি দাবী ছেড়ে দেয়, অথচ সম্পদ তারা হাতে বুঝে পায় না, এটা ভাইদের আদর-আপ্যায়ন দেওয়ার জন্য একটা লৌকিকতা মাত্র। এটা শরী'আত সম্মত নয়। আর এক্ষেত্রে এ সম্পত্তি ভাইদের জন্য হালাল হবে না। অন্যের মাল শুধুমাত্র তখনই হালাল হবে, যখন সে অন্তর থেকে সেটা দিবে। আর লৌকিকতা দ্বারা তা কখনও হয় না। [প্রমাণঃ সূরা নিসা, আয়তঃ ২৯, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ২:৩৭৭, মিশকাত, ১:২৪১, আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকীঃ ৪:৯৬, মাহমূদিয়া ৫:৬৯৬, রাহীমিয়া ২/২৫৯, ইমদাদূল ফাতাওয়া ৩:৪৭০]

অবাধ্য ছেলেকে তুলনামূক কম সম্পত্তি দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ বড় ছেলে আমাকে পিতা বলে স্বীকার না করে বাড়ী থেকে ১৮ বছর বয়সে চলে যায়। তাছাড়া বড় ছেলে আমার অবাধ্য। সুতরাং, ন্যায় সঙ্গত কারণে আমি তার উপর অসন্তুস্ট। এমতাবস্থায় আমার সম্পত্তির বেশী অংশ ছোট ২ ছেলেকে স্বেচ্ছায় দান করে দিতে চাই এবং কিছু অংশ সবার জন্যই রাখতে চাই। বড় ছেলেকে ছোট দুই ছেলের পরিমাণের মতো সম্পত্তি না দিলে কোন অসুবিধা হবে কি-না? শরী'আতের বিধান জানতে চাই।

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী বড় ছেলে যদি সত্যিই আপনার এমন অবাধ্য হয় যে, আপনাকে পিতা বলে স্বীকার করতেও রাজী নয় বা আপনাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়, তাহলে তাকে ওয়ারিশ থেকে একেবারে বঞ্চিত করা বা অংশ কম দেয়া জায়িয হবে। তবে আপনার হায়াতেই করতে হবে। যদি আপনি জীবদ্দশায় অন্যদের মধ্যে বন্টন না করে যান, তাহলে সে আপনার সম্পত্তির মধ্যে সমান অংশীদার হবে। যদিও আপনি ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, যদি কোন সন্তান নাফরমান না হয় বা অন্য কোন শর'ঈ কারণ না থাকে তাহলে সকল সন্তানকে সমান অংশ দেয়া জরুরী।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৭০, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৫৯, আল বাহরুর রায়িক ৭:২৮৮]

কোন সন্তানকে সম্পত্তি না দেওয়ার অসিয়্যত করার পর করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ বাবা তার কোন ছেলের জন্য সম্পত্তি না দেয়ার অসিয়্যত করে গেল। এখন বাবার অসিয়্যতের কারণে সেই ছেলে বাবার সম্পত্তি থেকে মাহরুম হবে কি?

জবাবঃ বাবা যদি কোন এবং ছেলেকে তার ওয়ারিশ সুত্রের সম্পত্তি না দেয়ার অসিয়্যত করে যায়, তাহলে উক্ত ছেলে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং তার বাবার অসিয়্যত অকার্যকর গণ্য হবে। ছেলে যথারীতি সম্পত্তি পাবে। [ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৩৩২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৪৩৯, আযীযুল ফাতাওয়া ৭:৮২]

মেয়েদেরকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত

জিজ্ঞাসাঃ আমরা দুই ভাই, এক বোন। বাবা মারা গেছেন, মা এখনও জীবিত আছেন। বাবার সম্পত্তির অংশ আমরা সবাই পেয়েছি। বাবা মৃত্যুর সময় আলাদা করে মাকে কিছু জমি দেন। এ জমি মা এখন আমাদের দুই ভাইকে দিয়েছেন। এ জমির অংশ বোন পাবে কি না? এখানে উল্লেখ্য যে বোন কয়েক বছর আগে মারা গেছে। তার ছেলে মেয়েরা জীবিত আছে।

জবাবঃ উল্লেখিত সুরতে যেহেতু মা সুস্থ অবস্থায় আপনাদের দু'ভাইকে তার নিজস্থ জমি হেবা করে দিয়েছেন, কাজেই এই জমির মালিক আপনারা দু'ভাই হয়ে গেছেন। আপনার বোন বা তার সন্তানরা এর অংশ পাবে না। তবে যদি হেবা করার সময় আপনাদের বোন জীবিত থাকতো। তাহলে আপনাদের মায়ের যিম্মাদারী ছিল ছেলে মেয়ে সকলকে সমানভাবে হেবা করা। মেয়েকে বঞ্চিত না করা বা কম না দেয়া কর্তব্য।

উল্লেখ্য, পিতা-মাতা সুস্থ অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দিলে, তা মীরাছ নয়। সুতরাং, মীরাছের নিয়মে তা বন্টন না করে ছেলে-মেয়ে সকলকে সমানভাবে বন্টন করতে হবে। [প্রমাণঃ রাহীমিয়া ২:২৫৯, আল বাহরুর রায়িক ২:২৮৮, খালাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০০]

বিদ'আতী ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন লোক যদি মাযারে গিয়ে সিজদা করে এবং বলে যে, আমি মাযারে যাওয়ার কারণে আমার সন্তান হয়েছে এবং আমি সুখে আছি। তাকে ঐ মাযারে যাওয়া থেকে নিষেধ করা সত্ত্বেও মানে না। পিতা কর্তৃক এখন তাকে সম্পত্তি না দিলে গুনাহ হবে কি না? তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে গুনাহ হবে কি না?

জবাবঃ যদি কোন সন্তান শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে এবং বদদ্বীন হয়ে যায়; তাকে অনেক বুঝানোর পরও উক্ত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা বা শুধু খাওয়া পরা চলে এতটুকু পরিমাণ দেওয়া জায়িয আছে। উক্ত সন্তানের ঐ কাজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কথাবার্তাও বন্ধ রাখতে পারবে। এটা শরী'আতে নিষেধ নয়, বরং খাঁটি ঈমানের দাবী। হাদীসে যে কথাবার্তা বন্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তার অর্থ দুনিয়াবী কোন কারণে মনোমালিন্য রাখা নাজায়িয। কিন্তু এখানে তো দুনিয়াবী কারণ নয়, বরং আল্লাহর মহব্বতের দাবীতে কথা বন্ধ রাখা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে। হাদীসেও সাহাবীগণ রা. থেকে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আব্দুল হাই ৩;৯ এলাউস সূনান ১৬:৯১, আল বাহ রুর রায়িক্ব ৭:২৮৮]

ইয়াতীমের অংশ পৃথক না করে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি ব্যয় করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি নাবালিগ ইয়াতীম সন্তান রেখে মারা যাওয়ার পর সাধারণতঃ উক্ত ইয়াতীমের মা কিংবা বড় ভাই তার দায়িত্ব নিয়ে উক্ত মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি ইয়াতীম ও অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন না করে একত্রিতভাবে সংসার পরিচালনা করতে থাকে এবং ইয়াতীমের অংশের আয় সাংসারিক কাজে ব্যয় করে বা ঐ মুহূর্তে উক্ত ইয়াতীম সন্তানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে বড় হওয়ার পর শুধু তার পিতার পরিত্যক্ত জমি, বাড়ী, নগদ অর্থ থেকে তার অংশ পৃথক করে দেয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদ যেমন, জমি, মিল, কারখানা দোকান ইত্যাদি থেকে বিগত বছর সমূহের অর্জিত অর্থের কোন অংশ দেয়া হয় না। শরী'আতের দৃষ্টিতে এমনটি জায়িয কিনা? এ ক্ষেত্রে বড় ভাই কিংবা মা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণের কারণে অপরাধী হবেন কিনা?

জবাবঃ এ ব্যাপারে শরী'আতের সিদ্ধান্ত হল, মাইয়্যিতের ইন্তেকালের পরপরই তার ত্যাজ্য সম্পত্তি সকল বালিগ ও নাবালিগ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। অতঃপর ইয়াতীম ছেলেদের অংশ তার বড় ভাই বা তার মায়ের কাছে গচ্ছিত থাকবে। তিনি উক্ত মাল থেকে ইয়াতীমের খাওয়া, পড়া চিকিৎসা ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রয়োজন মত খরচ করতে থাকবেন। তার সম্পদের অবশিষ্ট অংশ তার বালিগ হওয়া পর্যন্ত খুব ভালভাবে হিফাজত করবেন। বালিগ ও পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর তার নিকট তা হস্তান্তর করবেন। শরী'আতের উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী ইয়াতীমের মাল থেকে তার নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা বা তার ইজমালী সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা, মাইয়্যিতের সাওয়াব রিসানীর জন্য গরীব মিসকীনদের খাওয়ানো বা সংসারের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করতে থাকা, মেহমানদারী করা, সবই নাজায়িয ও হারাম। উক্ত কাজ ইয়াতীমের সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার

শামিল। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে যে, যারা ইয়াতীমের মাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করেছে, তারা তাদের পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন ঢুকাচ্ছে, এবং তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ কররে। (সূরা নিসা আয়াতঃ ১০)

সুতরাং, উক্ত মারাত্মক গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব থেকেই ইয়াতীমের মাল নিজেদের সম্পদ থেকে পৃথক করে রাখা ও তার সঠিক হিসাব রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

ইয়াতীমের নিজস্ব প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সকল খরচ বড় ভাই বা তার মা নিজস্ব মাল থেকে বহন করবে। আর তার প্রয়োজনীয় খরচ বাদে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ভালভাবে সংরক্ষণ করবে। [প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৮:১৮, বেহেশতী জেওর ৭:৪২, মাযহারী ২/২২৩]

ছেলে মারা যাওয়ার পর নাতীদেরকে সম্পত্তি লিখে দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার সর্বমোট আট ছেলে, দশ মেয়ে। পঞ্চম নম্বর ছেলে তিন ছেলের পিতা। ঘটনা ক্রমে রোগাক্রান্ত হয়ে সে আমার তিন নাতী রেখে মারা গিয়েছে। আমি ঐ নাতীদেরকে নিজ সম্পত্তি থেকে সম্পত্তি লিখে দিতে চাই, কিন্তু আমার অন্য ছেলেরা বাধা প্রদান করছে। এ ব্যাপারে শর'ঈ বিধান কি?

জবাবঃ মাসআলা হল এই যে ইয়াতীম পৌত্রদের জন্য দাদা তার সম্পত্তি থেকে ইয়াতীমদের জরুরত পূর্ণ হয় এ পরিমাণ সম্পত্তি হেবা হিসেবে দান করে লিখে দিতে পারবেন। এটা দাদার ঈমানী ও নৈতিক জিম্মাদারী। দাদা কর্তৃক ইয়াতীমদের জরুরত মুতাবিক সম্পত্তি দেয়ার সুযোগ লাভের জন্য ইয়াতীমদেরকে আল্লাহ তা'আলা ওয়ারিশ বানাননি। কারণ যদি তারা পিতার স্থলে ওয়ারিশ হত, তাহলে তারা মৃত পিতার অংশটুকুই পেত

যা তাদের অন্যান্য চাচাদের অংশের সমান। এর থেকে বেশী পাওয়ার কোন সুযোগ হত না। কিন্তু এতে হয়ত তাদের ঠেকা ও জরুরত পূর্ণ হত না। অপরদিকে তাদের পিতা বেঁচে নেই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শরী'আতে তাদেরকে ওয়ারিশ বানানো হয়নি। ওয়ারিশ থেকে বাহিরে রাখা হয়েছে। কারণ, ওয়ারিশ হলে, মৃত পিতার অংশ থেকে বেশী পাওয়ার সুরত নেই। আর ওয়ারিশ না হওয়ায় তাদের জরুরত পরিমাণ, পিতার অংশের চেয়েও বেশী পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কারণ দাদা সুস্থ অবস্থায় ইয়াতীম নাতীদের জরুরতের প্রেক্ষিতে যে অংশ দিবেন, এটা মীরাছ নয়, বরং হেবা এবং সুস্থ অবস্থায় তার সম্পূর্ণ মাল অন্যকে হেবা করার অধিকার আছে। সুস্থ অবস্থায় অন্যকে হেবা করার জন্য কোন পরিমাণ শরী'আতে নির্ধারণ করা হয়নি।

অবশ্য মৃত্যুর আগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় অসিয়্যত করতে চাইলে, তিন ভাগের এক ভাগের মধ্য থেকে করা জরুরী। সুতরাং, আপনি নাতীদের প্রয়োজন লক্ষ করে যতটুকু দেয়া দরকার, তা হেবা করে দেন। এটা আপনার জন্য নৈতিক ও দ্বীনী জিম্মাদারী। কারণ তাদের পিতা নেই, সহায়-সম্পদ নেই। আপনার দানের উপরই তাদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় শরী'আত দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেছে। এ কারণেই ইয়াতীম বাচ্চা সম্পদ রেখে মারা গেলে, দাদা পিতার ন্যায় উক্ত ইয়াতীম বাচ্চার মীরাছ পেয়ে থাকে। তো শরী'আত যখন দাদাকে ইয়াতীমদের পিতা ঘোষণা করেছে, তখন দাদা তাদেরকে নিজের সম্পদ থাকতে না দিয়ে কার দায়িত্বে ছেড়ে যাচ্ছেন? একটু চিন্তা করলেই বিষয়টা সহজে বুঝে আসে। ইয়াতীমদেরকে তাদের সুবিধার জন্যই ওয়ারিশ থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, একথা বহু দাদা দ্বীনী জ্ঞানের অভাবে বুঝতে পারেন না। বরং উল্টা বুঝে

আফসোস করতে থাকেন যে, আমিতো ইয়াতীম নাতীদের দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তো দিতে দিলেন না, (নাউজুবিল্লাহ)।

আবার অনেক দাদা হয়তো দয়া পরবশ হয়ে জিম্মাদারী মনে করে ইয়াতীমদের কিছু সম্পদ দিতে চান, কিন্তু জাহিল নির্দয় চাচারা দিতে দেয় না। ঐ সব চাচাদের দিল পাথর হয়ে গেছে এবং দুনিয়ার মোহে তারা সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। এ মাল কখনও তাদের জন্য বরকতের কারণ হবে না। উল্লেখ্য সাবেক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁনও আল্লাহর এ বিধান বুঝতে না পেরে কুরআনী আইনে হস্তক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস করেছে। আইয়ুব খাঁন চলে গেছে, কিন্তু তার এ অভিশপ্ত কানুন অর্থাৎ ইয়াতীম নাতীগণ মীরাছ পাবে, পরবর্তী রাষ্ট্র পরিচালগণ ধরে রেখেছেন। সকল অভিশপ্ত আইনের বেলায় একই নিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা নিতান্ত দুঃখজনক। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ১৪ /৪৩৮]

স্ত্রীকে সম্পত্তি হেবা করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার কোন ছেলে নেই। ৪ জন মেয়ে আছে। আমার ভাইয়ের ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। এছাড়া আমার ৩ জন বোন রয়েছে। ভাই বোনেরা আল্লাহর রহমতে কেউ গরীব নয়। তারা সবাই স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করছে। সুতরাং আমি যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে হেবা করে দেই তাহলে আমার ভাইবোনদের কোন কষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় আমার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে হেবা (দান) করে দেয়া জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ আপনার ইন্তিকালের পর আপনার সম্পদের অধিকাংশ (অর্থাৎ ৩/২ পাবে আপনার মেয়েরা আর মাত্র ৮/১ পাবে আপনার স্ত্রী)। অবশিষ্ট সম্পদ পাবে ভাই ও বোনেরা। কিন্তু সবচেয়ে কম যে পাবে অর্থাৎ স্ত্রী, তাকেই আপনি সমস্ত সম্পত্তি হেবা করতে চান, আর সবচেয়ে বেশী যারা

পাবে (অর্থাৎ, মেয়েরা), তাদেরকে বঞ্চিত করতে চান। অল্পের অংশীদারকে বেশী দিয়ে বেশীর অংশীদারকে বঞ্চিত করা জুলুম নয় কি? বিশেষতঃ কন্যাদেরকে বঞ্চিত করা হিন্দুয়ানী প্রথা এবং মারাত্মক অপরাধ। তাই সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীকে হেবা করা আপনার জন্য ঠিক হবে না। অপনার উচিত-সম্পত্তি এভাবেই রেখে যাওয়া। আপনার মৃত্যুর পর সকলেই তাদের হিস্যা অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করে নিয়ে যাবে।

অথবা শরী'আত সম্মত কোন কারণ থাকলে আপনি সুস্থ অবস্থায় মেয়েদের ও স্ত্রীকে সমানভাবে ভাগ করে মালিক বানিয়ে দিতে পারেন। তবে বিশেষ কোন কারণ না থাকলে মৃত্যুপূর্ব বন্টন না করাই উচিত। [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৫/৬৯৬, ইমদাদুল মুফতীন ১০৪৯, আযীযুল ফাতাওয়াঃ ৭৮৩, ফাতাওয়া আব্দুল হাইঃ ৩:৩১]

ধোকা দিয়ে সম্পত্তি লিখে নেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমরা তিন ভাই। ছোট দুই ভাই মাকে নিয়ে নিজ বাড়ীতে থাকি। বড় ভাই অন্যত্র বসবাস করে। বড় ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে চিকিৎসা করার কথা বলে একবার রেজিষ্ট্রি অফিসে নিয়ে যাই এবং তিন ভাইয়ের নামে তার সম্পত্তির দানপত্র লিখে ওষুধ ক্রয়ের অজুহাত দেখিয়ে মায়ের টিপসই নেই। পরে আমরা ছোট দুই ভাই মাকে নিয়ে সম্পত্তি ভোগ দখল করি। কিন্তু বড় ভাই মায়ের ভরন-পোষণ দেয় না এবং মায়ের সাথে অমানুষিক আচরণ করে। আমরা ছোট দুই ভাই বড় ভাইকে এ ব্যাপারে বহুবার সতর্ক করার পরও কোন লাভ হয়নি বরং সে আমাদের উপর রাগ করে এবং তার ভাগের জমি অন্য লোকের কাছে বিক্রি করবে বলে হুমকি দেয়। মা তখন দানপত্রের কথা জানতে পেরে দানপত্র বাতিলের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করে এবং দানপত্র বাতিল হয়ে যায়। এরপর বড় ভাই মায়ের নামে আদলতে মামলা করে।

এগার বছর পর মা নিজের পক্ষে মামলার রায় পায় এবং তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায় আমাদের ছোট দুই ভাইয়ের নামে লিখে দিয়ে কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। আমরা ছোট দুই বাই ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করি। এখন কথা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি আমাদের ভোগ দখল করা বৈধ হবে কি?

জবাবঃ বাস্তবেই যদি প্রথমবার বড় ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী মায়ের অজান্তে তার জমি গোপন সূত্রে আপনারা তিন ভাইয়ের নামে দানপত্রে রেজিষ্ট্রী করে থাকেন, তাহলে সে দানে মায়ের সম্মতি না থাকায় শরী'আত অনুযায়ী তা সহীহ হয়নি; বরং মাকে ধোকা দিয়ে এ দানপত্র করার কারণে আপনারা মারাত্মক গুনাহগার হয়েছেন।

তবে পরবর্তীতে আপনাদের ছোট দু'ভাইকে তিনি যে দানপত্র করেছেন, তা যদি স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় করে থাকেন এবং আপনাদেরকে সে সম্পত্তি মালিক বানিয়ে দখলসত্ব বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন এবং আপনারাও বুঝে নিয়ে থাকেন, তাহলে এ দান সহীহ হয়েছে এবং অবাধ্যতা, ধোকাবাজি ও চরম বেয়াদবীর কারণে বড় ছেলেকে বঞ্চিত করাও আপনাদের মায়ের জন্য সঠিক হয়েছে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১:২৬১ দুররে মুখতার ৫:৬৯৬, হিন্দিয়া, ৪:৩৯১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪:৪০০, আল বাহরুর রায়িক ৭:২৮৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৭০]

এক সন্তানের নামে জমি রেজিষ্ট্রী করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার পিতা তাঁর ৮ কাঠা জমির মধ্য থেকে আমাকে ৭.৫০ কাঠা জমি রেজিষ্ট্রী করে দান করেছেন। জমি দান করার এ ব্যাপারটি আমার চার বোন ও এক ভাই জানত না। পরে দুই বোনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে পিতার সম্পত্তির উপর তাদের কোন দাবী নেই। অন্য

আর কারো সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে আমার ভাই পিতা-মাতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি। তদুপরি ধর্মের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। এমনকি মায়ের মৃত্যুর পরও পিতার কোন দেখাশোনা করছে না। এখন উপরোক্ত দানের ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি? বা তা না-জায়িজ হলে করণীয় কি?

জবাবঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী আপনার পিতা যদি তার জমি আপনাকে সম্পুর্ণরূপে হাওলা করে দিয়ে থাকেন অর্থাৎ তিনি যদি তার অন্যান্য জমি থেকে পৃথক করে কিছু জমি আপনার দখলে দিয়ে দেন, যার দখল আপনি বুঝে নিয়েছেন, তাহলে এক্ষেত্রে আপনি উক্ত জমির মালিক হয়ে গিয়েছেন। যদিও আপনার পিতা অন্যদেরকে বঞ্চিত করার কারণে গুনাহগার হবেন। এখন যদি ভুল সংশোধন করতে চান, তাহলে আপনার নিজের নামের অংশ ছেড়ে দিয়ে পিতার সম্পূর্ণ জমি থেকে সকলের অংশ সমান করে দিতে হবে। এর দ্বারা তিনি গুনাহ থেকে মুক্তি পাবেন বলে আশা করা যায়।

অর্থাৎ যদি আপনার পিতার এ জমি ছাড়া অন্য জমি না থাকে তাহলে সে সেক্ষেত্রে আপনার পিতাকে গুনাহ থেকে মুক্তি দানের জন্য আপনার উচিত, আপনাকে দেয়া জমি ও পিতার অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে ভাই-বোনদেরকে মীরাছ হিসেবে ভাগ করে দেয়া ।

পক্ষান্তরে যদি তিনি আপনাকে শুধুমাত্র রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে থাকেন এবং আপনাকে বুঝিয়ে না দেন অথবা আপনি দানপত্র বুঝে নিয়ে তা নিজের দখলে এখনও নেননি, তাহলে এক্ষেত্রে আপনার পিতার হেবা শুদ্ধ হয়নি বিধায় তিনি ইচ্ছা করলে উক্ত জমি আপনার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সকলকে সমান ভাগে বন্টন করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে আপনাকে সহ কাউকে নাও দিতে পারেন। কাউকে না দিলে সেক্ষেত্রে

তার মৃত্যুর পর মীরাছ হিসেবে যে যা পাবে, সেটা তার অংশ হবে, হেবা হবে না। বরং মীরাছ হবে এবং এক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে।

প্রকাশ থাকে যে, আপনার দুই বোন যেভাবে দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এভাবে দাবী-দাওয়া ছাড়া হয় না। তাই দাবী ত্যাগ করা প্রমাণিত হওয়ার জন্য উত্তম হল, প্রথমে তাদেরকে জমির মালিক সম্পূর্ণভাবে বানিয়ে দিতে হবে। তারপর তারা ইচ্ছা করলে আপনাকে তার থেকে কিছু হাদিয়া দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। যদি হাদিয়া দেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি উক্ত জমির মালিক হবেন আর তখন তাদের দাবী-দাওয়া ত্যাগ করা পূর্ণভাবে প্রমাণিত হবে, অন্যথায় নয়। [প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ৫:৬৯৬ ও ৭০৪, খুলসাতুল ফাতাওয়া ৪:৪০০, বাহরুর রায়িক ৭:২৮৮, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া, ৭:২৫৬]

এক স্ত্রীর সন্তানদের নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ এক ব্যক্তির দুটি সন্তান ছিল। সে তার সমুদয় সম্পত্তি দুই সন্তানের মাঝে বন্টন করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী মারা গেলে সে অন্যত্র বিবাহ করেছে এবং উক্ত স্ত্রীর গর্ভ থেকে সন্তানও হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তানও, প্রথম স্ত্রীর সন্তানদেরকে দেয়া সম্পত্তি থেকে কোন অংশ পাবে কি-না? উল্লেখ্য যে বর্তমানে এ সন্তানদের পিতাও ইন্তিকাল করেছেন।

জবাবঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হেবাকারী ব্যক্তি যদি উক্ত সম্পদ হেবা সূত্রে ছেলেদেরকে বুঝিয়ে হস্তান্তর করে দেয়ার পর ইন্তিকাল করে থাকে, তাহলে প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের নিকট থেকে হেবাকৃত সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানকে দেয়া জায়িয নয় এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানরা প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের থেকে হেবাকৃত জিনিসের কোন অংশই দাবী করতে

পারবে না। তবে প্রথম স্ত্রীর সন্তানরা দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদেরকে স্বেছায় কিছু দিতে চাইলে তা দিতে পারবে এবং তা নতুন হেবা হিসেবে গণ্য হবে। আর এটা তাদের নৈতিক দায়িত্বও বটে। এর দ্বারা তারা পিতার এক বিরাট হক আদায় করতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয় বরং সৎ ভাইদের সাথে 'সিলাহ রেহমী'-এর দায়িত্বও আদায় করা হবে। সুতরাং, পিতার আত্মাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে এটা তাদের করাই উচিত।

আর যদি উক্ত সম্পত্তি কেবল ক্রয় করে তাদের নামে রেজিষ্ট্রি করে থাকে এবং তাদের বুঝিয়ে না দিয়ে থাকে, তাহলে এই হেবা সহীহ হয়নি। সেক্ষেত্রে এ সম্পত্তির মধ্য থেকে মৃত পিতার সকল ওয়ারিশগণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্য থেকে তাদের নির্ধারিত অংশ পাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তানরাও প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের সঙ্গে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশীদার হবে। [প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার, ৫:৬৮৮ ৬৯৮ ও ৭০১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৪৭৪, মিশকাত শরীফ, ২:৪১৯- ৪২০]

মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন

জিজ্ঞাসাঃ (ক) এক মুসলমান ভাই, ছয় মেয়ে ও একজন স্ত্রী রেখে ইন্তিকাল করেন। পরে তার বিধবা স্ত্রীর ঐ মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই এর সাথে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। উল্লেখ্য যে মৃত ব্যক্তির পাঁচ ভাই ও এক বোন রয়েছে এবং এই দ্বিতীয় সংসারে তিনটি পুত্র সন্তান হয়। মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে এখন ঐ বিধবা স্ত্রীর কোন হক আছে কিনা ঐ ত্যাজ্য সম্পত্তি কিভাবে বন্টন হবে?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তিকে ২৪ ভাগে ভাগ করতে হবে। বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি ২৪ ভাগ থেকে তিন ভাগ

পাবে। আর তার মেয়েরা ১৬ ভাগ পাবে। আর অবশিষ্ট ৫ ভাগ তার ভাই ও বোনেরা পাবে।

দুধ সম্পর্ক ভাই বোন ওয়ারিশ হয় না

জিজ্ঞাসাঃ আপন ভাই-বোন যেরূপ পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়, অর্থাৎ মীরাছ পায়, দুধ ভাই বোনও কি পিতার সম্পত্তি পাবে?

জবাবঃ দুধ ভাই-বোন দুধ পিতা-মাতা থেকে সম্পত্তি পাবে না।

প্রাপ্ত সম্পদ

রাস্তায় পড়ে থাকা টাকা-পয়সা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি আজ থেকে প্রায় এক বছর, আগে রাস্তায় ৩৭০ টাকা পেয়েছিলাম। পরে বহু খোঁজাখুঁজির পরও মালিকের সন্ধান না পেয়ে উক্ত টাকাগুলো নিজে খরচ করে ফেলেছি। এ মুহূর্তে আমার করণীয় কি-? উল্লেখ্য যে, আমি গরীব। আমার কোন সম্পত্তি নেই এবং চাকুরী বা ব্যবসাও নেই, যা দ্বারা আমি এ টাকাগুলো পরিশোধ করব।

জবাবঃ টাকা প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়ার পরও যদি হারানো মালের মালিক না পাওয়া যায় তাহলে হারানো জিনিস সংরক্ষণকারী ব্যক্তি ধনী হলে মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যতে উক্ত টাকা গরীবদেরকে সদকা করে দিবে। আর সংরক্ষণকারী নিজেই গরীব কিংবা মিসকীন হলে নিজেও তা খরচ করতে পারে। সেই হিসেবে আপনার জন্য উক্ত টাকা নিজে খরচ করা ঠিক হয়েছে। [প্রমাণঃ দারুল উলূম ১২/৪৫৬, ফাতাওয়া শামী ৪:২৮৪]

রাস্তায় প্রাপ্ত টাকা মসজিদে দান করা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি রাস্তায় কোন টাকা পতিত পায় এবং ঐ টাকার প্রকৃত মালিক খুঁজে পাওয়া না যায়, এমতাবস্থায় ঐ টাকার কি ব্যবস্থা করতে হবে? তা মসজিদে দান করা যাবে কিনা?

জবাবঃ প্রাপ্ত টাকা যদি আড়াই ভরি রুপার মূল্যের কম হয় তাহলে প্রাপ্ত স্থানে এবং তার আশেপাশে লোকজন জমা হওয়ার স্থানসমূহে মনের সন্দেহ দূর হওয়া পর্যন্ত টাকা প্রাপ্তির ঘোষণা দিবে। আর যদি আড়াই ভরি রূপা বা তার সমতুল্য বা তার চেয়ে অধিক মূল্যের টাকা বা সম্পদ পাওয়া যায়, তাহলে পূর্ণ এক বছর উল্লেখিত স্থানে ঘোষণা দিবে। এর পরেও যদি প্রকৃত মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে যিনি টাকা পেয়েছেন, তিনি আসল মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যতে উক্ত টাকা কোন গরীবকে দান করে দিবেন। তবে তিনি নিজে গরীব হলে তা নিজের প্রয়োজনেও ব্যয় করতে পারেন। তবে সর্বাবস্থায় যদি পরে মালিক হাজির হয় এবং সদকার অনুমতি না দেয় ও টাকা দাবী করে, তাহলে তার টাকা ফেরত দিতে হবে। উল্লেখ্য, উক্ত টাকা মসজিদে দেয়া যাবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪/২৮৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:৪৫৫ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৪৩২]

পাওনাদার না পাওয়া গেলে তখন করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ পাওনাদারকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তার পাওনা আদায় করার উপায় কি?

জবাবঃ সাধ্যানুযায়ী খোঁজা-খুঁজির পরেও যদি পাওনাদারের সন্ধান লাভ সম্ভব না হয়, তাহলে দেনা পরিমাণ টাকা পাওনাদারের পক্ষ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করে দিবে এবং মনে এই নিয়্যাত রাখবে যে, এই দানের সাওয়াব পাওনাদার পাবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে

এই দানের কারণে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না। অবশ্য পরে যদি পাওনাদার এসে যায় তাহলে দান করার ব্যাপারটি তাকে জানানোর পরও তার পাওনা ফেরত চাইলে তাকে পাওনা পরিশোধ করতে হবে এবং আগের দান তার নিজের পক্ষ থেকে গণ্য হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া তাতার খানিয়াহ ৫:৫৯১]

নও মুসলিমের কুফুরী অবস্থার অর্জিত সম্পদের শর'ঈ হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ নওমুসলিম ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর তার কাছে কাফির থাকা অবস্থায় হারাম উপায়ে যে মাল ছিল, সে মাল কি করতে হবে? এই মাল কি সে মুসলমান হওয়ার পর ব্যবহার করতে পারবে?

জবাবঃ অমুসলিম থাকা অবস্থায় কোন মানুষের হক নষ্ট না করে উপার্জিত মাল-সম্পদ হালাল বা হারাম যে পন্থায়ই উপার্জন করে থাকুক, মুসলমান হওয়ার পর ঐ মাল-সম্পদ এই ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা এবং তার মালিকানায় রাখা জায়িয হবে। কেননা অমুসলিম থাকা অবস্থায় এই ব্যক্তি হালাল হারামের বিধান মেনে চলার জন্য বাধ্য ছিল না, তখন শুধু সে ঈমান গ্রহণের জন্য আদেশপ্রাপ্ত ছিল। তাই মুসলমান হওয়ার পর স্ত্রী যদি এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের বিবাহ ঠিক থাকে। অথচ তখন সে পদ্ধতিতে বিবাহ হয়েছিল, তা হয়ত শরী'আত পরিপন্থী ছিল। কিন্তু ইসলাম তা-ই বহাল রাখে। (প্রমাণঃ হিদায়া ২:৩৪৪)

এক হাদীসে আছে, ইসলাম অতীতের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। [মিশকাত শরীফ ১:১৪]

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাল-সম্পদ যদি কোন ব্যক্তির হক নষ্ট করে অর্জন করে থাকে, আর ঐ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে তাকে মাল ফেরত দিতে হবে অথবা মালের মালিক থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। কেননা,

এটা বান্দার হক। আর তা বান্দা থেকেই মাফ করিয়ে নিতে হয়। [প্রমাণঃ মিরকাত ১:১০২, আততালীকুস সাবীহ ১:৪১]

উত্তোলিত চাঁদার প্রয়োজন না হলে খরচের নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ রাস্তার পার্শ্বে একটা টিউবওয়েল বসানোর নামে পথচারীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করা হয়েছে। অন্যভাবে একটি টিউবওয়েল বসানোর কারণে আর উক্ত টাকার প্রয়োজন হচ্ছে না। আমার প্রশ্ন উক্ত টিউবওয়েলের নামে আদায়কৃত টাকা কোন খাতে বা কিসে ব্যবহার করবে?

জবাবঃ পথচারী সম্পূর্ণ সেচ্ছায় উক্ত টাকা দিয়ে থাকলে, তা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। টিউবওয়েল দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল পথচারীদের উপকার হওয়া, এখন যেহেতু টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাই পথচারীদের কাছ থেকে উঠানো টাকা দ্বারা এমন কোন কাজ করবে যার দ্বারা পথচারীদের উপকার হয়। যেমন, রাস্তার পার্শ্বে বিশ্রামের জন্য ছায়াদার জিনিষ তৈরী করে দেয়া; চাই সেটা যাত্রী ছাউনী হোক বা ঘর তৈরী হোক বা কোন ছায়াদার বৃক্ষ হোক। অথবা নামাযের স্থান, পেশাব-পায়খানা, পুল, সাকো ইত্যাদি করে দিতে পারে। এছাড়া অন্য যে কোন কাজে, যা দ্বারা পথচারীদের উপকার হয়, করা যেতে পারে।

সামাজিকতা

সালামের শর‘ঈ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ নামায শেষে মুনাজাতের পর আমরা কেবলমাত্র ইমাম সাহেবকে সালাম করে মসজিদ থেকে বিদায় গ্রহণ করি এবং পরস্পরে বিদায়ের সময়ও এরূপ করে থাকি। শরী‘আতের দৃষ্টিতে তা কতটুকু বৈধ?

জবাবঃ আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় নামায শেষে মসজিদ থেকে মুসল্লীগণের বের হওয়ার সময় ইমাম সাহেবকে সালাম করার রীতি চালু আছে এবং অনেক জায়গায় এটাকে জরুরী মনে করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটা জরুরী ও দ্বীনের অংশ মনে করার কারণে তা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এরূপ রীতি শরী‘আতে নেই। বরং শরী‘আতের বিধান হল, যখন কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন সালাম ও মুসাফাহা করা সুন্নাত। তদ্রূপ বিদায়ের সময়ও সালাম মুসাফাহা করা সুন্নাত। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে নামায শেষে বা মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার সময় সালাম করার কোন বিধান শরী‘আতে নেই। তবে কেউ যদি এটাকে দ্বীনের অংশ মনে না করে মাঝে মধ্যে অন্যান্য সময়ের সালামের ন্যায় সালাম করে থাকে তাহলে তা বিদ‘আত হবে না। [প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ২:১০০, মিশকাত শরীফ ২:৩৯৯, ৪০২, ফাতাওয়া শামী, ৬:৩৮১ ও ৪১৩]

বিধর্মী লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

জিজ্ঞাসাঃ কোন বিধর্মী লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সম্মান প্রদর্শন করতঃ সম্বোধন সূচক কি শব্দ বলা উচিত? অনেক সময় দেখা যায়, মুসলমান ছাত্ররা সম্মান প্রদর্শন করতঃ হিন্দু শিক্ষককে, ‘আদাব’ বলে

থাকে। মুসলমান ছাত্রদের এরূপ বলা ঠিক হবে কি? না সরাসরি সালাম করতে হবে?

জবাবঃ কোন বিধর্মীকে সালাম দেয়া যাবে না, সে আগে সালাম দিলে তার সালামের উত্তরে وعليكم বা يهديكم الله বা اسلام على من اتبع الهدى বলে দিবে। আর তাদের সাথে সাক্ষাত হলে সৌজন্য প্রর্দশন স্বরূপ আদাব-বলে বা অন্য কোন ভাবে সম্মান প্রর্দশন করবে যেমন, হাতের দ্বারা ইশারা করে বা তার কূশলাদি জিজ্ঞাসা করে ইত্যাদি। তবে কোন ক্রমেই নমস্কার বা নমস্তে বলা যাবে না। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ৩৯৮-৩৯৯, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:২৫৬, কিফায়াতুন মুফতী ৯:৯২]

পিতা-পুত্রের যৌথ কর্মে পুত্রের মালিকানা

জিজ্ঞাসাঃ পিতা ও পুত্র যদি একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করে, তাহলে পুত্রের উপার্জিত অর্থের মালিক কে হবে? আমাদের দেশে সব অর্থের মালিক পিতাকেই মনে করা হয়। এ ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা কি?

জবাবঃ পিতা ও পুত্রের একান্নভুক্ত পরিবারে উপার্জিত অর্থের মালিক সবসময় পিতাই হবে এমন ধারণা করা ঠিক নয়। বরং পিতা ঐ সময় মালিক হবেন যখন পিতা ও পুত্র উভয়ের পুঁজিবিহীন কর্মস্থল এক হয় অথবা একমাত্র পিতার পুজি বা সম্পত্তি নির্ভর ব্যবসায় পুত্র শুধু শ্রম দেয়া।

আর যদি পুঁজিবিহীন কর্মস্থল ভিন্ন ভিন্ন হয় বা পূত্রের নিজস্ব পুঁজিও শামিল থাকে সেক্ষেত্রে পুত্রের উপার্জন বা তার পুঁজি অনুপাতে লভ্যাংশের মালিক পুত্রই হবে পিতা নয়।

অবশ্য ছেলে-সন্তানেরা যদি তাদের উপার্জিত অর্থ পিতার হাতে/ফান্ডে নিঃশর্তভাবে পিতাকে মালিক বানিয়ে জমা দিয়ে দেয়, তাহলে হেবা সূত্রে

পিতা এর মালিক হয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে এ অর্থ দিয়ে তৈরীকৃত জিনিসও পিতার মালিকানা বলে গণ্য হবে। তবে আমাদের দেশে সন্তান কর্তৃক অস্পষ্টভাবে যে টাকা পয়সা পিতা-মাতার হাতে দেয়া হয়, পিতা-মাতা মনে করে তাদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়া হচ্ছে, আর ছেলে মনে করে যে, এর দ্বারা পিতা তার জন্য সম্পদ করে দিবেন। ছেলে তার মনের কথা পরিষ্কার বলে না, যাতে পিতা মনে কোন আঘাত না পায়। অথচ পরবর্তীতে সম্পদের দাবী-দাওয়া নিয়ে এর চেয়ে বহুগুণ বেশী আঘাত দিয়ে থাকে। এ প্রথা শরী'আতে খুবই ঘৃণিত। প্রত্যেকের কর্তব্য প্রথমেই মু'আমালা পরিষ্কার করে নেয়া। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৮২৩-৮২৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯:১৬০, আদদুররূল মুখতার ৪:৩২৫]

টেলিফোন করার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে টেলিফোন করার নিয়ম কি? বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক ।

জবাবঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রের দিক নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। টেলিফোন আধুনিক যুগের এক অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু এর যথেচ্ছা ব্যবহার এবং অন্য মানুষকে সময়ে অসময়ে টেলিফোন করে ব্যস্ত ও পেরেশান করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ তাই কিভাবে টেলিফোন ব্যবহার করলে গুনাহের হাত থেকে বাঁচা যাবে। তা নিম্নে দেয়া হলঃ

১। কোন ব্যক্তির কাছে ঘুমানোর সময় বা বিশেষ কোন কাজ যেমন, নামায ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকায় ইত্যাদির সময় অথবা গভীর রাত্র তখন একান্ত ঠেকা ছাড়া তার নিকট টেলিফোন করা নাজায়িয। কেননা, এতে

তার ঠিক ঐ রকমই কষ্ট অনুভব হয়, যেমন কষ্ট হয় বিনা অনুমতিতে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

২। যার সাথে অহরহ ফোনে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তার কাছ থেকে জেনে নিবে যে, কোন সময় তার কথা বলতে সুবিধা হবে। পরে সেই হিসেবে টেলিফোন করবে।

৩। অনেক সময় দেখা যায় যে রিং হয়েই চলছে, কিন্তু কেউ রিশিভার উঠাচ্ছে না। এটা একেবারেই অনুচিত এবং মানবতা বিরোধী। কেননা, কেউ যদি আপনার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে এটা তার অধিকার। তাই এ অধিকার বাস্তবায়নে আপনাকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে। হ্যাঁ, সে মুহূর্তে সময় দেয়া অসম্ভব হলে নিজে বা নিজের লোকের মারফত তা জানিয়ে দেয়া উচিত। [প্রমাণঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৬ খন্ড সূরায়ে নূর]

হালখাতার মিষ্টান্ন খাওয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় হালখাতার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। দোকানদাররা সাধারণত যাদের কাছে বাকী আছে তাদেরকে এবং যাদের বাকী নেই কিন্তু ধনী লোক তাদেরকে দাওয়াত করে। যাদের কাছে বাকী আছে তারা তাদের টাকা পরিশোধ করে দেয় এবং অগ্রিম টাকাও দেয়। পরে দোকান থেকে পণ্য সামগ্রী নিয়ে তা শোধ করে। উভয় অবস্থায় দোকানদার তাদেরকে মিষ্টি খাওয়ান। এখন আমার প্রশ্ন হলঃ

(১) যাদের কাছে টাকা পাওয়া যায় তারা টাকা পরিশোধ করে যে মিষ্টান্ন খান তা খাওয়া জায়েয কি না?

(২) যারা অগ্রিম টাকা দিয়ে মিষ্টান্ন খান এবং পরে টাকা পণ্য নিয়ে শোধ করেন, তাদের খাওয়া মিষ্টান্ন কি সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে? বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন ।

জবাবঃ আমাদের জানা মতে হালখাতা উপলক্ষে দোকানদাররা তাদের ক্রেতাদেরকে যে আপ্যায়ন করে থাকে সেটা সাধারণতঃ মেহমনদারীর নিয়্যতেই করে থাকে। সুতরাং, এখানে সুদের কোন অবকাশ নেই। বরং সুদ তো এক্ষেত্রে হত যদি দোকানদাররা এই আপ্যায়নের বিনিময়ে ক্রেতাদের থেকে পাওনা টাকা থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করত।

তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শরী'আতের খেলাফ কোন কাজ না হয়। এবং প্রতি বছর একই তারিখে করতে হবে এরূপ ধারণা থেকে বিরত থাকবে। কারণ ইসলাম কোন দিন তারিখ অনুসরণকে সমর্থন করে না এবং কোন দিনকে অকল্যাণকর মনে করা উচিত নয়। সুতরাং বৈশাখের শুরুতেই করতে হবে এমন মনে করবে না। কারণ এটা বিজাতীয় রীতি যার থেকে বেঁচে থাকা মুসলমানদের কর্তব্য। [প্রমাণঃ আবু দাউদ ২:৫২৫]

আত্মীয়দের বাসায় খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ এমন আত্মীয় যাদের উপার্জন হালাল নয়, তাদের বাসায় খানা খাওয়া ঠিক কি-না? আত্মীয়তা রক্ষার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় খানা খেতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের বাড়ীতে খানা খাওয়া হালাল হবে কি-না?

জবাবঃ যাদের উপার্জনের অর্ধেক বা তার বেশী হারাম এমন আত্মীয়ের বাসায় খানা খাওয়া বা তাদের উপহার সামগ্রী বা হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয হবে না। আর যদি তাদের মালের অধিকাংশ হালাল মনে হয়

তাহলে তাদের বাসায় খেতে ও তাদের হাদিয়া গ্রহণ করতে ক্ষতি নেই। তেমনিভাবে অধিক উপার্জন হারাম হওয়া সত্ত্বেও নিদিষ্ট হালাল মাল থেকে খাওয়ালে তা হালাল হবে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১:২৪১, ফাতাওয়া আমগীরী ৫:৩৪২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫:২২৪ তাবলীগে দ্বীন ৬২]

পর্দা-পোষাক

যাদের সঙ্গে দেখা দেয়া বৈধ / অবৈধ

চাচী, মামী, চাচাত বোন, মামাত বোনদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ

জিজ্ঞাসাঃ যাদের সাথে দেখা দেওয়া শরী'আত নিষেধ করেছে, বিশেষ করে চাচী, মামী, চাচাত বোন, ফুফাতো বোন, মামাত বোন, আপন শালী, আপন ভাবী এদের মধ্যে কেউ যদি মারা যায় তাহলে এদের লাশ দেখা যাবে কি-না? অথবা এদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় তাহলে তাদের সেবা করা যাবে কি না? অথবা দেখা সাক্ষাত করা সাবে কি না?

জবাবঃ শরী'আত যাদের সাথে জীবিতাবস্থায় দেখা করা নিষেধ করেছে তাদেরকে মৃত্যুর পরও দেখা হারাম এবং অসুস্থ হওয়ার পর দেখাও নিষেধ। সুতরাং, চাচী, মামী, চাচাতো বোন প্রভৃতিদেরকে অসুস্হ ও মৃত্যুর পর দেখাও হারাম, না জায়েয। অবশ্য প্রয়োজনে পর্দার পুরা পাবন্দি করে কোন সেবা সম্ভব হলে করা যাবে। (প্রমাণঃ বাদায়িয়ুস সানায়ে-১:৩০৬, আদদুররূল মুখতার-৬:৩৭১)

জ্বীনকে বাধ্য করে তদবীর ও বেগানা মহিলাদের চিকিৎসা প্রদান

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক নামধারী মাওলানা সাহেব তাবীজ ও তদবীরের আর্থিক ব্যবসায় এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন যে, বেপর্দা নারী ও যুবতীদের সঙ্গে অবাধে দেখা সাক্ষাৎ করেন, কথা-বার্তা বলেন, ঝাঁড়-ফুঁক ইত্যাদি দেন এবং তিনি বলে থাকেন যে বহু জ্বীন তার বাধ্য রয়েছে। আরো বলেন যে, একবার দু-টি জ্বীন তার অবাধ্য হওয়ায় সেই দু-টিকে তিনি পুড়িয়ে মেরে ফেলেছেন। তার এসব কার্যকলাপ ইসলামী শরী'আত মুতাবিক বৈধ কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে পর্দা করা ফরয। পুরুষদের জন্য বেগানা মহিলাদের সাথে বেপর্দা অবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ করা হারাম। তাছাড়া তাবীজ-তুমার বা শিরকী কাজের মাধ্যমে জ্বীন জাতিকে বাধ্য করাও নাজায়েয। সুতরাং বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত মাওলানা সাহেবের এমন করে থাকলে সে ভন্ড ও ফাসিক। তার নিকট থেকে সকল মুসলমানের দূরে থাকা ঈমানী দায়িত্ব। (প্রমাণঃ সূরা মুমিনূন-৫, মিশকাত শরীফ- ২:২৬৯-২৭০ মিশকাত শরীফ- ১: ২, কাওয়ায়িদুল ফিক্বহ-৪০৫, হিদায়াহ-৪:৪৪৪)

পর পুরুষদের সাথে দেখা দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ স্ত্রীর জন্য তার দেবর, ভাশুর, ননাসের জামাই এবং ননদের জামাই-এদের সাথে দেখা দেয়া ঠিক হবে কি?

স্ত্রী যদি দেবর, ভাশুরদের সাথে দেখা দেয় এবং তাদের সাথে কথা বললে স্বামী যদি কোন আপত্তি না করে বা স্বামী যদি তাদেরকে স্ত্রীর কাছে আসতে বাধা না দেয়, তাহলে স্বামীও কি আজাব ভোগ করবে?

জবাবঃ পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। পুরুষদের জন্যে যেমন বেগানা মহিলার সাথে বেপর্দা দেখা-সাক্ষাৎ হারাম, তেমনিভাবে মহিলাদের জন্যেও বেগানা পুরুষদের সাথে বেপর্দা দেখা-সাক্ষাৎ হারাম। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে পর্দার গুরুত্ব বুঝান, যার ফলে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, দেবর-ভাশুরের সাথে দেখা দেয়ার ব্যাপারে আপনার কি মত? তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দেবর-ভাশুর তো মৃত্যু সমতুল্য। অর্থাৎ, তাদের সাথে দেখা দেওয়া তো আরো অধিক মারাত্মক আপরাধ। মৃত্যু যেমন কখন আসে ঠিক নেই, মানুষের সম্পূর্ণ অজান্তেই এসে পড়ে তেমনিভাবে মানুষ বেপর্দার কারণে কখন কি

করে বসে তারও ঠিক নেই। এছাড়াও মৃত্যুতুল্য বলার আরেকটি অর্থ হল, মৃত্যুকে যেমনি মানুষ ভয় পায় তেমনি দেবর-ভাশুরকেও ভয় পাওয়া উচিত।

সূতরাং, কোন স্ত্রীর জন্য দেবর-ভাশুরদের সাথে বেপর্দা ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। চাই স্বামীর পক্ষ থেকে অনুমতি থাকুক বা নাই থাকুক। তবে যদি স্বামীও এ অনুমতি দেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বামীও উক্ত গুনাহের অংশীদার হবে। যারা আল্লাহ তা'আলার এই মহান বিধানকে লংঘন করবে, দুনিয়াতেও অনেকে সমস্যার সম্মুখীন হবে। আর পরকালে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। তেমনিভাবে যে লোক তার অধিনস্থ তথা তার স্ত্রী মেয়ে ও বোনদেরকে বেপর্দা চলা-ফেরা থেকে বাধা দেয় না, হাদীসের ভাষায় সে দাইয়ূস এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (প্রমাণঃ বুখারী-২:৭৮৭)

চাচাত বোনকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ চাচাত বোনের সাথে সরাসরি কথা বলা, এমনকি চিঠির মাধ্যমে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া জায়েয হবে কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে চাচাত বোনের সাথে পর্দা করা ফরয। সুতরাং, একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তার সাথে কথাবার্তা বলা নাজায়েয। তবে ফিৎনার আশংকা না থাকলে পর্দার বিধান রক্ষা করে দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। (সূরা নূর-৩১, তাফসীরে মাযহারী-৬:৪৯৭-৫০২)

দুলাভাইয়ের ভাইয়ের সাথে দেখা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আপন দুলাভাইয়ের ভাইয়ের সাথে দেখা দেয়া শরী'আতে জায়েয কিনা?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে আপন দুলাভাইয়ের সাথে দেখা দেয়া নাজায়েয। মহিলাদের জন্য শরী'আতে ১৪ প্রকার লোকের সাথে দেখা দেয়া দেয়া জায়েয আছে। অন্যান্যদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয নয়। উক্ত ১৪ প্রকারের মধ্যে দুলাভাই অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং, দুলাভাইয়ের ভাই তো দূরের কথা, স্বয়ং দুলাভাইয়ের সাথে বালেগ শালিকার দেখা দেয়া জায়েয নয় বরং হারাম।

সৎ মার সাথে দেখা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ সৎ মায়ের সঙ্গে দেখা দেয়া জায়েয কিনা? শরী'আতে যেই চৌদ্দজনের সাথে দেখা দেয়া জায়েয রয়েছে, এর মধ্যে তো সৎমার কথা উল্লেখ নেই, যদি জায়েয হয়ে থাকে, তবে কি ভাবে?

জবাবঃ সৎ মার সঙ্গে দেয়া দেয়া জায়েয আছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত মহিলাদেরকে বিবাহ করা স্থায়ীভাবে হারাম করেছেন, তাদের সঙ্গে দেখা দেয়া জায়েয। আর তাদের মধ্য থেকে সর্ব প্রথমেই হচ্ছেন পিতার স্ত্রী। বলাবাহুল্য, সৎ মা পিতারই স্ত্রী। অতএব, সৎমার সঙ্গে দেখা দেয়া জায়েয হবে। (প্রমাণঃ আল কুরআন; সূরা নিসা-২৩)

চাচা, মামা, খালু, ফুফা এদের সাথে দেখা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ সূরা নূর পারা ১৮ রুকু ৪ আয়াত ৩১-এ নারীদেরকে ১২ জন পুরুষের সাথে দেখা করতে পারবে বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু এর মধ্যে, চাচা, মামা, খালু, ফুফা এদের উল্লেখ নেই। তাহলে তারা কি মহিলাদের জন্য মাহরাম নন? যদি তাদের সাথে দেখা করে, তাহলে কোন গুনাহ হবে কিনা?

জবাবঃ উপরে বর্ণিতদের মধ্য থেকে শুধু দুইজন অর্থাৎ, চাচা ও মামা মাহরাম। তাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয। এবং বাকী দুইজন অর্থাৎ

খালু ও ফুফা মাহরাম নয়। তাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া জায়েয নয়। সূরা নূর-এর মধ্যে - ১২ জনের কথা বলা হয়েছে, আর বাকী দুইজন (মামা ও চাচা) এদের কথা চতুর্থ পারার শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, যে কোন পুরুষ তার আপন ভাগিনীকে বিবাহ করতে পারবে না। এখানে চাচার কথা এসে গেল এবং কোন পুরুষ আপন ভাগিনীকে বিবাহ করতে পারবে না। এখানে মামার কথা এসে গেল। সুতরাং, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত জায়েয। মোদ্দাকথা, যাদের সঙ্গে কোন সময়ই বিবাহ জায়েয নয়, তাদের সঙ্গে দেখা করা যায়। (সূরা নিসা-২৩)

উকিল বাবার সাথে দেখা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ উকিল বাবার সাথে দেখা করা জায়েয আছে কিনা?

জবাবঃ মেয়েদের জন্য তার স্বামী এবং পুরুষ মাহরাম অর্থাৎ এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম, কিংবা কামভাবহীন-অশীতিপর বৃদ্ধ, অথবা এমন নাবালেগ অবুঝ ছেলে, যারা মেয়েদের গোপন বিষয়ে জ্ঞাত নয়- এ ধরনের পুরুষদের সাথে কেবল দেখা দেয়া জায়েয। কিন্তু প্রশ্ন বর্ণিত উকিল বাবা যেহেতু চৌদ্দ শ্রেণীর কোন শ্রেণীর অন্তভুক্ত নয়, কাজেই তাকে বাবা মনে করা বা তার সাথে দেখা- সাক্ষাৎ করা কোনভাবেই জায়েয নয়। বরং তার সাথে পর্দা রক্ষা করা ফরয। খোদায়ী বিধানের উপর দেশের রেওয়াজ ও প্রথাকে প্রাধান্য দেয়া মহা অপরাধ। উল্লেখ্য, উকিল বাবা নামের সম্পর্ক শরী'আত অনুমোদন করে না, তাই এ শব্দটিই একটি গহিত শব্দ যা বর্জনীয়। (প্রমাণঃ সূরা নুর-৩১, তাফসীরে মাযহারী-৬:৪৯০)

পর্দার সাথে গায়রে মাহরামের সাথে সালাম বিনিময়

জিজ্ঞাসাঃ গায়রে মাহরাম মহিলা যেমন মামাতো বোন, চাচাতো বোন, খালাতো বোন, ভাবী ইত্যাদি এদের সাথে পর্দার আড়াল থেকে সালাম বিনিময় বা কথা বলা যাবে কি না?

জবাবঃ পর্দার আড়ালে গায়রে মাহরাম মহিলা তথা মামাতো বোন, চাচাতো বোন, খালাতো বোন, ভাবী প্রমুখের সাথে সালাম ও প্রয়োজনীয় জরুরী কথাবার্তা বলা জায়েয আছে। তবে ঐ সব মহিলাদের উচিৎ তারা যেন দরকারী কথা সংক্ষেপে নিরস ভাষায় বলে শেষ করে দেয়। লম্বা নরম আলাপ বা অহেতুক-অপ্রয়োজনীয় কথা বার্তা যেন না হয়। কারণ, গায়রে মাহরামের সাথে কথাবার্তা যদি আত্মতৃপ্তিমূলক, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধিকারী- পাপের পথে অগ্রসরকারী প্রভৃতি ধরনের হয়, তবে তাও নাজায়েয হবে। যে জিনিস অন্যায় ও অবৈধ কাজের প্রতি আবেগতাড়িত করে, সে জিনিস নিঃসন্দেহে নাজায়েয। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া- ৬:২৬৮)

মেয়েদেরকে সালাম দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ গায়রে মাহরাম মেয়েদেরকে সরাসরি বা ফোনে বা চিঠিপত্রে বা কারো মারফত সালাম দেয়া বা তাদের সালামের জবাব দেয়া জায়েয আছে কিনা?

জবাবঃ মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে সালাম আদান-প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, আদান-প্রদানকারী উভয় পুরুষ হোক বা উভয় মহিলা হোক। মাহরাম পুরুষ মহিলাগণ আপসে সালাম আদান-প্রদান করবে।

কিন্তু যদি গায়রে মাহরাম হয় তাহলে তাদের জন্য সালাম আদান-প্রদান বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হল কোন পক্ষ হতে ফিৎনার আংশকা না থাকা। যদি ফিৎনা হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে জায়েয হবে না। আর যদি

মহিলা অতি বৃদ্ধা হয় বা ফিৎনার আশংকা না থাকে, তাহলে যেমন সরাসরি সালাম দেয়া জায়েয তেমনিভাবে টেলিফোন ও চিঠিপত্রেও সালাম দেয়া জায়েয হবে। (বুখারী ১:৫৩২, মুসলিম হাদীস নং- ৬২৫৭, তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম-৫:১৫৮, ফাতাওয়া আলমগীরী-৫:৩২৬, ফাতাওয়া শামী- ৯:৫৩০ (মাকতাবায়ে যাকারিয়া) তাফসীরে মাযহারী-২:৩৬৫)

ভাবির সাথে সাক্ষাৎ বা দেখা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার তিন বছর বয়সের সময় আমার বড় ভাইয়ের বিবাহ হয়। ভাবী আমাকে ছোট কাল থেকেই লালন-পালন করে আসছেন। ভাবীকে আমি নিজের মায়ের মত দেখি, আমার মধ্যে কোন দুশ্চিন্তা, খারাপ ধারণা বা যৌন ধারণা সৃষ্টি হয় না। এখন আমার ভাবীর সাথে দেখা করা আমার জন্য জায়েয হবে কি না?

জবাবঃ বালেগ হওয়ার পর আপনার জন্য কোন ক্রমেই আপনার ভাবীর সাথে দেখা করা জায়েয হবে না। কারণ- যে চৌদ্দ জনের সাথে দেখা করা শরী'আতে জায়েয আছে তাদের মধ্যে ভাবী শামিল নয়। হাদীসে মেয়েদের জন্য তার দেবর ও ভাশুরকে মৃত্যুতুল্য বলা হয়ছে। কারণ, তাদের দ্বারা অন্যায় সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। সুতরাং, এক্ষেত্রে বেশী পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। কোন মানুষের জন্য নিজের নফসকে বিশ্বাস করা এবং নফসকে পবিত্র মনে করাটাই নাজায়েয। আম্বিয়া আ. মা'সুম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের নফসকে পবিত্র বলে সত্যায়ন করা থেকে বিরত থাকতেন। (সূরা ইউসুফ-৫৩)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ জাতির দুর্বলতার সকল দিক সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত। সুতরাং, যুক্তি-তর্ক ছাড়া বিনা বাক্য ব্যয়ে

তার নির্দেশ মান্য করার মধ্যেই মানুষের কামিয়াবী। ভাবীকে দেখলে, যদি কারো মধ্যে যৌনস্পৃহা জাগ্রত না হয়, তাহলেও তার জন্য ভাবীকে দেখা বা তার দিকে নজর করা জায়েয হবে না। কেননা, এমনও থেকে পারে যে এ মুহূর্তে মন পরীক্ষার আছে, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে ইবলীস শয়তান তার অজান্তে তার মনের মধ্যে কু-ভাব সৃষ্টি করতে পারে। এজন্যই শরী'আত আগে থেকেই তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে মানুষকে ধ্বংস ও চরম বেইযযতীর হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছে।

এতদ্ব্যতীত শরী'আতের হুকুম যখন অকাট্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন তা মানতেই হবে। সে হুকুম কারণ নির্ভর হবে না। কারণ পাওয়া যাক, চাই না যাক বিনাবাক্যে শরী'আতের হুকুম পালন করাই ঈমান ও ইসলামের দাবী। (প্রমাণঃ সূরা নূর-৩১, তাফসীরে মাযহারী-৬:৪৯৭)

পুরুষ এবং নারী কার কার সাথে দেখা দিতে পারবে

জিজ্ঞাসা পুরুষরা কত শ্রেণীর মহিলাদের সাথে এবং মহিলারা কত শ্রেণীর পুরুষদের সাথে দেখা করতে পারবে?

জবাবঃ **পুরুষরা নিম্নবর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা করতে পারবেঃ**

১। মা।

২। দাদী, নানী তাদের উর্ধ্বতন ক্রমাণু মহিলাগণ।

৩। সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন।

৪। আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান ও ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

৫। যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে, তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান। স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী, দাদী শাশুড়ী।

৬। ফুফু অর্থাৎ, পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৭। খালা অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

৮। ভাতিজী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে ও - তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

৯। ভাগ্নি অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

১০। দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন যে কোন কন্যা সন্তান ও দুধ সম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

১১। দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী ও তাদের অধঃস্তন ক্রমানু মহিলাগণ।

১২। দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

১৩। যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

১৪। অপ্রাপ্তবয়স্কা এমন মেয়ে যার প্রতি পুরুষদের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না।

উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সাথে দেখা সাক্ষাৎ মোটেও জায়েয নয়। বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

মহিলাগণ নিম্নবর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষের সাথে দেখা করতে পারবেনঃ

১। বাবা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমাণু পুরুষগণ।

২। সহোদর ভাই-বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৩। শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন ক্রমাণু পুরুষগণ।

৪। আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানদের স্বামী।

৫। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৬। ভাতিজা, ভাগিনা অর্থাৎ, সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

৭। আপন চাচা অর্থাৎ, বাবার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৮। আপন মামা অর্থাৎ, মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৯। দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত সন্তান যে কোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

১০। দুধ সম্পর্কীয় বাবা, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমাণু পুরুষগণ।

১১। দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পূত্র সন্তান।

১২। দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পূত্র সন্তান।

১৩। যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তার প্রতি মহিলাদেরও কোন আকর্ষণ নাই।

১৪। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক যার মাঝে এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতীত কোন মহিলার জন্য অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ মোটেও জায়েয নয় বরং সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয ও হারাম।

(প্রমাণঃ সূরা নিসা-আয়াত ২৩, সূরা নূর-আয়াত ৩১, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন-২: ৩৫৬-৩৬, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন-৬:৪০১-৪০৫, তাফসীরে মাযহারী-২:২৫৪-২৬১, তাফসীরে মাযহারী-৬: ৪৯৭-৫০২)

মহিলাদের শিক্ষা, শিক্ষকতা ও মার্কেটিং করা

অসহায় অবস্থায় মহিলাদের চাকুরী

জিজ্ঞাসাঃ (১) একজন অবিবাহিত মহিলা বি এস সি পাশ করেছেন। পিতার অসচ্ছলতার দরুন তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই ভাবতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা হাই স্কুলে চাকুরী নিতে পারবেন কি? শরী'আতের দৃষ্টিতে এর বিধান কি?

জিজ্ঞাসাঃ (২) একজন লোক হাইস্কুলের শিক্ষক। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার দরুণ চাকুরী নেয়া অপরিহার্য এমন একজন মহিলাকে নিজের স্কুলে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তার কোন অসুবিধা হবে কি?

জবাবঃ (১) বিবাহেব আগে মহিলাদের ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার পিতার উপর। পিতা না থাকলে বড় ভাই বা অন্যান্য গার্জিয়ানদের উপর।

আর বিবাহের পর তার স্বামীর উপর। তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা সাবলম্বী হওয়ার জন্য মহিলাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এটা বহু আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তবে যদি দায়িত্বশীল কোন বাক্তি না থাকে অথবা থাকা সত্ত্বেও দেখাশুনা না করে বা করতে না পারে, তখন নিজের চলার জন্য এমন কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে যেখানে শ'রঈ পর্দা লংঘিত হয় না। যেমন- নূরানী মু'আল্লিমা ট্রেনিং নিয়ে বাড়ীতে বসে মহিলাগণকে কুরআনের তালীম দেওয়া হাতের কাজ করা ইত্যাদি।

সমাজে অনেক ভদ্র মহিলাই এখন এভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু হাইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষা দেয়া হয় এবং পুরুষ ও মহিলা উভয় ধরনের শিক্ষক থাকেন। ফরয পর্দা লংঘন করে সেখানে চাকুরী গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। হ্যাঁ, যদি এমন কোন স্কুল পাওয়া যায় যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষাথী সকলেই পর্দাকারিণী মহিলা, সেখানে যেহেতু বেপর্দা হওয়ার কোন আশংকা নেই। কাজেই এ ধরনের কর্মস্থলে পর্দার পাবন্দী করে চাকুরী গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

(২) হারাম কাজ নিজে করা যেমন না জায়েয ও কবীরা গুনাহ, তেমনি সে কাজে সহায়তা করা বা ব্যবস্থা করে দেওয়া নাজায়েয। সুতরাং, প্রশ্নে উল্লেখিত স্কুলের মাষ্টার সাহেবের জন্য একজন মহিলাকে হাইস্কুলে চাকুরী দেওয়া জায়েয হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

(সূরা নূর-৩১, সূরা বাকারা-২৩৩, সূরা আহযাব-৩৩, সূরা মায়িদা-২, মিশকাত শরীফ-২:২৬৯, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-২:৩৩৮, মা'আরিফুল কুরআন-৭:১৩৫, ফাতাওয়া রাহীমিয়া-৪:৯৪, ১০৯)

প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাকে প্রাইভেট পড়ানো

জিজ্ঞাসাঃ প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাকে প্রাইভেট পড়ানো কি শরী'আত সম্মত?

জবাবঃ প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকে প্রাইভেট পড়ানোর ক্ষেত্রে বেপর্দা হওয়াটাই স্বাভাবিক, তাই বেপর্দাভাবে প্রাইভেট পড়ানো নাজায়েয ও হারাম। এমন ব্যক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। (প্রমাণঃ সূরা নূর-৩০, মিশকাত শরীফ-২৭০ পৃঃ)

প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে বেপর্দা অবস্থায় নূরানী ট্রেনিং দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকে বেপর্দা অবস্থায় নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা দেয়া জায়েয আছে কি-না? এবং এরূপ বয়সের মেয়েদেরকে বেপর্দা অবস্থায় কুরআন শিক্ষা দানকারী ইমামের পেছনে নামায আদায় করা জায়েয আছে কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে পর্দা করা ফরয। সুতরাং, পুরুষদের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কা বেগানা মহিলাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা হারাম। তাই প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে খোলামেলাভাবে পর্দা তরক করে কুরআন শিক্ষা দেয়া কোন ইমাম বা মু'আল্লিমের পক্ষে মোটেও জায়েয হবে না। এরূপ ইমাম শয়ী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং, তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী এবং তার তাওবা করে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা নাজায়েয। আর উক্ত ইমামের জন্য ইমমতি করাও মাকরূহে তাহরীমী।

(সূরা নূর-৩০, হিদায়াহ-৪৪২, মিশকাত-২:২৬৯, তাফসীরে মাযহারী-৬:৯৮, দুররে মুখতার-১:৫৫৭)

ইমামের জন্য বালিকা স্কুলে শিক্ষকতা করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব বালিকা স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং ইমামতি করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বালেগা মেয়েরা বোরকা ছাড়াই হলে আসে এবং ক্লাস করে। ইমামের জন্য উভয় চাকুরী জায়েয হবে কি না? এলাকার মুসল্লীদের নামাযের কোন অসুবিধা হবে কি না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ মসজিদের ইমাম ও খতীব দীনদার ও পরহেজগার আলেম হওয়া জরুরী। ইমাম যদি পরহেজগার না হন বরং প্রকাশ্য কবীরা গুণাহে লিপ্ত হন, অথবা সগীরা গুণাহে অভ্যস্ত থাকেন, তাহলে তাকে ইমাম হিসাবে নিয়োগ করা মাকরূহে তাহরীমী হবে। আর তার জন্য ইমামতি করাও মাকরূহে তাহরীমী হবে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ এরূপ ব্যক্তিকে ইমাম হিসাবে বহাল রাখা নাজায়েয। প্রশ্নে উল্লেখিত কাজটি তথা বালেগা মেয়েদের পর্দা বিহীন পড়ানো নাজায়েয ও হারাম। সুতরাং, উক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখিত চাকরী বর্জন করে তাওবা ইস্তোগফার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমী এবং তার পিছনে নামায পড়াও মাকরূহে তাহরীমী হবে। তাকে ইমামতিতে বহাল রাখাও নাজায়েয হবে। সুতরাং, উক্ত ব্যক্তি স্কুলে চাকরি করলে ইমামতি ছেড়ে দিবেন। অবশ্য তার জন্য ইমামতী করা বা না করা উভয় অবস্থায় স্কুলের চাকুরী ছেড়ে দেয়া জরুরী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী-১:৮৩/, কানযুদ্দাকায়েক-২৮, ফাতাওয়ায়ে শামী-১:৫৬০, ফাতাওয়ায়ে রাহীমীয়া-১:১৬৩)

মহিলাদের বোরকা পরিধান করে মার্কেটে যাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানি মহিলারা জরুরত তথা একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে পারবে না। এখন আমার প্রশ্ন হল, কোন মহিলার জন্য একাকী বা স্বীয় স্বামীর সাথে বোরকা পরিধান

করে মার্কেটে গিয়ে কাপড় বা কোন জিনিস পছন্দ করা জায়েয হবে কি-না বা এটা জরুরতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না?

জবাবঃ মহিলাদের স্বীয় দীনদারী টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখিরাতে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদের কর্তব্য হলো সর্বদা গৃহাভ্যন্তরে থাকা, বাইরে না যাওয়া। তবে একান্ত প্রয়োজনে মাহরামের সাথে, পর্দার সাথে বাইরে যাওয়া অনুমতি আছে।

মহিলাদের শুধুমাত্র জিনিসপত্র পছন্দ করার জন্য স্বীয় স্বামীর সাথে মার্কেটে যাওয়ার অনুমতি শরী'আতে নেই। কেননা, প্রথমতঃ শরী'আত মহিলাদেরকে যে প্রয়োজন বা ঠেকার ভিত্তিতে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে এটা সে প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। কারণ, প্রয়োজনে বা ঠেকার অর্থ এমন জরুরত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুধু পর্দা করলেই বা বোরকা পড়লেই মহিলাদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া জায়েয হয় না। বরং প্রথমে বিশেষ জরুরত সাব্যস্ত হতে হবে, তারপর পর্দা সহকারে বের হওয়া জায়েয হবে।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীর নিজের পক্ষ থেকে জিনিস পছন্দ করাটা স্বামীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস না থাকার পরিচয় বহন করে। কারণ লেবাস-পোশাক দ্বারা একমাত্র স্বামীকে খুশী করাই স্ত্রীর কাম্য। সুতরাং, যাকে খুশী করা উদ্দেশ্য তিনি নিজের পছন্দমত কিনবেন এটাই তো যুক্তিযুক্ত। তাই স্ত্রীর এ ধরনের আচরণ থেকে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। তাইতো কুরআনে কারীমে মহিলাদের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না"। (সূরা আহযাব-৩৩)

এমনিভাবে হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করতেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছে, তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করো না তবে তাদের জন্য তাদের ঘরে নামায পড়াটাই উত্তম। এ হাদীসদ্বয়ের সমন্বয়ে ফুকহায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তথা সাহাবায়ে কেরামের যামানায়ই ফিৎনার আংশকায় মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করে দেয়া হয়। বলা বাহুল্য বর্তমান যামানার পরিস্থিতির সাথে আর সাহাবীগণের স্বর্ণযুগের পরিস্থিতির সাথে কোন তুলনা করা যায় না। অর্থাৎ, এর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আর যখন সেই সাহাবায়ে কিরামের যামানায় সামান্যতম ফিৎনার আশংকায় মহিলাদেরকে মসজিদে এসে নামায পড়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। সেখানে বর্তমান ফিৎনার যামানায় কি করে একজন মহিলার জন্য মার্কেটে যাওয়া বৈধ হতে পারে। চাই সে একা যাক বা স্বামীকে নিয়ে যাক। কেননা, শোনা যায় অনেক সময় স্বামী বা মাহরাম থাকা অবস্থায়ও অনেক মহিলার বিপদে পড়তে হয়েছে। তাছাড়া মহিলা স্বামীর সাথে বোরকা পরিধান করে মার্কেটে গেলে যদিও তার সৌন্দর্য কোন বেগানা পুরুষ দেখতে পারবে না। কিন্তু সে তো একটি অযথা কাজ করতে গিয়ে নিজে কোন পুরুষকে দেখবে। আর এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর পত্নি তথা উম্মে সালামা ও মাইমুনা রা. ছিলেন। হঠাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ) সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট আগমন করলেন; তাই তিনি স্বীয় স্ত্রীদ্বয়কে তার থেকে পর্দা করতে বললেন। তখন স্ত্রীগণ বললেন, আগন্তুক তো অন্ধ, সে কিভাবে আমাদেরকে দেখবে?

তাদের কথার প্রতিউত্তরে প্রিয়নবী ﷺ বললেন, তোমরাও কি অন্ধ (তোমরা কি তাকে দেখবে না? সেটা কি তোমাদের জন্য বৈধ হবে?)

অতএব, সকল মহিলাদের জন্য এদিকে লক্ষ রাখা দরকার। উল্লেখ্য, মহিলাদের মুখমন্ডল ও হাত সতরের মধ্যে শামিল। সুতরাং, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও সমস্ত শরীর এবং চেহারা ঢেকে হাত মোজা ও পা মোজা পরিধান করে বের হওয়া কর্তব্য। (সূরা আহযাব-আয়াত ৩৩, আবু দাউদ শরীফ-১:৮৪, মিশকাত শরীফ-২৬৯, ফাতাওয়া রাহীমিয়া-১:৩০, মা'আরিফুল কুরআন-৭:১৩৪-২০৮, ২১৭)

নিজ ঘরে বসে মহিলাদের তালীম করা

জিজ্ঞাসাঃ মহিলা যদি নিজ ঘরে বসে এলাকার মহিলাদের মাসআলা-মাসাইল ও কিতাবী তালীম দেয়, তা জায়েয হবে কি না?

আবার কোন কোন মহিলা গ্রামে হেঁটে হেঁটে ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের নিয়ে কিতাবী তালীম, জিকির-আযকার করে। তা বৈধ কি না?

জবাবঃ উক্ত মহিলাগণ যদি কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন এবং পর্দার কোন রকম অসুবিধা না হয়, তাহলে উভয় সুরত জায়েয আছে। তরে উক্ত মহিলাগণ কি ধরনের তালীম দেন, তা কোন হক্কানী আলেম দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে। কিন্তু মহিলাদের একত্র হয়ে যিকির করা ঠিক হবে না।

দাইয়ূস-এর পরিচয়

জিজ্ঞাসাঃ দাইয়ূস কাকে বলে?

জবাবঃ হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা তিন ধরণের লোকের জন্য জান্নাত হারাম করে

দিয়েছেঃ (এক) মদ্যপ (দুই) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি, (তিন) দাইয়ূস। দাইয়ূস বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে স্বীয় স্ত্রী বা পরিবারের কোন মহিলাকে অন্য কোন বেগানা পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে দেয়, তাতে কোন প্রকার বাধা দেয় না। অথবা, দাইয়ূস ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার অধীনস্থ মহিলা শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় ঐ পুরুষের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে বাধা প্রদান করে না। (মিশকাতুল মাসাবীহ-৩১৮, কাওয়াদিয়দুল ফিকহ-২৯৭)

শরী'আতের দৃষ্টিতে মহিলাদের চাকুরী

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান যুগে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চলছে। আমাদের দেশে সরকারীভাবে চাকুরী ক্ষেত্রেও মহিলাদেরকে, অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে মহিলাদের চাকুরী করার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি? কুরআন ও হাদীসের আলোকে তা বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

জবাবঃ ইসলাম নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের যিম্মাদারী ও দায়িত্ব পৃথকভাবে বন্টন করে দিয়েছে। বাইরের সকল দায়িত্ব স্বামীর কাঁধে অর্পিত, আর ঘরের কাজ বা আভ্যন্তরীন দায়িত্বগুলো স্ত্রীর কাঁধে অর্পিত। বস্তুতঃ মহিলাদের জন্যে যথাসম্ভব ঘরে অবস্থান আবশ্যক, বেগানা পুরুষদের সঙ্গে সম্মিলন ঘটে এমন যে কোন পরিস্থিতি থেকে দুরে থাকা জরুরী।

শরী'আতের মূলনীতির আলোকে নারীর জন্য পর পুরুষের সাথে অফিস-আদালতে, কোর্ট-কাচারীতে চাকুরী করা একেবারেই গর্হিত এবং নাজায়েয কাজ। তাছাড়া এর দ্বারা পর্দা প্রথা, যা শি'আরে ইসলাম এবং একটি ফরয আমল তারও মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। এছাড়াও আরো

বিভিন্নভাবে শর'ঈ আহকাম লংঘিত হয়। এসব কারণেই মেয়েদের জন্য পর পুরুষদের সঙ্গে কাজ করতে হয় এমন কোন চাকুরী করা নাজায়েয।

তবে রুজী-রোজগারের ব্যাপারে কোন মহিলার যদি কোন ব্যবস্থাই না থাকে যেমন উপার্জনক্ষম কোন পিতা, ভাই বা স্বামী না থাকে, তাহলে পর্দার সাথে অন্য কোন হালাল পেশা অবলম্বন করতে পারে, যেমনঃ সেলাই মেশিনের কাজ বা হাঁস-মুরগী পালন বা মেয়েদের দীনী তালীম বা কুরআনী শিক্ষা দানের কাজ বা মেয়েদের দুনিয়াবী বৈধ তালীমের কাজ করে বিনিময় নেয়া ইত্যাদি। (সূরা নিসা-৪৩, মিশকাত শরীফ-২৬৯, ফিকহী মাকালাত-১:২৪৮ আপকে মাসাইল আওর উনকা হল-৭:৪০৭)

স্বামীর চাপের মুখে স্ত্রীর চাকুরী করা

জিজ্ঞাসাঃ একজন মহিলা সরকারী চাকুরী করেন, পর্দা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি চাকুরী ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু স্বামী চাকুরী করাতে চাচ্ছেন। এখন উক্ত মহিলা স্বামীর হুকুম পালন করে চাকুরী করবেন, নাকি ছেড়ে দিবেন? স্বামীর চাপের মুখে চাকুরী করলে, এর জন্য দায়ী কে হবে?

জবাবঃ হাদীস শরীফে আছে-"মহান আল্লাহর নাফরমানী করে কোন বান্দার হুকুম মান্য করা জায়েয নয়"। তাছাড়া যেহেতু রিযিক-উপার্জনের জিম্মাদারী আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের উপর অর্পণ করেন নাই বরং তাকে পর্দার ভিতরে থেকে স্বামীর খিদমত এবং স্বামীর সাংসারিক আভ্যন্তরীন কাজ আনজাম দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, বিশেষ করে স্বামীকে দায়িত্ব দিয়েছেন স্ত্রীকে পর্দায় রাখার এবং স্ত্রীর উপর নিজেকে পর্দায় রাখা ফরয করে দিয়েছেন। তাই স্বামীর চাপের মুখে উক্ত স্ত্রীর জন্য চাকুরী করা জায়েয হবে না। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাদের চাকুরী

করতে গেলে, অফিস-আদালতে অন্য পুরুষের সাথে দেখা-শুনা, কথা-বার্তা, উঠা-বসা করতে হয়। পর্দা রক্ষা করে চলার কোন সুরত সেখানে থাকে না। তাই এমতাবস্থায় স্বামীর অবৈধ হুকুম মান্য করা জায়েয হবে না। মনে রাখতে হবে- তার জন্য তাকেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তার আমলনামা তাকেই দেয়া হবে। সেখানে কেউ কারোর দায়িত্ব নিবে না। সুতরাং, স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে স্বামীকে বুঝানো। নিজে বুঝাতে না পারলে আলেম উলামাগণের সহযোগিতা নিবে। আর সংসারে যদি বাস্তবিকই আর্থিক সংকট থাকে-যা দূর করার মত সামর্থ্য স্বামীর নেই তাহলে স্ত্রী নিজেকে পর্দার ভিতরে রেখে হালাল রিযিকের কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে।

(সূরা নিসা-৩৪, মুসনাদে আহমাদ-১:১৩১, তাফসীরে রুহুল মা আনী, সূরা আহযাবঃ ২৩-৫৯)

ইসলামের দৃষ্টিতে সহশিক্ষা

জিজ্ঞাসাঃ স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ একই শ্রেণী কক্ষে ও অধিকাংশ সময় পাশাপাশি বসে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে আর শিক্ষকবৃন্দও পুরুষ- মহিলা উভয় রকমের হয়ে থাকেন। এমন পন্থায় শিক্ষা অর্জন করা শরী'আতের আলোকে বৈধ হবে কি না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত পন্থার শিক্ষা অর্জন করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে পর্দাকে ফরয করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য না-মাহরাম মহিলাকে দেখা এবং তাদের সাথে কথা-বার্তা বলা সম্পূর্ণ হারাম। তেমনিভাবে মহিলাদের জন্যও গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা অথবা কথা-বার্তা বলা হারাম। সুতরাং, একই শ্রেণীকক্ষে পাশাপাশি সীটে বসে শিক্ষা অর্জন করা কোন

ক্রমেই বৈধ হবে না। তেমনিভাবে সেখানে শিক্ষকবৃন্দের মাঝে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই রয়েছে, তাই তাদের সেই শিক্ষা অর্জন করা বৈধ হবে না। অবশ্য যদি উভয়ের জন্য ভিন্ন পাঠাশালা থাকে এবং পুরুষদেরকে পুরুষ শিক্ষক এবং মেয়েদেরকে মেয়ে শিক্ষিকা পাঠদান করেন এবং বালেগা মেয়েরা ও শিক্ষিকাগণ পর্দা রক্ষা করেন তাহলে তা শিখতে পারে। (প্রমাণঃ সূরা নূরঃ ৩০-৩১, তাফসীরে মাযহারী-৬:৪৯৭, হিদায়াহ খণ্ড ৪ নং ৪৪২-৪৪৪, মিশকাত-২৬৯)

শরী'আতের দৃষ্টিতে মহিলাদের পার্থিব শিক্ষা অর্জন করা

জিজ্ঞাসাঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য জেনারেল লাইনে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা কেমন?

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলার বিধানে মেয়েদের জন্য জাগতিক বিষয়াবলীতে সাদাসিদা থাকা এবং বেশী চতুর না হওয়া মর্যাদার বিষয়। এর ব্যতিক্রম করা তাদের মান-মর্যাদা ক্ষুন্নকারী। কুরআনের আয়াতে এ কথার ইঙ্গিত আছে। (সূরা নূর-২৩)

তাছাড়া যে সব ক্র টির কারণে অধিকাংশ মেয়েলোককে জাহান্নামী বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ক্রটি হলো, চালাক-চতুর হয়ে স্বামীকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা। আর আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মেয়েরা খুবই দুরন্ত ও চতুর হয়ে এ ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়। সে হিসেবে মেয়েদের জন্য কুরআনে কারীম ও দীনী ইলম শিক্ষা করার পর দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করাই যথেষ্ট। এর থেকে বেশী তাদের জন্য শোভনীয় নয় বরং তাদের মর্যাদা ক্ষুন্নকারী। (প্রমাণঃ ইসালাহে ইনকিলাবে উম্মত-খঃ ১, প্রঃ ৩১৪)

বলা বাহুল্য, যে শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা বলা হয়, তা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীদের জন্য কোন ক্রমেই শোভনীয় নয় বরং পর্দাবিহীনভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা বা সহ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা নাজায়েয ও হারাম এবং এটা ইংরেজরা কৌশলে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য একটি ফাঁদ পেতেছে। ফলে এর দ্বারা সমাজে নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া মহিলাদের পার্থিব বিদ্যা বেশি শিক্ষা করা কোন জরুরীও নয়। কারণ পার্থিব বিদ্যা বেশী অর্জনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জীবিকা নির্বাহ ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করা। আর জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব শরী'আতের পক্ষ থেকে পুরুষদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। কাজেই উক্ত কাজের দায়িত্ব মহিলাদের নিজের হাতে তুলে নেয়া বা তুলে দেয়া শরী'আত পরিপন্থী। এছাড়াও মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার নিম্নরূপ কুফল রয়েছে।

মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার কুফল

(১) শরী'আতের দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলাদের কর্মক্ষেত্র যেহেতু ভিন্ন; সুতরাং, প্রত্যেকের শিক্ষা-দীক্ষা তার কর্মক্ষেত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর তালীম ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার সিলেবাস কোন ক্রমেই উভয়ের জন্য এক ও অভিন্ন হতে পারে না। ইসলাম উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ নিষেধ করেনি; কিন্তু তা অবশ্যই এমন হতে হবে, যা তার কর্মজীবনে কাজে আসে। যাতে করে তার পড়াশুনার শ্রম বিফল ও ব্যর্থ না হয়। কেননা, অনর্থক শ্রম শরী'আতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং কুরআনে মুমিনদের একটি বিশেষ গুণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, "তারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে"। (সূরা মুমিনূন-আয়াত ৩)

(২) মহিলাদের জন্য দীনী শিক্ষা বাদ দিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া খুবই ক্ষতিকর। কারণ অল্প বয়সে অন্তরে যা বৃদ্ধমূল হয়ে যায়, তা আর কোন দিন দূর হয় না এবং তার দ্বারা প্রাথমিক অবস্থাতেই অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি হয়।

(৩) বাল্যকালে আধুনিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া তার শিরা-উপশিরায় বসে যাওয়ার কারণে, পরবর্তীতে এর পরিবর্তন ঘটানো কঠিন হয়ে যায়।

(৪) দীনী পরিবারের মহিলাও যখন আধুনিক পরিবেশে যায় এবং সেখানের মেয়েদেরকে আধুনিক অবস্থায় দেখতে পায়, তখন তারাও ইসলামিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে, বিভিন্ন রকম সাজ-সজ্জা, বেশ-ভূষা গ্রহণ করা আরম্ভ করে।

(৫) লাজুকতা মহিলাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আর আধুনিক শিক্ষা মহিলাদের এ লজ্জাকে ধুয়ে মুছে শেষ করে দেয়।

(৬) পর পুরুষের সঙ্গে মহিলাদের দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশাতো দূরের কথা, কথা বলতে হলেও শক্ত ও নিরস ভাষায় বলার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় নব্য শিক্ষিতা মহিলারা পর পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং কোমল কণ্ঠে কথা বলা কে ভদ্রতা মনে করে এবং আকর্ষণীয় করে কথা বলা শিক্ষা করাকে জ্ঞান শিক্ষা বলে মনে করে। অথচ এটাই আধুনিক শিক্ষার বিষফল।

(৭) কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ অর্থাৎ পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল (সূরা নিসা-৩৪) কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা শ্লোগান তুলছে সমান অধিকারের, যা কুরআন-হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটাও আধুনিক শিক্ষার বিষফল।

(৮) আধুনিক শিক্ষা মহিলাদেরকে স্বামীর খেদমত না করা এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে তোলে।

(৯) আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা স্বামীর ঘরে পর্দাতে থাকতে রাজী থাকে না। তারা অফিস-আদালতে চাকুরী করতে চায়। অথচ মহিলাদেরকে এসব কাজের অনুমতি দেয়া হয়নি। ভুগোল শিক্ষা করার দ্বারা মনে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করার বাসনা সৃষ্টি হয় এবং ঘর থেকে বের হওয়ার পথ সুগম হয়, যা মহিলাদের কাজ নয়। (প্রমাণঃ ইসলাহে খাওয়াতীন পৃ-৪০১)

(১০) ইতিহাস শিক্ষা করার দ্বারা বড় বড় নাস্তিক মহিলার ন্যায় নিজেকে গড়ার মনোভাব পয়দা হয়।

তবে পর্দা ও শরী'আতের হুকুম পর্দা-পুশিদা ঠিক রেখে পার্থিব বিদ্যাসমূহের মধ্যে প্রয়োজনমাফিক বিদ্যা গ্রহণ করা বৈধ। যেমন, হিসাব-নিকাশের প্রাথমিক বিদ্যা ও কিছু পরিমাণ লেখা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জন করা, হস্তশিল্প ও গৃহস্থালীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করা মেয়েদের জন্য জায়েয আছে। তেমনিভাবে পরিবারের পৃষ্ঠপোষক কোন পুরুষ লোক না থাকা অবস্থায় নিজের সতিত্ব রক্ষা করে পর্দার ভিতরে থেকে কিছু কামাই রোজগারের জন্য দীনী বা দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা করা যেতে পারে। তবে এমন বিদ্যা অর্জন করা যা শিখতে ও প্রয়োগ করতে গেলে পর্দা ভঙ্গ হয় বা নিজের সতিত্বের উপর হুমকি আসে তা বৈধ হবে না।

সুন্নাতী পোষাক

মহিলাদের সুন্নাতী পোশাক

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েদের জন্য সুন্নাতী পোশাক কি কি?

জবাবঃ মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে শরী'আতে বলা হয়েছে যে, মেয়েরা এমন পোশাক পরিধান করবে, যার দ্বারা তাদের সতর পরিপূর্ণভাবে আবৃত করা যায়। আর মেয়েদের সতর হল- মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটুকু। সুতরাং, তারা এ ধরনের পোশাক পরিধান করবে- যার দ্বারা তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে যায়।

আর বর্তমানে মেয়েদের অধিক সতর ঢাকা সম্ভব হয় সেলোয়ার-কামিজ ও উড়নার মাধ্যমে। তবে সেলোয়ার-কামিজ ও উড়না অবশ্যই পাতলা কাপড়ের না হওয়া উচিত। বরং, ,মোটা কাপড় ও ঢিলা-ঢোলা হওয়া জরুরী। অনুরূপভাবে শাড়ীও পরীধান করা যেতে পারে, যার দ্বারা সতর পরিপূর্ণভাবে ঢেকে রাখা হয় এবং সব সময় ঢেকে রাখার উপর অভ্যস্ত হয়।

আমাদের দেশে একটা কুসংস্কার বা গোমরাহী রয়েছে যে, বিবাহের আগে মেয়েদের জন্য সেলোয়ার-কামিজ ও উড়না পরা ভাল মনে করলেও বিবাহের পর এটাকে খারাপ মনে করা হয়। এটা কু-প্রথা। এতে বিবাহের পূর্বে তাদের কিছু লজ্জা থাকলেও বিবাহের পর কিছু দিন যেতে না যেতেই শাড়ী পরে পেট পিঠ বের করে চলাফেরা করে। অনেক সময় সামান্য প্রয়োজনে হাটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে ফেলে। তাই তারা যদি সেলোয়ার কামিজ ও উড়না পরিধান করে, তাহলে এমন বেপর্দার সমুখীন হতে হবে না। সুতরাং, সেলোয়ার-কামিজ ও উড়নাকে মেয়েদের সুন্নাতী পোষাক বলা যেতে পারে। (প্রমাণঃ সূরা নূর-৩১, সূরা আহযাবঃ ৫৩-৫৫)

পর্দা কার জন্য?

জিজ্ঞাসা শরী'আতের দৃষ্টিতে পর্দা কি পুরুষ-মহিলা সকলের উপর ফরয?

জবাবঃ হ্যাঁ, পর্দা সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ, পুরুষরা যেমন বেগানা মহিলাদের দিকে দেখবে না, তেমনিভাবে মহিলারাও বেগানা পুরুষদের দিকে দেখবে না। তবে এতটুকু পার্থক্য আছে যে, মেয়েদের বাইরে বের থেকে হলে, বোরকা ইত্যাদি পরে সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঢেকে বাহির হওয়া জরুরী, কিন্তু পুরুষদের জন্য শরী'আত এ ধরনের কোন নির্দেশ দেয়নি।

টুপি, রুমাল ও পাগড়ী পরার তরীকা

জিজ্ঞাসা (ক) রাসূল ﷺ কিভাবে মাথা ঢাকতেন? বিভিন্ন ধরনের টুপি, রুমাল ও পাগড়ীর মধ্যে সুন্নাত তরীকায় মাথা ঢেকে নামায আদায় করার সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটি?

জবাবঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এমন টুপি পরিধান করা সুন্নাত-যা মাথার সাথে মিশে থাকে। রাসূল ﷺ ও সাহাবাহে কিরাম রা. নামাযে ও নামাযের বাইরে টুপি পরিধান করেছেন। বহু হাদীসের মথ্যে টুপির কথা উল্লেখ রয়েছে। হুযুর ﷺ আদেশ করেছেন যে, তোমরা পাগড়ীর নীচে টুপি পরিধান কর। কেননা, মুসলমান ও মুশরিকদের পাগড়ী পরিধানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, মুশরিকরা পাগড়ীর নীচে টুপি পরিধান করে না। আর মুসলমানগণ পাগড়ীর নীচেও টুপি পরেন। (তিরমিযী শরীফ-১:২১০)

তারাবানী শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ-এর টুপি মাথার সাথে মিশে থাকতো। অতএব, যে প্রকার টুপি হোক না কেন, মাথার সাথে মিশে থাকলেই সুন্নাত আদায় হবে। তবে এতটুকু

খেয়াল রাখা জরুরী যে, বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্য যেন না হয়। আর পাগড়ী পরা আরো ভাল। তবে তখন পাগড়ীর নীচে টুপিও পরতে হবে।

মেয়েদের জন্য পুরুষের কাপড় ও শাড়ী-ব্লাউজ পরিধান করা

জিজ্ঞাসা আজকাল অনেক দীনদার মহিলা পুরুষদের কল্লিদার পাঞ্জাবীর মত জামা পরিধান করে। এতে সাধারণতঃ এতটুকু পার্থক্য দেখা যায় যে, পুরুষদের জামার দুই সাইডে পকেট থাকে বুক পকেট থাকে, কিন্তু মেয়েদের পরিহিত পাঞ্জাবীর মধ্যে পকেটই থাকে না।। গলাটা অনেক মহিলারাই পুরুষদের গলার ন্যায় পরে। আর কেউ কেউ সামান্য পরিবর্তন করে নেয়। আর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। অনেক দীনদার মহিলাগণ এটাকেই মেয়েদের জন্য সুন্নাতী লেবাস মনে করে। এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য। মেয়েদের জন্য উত্তম লেবাস কি? শাড়ী-ব্লাউজ পরা কি হিন্দুয়ানী তরিকা?

জবাবঃ পুরুষদের জন্য যেমন মহিলাদের লেবাস বা মহিলাদের লেবাসের মত কোন লেবাস বা জামা ইত্যাদি পরিধান করা হারাম, তেমনিভাবে মেয়েদের জন্য পুরুষদের লেবাস বা পুরুষদের লেবাসের ন্যায় কোন লেবাস পরা হারাম।

প্রশ্নে বর্ণিত পার্থক্য দ্বারা মেয়েদের ঐ জামা পুরুষদের জামা থেকে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য বুঝা যায় না। বরং ওটা পুরুষদেরই জামা বলতে হবে। কারণ- পকেটবিহীন জামা পুরুষরাও পরে। কাজেই এ ধরনের জামা মেয়েদের জন্য পরার মোটেই অনুমতি নেই। এরূপ জামা পরার অর্থ হল-২৪ ঘন্টা হারামের মধ্যে ডুবে থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার লানতের পাত্র হওয়া। কারণ, যে সব মহিলারা পুরুষদের ন্যায় লেবাস পরে, তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত (অভিসম্পাত) বর্ষিত

হয় বলে হাদীসে হুশিয়ারী এসেছে। (প্রমাণঃ মিশকাত-৩৮০, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৭৯৩১)

মেয়েদের উত্তম লেবাস হল, সেলোয়ার এবং এমন ঢিলা -ঢোলা কামিজ যার দ্বারা শরীরের অঙ্গসমূহ ফুটে ওঠে না এবং হাটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা হয়। সাথে বড় ওড়না। আর এসব কিছু এমন মোটা কাপড়ের থেকে হবে, যাতে শরীরের রং বা আকার পরিদৃষ্ট না হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরা যে শাড়ী ও ব্লাউজ পরে, তা নাজায়েজ নয়। শাড়ীকে হিন্দুয়ানী লেবাস বলা যায় না। তা বাঙ্গালী মুসলমানদের নিত্য পরিধেয়। তবে মেয়েরা যেভাবে ওগুলো পরে (অর্থাৎ পেট-পিঠ দেখা যায়, কোন অংগের গঠন ফুটে উঠে), সেভাবে পরা জায়েয হবে না। এতে তাদের সতর ঠিকমত না ঢাকার কারণে বেপর্দার গুনাহ হচ্ছে, অন্যদিকে নামায হচ্ছে না। কাজেই শাড়ী পরতে হলে, নীচে পেটিকোট অবশ্যই পরবে। আর ব্লাউজ ফুল হাতা পরবে এবং কোমর পর্যন্ত ঢেকে যায় এতটুকু লম্বা পরবে।

এছাড়াও সম্ভব হলে, মাথা ও শরীর ঢাকার জন্য একটা বাড়তি উড়না ব্যবহার করবে। মনে রাখবে-ছেলে, ভাই, বাবা, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ জায়েয হলেও নিজের পেট, পিঠ ইত্যাদি তাদের সামনে খোলা রাখা বা দেখানো জায়েয নয়। (প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী-৫:৪৩১:৪৩২)

যে ধরনের কাপড় পরিধান করা সুন্নাত

জিজ্ঞাসাঃ পরিধেয় পাঞ্জাবী সাধারনতঃ দু ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ জুববা বা গোল পাঞ্জাবী। দ্বিতীয়তঃ কল্লিদার পাঞ্জাবী। এর মধ্যে কোনটা পরিধান করা সুন্নাত সম্মত?

জবাবঃ ৪টি শর্ত সাপেক্ষে যে কোন ধরনের পোশাক পরা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িযঃ

(১) পরিপূর্ণভাবে সতর আবৃত হওয়া;

(২) শরী'আতে নিষেধকৃত ধরনের না হওয়া;

(৩) বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্য না হওয়া;

(৪) রিয়া ও অহংকারের নিয়্যতে লেবাস পরিধান না করা।

তবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ মৌসুমের চাহিদা অনুযায়ী সাদাসিধাভাবে যেরূপ পোশাক পেতেন, তাই পরতেন। রাসূল ﷺ নিসফে সাক (অর্ধহাটু পরিমাণ) পর্যন্ত লম্বা জামা পরতেন এবং জুববা ও ফাড়া উভয়টা পরাকেই পছন্দ করতেন সুতরাং জামা সম্পর্কে সুন্নাত হচ্ছে- সতর ঢাকা, অপচয় না হওয়া, সাধারণ ভাবে ঢিলা-ঢোলা এবং নিসফে সাক পর্যন্ত লম্বা হওয়া, বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া ও অহংকারী বা রিয়াকারী না হওয়া। চাই জুব্বা হোক, বা কল্লিদার ফাড়া হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী-৬: ৩৫১)

জুব্বা পরিধান করে নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ অন্য কিছু পরিধান না করে কেবলমাত্র জুব্বা পরিধান করে নামায আদায় করলে অথবা ইমামতি করলে নামায জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে পুরুষদের জন্য যতটুকু পরিমাণ সতর ঢাকা ফরয কেবলমাত্র মোটা কাপড়ের জুব্বা পরিধান করলেও ততটুকু ফরয আদায় হয়ে যায়। সুতরাং, অন্য কোন কাপড় পরিধান করা ব্যতীত কেবলমাত্র মোটা কাপড়ের জুব্বা পরিধান করে নামায পড়লে অথবা ইমামতি করলে

নামায সহীহ হবে। তবে অন্য কাপড় থাকা অবস্থায় এরূপ করা ভাল নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী-১:৪০৪)

জ্ঞাতব্যঃ নিম বা বাচ্চা দাড়ি উপড়ানো বা হলক করা বিদ'আত সুতরাং কোন ভাবেই উপড়ানো বা হলক জায়েয হবে না। নিমদাড়ী হলক করার কারণে হযরত উমর রা. বেত্রাঘাত করতেন।

সুন্নাতী পোশাক সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা আমাদের এলাকার অধিকাংশ উলামাগণের অভিমত হলো যে, কাটা পাঞ্জাবী যদি পায়ের টাখনু পর্যন্ত হয় তবুও সুন্নাত আদায় হবে না। আবার অনেকে বলে থাকেন যে, নিসফে ছাক হলে আদায় হবে। তবে গোল জামা পরিধান করাই উত্তম। কেননা, কুরআনুল কারীমে তাকওযার কথা এসেছে।

এখন প্রশ্ন হল, কাটা পাঞ্জাবী নিসফে ছাক হলে সুন্নাত আদায় হবে কি না?

জবাবঃ পোশাকের ব্যাপারে শরী'আতের কোন একক আকৃতির পাবন্দী (সীমাবদ্ধতা) নেই যে, সে আকৃতির খেলাফ হলেই, পোশাক না জায়েয বা খেলাফে সুন্নাত হয়ে যাবে। বরং প্রাকৃতিক অবস্থা ও মৌসুমের চাহিদা এবং মানুষের অভ্যাসের বিভিন্নতার কারণে পোশাকের বিভিন্নতার অবকাশ শরী'আতে রয়েছে।

অবশ্য পোশাক সম্পর্কে শরী'আতের কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে তার প্রতি সর্বাবস্থায় লক্ষ রাখা জরুরী। যার বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলঃ

(১) পোশাক এমন খাট, পাতলা বা টাইট না হওয়া জরুরী যাতে যে সমস্ত অঙ্গ-পত্যঙ্গ গোপন করা/ ঢাকা ওয়াজিব সেগুলো দেখা যায় বা সেগুলোর আকৃতি প্রকাশ পেয়ে যায়।

(২) কাফির-ফাসিক তথা অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক অবলম্বন না করা।

(৩) পুরুষরা মহিলার পোশাক এবং মহিলারা পুরুষের পোশাক পরিধান না করা।

(৪) নিজ আর্থিক ক্ষমতা থেকে বেশি দামের পোশাক পরিধানের চেষ্টা না করা।

(৫) সম্পদশালী ব্যক্তির এত নিম্নমানের পোশাক পরিধান না করা যে, মানুষে দেখে তাকে গরীব-নিঃস্ব মনে করবে।

(৬) অহংকার, রিয়া, লৌকিকতার উদ্দেশে পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকা।

(৭) পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

(৮) পুরুষের সেলোয়ার, লুঙ্গি, পায়জামা বা পাঞ্জাবী ইত্যাদি পোশাক টাখনুর নীচ পর্যন্ত লম্বা হওয়া হারাম।

(৯) পুরুষের জামা নিসফে ছাক তথা পায়ের গোছার অর্ধপর্যন্ত, সর্বনিম্ন পায়ের টাখনু পর্যন্ত লম্বা হওয়া সুন্নাত এবং পুরুষের জন্য সাদা পোশাক পরিধানকে পছন্দ করা হয়েছে।

(১০) পুরুষের জন্য নিরেট রেশম পরিধান করা হারাম।

(১১) পিওর লাল পোশাক পরিধান করা করা পুরুষের জন্য মাকরূহ, তবে অন্য রঙ্গের সংমিশ্রন বা অন্য রঙ্গের ডোরা বিশিষ্ট হয় তাহলে সেটা মাকরূহ হবে না। তাতে কোন অসুবিধাও নেই।

বর্ণিত শর্ত ও গুণগুলো যে সব পোশাকের মাঝে পাওয়া যাবে তা সবই শর'ঈ ও সুন্নাতী পোশাক বলে গণ্য হবে।

উল্লেখিত শর্ত পাওয়া যাওয়ার পরও জুব্বা না হলে সুন্নাতী পোশাক হবে না এমন কথা বলা মূর্খতা। পোশাকের ব্যাপারে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

কারণ স্বয়ং হুযুর ﷺ এর ক্ষেত্রে অবস্থাও মৌসুমের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বর্ণনা পাওয়া যায়। (সূরা আল-আরাফ, বুখারী-২:৮৬০, ৮৬১, ৮৬৩, ৮৬৫, ৮৭৪, মুসলিম-২:১৯৪, আবু দাউদ-২:৫৫৮, ৫৬২, ৫৬৬, ৫৫৯, তিরমিযী-১:৩০২, ইবনে মাজাহ-২৫৩, ফাতাওয়া শামী-৯:৫০৫)

বিধর্মীদের পোশাক পরিধান করা

পায়ের গিরা ঢেখে পোশাক পরিধান করা

জিজ্ঞাসাঃ (ক) উপর থেকে লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট এবং নীচ থেকে মোজার দ্বারা পায়ের টাখনু ঢাকা নাজায়েয। এই বাক্যটি কি শরী'আত সম্মত? (বাংলাদেশের মানুষ যে সকল মোজা পরিধান করে তাতে পায়ের গিরা ঢেকে যায়। এভাবে গিরা ঢাকলেও কি গুনাহ হবে?

জবাবঃ সর্বাবস্থাতেই লুঙ্গি, পায়জামা, সেলোয়ার, প্যান্ট জুব্বা, আবা-কাবা ইত্যাদি উপরের দিক থেকে টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- "কিয়ামতের দিবসে আল্লাহতা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি (রহমতের) নজর করবেন না, যে লুঙ্গি বা কোন কাপড় টাখনুর নীচে পরিধান করে"। তবে মোজা দ্বারা পায়ের টাখনু ঢাকা নাজায়েয, এ কথা ঠিক নয় বা শরী'আতসম্মত নয়। কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজা পরিধান করেছেন। আর সে মোজা অবশ্যই টাখনু আবৃত করে নিত। এ কারণে, এমন মোজা ও জুতা পরিধান করা, যা দ্বারা নীচের দিক থেকে টাখনু ঢেকে যায়, তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং, এ নিয়ে কোনরূপ বিতর্ক সৃষ্টি করা ঠিক হবে না। বরং, দ্বীনের মধ্যে নতুন হুকুম আবিষ্কার বলে গণ্য হবে।

(প্রমাণঃ বুখারী শরীফ-২:৮৬১-৮৬৩, আবু দাউদ শরীফ-২:৫৬৬, ইবনে মাজাহ শরীফ-২৫৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪:১২২)

টাখনুর নীচে কাপড় পরা

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে সব সময় টাখনুর নীচে প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি ইতাদি পরে থাকে। তবে কেবল নামাযের সময় টাখনুবু উপরে উঠায়। তা ঠিক কি না?

জবাবঃ পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে জামা, পায়জামা, লুঙ্গি ইত্যাদি পরা সর্ব অবস্থায় হারাম। শুধু নামাযের সহিত তা খাস নয়। সুতরাং, নামাযের সময় তারা যেমনিভাবে কাপড় টাখনুর উপর উঠিয়ে নেয় নামাযের বাইরেও সেভাবে টাখনুর উপরই কাপড় পরতে হবে। টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে প্যান্ট, পায়জামা পরা বিধর্মীদের শিক্ষা ও তাদের কৃষ্টি। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি জামা-পায়জামা ইত্যাদি টাখনুর নীচে পরবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর এত নারাজ হবেন যে, তার থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিবেন। বেদীনরা মুসলমানদেরকে আল্লাহর নজর থেকে দূরে সরানোর জন্য এ ধরনের বেশ-ভূষা মুসলমানদের মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে চালু করে দিয়েছে। মুসলমানদের এ ব্যাপারে খুব সাবধান হওয়া জরুরী। টাখনুর নীচে সাধারণত অহংকারী ব্যক্তিরা পোষাক পরিধান করে থাকে। এ হিসাবে হাদীসে অহংকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অহংকার ব্যতীত টাখনুর নীচে লিবাস পরা যাবে। এ ব্যাপারে অনেক মানুষ ভুলের মধ্যে আছে। (প্রমাণঃ ইমদাদুল আহকাম-২:১৭৯, ফাতাওয়া মাহামুদিয়া-২:১৪০, ফাতাওয়া রহীমিয়া মুহতার-২০, বুখারী শরীফ-১)

মুসলমানের জন্য টাই পরা

জিজ্ঞাসাঃ 'টাই' পরা জায়েয কিনা? বর্তমানে মুসলমানগণ এমনকি ছোট ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত টাই পরে থাকে এবং এটাকে গৌরবের বস্তু মনে করে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি?

জবাবঃ টাই পরা জায়েয নয়। এটা বিধর্মী খৃষ্টান সম্পদায়ের ধর্মীয় শি'আর (নিদর্শন) কাজেই কোন মুসলমানের জন্য টাই পরা জায়েয হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে- যে ব্যক্তি কোন বিধর্মী সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং টাইসহ আরো যত বিজাতীয় লিবাস আছে, যেমন-ক্রস চিহ্ন ধারণ করা, পৈতা ধারন করা, কপালে সিঁদুর লাগানো, টিকি রাখা ইত্যাদি সবকিছুই পরিত্যাগ করা জরুরী। কারণ-এওলো সব কুফুরী কাজ যা ইমানের জন্য ক্ষতিকর।

(প্রমাণঃ কিফায়াতূল মুফতী ৯:১৫৩, মিশকাত শরীফ ৩৭৫, তাফসীরে কুরতুবী ৯:২৬৬)

পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ স্বর্ণের তৈরী অলংকার ব্যবহার করা কি পুরুষের জন্য হারাম? যদি কাউকে স্বর্ণের জিনিস হাদিয়া দেয়া হয়, তা ব্যবহার করতে পারবে কিনা?

জবাবঃ নবী করীম ﷺ বলেছেন- "আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম"। সুতরাং, স্বর্ণ ব্যবহার করা পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। তবে কোন পুরুষকে হাদিয়া দেয়া জায়েয আছে। হাদিয়া গ্রহণকারীর কর্তব্য হল-উক্ত স্বর্ণ তিনি নিজের পরিবারের কোন মহিলাকে দিয়ে দিবেন, অথবা বিক্রি করে পয়সা হাসিল করবেন। হাদিয়া গ্রহণকারী ব্যক্তি পুরুষ যদি উক্ত স্বর্ণ ব্যবহার করেন, তাহলে তার জন্য সেটা হারাম ও নাজায়েয হবে। (প্রমাণঃ হিদায়াঃ ৪:৪৩৯-৪৪১, ফতহুল কাদীর, ৮:৪৫২)

প্যান্ট পরা

জিজ্ঞাসাঃ বাংলা বেহেশতী জেওর-এর প্রথম ভলিয়মের ৪০১ পৃষ্ঠায় ৩ নং মাসআলার শেষ দিকে লিখা আছে 'প্যান্ট পরা নাজায়েয'। এখন কথা হচ্ছে- ফুলপ্যান্ট যদি ঢিলা ঢোলা হয় এবং তার ঝুল যদি টাখনু-গিরার নীচে না যায়, তবে উক্ত ফুলপ্যান্ট পরা জায়েয হবে কি না?

জবাবঃ হাফপ্যান্ট পরা সর্ব অবস্থায় নাজায়েয আর বিজাতীদের অনুকরণে তাদের মতে করে ফুলপ্যান্ট পরিধান করাও নাজায়েয। কারণ, এর মধ্যে বিজাতীয় অনুকরণ ও টাখনুর নীচে লেবাস পরা এবং নামাযে অসুবিধাসহ কয়েকটি অন্যায় জমা হয়ে যায়। তবে ফুলপ্যান্ট যদি ঢিলা-ঢোলা হয় এবং টাখনু-গিরার উপরে হয়, নামায পড়তে কোন অসুবিধা না হয়, তাহলে তা সাধারাণ লোকেরা প্রয়োজনে পরতে পারবে তবে জরুরতে না হলে এ ধরনের ফুলপ্যান্ট না পরাই উত্তম। কারণ, এটা নেক লোকদের লেবাস নয়। এরূপ হুকুম শার্ট ইত্যাদিরও। কেননা, এতে উল্লেখিত অন্যায়গুলো পাওয়া যায় না এবং এরূপ প্যান্ট প্রকৃতপক্ষে বিজাতীদের পোষাক নয়।

পুরুষের জন্য লাল রং এর কাপড় পরিধান করা

জিজ্ঞাসাঃ পুরুষদের জন্য লাল রং-এর কাপড় পরিধান করা জায়েয কি-না?

জবাবঃ পুরুষদের জন্য একেবারে লাল রং-এর কাপড় যার মধ্যে অন্য কোন রং নাই পরিধান করা মাকরূহ। তাই লাল রং-এর কাপড় পরিধান করা থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। অবশ্য লাল রং-এর সাথে যদি অন্য কোন রং মিশ্রিত না থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করার কোন প্রকার অসুবিধা নেই। (প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার-৬:৩৫৮ আল বাহরুর রায়িক্ব-৮:১৯০, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪:১২৫)

কাফির-ফাসিকের পোশাক পরিধান করা

জিজ্ঞাসাঃ কাফির-ফাসিকেদের পোশাক পরিধান কি কবীরাহ গুনাহ? জনৈক ব্যক্তি বলেন, "ইসলামে কোন নির্দিষ্ট পোশাক নেই"। এ কথাটি কি ঠিক, যদি ইসলামী পোশাক থাকে, তাহলে তা কি? তিনি আরো বলেন- কুরআন ও হাদীসে নির্দিষ্ট কোন পোশাকের কোন কথা উল্লেখ্য নেই। এ উক্তি কতটুকু সত্য?

জবাবঃ যেসব পোশাক শুধু কাফিররাই তাদের ধর্মীয় রীতির ভিত্তিতে পরিধান করে থাকে, তা মুসলমানদের জন্য পরা হারাম ও কবীরাহ গুনাহ। যেমন টাই, পৈতা ইত্যাদি।

"ইসলাম ধর্মে কোন নির্দিষ্ট পোশাক নেই"- এ কথাটি ঠিক নয়। তবে ইসলাম ধর্ম পোশাকের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। এ জন্যই তো শরী'আত এ কথা বলে না যে, শুধু নির্দিষ্ট কোন পোশাক পরতে হবে। বরং, মানুষের অভ্যাস, অবস্থা এবং স্থান-কাল ভেদে পোশাকের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। অবশ্য এ পার্থক্যটি লাগামহীনভাবে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করা যাবে না। তাই শরী'আতের সেই উসুলগুলো নিম্নরূপ

(১) পরিপূর্ণভাবে সতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় হওয়া। যেহেতু ছোট কাপড় বা পাতলা কাপড় দিয়ে সতর ঢাকা যায় না, তাই এ ধরনের কাপড় পরিধান করা জায়েয নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের সতর আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ- সজ্জার বস্তু। (সূরা আরাফঃ ২৬)

উক্ত আয়াতে يوارى سواتكم দ্বারা সতর ঢাকার কথা বলা হয়েছে। আর সতর ঢাকাই কাপড় পরিধানের আসল উদ্দেশ্য। তাই এ ধরনের পোশাক যা পরিধান করা সত্ত্বেও পুরুষ অথবা মহিলার সতর ঢাকে না, তা শরী'আতের দৃষ্টিতে পোশাক বলে গণ্য হবে না, যদিও তা সুন্দর হয়। এমনিভাবে পাতলা কাপড় যা দ্বারা সতর ঢাকা যায় না অথবা আটঁসাটঁ কাপড় যা দ্বারা সতরের পরিপূর্ণ আকৃতি বুঝা যায়, এসব কাপড় পরিধান করা হারাম ও নাজায়েয। (তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম-৪:৮৮)

(২) শরী'আতের পরিপন্থী ও শরী'আত পরিপন্থী পদ্ধতিতে পোশাক পরিধান করা জায়েয নয়। তাই পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে কোন কাপড় পরিধান করা, রেশমী কাপড় পরিধান করা, স্বর্ণের কোন অলংকার পরিধান করা, পুরুষেদের জন্য মহিলার পোশাক এবং মহিলার জন্য পুরুষের পোশাক পরিধান করা জায়েয নয়। পুরুষের জন্য কুসুমী রঙ এবং সম্পূর্ণ লাল রং এর পোশাক পরিধান করাও নিষিদ্ধি। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন- "লুঙ্গি (অথবা অন্য কোন কাপড়) টাখনুর নীচের যে অংশটুকুতে পরিধান করবে, সে অংশটুকু জাহান্নামে যাবে। (মিশকাত শরীফ-৩৭৩ পৃঃ)

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণকে হারাম করা হয়েছে এবং তা মহিলাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে"। (তিরমিযী শরীফ-১:৩০২)

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লানত করেছেন- ঐ সমস্ত পুরুষের উপর, যারা (বেশ-ভূষায়) মহিলাগণের সামঞ্জস্যতা

অবলম্বন করে এবং সমস্ত মহিলাগনের উপর, যারা পুরুষের সামঞ্জস্যতা অবলম্বন করে। (মুখতাসারুত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ ১৯৪ পৃষ্ঠা)

(৩) বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্য না হওয়া। এ প্রসঙ্গে ﷺ ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

তিনি আরো বলেন-"তোমার (বেশ-ভূষায়) বিধর্মীদের বিরোধিতা কর, দাঁড়ি লম্বা রাখ এবং মোচ ছোট রাখ। (বুখারী শরীফ ২:৮৭৫)

(৪) লোক দেখানো ও অহংকারের নিয়্যতে কাপড় পরিধান না করা।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- হালাল বস্তু থেকে যা ইচ্ছা তা খাও এবং জায়েয পোশাক থেকে যা ইচ্ছা পরিধান কর, কিন্তু দু'টি জিনিস যেন তোমাকে ভুলের মধ্যে না ফেলে দেয়, আর সে দু'টি জিনিস হচ্ছে (১) অতিরিক্ত খরচ করা (২) রিয়া ও অহংকার করা। (বুখারী শরীফ-২:৮৬০)

পর্দা ও পোশাকের বিবিধ আহকাম

পর্দা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পর তাওবা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলা যদি ক্রোধন্বিত হয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে বলে যে, পৃথিবী উল্টে গেলেও আমি পর্দা করব না। কিন্তু সাথে সাথে সে তাওবা করে নেয়, তাহলে এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?

জবাবঃ কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে পর্দা করা ফরয এবং পর্দা তরক করা হারাম। শরী'আতের কোন ফরয বিধান সম্পর্কে এরূপ কটূক্তি করা যে, "দুনিয়া উল্টে গেলেও পর্দা করব না" এর দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। ফলে এরূপ কাজ থেকে পবিত্র অন্তরে তাওবা করা একান্ত জরুরী। সাথে সাথে ভবিষ্যতে এরূপ না করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হতে হবে।

জিজ্ঞাসার বর্ণনা মুতাবিক যেহেতু উক্ত মহিলা তাওবা করে নিয়েছে, তাই আশা করা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, তবে সতর্কতামূলকভাবে নতুন করে কালিমা পাঠ করে বিবাহ দুহরিয়ে নেয়া উচিত। (প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ-১:২০৬, সূরা আহযাবঃ ৩৩-৫৯)

পুরুষের সতর ঢাকায় বিধান

জিজ্ঞাসাঃ পুরুষের নাভি থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত সর্বদা ঢেকে রাখা ফরয়। এই ফরয তরক করা কি রকম পাপ? অল্প সময় কিংবা সারা দিন ফরয তরক করা কি সমান পাপ?

জবাবঃ পুরুষের জন্য অন্য লোকের সামনে নাভি থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত সর্বদা ঢেকে রাখা ফরয। তবে নির্জনে যেখানে কেউ নেই এমন স্থানে এবং স্ত্রীর সামনে নাভি হতে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরী ফরয নয়। তবে

বিশেষ দরকার না হলে এ অবস্থায়ও হাটু না খোলাই উত্তম। ইচ্ছাপূর্বক এ ফরয তরক করা কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত হল লজ্জিত হয়ে খালেছ দিলে তাওবা করা। সেই সাথে উক্ত গুনাহ পরিহার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে উক্ত গুনাহ পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। কবীরা গুনাহ দীর্ঘ সময় করা, আর অল্প সময় করা, উভয় অবস্থায়ই কবীরা গুনাহই হবে। তবে অধিক সময় করলে গুনাহের পরিমাণ এবং শাস্তিও বেশী হবে। (প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২৬৯-২৭০, হালবী কাবীরা ২০৯, হিদায়া ৪:৪৪৪)

মেয়েদের ছবি দেখা

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েদের ফটো দেখা ঠিক হবে কি না?

জবাবঃ বেগানা মহিলাদেরকে দেখা যেমন নাজায়েয, তেমনি তাদের ছবি দেখাও নাজায়েয। ফটো বা ছবি দেখার দ্বারা নাজায়েয পাপের পাশাপাশি তা হৃদয় যন্ত্রনারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু দেখা ও কল্পনার দ্বারা চোখের যিনার গুনাহ হতে থাকে। তাই মেয়েদের ফটো বা ছবি দেখা কোন মতেই জায়েয নয়। (প্রমাণঃ হিদায়া-৪: ৪৫৮)

অর্ধ রেশমী কাপড় পরিধানের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ রেশমী কাপড়ের সাথে যদি অন্য কোন সুতা মিশ্রিত থাকে, তবে সে কাপড় পড়া জায়েয হবে কি না?

জবাবঃ যখন কোন কাপড় রেশমী সুতা ও অন্য কোন সাধারণ সুতার মিশ্রণে তৈরি করা হয়, তখন ঐ কাপড়ের বুননের দিক অর্থাৎ, প্রস্থের দিক ধর্তব্য হবে।

অর্থাৎ, প্রস্থের দিকের বা বুননের দিকের সুতা রেশমী হলে, কাপড়টি রেশমী কাপড়ের হুকুম রাখবে এবং তা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম হবে। আর যদি বুননের সুতা রেশমী ব্যতিত অন্য সুতা হয়, তাহলে ঐ কাপড় পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে। (প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪:১২৭, হিদায়া ৪:৪৫৬)

প্রয়োজনবশতঃ বেগানা মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন পোস্ট অফিসের পিয়ন। প্রতিদিন কমপক্ষে ৪/৫ টি রেজিষ্ট্রি পত্র মেয়েলোকের নামে আসে। এমনকি অর্ডিনারী কয়েকটি পত্রও প্রায়ই মেয়েলোকের নামে আসে। মেয়েলোকের রেজিষ্ট্রি পত্রগুলো বিলি করতে গিয়ে তাদের সাথে অবশ্যই দেখা হয়। এবং কথাবার্তাও হয়। একটি ইসলামিক বইতে লেখা দেখলাম বেগানা মহিলাকে দেখা হারাম ও নাজায়েয। মেয়েদের বেলায়ও একই হুকুম। আমার জিজ্ঞাসা হল ইসলামের দৃষ্টিতে এই হারাম থেকে বাঁচতে হলে আমার করণীয় কি ?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে গাইরে মাহরাম তথা বেগানা মহিলাদেরকে দেখা; তাদের সাথে অযথা কথা বলা এমনকি সালাম দেয়াও সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয।

তবে প্রয়োজনীয় ও জরুরী ক্ষেত্রে শর'ঈ পর্দা বজায় রেখে দরকারী কথাবার্তা বলা জায়েয আছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের উচিত তারা যেন দরকারী কথা বার্তা সংক্ষেপে কর্কশ ভাষায় বলে শেষ করে দেয়। অযথা দীর্ঘ ও নরম আলাপ বা অহেতুক কথা বার্তা যেন না বলে।

প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার করণীয় হল-আপনি মহিলাদের নামে আসা রেজিস্ট্রারী ও অর্ডিনারী পত্র ও এ জাতীয় পত্র বিতরনের প্রয়োজনে

আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে উক্ত পত্রগুলো প্রাপক মহিলার কোন মাহরাম তথা স্বামী, ছেলে বা ভাই-বাবার মাধ্যমে তার হাতে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং প্রাপকের হাতের সাইন বা স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য সে স্থানটুকু চিহ্নিত করে পত্র বাহককে বলবেন। এভাবে আপনার প্রয়োজনীয় দ্বায়িত্বও শেষ হবে এবং শর'ঈ পর্দার আইনও লংঘন হবে না।

তবে যদি একান্তভাবে চেষ্টা করে বিফল হন অর্থাৎ, কোন পুরুষ মাহরাম পাওয়া না গেলে, তখন নিজেই দৃষ্টি নীচের দিকে রেখে ঐ মহিলার স্বাক্ষর নিয়ে নিবেন। (প্রমাণঃ সূরা নুর ৩০, সূরা আহযাব ৩৩/৫৯, ইমদাদুল মুফতীন ১০৩১)

পুরুষদের জন্য মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবন

জিজ্ঞাসাঃ ক্যাসেটে উঠানো মহিলাদের কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এবং ঈমান, আমল ও আখিরাত সম্পর্কে বয়ান পুরুষের জন্য শ্রবন করা জায়েয হবে কিনা?

জবাবঃ ক্যাসেটে উঠানো কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত শ্রবণ করা জায়েয আছে। তবে পুরুষদের তিলাওয়াত পুরুষরা শুনবে, আর মহিলাদের তিলাওয়াত মহিলারা শুনবে। কিন্তু মহিলাদের তিলাওয়াত পুরুষের জন্য শ্রবণ করা জায়েয নয়। কারণ মহিলাদের আওয়াজ বা কন্ঠস্বর বেগানা পুরুষ থেকে বিনা প্রয়োজনে গোপন থাকা বা রাখা জরুরী। এমনকি বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে কথাবার্তা বলাও নিষেধ। একান্ত প্রয়োজনেই কেবলমাত্র পর্দার আড়াল থেকে মেয়েরা কর্কশ স্বরে কথা বলতে পারে। ক্যাসেটের মাধ্যমে মহিলাদের তিলাওয়াত বা অন্য কোন দীনী আলোচনা শোনার জন্য মহিলাদের কন্ঠস্বর ব্যতীত আরো যথেষ্ট মাধ্যম রয়েছে। সুতরাং প্রয়োজন হলে, সেখান থেকেই শুনবে এবং

নসীহত হাসিল করবে। তেমনিভাবে মহিলাদেরও উচিত যে, কোন পুরুষ কারী সাহেবদের সুমধুর কন্ঠে তিলাওয়াত না শোনা। কারণ, এতেও অনেকে ক্ষতি রয়েছে। মেয়েরা কেবল মেয়েদের তিলাওয়াত শুনবে। তবে মেয়েরা পুরুষ বুজুর্গ উলামায়ে কিরামের ওয়াজ শুনতে ও নসীহত হাসিল করতে পারে। (প্রমাণঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন-৬: ৪০৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪:১৯৭)

বেপর্দা মেয়ের প্রতি পিতার করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ স্ত্রী অবাধ্য হলে, পাপ পথে চললে বা শরী'আতের নির্ধারিত সীমালংঘন করলে, কুরআনে নির্দেশিত তিন প্রকারের সংশোধনীর চেষ্টা করেও বিফল হলে, তালাক দেওয়ার বিধান শরী'আতে আছে। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার সুযোগও রয়েছে। কিন্তু কারো মেয়ে যদি অবাধ্য হয়, পাপ পথে চলে, শরী'আতের বিপরীত চলে, কিন্তু কারো মেয়ে যদি অবাধ্য হয়, পাপের পথে চলে, শরী'আতের বিপরীত চলে, পিতা শত চেষ্টা করেও বশে বা সৎপথে আনতে অক্ষম হয়, এতে তার মান- সম্মান ও ইজ্জত-হুরমত বজায় রাখতে পারে না, মেয়েটির কারণে সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারে না, বরং ধিকৃত হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়? শরী'আতের এর কি সমাধান রয়েছে?

জবাবঃ ছেলেমেয়েদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য বাল্যকালেই তাদেরকে দীন শিক্ষা দেয়া মা-বাবার উপর ফরজ করা হয়েছে। সেই প্রথম ফরয তরক করার কারণেই আজ বদদীনী পরিবেশে থেকে এবং দীনী শিক্ষার বদলে নাস্তিক্যবাদী কু-শিক্ষা পেয়ে তারা বিপথগামী হচ্ছে। তাদেরকে বাল্যকালেই দীন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা না দিলে অভিভাবকগণ পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

মেয়ের ব্যাপারে পিতার কর্তব্য হচ্ছে, শিশুকাল থেকেই দীনী পরীবেশে রেখে দীনদারী শিক্ষা দিয়ে আদর্শ চরিত্র অধিকারীনী রূপে তাকে গড়ে তুলবে। অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীনদার, পরহেযগার পাত্র দেখে তাকে অবিলম্বে বিবাহ দিয়ে দিবেন। সাবালিকা হওয়ার পরও যদি অভিভাবক তার বিবাহের বন্দোবস্ত না করে এবং এমতাবস্থায় যদি সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তবে অভিভাবকও সেই গুনাহর অংশীদার হবে। (মিশকাত শরীফ-২:২৭১)

আজ অধিকাংশ পিতা-মাতা ছেলেমেয়েকে কুরআন শিখায় না, দীনী ইলম শিখায় না। বালেগ হওয়ার পর তাদের হেফাযতে রেখে তাড়াতাড়ি তাদের বিবাহ-শাদীর ফিকির করে না। যদ্দরুন পরে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শরী'আতের বর্ণিত নির্দেশের উপর ধারাবাহিকভাবে আমল করলে এ ধরণের দুর্ঘটনার ঝুঁকি এক প্রকার থাকে না বললেই চলে। কিন্তু মানুষেরা শরী'আতের বরখেলাফ করে যখন পেরেশানীতে পড়ে, তখন শরী'আতকে দোষারোপ করে নিজের ঈমান নষ্ট করে ফেলে। শরী'আতের দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ে কাউকে অন্যায়ের কারণে ত্যাজ্য করার বিধান নেই। বরং, বুঝিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর দুনিয়াবি আইনে ত্যাজ্য করলেও তারা শরী'আতের বিধান মোতাবেক পিতা-মাতার সম্পদ থেকে মাহরূম হয় না। তবে তার সম্পূর্ণ সম্পদ যদি অন্য আওলাদকে মালিক বানিয়ে হিবা করে দেয়, সেক্ষেত্রে অবশ্য ত্যাজ্য সন্তানরা অংশ পায় না। সন্তান নাফরমানীতে ডুবে থাকলে তার ব্যাপারে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়াই উত্তম।

আপনি তাকে সৎপথে আনার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। সম্পদ থেকে মাহরূমীর ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোনরূপ শাসনে কন্টোলে আনার চেষ্টা করুন। আর তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মহিলাদের কোন দীনী পরিবেশ ও দ্বীনি

তালীমের মধ্যে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তৎসঙ্গে দীনদার পাত্র দেখে তাকে যথাশীঘ্র বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। পাশাপাশি তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে অনবরত দু'আ রোনাযারী করতে থাকুন এবং তাকে দীন শিক্ষা না দেয়ার কারণে নিজের ভুলের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করুন।

(প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া-১৪:৪৩৯, ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৬:৪৭০/১৫০, ফাতাওয়া আব্দুল হাই-৩:৯, ইমদাদুল মুফতীন-১০৫১)

মেয়েদের পর্দা করার সময় ও তার পরিমাণ

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েদের প্রতি কখন থেকে পর্দা করার হুকুম হয়? পর্দায় তাদের পূর্ণ শরীর ঢাকতে হবে কি-না?

জবাবঃ মেয়েরা যখন কারীবুল বুলূগ বা বালেগা হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে হয়, অর্থাৎ তারা নিজেরা কামভাব অনুধাবন করতে শুরু করে এবং তাদের দিকে দেখলে অন্য পুরুষের মনে কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই তাদের জন্য পর্দা করা জরুরী হয়ে পড়ে।

মেয়েদের জন্য বেগানা পুরুষ তথা যাদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ তাদের সামনে সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখাই ফরয। তবে একান্ত জরূরত বশতঃ মুখমন্ডল, দু'হাতের কব্জা ও দু'পায়ের পাতা খোলার অনুমতি আছে। উল্লেখ্য যে, ঐ সব অঙ্গসমূহ যদিও সতরের ভিতর শামিল নয়, তথাপিও ফিতনার যামানা হওয়ার কারণে একান্ত ঠেকা না হলে, উক্ত অঙ্গও ঢেকে রাখা জরুরী। বিনা ঠেকায় গাইরে মাহরামদের সামনে মুখমন্ডল, দু'হাতের কব্জা ও দু'পায়ের পাতাও খোলা নিষেধ। সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঢাকা জরুরী। (প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/১৯৭, তালীফাতে রশীদিয়া-৪৮৫)

বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ যে সমস্ত মহিলারা পর্দা করে না এবং এ সম্পর্কে স্বামী সর্তক করার পরও তার কথা শুনে না, এমন স্ত্রীকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য স্বামীর কি করা উচিত?

জবাবঃ পর্দা আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিধান। তাই এ বিধান পালন করা প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরয। আখিরাতের কল্যান অর্জনের সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর মায়া-মুহাব্বতের স্থায়িত্বের লক্ষ্যে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্যই পর্দার এ বিধান। কিন্তু এমনও অনেক লোক আছে, যারা আত্মঅহমিকা, নির্বুদ্ধিতা ও বেওকুফীর কারণে নিজেদের এত বড় উপকারী জিনিসের বিরোধিতা করে থাকে। কাজেই কোন মহিলা যদি পর্দা না করে এবং স্বামীর বলাতেএ তার কথা না শুনে, তাহলে সে একাধারে আল্লাহ ও তার রাসূল এবং স্বামীর অবাধ্যচারিনী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে বুঝাবে। প্রয়োজন হলে একই ঘড়ে বিছানা আলাদা করে দিবে। এতেও যদি কোন ফল না হয়, তাহলে হালকা শাস্তি প্রয়োগ করবে। এতেও যদি সু-পথে না আসে তাহলে দু'পক্ষের দু'জন মুরুব্বীর দ্বারা ফায়সাল কারাবে। এতেও যদি ফায়দা না হলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় শরী'আত মুতাবিক তালাক দিয়ে কোন দীনদার পর্দানশীল মহিলাকে বিবাহ করে নিবে। আর এ রকম করাই উচিত। কারণ, একজন দীনদার লোকের জন্য দীনদার পর্দানশীল স্ত্রী হওয়া উচিত। বেপর্দা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করায় মান-সম্মান নিয়ে জীবন যাপন করা এবং তার থেকে নেক সন্তান আশা করা অসম্ভব।(প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৯:৩৬)

পিতা-মাতার আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার পিতা-মাতা বেপর্দাভাবে আমাকে হাইস্কুলে দিতে চায়। কিন্তু আমি পর্দা ভঙ্গ করে হাইস্কুলে যেতে চাই না। তাই এ অবস্থায় পিতা-মাতার কথা না মানলে গুনাহ হবে কি-না?

জবাবঃ বালেগা মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয। পিতা-মাতা বা কোন মানুষের কথার কারণে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, "আল্লাহকে অসুন্তুস্ট করে কোন বান্দাকে খুশী করা জায়েয নয়"।

তাই এ অবস্থায় পর্দা ভঙ্গ করে হাইস্কুলে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে যে কোন হিকমতের মাধ্যমে পিতা-মাতাকে স্বীয় মতের উপর রাজী করাবে। যদি অগত্যা পিতা-মাতা রাজি নাই হন তাহলে তাদের নির্দেশ এ ব্যাপারে না মানলে গুনাহগার হতে হবে না। (মিশকাত শরীফ-৩১৯, তাফসীরে কুরতুবী-৯:২৬৬, আবু দাউদ-২:৫৫৯)

আংশিক চেহারা খোলা অবস্থায় ভিন পুরুষের সাথে দেখা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে অনেক দীনদার মহিলারা বোরকা পরে নেকাব উঠিয়ে রাখে। যাতে করে তাদের সম্পূর্ণ মুখমন্ডল খোলা থাকে। আবার কেউ কেউ মুখের উপর দিয়ে কাপড় পেচিয়ে রেখে চোখ বাহির করে রাখে। তার সাথে মুখের কিছু অংশ বের হয়ে যায়। এ ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে উলামায়ে মুতাআখখিরীনের ফাতাওয়া অনুযায়ী মহিলাদের সম্পূর্ণ শরীর (শুধু পায়ের পাতা ব্যতীত) সতরের অন্তর্ভুক্ত।সুতরাং তাদের জন্য না-মাহরামদের সামনে বা রাস্তাঘাটে চলার সময় চেহারা খোলা রাখা না জায়েয।চক্ষুও সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, চক্ষুও ঢেকে রাখা কর্তব্য। তেমনিভাবে উভয় হাতে মোজা পরিধান করে

বের হওয়া জরুরী। শুধু পায়ের পাতা খোলা রাখতে পারে। তবে উত্তম হল পায়ে মোজা পরিধান করা এবং পা খোলা না রাখা। (প্রমাণঃ হিদায়া ৪:৪৪২, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদীয়া ৬:৩৭৩)

পর্দাহীন মহিলাদের সাথে পর্দা করা

জিজ্ঞাসাঃ সে সকল মহিলারা শরী'আতের ফরয বিধান পর্দা মান্য করে না, পর পুরুষের সাথে অবাধে চলা-ফেরা, দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথা-বার্তা বলে বেড়ায়, তাদের সাথে পর্দানশীল মহিলাদের জন্য দেখা-সাক্ষাৎ ও খোলামেলা আলাপ আলোচনা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি?

জবাবঃ যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলারা ইসলামের মহান আদর্শ ও শরী'আতের পর্দার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয নির্দেশ সর্বাবস্থায় যথাযথভাবে মান্য করে চলতে চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে বেপর্দা মহিলা যারা শরী'আতের এ অত্যাবশ্যকীয় পর্দার নির্দেশকে নানারকম যুক্তি-তর্ক আর খুঁড়া অজুহাত দেখিয়ে অবজ্ঞাচ্ছলে স্পর্ধার সাথে অমান্য করে লাগামহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাদের সাথে বের্পদা অবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ ও খোলামেলা আলাপ আলোচনা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। কারণ-এ ধরনের মহিলাদেরকে শরী'আতে গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, পর্দানাশীন সম্মনিতা মহিলাবৃন্দকে এ ধরনের বেপর্দা মহিলাদের থেকে দূরে থাকা এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না রাখা বাঞ্ছনীয়। (প্রমাণঃ ইবনে কাসীর, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-৫:৩২৭)

দন্ডবিধি

যিনা করার পর তাওবাকারীর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন প্রেমিকার সাথে যিনা করার পর তাকে বিবাহ করে, তবে কি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যিনার গুনাহ থেকে মুক্তি দেবেন?

জবাবঃ কোন মহিলার সাথে যিনা করার পরে তাকে বিবাহ করার দ্বারা গুনাহ মাফ হবে না। তবে যদি সেই ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে যিনা না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে তাওবা করে, তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই গুনাহ মাফ করবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সহীহ তাওবার দ্বারা সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামে বিবাহের আগে প্রেম-প্রীতি সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। [প্রমাণঃ সূরা নিসা আয়াত ১৭, সূরা ফুরক্বান আয়াত ৭০, মিশকাত শরীফ, ২০৩]

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করা

জিজ্ঞাসাঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে তার শাস্তি কি হওয়া উচিত?

জবাবঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি মুরতাদ। তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইসলামী রাষ্ট্র তার ধর্ম গ্রহণ করবে। তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে, যদি তাওবা করে, পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে তাকে কতল করে দেওয়া হবে। আর যদি মহিলা এরূপ করে তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে। যদি তাওবা না করে, তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারেই আবদ্ধ করে রাখা হবে। [প্রমাণঃ হিদায়া ২:৬০০-৬০১]

দুনিয়ার বিচার কি গুনাহ মাফ করে?

জিজ্ঞাসাঃ ধরুন আমি একটি পাপ করেছি। দেশের প্রচলিত নিয়ম অথবা ইসলামী শরী'আত অনুযায়ি আমার বিচার হয়েছে। যখন দুনিয়াতেই আমার বিচার হয়ে গেল, তখন কি আবার কিয়ামতেও এর পুনঃবিচার হবে?

জবাবঃ যদি কোন লোক অন্যায় বা গুনাহের কাজে করে। আর সে জন্য শরী'আত অনুযায়ী অথবা রাষ্ট্রীয় আইননুসারে তার কোন শাস্তি হয়, তাতে তার সেই অন্যায় কাজের গুনাহ মাফ হবে না। কারণ এই শাস্তি তো শুধুমাত্র দুনিয়ার আইন-শৃংখলা ও জনগণের শান্তি নিরাপত্তার বজায় রাখার জন্য দেয়া হয়ে থাকে, যাতে করে ভবিষ্যতে আর এ ধরণের অন্যায় কাজ করতে কেউ সাহস না পায়। এ শাস্তি শুধু দুনিয়ার নিয়ম ঠিক রাখার স্বার্থে। অন্তরের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য অন্যায়ের পর মনে প্রাণে অনুতপ্ত হয়ে উক্ত অন্যায় ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতে আর সেই অন্যায় না করার পাক্কা নিয়্যত করে তাওবা করা জরুরী। সুতরাং যতক্ষণ না সে অন্যায়ের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করবে, তার ঐ খাস গুনাহ মাফ হবে না, তার জন্য পরকালের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে যেহেতু হাদীসে আছে যে, যে কোন ধরনের কষ্ট ভোগের দ্বারা বান্দার গুনাহ মাফ হয়। সে হিসাবে উক্ত ব্যক্তির কষ্টভোগের দ্বারা সাধারণ গুনাহ মাফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৫১৮ আলমগীরী ২:১৪৩ পৃঃ]

পশুর সঙ্গে ব্যভিচার

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি মহিষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে উক্ত মহিষের গোশত খাওয়া জায়িয হবে কি-না? যদি তা জায়িজ না হয়,

তাহলে উক্ত মহিষের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? আর ব্যভিচারী ব্যক্তি শাস্তি কি হবে?

জবাবঃ যদি কেউ কোন পশুর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে সে জঘন্য অপরাধী ও পাপী সাবস্ত হবে। সুতরাং কেউ এরূপ করে ফেললে কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তার খালিস অন্তরে তাওবা করা উচিত। আর তার এ অপরাধের জন্য এলাকার গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ তাকে সর্বোচ্চ ৩৯ টি বেত্রাঘাতের দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। আর উক্ত পশুর হুকুম হচ্ছে এ যে, সেটাকে জবেহ করে গোশত জ্বালিয়ে দিতে হবে। এরূপ করা মুস্তাহাব। তবে উল্লেখ্য পশুর গোশত খাওয়া হারাম হবে না। সুতরাং, কেউ ইচ্ছা করলে এমন পশুর গোশত খেতে পারে। এ ছাড়া এরূপ পশুর ক্ষেত্রে আরেকটি পন্থা অবলম্বন করতে পারে যে, সেটাকে দূরবর্তী এলাকায় বিক্রি করে দিব। যাতে করে এতদসংক্রান্ত আলোচনা যেন একবারে বন্ধ হয়ে যায়। এর বিক্রয়লব্ধ টাকা মালিকের জন্য হালাল হবে। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৯১২, রদ্দুল মুহতার ৬:৩৬]

অবৈধ মিলনে সন্তানের বংশসূত্র নির্ধানণে শরী'আতের বিধান

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মহিলা অবৈধ মিলনের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি সন্তান প্রসব করে। বর্তমানে ছেলের বয়স পাঁচ বছর। আর যার সাথে উক্ত মহিলার এ অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে, সেও বর্তমানে জীবিত। এদিকে উক্ত মহিলার অন্যত্র বিবাহ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং, বর্তমানে উক্ত পুরুষ, মহিলা ও প্রসবকৃত এ সন্তান সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের এ অবৈধ দৈহিক মিলন সম্পূর্ণ হারাম, যিনা ও মহাপাপ হয়েছে। ইসলামী হুকুমত বহাল থাকলে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী উভয়কে একশতটি করে দোররা মারা হত। কিন্তু

বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত বহাল নেই বিধায় মুফতীয়ানে কিরামের পরামর্শ মুতাবিক তাযীরের বিধান প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাথে সাথে উভয়ের জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করা একান্ত জরুরী। অন্যথায় আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আর উক্ত সন্তানটি যদি সেই মহিলার অন্যত্র বিবাহ হওয়ার আগে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাহলে তার বংশসূত্র তার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। অর্থাৎ ঐ ছেলেটি তার মায়ের সন্তান বলে গন্য হবে। কোন ক্রমেই ব্যভিচারী পুরুষটির সন্তান বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং, তার উপর এ সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও অর্পিত হবে না। তেমনিভাবে একই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও উক্ত সন্তানটি তার মীরাছেরও অধিকার হবে না। তবে উক্ত ছেলে তার মায়ের সম্পত্তি থেকে মীরাছ পাবে। আর এ ছেলে বয়স্ক না হয়ে নিজ উপার্জন করার পূর্ব তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তার মায়ের উপর অর্পিত হবে।

উল্লেখ্য যে, যদি ঐ ছেলেটি উক্ত মহিলার বিবাহের ছয় মাস বা তার চেয়ে অতিরিক্ত সময়কালে জন্মগ্রহণ করে তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে বর্তমান স্বামীর সন্তান বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত মেয়াদ কালের আগে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং মহিলার স্বামী ছেলেটিকে নিজের ছেলে হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে ছেলেটি বৈধ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে এবং মহিলার বৈধ স্বামী থেকে তার বংশধারা সাব্যস্ত হবে। [প্রমাণঃ সূরা নূর ২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৭:১১২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৩৪]

অবৈধ গর্ভকে ঔষধের মাধ্যমে নষ্ট করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে ভালবাসে এবং তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রতিক্ষা আছে। কিন্তু বিবাহের পুর্বেই তাদের

মিলামিশার কারণে পেটে সন্তান চলে আসে। বিবাহের বয়স ৪ মাস, আর পেটের সন্তানের বয়স ৫ মাস। এ অবস্থায় সন্তান জারজ হয়, তাহলে ঔষধের মাধ্যমে সন্তান নষ্ট করা জায়িয হবে কি না? আর শরী'আত মুতাবিক তাদের উভয়ের জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে কিনা?

জবাবঃ বিবাহ আগে এসব ভালবাসা হারাম এবং পরিণাম অত্যন্ত খারাপ। সন্তানটি যদি বিবাহের ছয় মাস পরে জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে তাকে বৈধ সন্তান হিসাবে গণ্য করা হবে। কোন সন্তান যদি বিবাহের পর ছয় মাসের কমে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সন্তানটি বংশসূত্র পিতার থেকে সাবিত হবে না। বরং জারজ সন্তান বলে বিবেচিত হবে। তবে পিতা যদি উক্ত সন্তানকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে এবং যীনার কথা স্বীকার না করে, তাহলে তার থেকে নসব সাবিত হবে। তবে যিনার কথা স্বীকার করলে, তার থেকে সন্তানের বংশসূত্র প্রমাণ হবে না । তবে মেয়েটির বিবাহ তার সঙ্গে বৈধ হয়েছে।

সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি গঠিত হয়ে যায় এবং প্রাণ এসে যায় (যার সময় সীমা ১২০ দিন অর্থাৎ চার মাস), এমতাবস্থায় গর্ভপাত ঘটানোর জায়িয নয়। ৫ মাসের গর্ভপাত ঘটানো জায়িয নয়। ৫ মাসের গর্ভপাত করানো জায়িয নয়।

যিনাকারী মহিলা পুরুষ যদি বিবাহিতা হয় এবং তাদের এ অপকর্মের উপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন পুরুষ স্বাক্ষী থাকে বা তারা নিজেরা স্বীকার করে, তাহলে শর'ঈ বিধান হল, তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। আর যদি অবিবাহিতা হয়, তাহলে একশত বেত্রাঘাত করা। এটাই শর'ঈ হদ (শাস্তি)। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে শর'ঈ হদ প্রয়োগ করার জন্য দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী হুকুমত থাকা আবাশ্যক। যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে শরী'আত অনুযায়ী ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই,

তাই শরী'আতের উল্লেখিত দণ্ডবিধি কার্যকর করা যাবে না। তবে তা'জীর বা সাধারণ শাস্তি হিসাবে স্থানীয় প্রশাসনের চেয়ারম্যান- মেম্বার, স্থানীয় ও গণ্যমান্য মুরব্বী ব্যক্তিবর্গ হক্কানী মুফতীগণের তত্ত্বাবধের অনুর্ধ ৩৯ টি বেত্রাঘাত ইত্যাদি মেরে শাস্তি দিতে পারবেন। যাতে করে সমাজে এ ধরণের অপরাধ বাড়তে প্রয়াস না পায়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬:২৭৫, যখীরা ৫:৩২৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২০২-৩ পৃ. ফাতাওয়া দারুল উলূম ১১-১৯-৪৩ পৃ. হিদায়া ২:৪৩২ পৃ. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১:৫৩৬-৫৪০ পৃ. ইমদাদুল মুফতীন ৫২৪ পৃ. ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৩:২৬১-২৭৭ পৃ.]

হস্তমৈথুন ও সমকামিতার শাস্তি

জিজ্ঞাসাঃ যিনা একটি জঘন্য কবীরা গুনাহ, কিন্তু হস্তমৈথুন ও সমকামিতা কি এ পর্যায়ের গুনাহ? এসব অন্যায়ের শাস্তি কি?

জবাবঃ হস্তমৈথুন হারাম ও লা'নতের যোগ্য। সমকামিতা এটা যিনা থেকেও, মারাত্মক অন্যায়। এই খবীস কাজ লূত আ. এর কওমের পাপিষ্ঠ লোক থেকে শুরু হয়েছে। জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জানোয়ারও এ কাজ থেকে বাঁচতে চায় এবং এটাকে খারাপ মনে করে। মহান আল্লাহ লূত আ. এর দুরাচার কওমের শাস্তি স্বরূপ বস্তিকে উপরে উঠিয়ে উল্টিয়ে ফেলেন। অতঃপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। হুযূর ﷺ এ অপকর্ম জড়িত উভয়কে কতল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য এক হাদিসে পাথর মেরে উভয়কে খতম করার নির্দেশ এসেছে। একবার হযরত আবু বকর রা. এর দরবারে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এ রকম খবীস ব্যক্তির অবস্থা লিখে শাস্তির দরখাস্ত করলে, আবু বকর রা. তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার ফায়সালা দেন।

সমকামিতার ভয়াবহতার কারণে এর শাস্তি নিয়ে সাহবাগণের রা. মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে, কেউ বলেছেন, উঁচু স্থান থেকে ফেলে দিয়ে মারতে হবে; আবার বলেছেন, দেয়ালের মত কোন কিছুর পার্শ্বে রেখে ঐ দেয়াল তার উপর ফেলে তাকে খতম করতে হবে। কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষ এ জঘন্য অপকর্মের কল্পনাও করতে পারে না। হস্তমৈথুন ও সমকামিতা দ্বারা পুরুষত্ব অল্পদিনে একবারেই নষ্ট হয়ে যায় এবং সমকামিতা দ্বারা এইডস এর ন্যায় এমন মারত্মক রোগ সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা কোন চিকিৎসা নেই।

উল্লেখ্য, শর'ঈ শাস্তিসমূহ জারী করার অধিকার একমাত্র ইসলামী হুকুমতের রয়েছে, জনসাধারণের বা ব্যক্তি বিশেষের ঐ সকল শাস্তি জারী করার কোন অধিকার নেই। ইসলামী হুকুমত না থাকার ক্ষেত্রে সমাজ থেকে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য শরী'আতে তা'যীর (তুলনামূলক হালকা শাস্তি) এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উলামায়ে কিরামের পরামর্শে জারী করতে পারেন। [প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার ৪:২৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৫৫১-১২]

বিবাহিত যিনা করলেন

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন মহিলা বিবাহের পর স্বামীর ঘরে থাকাকালীন অন্য কোন পুরুষের সাথে মেলামেশা করে, তাহলে মহিলা কি তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে? এমনিভাবে যদি কোন পুরুষ বিবাহের পরে অন্য কোন নারীর সাথে মেলামেশা করে তাহলে কি বিবাহ ভেঙ্গে যাবে?

জবাবঃ উল্লেখিত উভয় অবস্থায় স্বামী- স্ত্রীর বিবাহের কোন ক্ষতি হবে না বটে, তবে তারা যিনাকারী ও ব্যভিচারী রূপে গণ্য হবে। তাদের অন্যায়

প্রমাণিত হলে ইসলামী রাষ্ট্রীয় আইনে তাদের শাস্তি হচ্ছে, পাথর মেরে হত্যা করা।

তবে সেই মহিলা যদি স্বামীর অন্য ঘরের ছেলের সাথে মেলামেশা করে থাকে, তবে সেই স্বামী-স্ত্রী মহাপাপী হবেই, সেই সাথে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯:৯৮, ফাতাওয়া রাহীমায়া ২:১৪৩]

যিনার দ্বারা সন্তান হলে তার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলা তার স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন পুরুষের থেকে যদি অব্যধ সন্তান নেয়, তাহলে তার ব্যপারে শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ যিনার কথা স্বীকার করলে বা চারজন পুরুষের স্বাক্ষীর দ্বারা যিনা প্রমাণিত হলে, শরী'আত মুতাবিক ইসলামী হুকুমত বিদ্যমান থাকলে উভয়ের রজম হত অর্থাৎ উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করতে হত। কিন্তু সামাজিকভাবে এ বিচার কার্যকর করা যাবে না। তবে সমাজের মুরিব্বীরা এবং প্রশাসনের লোকেরা তাদের কোন শাস্তি দিতে পারেন। যাতে করে সমাজে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে না পড়ে। উল্লেখ্য যে, এই অবৈধ সম্পর্কের কারণে বিবাহের কোন ক্ষতি হবে না এবং ঐ সন্তানের বংশধারা প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রীর স্বামী থেকেই প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ স্বামীর বৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। সন্তানটির বংশধার যিনাকারী থেকে সাবিত হবে না। অবশ্য স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে, তাহলে তার ফায়সালা ভিন্ন। [প্রমাণঃ নুরুল আনওয়ার ২৫৯ হিদায়াহ ২:৫০৯-১০ বুখারী শরীফ ১:২৭৬]

বাংলাদেশে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ইসলামী দন্ডবিধি প্রয়োগ করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও কোন অপরাধের শরী'আত সম্মত বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে করা যাবে না। এর একমাত্র অধিকারী হল, ইসলামী সরকার। এ কথাটা হল বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ঠ আলেমের। কুরআন-হাদীসের আলোকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাবঃ কোন ইসলামী দণ্ড বিধান প্রয়োগ করতে চাইলে, তার পূর্বশর্ত হল, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকা। উল্লেখিত শর্ত না পাওয়াতে বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া স্বত্তেও বাংলাদেশে ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারবে না। সুতরাং উক্ত বিশিষ্ট আলেমের মতামত ঠিক। তবে যতটুকুর মধ্যে কারো কর্তৃত্ব আছে, ততটুকুর মধ্যে তিনি তা'যীর বা হালকা শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। যেমন, পিতা সন্তানকে, শিক্ষক ছাত্রকে, স্বামী স্ত্রীকে, নাহী আনিল মুনকার হিসাবে হাতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত দ্বায়িত্ব পালন করতে পারবেন। মুসলিম শাসকদের অনুমতি ছাড়া সাধারণ মানুষ যদি শাস্তি প্রয়োগ করে, তাহলে সমাজে ফিতনা-ফাসাদে ভরে যাবে। এজন্য আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার জনগণকে দেয়া হয়নি। সুতরাং, জনগণ একে অপরকে হিকমতের সাথে কথার মাধ্যমে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে থাকবে। যেখানে এটাও সম্ভব নয়, বরং জান ও মালের উপর প্রবল ক্ষতির আশংকা আছে, সেখানে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে অন্তর দ্বারা অন্যায় কাজকে ঘৃণা করবে এবং সেই অন্যায় বন্ধ করে তার স্থলে ভাল কাজ কিভাবে চালু করা যাবে, সে ব্যাপারে দিলের মধ্যে ফিকির রাখবে এবং মাশওয়ারা বা পরামর্শ করতে থাকবে। তাহলে দায়িত্বমুক্ত হওয়া যাবে, নতুবা গুনাহগার হবে। [প্রমাণঃ কামালাতে আশরাফিয়া ৮৩ পৃ.,

ফাতাওয়া শামী ৪:৬৫ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৫১৩, ইমদাদুল মুফতীন, ৯০৯,৯১০]

ইসলামী আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা হওয়ার পরও যদি দেশে ইসলামী আইন চালু না হয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি ইসলামী আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয় যেমন, চুরি করলে, হাত কেটে দেয়া; যিনা করলে, রজম করা ইত্যাদি, তবে প্রচলিত আইনের অপরাধী হলেও খোদার আইনে সে কি অপরাধী সাবস্ত হবে?

জবাবঃ ইসলামী রাষ্ট্র বলতে ঐ রাষ্ট্রকে বুঝায়, যার সংবিধান কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক। ইসলামী সংবিধান ছাড়া শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের ঘোষণা দিলেই তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে না। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম, আর ইসলামী রাষ্ট্র এক কথা নয়। ইসলামী রাষ্ট্র হলে, সেখানে ইসলামী আইন জারী না হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তারপরেও যদি নব গঠিত ইসলামী হুকুমত ইসলামী দণ্ডবিধি চালু করতে বিলম্ব করে, তাহলে জনগণ ইসলামী হুকুমতের রাষ্ট্র প্রধানকে আইন জারী করতে বাধ্য করবে। কিন্তু নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কখনো আইন হাতে তুলে নিতে পারবে না। কেউ নিলে, সে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে গুনাহগার হবে। কারণ, কুরআন তাকে এ দায়িত্ব দেয়নি। [প্রমাণঃ হিদায়া ২:৫১১, ফাতাওয়ায়ে শামী ৪:৬৫, বাদায়েয়ুস সানায়ে ৭:৫৭ ফাতাওয়া দারুল- ১২:১৯৮]

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে যিনাকারীদের ব্যাপারে গণ্যমান্যদের বিচার সালিস

জিজ্ঞাসাঃ (ক) যিনার ক্ষেত্রে প্রথম দোষী কে? বিবাহিতা মেয়ে ও অবিবাহিতা ছেলে যদি যিনা করে তাহলে শরী'আত মুতাবেক বর্তমানে তাদেরকে কি ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে?

(খ) যদি এক তরফা বিচার করা হয় অর্থাৎ ছেলের পক্ষ থেকে মেয়েকে ১ বিঘা জমি লিখে দিতে বাধ্য করা হয় এবং তা কার্যকর করা হয়। তাহলে বিচারকগন হাদীসের দৃষ্টিতে অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন?

জবাবঃ (ক) যিনার ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা উভয়ই সমপরিমাণ দোষী। যিনাকারী মহিলা পুরুষ যদি বিবাহিত হয় এবং তাদের এ কু-কাজের চারজন স্বাক্ষী থাকে এবং দেশে ইসলামী হুকুমত চালু থাকে, তাহলে শর'ঈ বিধান হল তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। আর যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে একশত বেত্রাঘাত করা।

প্রকাশ থাকে যে, শর'ঈ বিধান প্রয়োগ করার জন্য দেশে রাষ্ট্রিয়ভাবে ইসলামী হুকুমত থাকা আবশ্যক। যেহেতু আমাদের দেশে রাষ্ট্রিয়ভাবে ইসলামী হুকুমত শাসন ব্যবস্থা নেই, তাই শরী'আতের উল্ল্যেখিত দণ্ড কার্যকর করা যাবে না। তবে তা'যীর বা সাধারণ শাস্তি হিসেবে শর'ঈ পঞ্চায়েত সালিস বা স্থানীয় মুরুব্বী ও গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ হক্কানী মুফতী আলেমের তত্ত্বাবধানে অনুর্ধ ৩৯ টি বেত্রাঘাত বা জুতা ইত্যাদি মেরে শাস্তি দিতে পারেন। পক্ষান্তরে স্থানীয় মুরুব্বী বা চেয়ারম্যানগণ অন্যায়কারীদের তাওবা ও ইস্তিগফার না করা পর্যন্ত তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে বয়কট করবে। তারপর তাওবা করে চলাফেরা ইসলাম সম্মত হলে তখন তাদের সাথে সালাম কালামসহ সকল সম্পর্ক জারী করতে পারবে।

(খ) প্রশ্নে বর্ণিত এ ধরনের বিচারের কোন অবকাশ শরী'আতে নেই। সুতরাং উক্ত জমি ছেলেকে ফেরত দিতে হবে এবং যারা শরী'আতের বিধান না জেনে বিচার করেছেন, তারাও অপরাধী। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ১২:১৮২]

ওয়াকফ-মসজিদ

মসজিদের মাইকে হারানো বিজ্ঞপ্তি ও জানাযার ঘোষণা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় মসজিদের মাইকে বিভিন্ন রকম হারনো বিজ্ঞপ্তিসহ জানাযার নামাযের ঘোষণা দেওয়া হয়। তা জায়িয কিনা?

জবাবঃ মসজিদের মাইকে মসজিদে সংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোন দ্বীনী কিংবা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার অনুমতি শরী'আতে নেই। সুতরাং মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত মাইক দিয়ে দুনিয়াবী কোন বিষয়ের ঘোষণা দেওয়া জায়িয নয়। এমনিভাবে মসজিদের মাইক মসজিদের বাইরে নিয়ে কোন প্রোগ্রাম করাও জায়েয নেই। তবে যদি মাইকটি এমনভবে ওয়াকফকৃত হয় যে, দাতা দেওয়ার সময় মসজিদের কাজের সাথে সাথে অন্য বৈধ কাজেও ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তার অনুমোদিত কাজে ব্যবহার করা জায়িয হবে। [প্রমাণঃ আদ্দুরুল মুখতার ৪:৪৩৩, আলমগীরী ২:৪৫৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২:১৪৪]

মসজিদের মাইকে ক্বিরা'আত গজল ও যিকির করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার বেশ কিছু মসজিদে রমাযান মাসে সাহরীর সময় এবং রমাযানের বাহিরে ফজরের সময় মুসল্লীদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করার জন্য মাইকে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও গজল পাঠ করে। এ ব্যপারে বাধা দিলে সাধারণ পাবলিক তাদের উপর মনক্ষুন্ন হয় এবং তাদের বিভিন্ন রকম সমালোচনা করে হেয় প্রতিপন্ন করে। সাধারণ জনগণ লিখিত দলীলের মাধ্যমে এর সঠিক সমাধান চায়। আশা করি এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান দিয়ে দুই দলের মতবিরোধ দূর করবেন।

জবাবঃ সাহরীর সময় হলে ঘুমন্ত এলাকাবাসীকে জাগানোর জন্য সংক্ষিপ্ত এলান করা যাবে। তবে দীর্ঘ সময় নাত গযল বা তিলাওয়াত না করা চাই। আর যে কোন নামাজের আযানের আগে বা পরে মাইকে নিয়মিতভাবে নাত-গজল বা কুরআনর পরিবেশনের কোন বিধান ইসলামে নেই।

যেহেতু শরী'আতে এ জাতীয় কোন বিধান নেই সেহেতু এ ধরনের কাজকে ভাল মনে করা এবং তা নিয়ম বানিয়ে নেয়া এবং যারা এ কাজকে অপছন্দ করে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করা জায়েয হবে না। কেননা হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, যা দ্বীনের কোন কাজ নয় তা দ্বীনে অনুপ্রবেশ করা এবং তাকে দ্বীনের কাজ মনে করা বিদ'আত।

মাইকে হামদ নাত ইত্যাদি পড়া কোন সাওয়াবের কাজ নয়। তেমনী ভাবে যিকির নিম্মস্বরে করাই উত্তম। অথবা এতটুকু হালকা আওয়াজে করতে পারে যাতে অন্য কারো ইবাদতে, যিকিরে বা কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। সুতরাং এ কাজের জন্য অন্যকে কষ্ট দেওয়া বা অন্যের ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। বিশেষতঃ ফজরের আযানের সময় মানুষ সুন্নাতে মশগুল থাকে। কেউ তিলাওয়াত করে কেউ নীরবে যিকির করে। মাযূর, অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ যাদের জন্য জামা'আতে হাযির হওয়া জরুরী নয় তারা বিশ্রামে থাকে। এই অবস্থায় মাইকে যিকির হামদ বা নাত পরিবেশন উপরোক্ত ব্যক্তিদের জন্য অসুবিধার কারণ হয়, এই জন্য এগুলো বন্ধ করা অপরিহার্য। কারণ অন্যকে কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত এবং জিহ্বা থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে। এবং কারো কারো ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি

করাও গুনাহের কাজ। [প্রমাণঃ মিরকাত ২:১৬১; আহসানুল ফাকাওয়া ১:৩৬৯; মিশকাত শরীফ ১:২৭]

মসজিদের মাইকে অন্য কাজে ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের ওয়াকফকৃত মাইকের মাধ্যমে মসজিদের ভিতর থেকে ব্যাংকের সুদের টাকার তাগাদার ঘোষণা, স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের গম সংগ্রহের ঘোষণা, বাচ্চা ও মহিলাদের ঔষধ সংগ্রহের ঘোষনা এবং মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার ঘোষণা, টাকার বিনিমেয়ে অথবা বিনা টাকায় জায়িয হবে কি-না? আর জায়িয হলে কিভাবে জানতে চাই।

জবাবঃ মসজিদের ওয়াকফকৃত মাইকের মাধ্যমে মসজিদের ভিতর অনুষ্ঠিত ধর্মীয় প্রোগ্রাম যথা-নামায, খুৎবা, ওয়ায-নসীহত, তাফসীর ইত্যাদির ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের ঘোষণা করার জন্য ব্যবহার জায়িয নয়। এমনিভাবে মসজিদের জায়নামায, ফ্যান ও অন্যান্য আসবাবপত্র দুনিয়াবী বা মসজিদের বাইরে ধর্মীয় কাজে যেমন, বয়ান, ওয়ায ইত্যাদিতে ব্যবহার করা জায়িয নয়। তবে মাইকের ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ করার সময় ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে মসজিদের বাইরের ধর্মীয় কাজে মাইক ব্যবহার করা জায়িয হবে। [প্রমাণঃ আদদুরুল মুখতার ৪:৪৩৩; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৪৬; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:১০৬]

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গা

জিজ্ঞাসাঃ একটি মসজিদ সৌন্দর্যের জন্য ভেঙ্গে একই প্লটে ৭/৮ হাত দুরে সরিয়ে উঠানো যাবে কি-না ?

জবাবঃ সৌন্দর্যের জন্য মসজিদ ভাঙ্গা বা স্থানান্তরিত করা জায়িয হবে না। মসজিদে মুসল্লীদের স্থান সংকুলান না হলে মসজিদ সম্প্রসারিত করা যায়। কিন্তু পুরাতন মসজিদ নষ্ট না হয়ে থাকলে তা ভেঙ্গে নষ্ট করা জায়িয হবে না। তবে মেরামত করা যাবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:১৪৫; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬:১৬৫; আল-বাহরুর রায়েক ৫:২৫১; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৫১]

মসজিদের কোণায় নির্মিত কামরায় স্ত্রীসহ বসবাস করা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের নির্মাণকালে উক্ত মসজিদের দ্বীতীয় তলায় এক পার্শ্বে মুআযযিন সাহেবের জন্য একটি কামরা নির্মাণ করা হয়। উক্ত কামরায় মুআযযিন সাহেবের জন্য স্ত্রীসহ বসাবাস করা জায়িয হবে কি?

জবাবঃ মসজিদ নির্মাণকালে অথবা মসজিদের ঘোষণা দিয়ে নিয়মিত নামায আরম্ভ করার আগেই যদি ইমাম ও মুআযযিনের থাকার জন্য অথবা মসজিদের অন্য কোন প্রয়োজনে মসজিদের ছাদের উপর কিংবা নীচে কোন কক্ষ নির্মাণ করা হয়, তবে প্রয়োজনবশতঃ এরূপ করার কোন অসুবিধা নেই। তবে উক্ত কামরা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন, কামরাবাসীর উযু-গোসলের প্রয়োজন মিটাতে মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে না হয়। আর কামরাও যেহেতু মসজিদের হুকুম বলবৎ থাকবে; সুতরাং সেখানে স্ত্রী সহবাস করা যাবে না তবে বসবাস করা যাবে। তেমনিভাবে যে সকল কাজ মসজিদে করা জায়িয নয়, যেমন, প্রসাব-প্রায়খানা ইত্যাদি, এগুলোও উক্ত কামরায় করা জায়িয হবে না। তবে, কামরা যদি মসজিদ থেকে পৃথক হয়, তাহলে সেখানে স্ত্রী সহবাস করাতে কোন অসুবিধা নেই ।

আর ওয়াকফকৃত স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর ছাদের উপর অথবা পুনঃনির্মাণকালে ছাদের উপর এ ধরণের কামরা বানানো জায়িয হবে না। কারণ, যেখানে শর'ঈ মসজিদ নির্মাণ করা হয়, উক্ত জায়গার নীচে বা উপরে সম্পূর্ণটা মসজিদের হুকুমে হয়ে যায়। সুতরাং, সেখানে মসজিদের প্রয়োজনে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে এ জাতীয় কামরা নির্মাণ করা জায়িয হবে না। [প্রমাণঃ আদদুরুল মুখতার ৪:৩৫৮; ফাতাওয়া শামী ১:৬৫৬; আযীযুল ফাতাওয়া ২১০; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৪৪]

মসজিদে ইমাম, মুয়াযযিনের বাসস্থান নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের মধ্যে ইমাম, মুয়াযযিনের জন্য বা ভাড়া দেয়ার রুম বানানো জায়িয আছে কি-না? অথবা যদি ইমাম মুয়াযযিন এর জন্য মসজিদের বারান্দায় রুম বানানো হয়, তা জায়িয হবে কি না?

জবাবঃ শর'ঈ মসজিদ বাননোর পর মসজিদের কোন অংশ ইমাম মুয়াযযিনের জন্য রুম করা বা ভাড়া দেওয়ার জন্য রুম করা জায়েয নয়। এরূপ উক্ত মসজিদের বারান্দা রুম করাও জায়িয হবে না। কেননা, প্রচলিত মসজিদ সমূহের বারান্দা মসজিদের মধ্যে শামিল ধরা হয়। সুতরাং তা অন্য কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা জায়িয নয়। তবে যদি মসজিদ বানানোর সময় ইমাম মুআযযিনের থাকার জন্য মসজিদ সংলগ্ন কোন রুম বানিয়ে থাকে, বা ভাড়া দেওয়ার নিয়্যতে রুম বানিয়ে থাকে, তাহলে তা জায়িয হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৩৮৫; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৩:১৬২]

সরকারী জায়গায় নির্মিত (কমিটি পরিচালিত) মসজিদের চৌহদ্দী নির্ধারণ

জিজ্ঞাসাঃ সরকারী জায়গায় নির্মিত কমিটি পরিচালিত কোন মসজিদের চৌহদ্দী নির্ধারণ করা এই মর্মে যে, এই চৌহদ্দীর ভিতরে যারা থাকে তারাই এই মসজিদের পরিচালনা পরিষদে থাকতে পারবে; এর বাইরের কোন লোক পরিচালনা পরিষদের থাকতে পাড়বে না। অথচ উক্ত চৌহদ্দীর বাইরের কোন লোক পরিচালনা পরিষদে থাকতে পারবে না। অথচ উক্ত চৌহদ্দীর বাইরে বহু লোক রয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে এই মসজিদের মুসল্লী ও দানকারী। উল্লেখ্য যে, এ চৌহদ্দী নির্ধারণের বৈধতা প্রসঙ্গে হারাম শরীফের বরাত দেয়া হয় যে, হারাম শরীফেরও তো চৌহদ্দী রয়েছে। এতদসম্পর্কে শরী'আতের সিদ্ধান্ত জানতে ইচ্ছুক। সরকারী জায়গায় নির্মিত মসজিদ, যার চতুর্দিকে পাড়া রয়েছে এবং সবদিক থেকেই ঐ মসজিদ লোকজন নামায আদায় করতে আসে। এমতাবস্থায় মসজিদের কোন এক দিকের পাড়ার লোকদের দাবী যে, এই মসজিদ আমাদের। কাজেই এই মসজিদের পরিচালনা পরিষদে সর্বদা আমরাই থাকবো। অথচ সকলে নিয়মিত নামাযী-ই নয়, আর যারা নামাযী তারাও সকলে নিয়মিত নামায পড়ে না তারা মসজিদের দান-খয়রাত, মাসিক অথবা এককালীন চাঁদা প্রদানে অনুৎসাহী। পক্ষান্তরে অন্য তিন পাড়ার লোকদের মধ্যে নিয়মিত মুসল্লীও বেশী এবং প্রকৃত দান খয়রাত তারাই করে থাকে। এই প্রেক্ষিতে ঐ এক পাড়ার লোকদের মসজিদের সত্বদখল ও পরিচালনা পরিষদে জোরপূর্বক থাকতে চাওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন?

জবাবঃ মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর, এর জন্য কোন সীমানা নির্ধারণ করা, পরিচালনাকে কেন্দ্র করেই হোক বা অন্য কোন জিনিসকে কেন্দ্র করেই হোক, শরী'আতে এর কোন প্রমাণ বা নযীর পাওয়া যায় না। কাজেই এমনটি করা গর্হিত হবে।

মসজিদ পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানের এমন কোন দখল নেই যে, বিশেষ স্থানের বা বিশেষ মহল্লার অধিবাসী হতে হবে। বরং এ ক্ষেত্রে গুণাবলীর দখল রয়েছে যেমন, আক্বীদাগতভাবে সঠিক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা যা প্রকৃতভাবে কুরআন-হাদীসের বর্ণিত আক্বীদা সেই আক্বীদা পোষনকারী হওয়া, দ্বীনদার, আমানতদার, শরী'আতের বিশেষতঃ সুন্নাতের পাবন্দ, আল্লাহভীরু ও পরিচালনার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি। কাজেই উক্ত গুণের অধীকারী লোকজন যে এলাকার বা যত দূরবর্তী এলাকার লোকই হোক না কেন, তারাই পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবে। পক্ষান্তরে যে সকল লোক ফাসিক, (যেমন নামাযে পাবন্দ নয় বা জামা'আতের পরওয়া করে না, দাড়ি মুন্ডায় ইত্যাদি) খিয়ানতকারী বিশেষ করে সুন্নাতের খিলাফ চাল-চলনে অভ্যস্ত তাদের জন্য মসজিদে এমনকি কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব বহন ভরা জায়িয নেই। চাই তারা মসজিদের অতি নিকটতম প্রতিবেশীই হোক না কেন।

মোটকথা, পরিচালনার জন্যে চৌহদ্দী নির্ধারণ শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রমাণিত নয়। হারাম শরীফের চৌহদ্দী নির্ধারণ, এটা তার পরিচালনার জন্য নয় বরং সেই এলাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। যার কারণেই সেখানে মারামারি, কাটাকাটি, শিকার করা, শত্রুর উপর আক্রমণ করা ইত্যাদি হারাম। এতদ্ব্যতীত হারাম শরীফের চৌহদ্দী জিব্রাঈল আ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা অন্য কোন মসজিদের জন্য প্রমাণিত নেই। এমনকি মসজিদে নববীরও হারাম শরীফের মত সেই পর্যায়ের চৌহদ্দী নির্ধারিত নেই। কাজেই বাইতুল্লাহ শরীফ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদকে হারাম শরীফের উপর কিয়াস করা দূরস্ত হবে না। যদি কেউ এরূপ করে, তবে তা শরী'আত পরিপন্থী হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না।

একক ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়াকফকৃত মসজিদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার ক্ষমতা ওয়াকফকারীর বা তার মনোনীত ব্যক্তির থাকতে পারে যা শর্তসাপেক্ষ। যেমন-ওয়াকফ করার সময় ওয়াকফনামায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং মুতাওয়াল্লির ভিতরে তাওলিয়তের যোগ্যতা থাকতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের তাওলিয়াত বা পরিচালনার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, বা খাস মহল্লাবাসীর জন্য ধরে রাখা, বিশেষ করে যদি তার বা তাদের ভিতরে মসজিদ পরিচালনা জন্য যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, সে গুণগুলো না পাওয়া যায় তাহলে কখনও তা জায়িয হবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ২খ.৪০৮পৃঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, ২খ. ৪৫২ পৃষ্ঠা]

মসজিদের আসবাবপত্র ঈদগাহে নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের মিম্বার, মুসাল্লা, মাইক, পাটি, চট ইত্যাদি ঈদগাহে নিয়ে ঈদের নামাযে ব্যবহার করা জায়িয আছে কিনা? বিস্তারিত জানাবেন।

জবাবঃ মসজিদের জিনিসপত্র যেমন, মাইক, নামাযের বিছানা, মিম্বার ইত্যাদি হচ্ছে মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত। আর ওয়াকফকৃত জিনিসে ব্যবহার সম্পর্কে শরী'আতের বিধান হচ্ছে যে, নির্দিষ্ট কোন খাতের ওয়াকফকৃত জিনিস অন্য খাতে ব্যবহার করা জায়িয নেই।

সুতরাং মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত বা মসজিদের ফান্ডের টাকায় খরীদকৃত মিম্বার, মুসাল্লা, মাইক, পাটি, চট, ইত্যাদি ঈদগাহে ব্যবহার করা জায়িয হবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৩৫৮-৩৫৯; ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া ৩:১৬৩; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪০৭; ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১০:১৯৪; আযীযুল ফাতাওয়া ৫৯২]

মসজিদের উযুখানার উপরে ফ্যামিলিসহ ইমাম সাহেবের বসবাস

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের উযু খানা বা দোতলায় উঠার সিড়ির উপর ইমাম সাহেবের সহপরিবারে বসবাস করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয কি না?

জবাবঃ মসজিদের উযু খানার উপরের কামরায় যা মসজিদ ঘরের সীমানার বাইরে ইমাম বা মুয়াযযিন সাহেবের সহপরিবারে বসবাস করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয আছে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন মুসল্লীদের কোন অসুবিধা না হয়। তেমনিভাবে মসজিদের দোতলার উঠার সিড়িটি ইমাম-মুয়াযযিন সাহেবের পরিবারের লোকেরাও ব্যবহার করতে পারবে। কারণ, সিড়ি সাধারণত মসজিদের সীমানার বাইরে থাকে।

তবে লক্ষ রাখতে হবে মহিলাদের পর্দা যেন ঠিক থাকে এবং ছোট বাচ্চাদের হৈ-চৈ এর কারণে যেন মুসল্লিদের কোন সমস্যা না হয়। তবে বিকল্প সিড়ি তৈরি করার সুযোগ থাকলে তৈরি করে নেয়া উত্তম। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ে শামী ৪:৩৮৫, ৩৭৭ ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া ৬:৪৯৫]

মসজিদে মিউজিক ঘড়ি ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের অনেক মসজিদে এমন দেয়াল ঘড়ি লাগানো হয়, যেগুলো গানের আওয়াজের মত আওয়াজ করে। তাতে মিউজিক বাজে। এমন ঘড়ি মসজিদে রাখা জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ ঘণ্টাযুক্ত ঘড়ি মসজিদে রাখার একমাএ উদ্দেশ্য হচ্ছে সময় মত নামায আদায় করা এবং নামাযের সঠিক সময় নির্ণয় করা। সে মতে ঘন্টাযুক্ত ঘড়ি দ্বারা সঠিক সময় নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে গান বাজনার আওয়াজ মসজিদে প্রবেশ করানো জায়িয নয়। এমন কোন কিছু যা নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট করে তা মসজিদে সংরক্ষণ জায়িয নয়। তাই তো ফুকাহায়েকিরাম মসজিদের ভিতর কিবলার দিকের দেয়ালে

সুন্দর কারুকার্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এতে নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। প্রশ্নে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্র যুক্ত ঘড়িটি পাল্টে সাধারণ ঘন্টাযুক্ত ঘড়ি লাগাতে হবে। নবী ﷺ তো বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি ইত্যাদি মিটানোর জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন। সেই বাদ্যযন্ত্র মসজিদের ভিতরে বা কোন মুসলমানের ঘরের ভিতরে রাখা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এসবই বিধর্মীদের ষড়যন্ত্র। মুসলমানদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে দুর সরানোর জন্য এভাবে একটা করে বিভিন্ন ফন্দি তারা পেশ করছে। আর মুসলমানরা সেগুলোকে বিনা দ্বীধায় গ্রহণ করেছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৭৯৯; ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া ৬:১৩১; আযীযুল ফাতাওয়া ৭৯৪]

মসজিদে মোবাইল ফোন নিয়ে যাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদে মোবাইল ফোন নিয়ে নামায পড়তে গেলে অনেক সময় হঠাৎ করে বেজে উঠে। তা নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করে। আবার কখনো ঘড়ি উচ্চ আউয়াজে সময় সংকেত দেয়। প্রশ্ন হল, এসব মোবাইল বা এলার্ম ঘড়ি নিয়ে মসজিদে জামা'আতে নামায পড়া কেমন হবে?

জবাবঃ মসজিদে প্রবেশের আগেই মোবাইল সেট বন্ধ করে নেয়া কর্তব্য। নামাযের আগে যদি কখনো বন্ধ করতে মনে না থাকে সেক্ষেত্রে নামাযে হঠাৎ বেজে উঠলে যদি এক হাতে অল্প সময়ে বন্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে তা বন্ধ করে নেয়া উচিত। দীর্ঘ এলার্মযুক্ত ঘড়ির এলার্মও বন্ধ করা সম্ভব হলে তা বন্ধ করে নেওয়া উচিত।

কা'বা শরীফ বা মাজারের ছবি অংকিত পাথর মেহরাবে লাগানো।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার জামে মসজিদের মেহরাবের মাঝে এমন কতগুলো পাথর লাগানো হয়েছে, সে সকল পাথরের মধ্যে কা'বা

শরীফের, বড় পীর সাহেবের ও খাজা মঈনুদ্দীন সাহেবের মাজারের ছবি অংকিত। এ জাতীয় পাথর মসজিদের মেহরাবে লাগানো ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গিতে জায়িয হয়েছে কিনা?

জবাবঃ মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হলো, নামায আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির করা ইত্যাদি। যদি মসজিদের মেহরাব তথা সামনের অংশ এমন কারুকার্য বা ছবি অংকিত থাকে, যার দিকে নামাযীর দৃষ্টি পড়বে এবং খুশু-খুজু নষ্ট হবে তাহলে উক্ত কারুকার্য বা নকশা অংকন করা, মসজিদে নির্মাণের আদব পরিপন্থী এবং মাকরূহ কাজ বলে বিবেচিত হবে। এছাড়া হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মসজিদ সুসজ্জিত করা এবং খুব শানদার করা কিয়ামতের আলামত সমূহের একটি। [প্রমাণঃ ফাতাহুল কাদীর ১:৩৬৮]

প্রশ্নে উল্লেখিত আপনাদের মসজিদ মেহরাবে কা'বা ঘরের ছবি ও খাজা সাহেবের মাজারের ছবি অংকিত পাথর লাগানো মাকরূহ হয়েছে। [প্রমাণঃ আদদুরুল মুখতার ১:৬৫৮; কিফাতুল মুফতী ৩:১৪০; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:১৬৯; নাফউল মুফতী ৩৬৮]

বেতন বিহীন ইমামের মসজিদের জমি থেকে ফসল গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে একটা মসজিদ আছে। মসজিদে নির্ধারিত ইমাম আছে। ইমাম সাহেবের জন্য কোন নির্দিষ্ট বেতন নেই। কিন্তু মসজিদের নিজস্ব কিছু জমি আছে, ঐ জমি ইমাম সাহেব চাষ করেন এবং তা থেকে উৎপন্ন ফসল ইমাম সাহেব গ্রহন করেন। এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয কিনা?

জবাবঃ মসজিদের কমিটি ও মুতাওয়াল্লীর পরামর্শ অনুযায়ী ইমাম সাহেব মসজিদের জমিতে ফসলাদি চাষ করে নিতে পারবেন। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ২: ৪৬১; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:৮১]

سئل الفقيه ابو القاسم عن قيم مسجد جعله القاضي قيما على غلاتها وجعل له شيئا معلومًا ما ياخذه كل سنة حل له الاخذ ان كان مقدار اجر مثله كذا في المحيط. (عالمغيري /)

মসজিদে মুর্দারের খালি খাট রাখা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের বারান্দায় মুর্দারের খালি খাট রাখা জায়িয আছে কি না?

জবাবঃ খাট যদি পবিত্র হয়, তবে তা মসজিদে রাখা জায়িয আছে। কিন্তু খাট রাখার দরুন যদি মসজিদে ময়লা আবর্জনা জমে যায় বা মুসল্লীদের চলাফেরা করতে, নামায পড়তে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, তাহলে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন সংরক্ষিত জায়গায় রাখবে। অথবা মসজিদের আড়ের উপর টাঙ্গিয়ে রাখতে পারে। [প্রমাণঃ খাইরুল ফাতাওয়া ২:৭৩৯]

মসজিদে খতম পড়ানো

জিজ্ঞাসা: দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মসজিদে খতম পড়ানো জায়িয হবে কি?

জবাব: হ্যাঁ, জায়িজ আছে। কেননা, খতম যে উদ্দেশেই পড়া হোক না কেন, যেহেতু কুরআন তিলাওয়াত, এটা যিকির ও ইবাদতের মধ্যে শামিল, আর মসজিদ তো যিকির ও ইবাদতের জন্যই নির্ধারিত। তবে পয়সার বিনিময়ে পড়া হলে এরূপ খতম মসজিদে না পড়া উচিত।

মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার সাওয়াব

জিজ্ঞাসা: মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং এর আশ-পাশ পরিষ্কার করে রাখাতে সাওয়াব কতটুকু?

জবাব: মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর। আল্লাহ তা'আলা নিজেই হিফাজত করেন। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু দারুল আসবাব, তাই আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের দ্বারা এর হিফাজত করান এবং এর দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষাও নেয়া হয়ে থাকে।

অতএব, আল্লাহর ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ঝাঁড়ু দেয়া এগুলো আল্লাহর ঘর আবাদ করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ঘর যারা আবাদ করে, তাদের প্রসংগে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর (ঘর) মসজিদ আবাদ করবে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে তারা ভয় করে না। আশা করা যায় তারা হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা তাওবাঃ ১৮]

তিরমিযী শরীফে ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, যদি তোমরা কাউকে এমন দেখ যে, সে মসজিদের খবরগীরী এবং দেখাশুনার ব্যবস্থা নিতে থাকে, তার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন, আল্লাহের মসজিদ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. শরহে মিশকাত লিখেন, মসজিদ

আবাদ করার ব্যাখ্যা হল, (১) মসজিদ হিফাজত করা (২) মসজিদ ঝাড়ু দেয়া ও (৩) ইবাদত করা ।

সুতরাং, মসজিদ ঝাড়ু দেয়া আল্লাহর ঘর আবাদ করার শামীল। আল্লাহর ঘর আবাদকারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার ইমানের কথা ঘোষণা করেছেন এবং রাসূল ﷺ তার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য বলেছেন। আর ঈমানের চেয়ে বড় ফজিলতের জিনিস কি হতে পারে? [প্রমাণঃ মা আরিফুল কুরআন, ৪:৩৩১]

মসজিদে মান্নতের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ অনেক সময় লোকেরা মসজিদে মান্নত করে। যেমন বলে, আমার ওমুক কাজ সমাধা হলে মসজিদে একটি বকরী দিব। এসব জানোয়ারের বিক্রিত অর্থ মসজিদের কাজে লাগানো জায়িয হবে কি-না? আর যদি জায়িয না হয় তাহলে উক্ত টাকা পাওয়ার যোগ্য কে? যদি মসজিদের ইমাম-মুয়াযযিন গরীব হয়, তাহলে তারা কি এ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে?

জবাবঃ মসজিদের নামে কোন কিছুর মান্নত হয় না। কারণ, মান্নতের টাকা সেসব খাতে ব্যয় করতে হয়, যে সব খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়। আর মসজিদে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যায় না। তাই মসজিদের নামে মান্নত সহীহ হয় না। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ মসজিদে মান্নত করে তাহলে তা পুরণ করা জরুরী নয়। তারপরও যদি কেউ আদায় করে তাহলে সেই মাল নফল দান হিসেবে গণ্য হবে এবং সেসব জিনিস বিক্রি করে টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা যাবে। আর উক্ত টাকা দ্বারা ইমাম-মুয়াযযিনের বেতনও দেয়া যায়। কিন্তু সরাসরি ইমাম-মুয়াযযিনকে দেওয়া যাবে না। [প্রমাণঃ দারুল উলূম ১২:১২৯; রদ্দুল মুহতাব ৩:৭৩৫]

বলপূর্বক অন্যের জমিনে মসজিদে নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় বহু এলাকায় বহু পুরাতন একটি মসজিদ রয়েছে। বর্তমানে উক্ত মসজিদটির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। দক্ষিণ পার্শ্বে মসজিদের নিজস্ব জমি থাকা সত্ত্বেও মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদের উত্তর পার্শ্বে আমার পৈত্রিক ভিটা বাড়ির চৌহদ্দীর ভিতরে মসজিদ ঘরের সম্প্রসারণ করতে চায়। কিন্তু এতে আমি অস্বীকৃতি জানাই। এখন প্রশ্ন হল, জোরপূর্বক আমার বাড়ির চৌহদ্দীর ভিতর মসজিদ নির্মাণ করা বা সম্প্রসারণ করা জায়িয হবে কি-না এবং কর্তৃপক্ষের বলপূর্বক অন্যের জমিনে মসজিদ সম্প্রসারণ কতটুকু শরী'আত সম্মত?

জবাবঃ কারো মালিকানাধীন জমিনে অন্যদের জন্য জোরপূর্বক মসজিদ নির্মাণ করা জায়িয নয়। মসজিদ নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করতে হলে, তার জন্য নির্ভেজাল জমি মসজিদের নামে ওয়াকফ হওয়া জরুরী। আল্লাহর জমিন অত্যন্ত প্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহর ঘড় তৈরি বা সম্প্রসারণের নামে অন্যের জমি জবর দখল মারাত্মক জুলুম এবং হারাম। অতএব, আপনার সন্তুষ্টি ব্যতীত সেখানে মসজিদ সম্পসারণ সম্পূর্ণ অবৈধ হবে। অন্যের জমিনে মসজিদ তৈরি করলে, তা শরী'আতের দৃষ্টিতে মসজিদ বলেই গণ্য হবে না। এবং তার উপর মসজিদের কোন হুকুমও বর্তাবে না। এইরূপে মসজিদে নামায পড়াও মাকরূহ তাহরীমী হবে।

তবে হ্যাঁ, মসজিদের মুসল্লী যদি বেশী হয় এবং মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য মসজিদ সংলগ্ন মসজিদের অন্য কোন নিজস্ব জমি না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী লোকের থেকে ন্যায্য মূল্য প্রদান করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদের জন্য জমি নিতে চাইলে, জমির মালিকের কর্তব্য-তা মেনে নিয়ে জমি দিয়ে দেয়া এবং উক্ত জমির টাকা দিয়ে অন্যত্র নিজের

জমি করে নেয়া। আল্লাহর ঘরের স্বার্থে এটা তার ঈমানী দ্বায়িত্ব বটে এবং এতে সে অনেক সাওয়াবও লাভ করবে।

এক্ষেত্রে যদি জমির মালিক অযথাই জমি দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে প্রয়োজন পরিমাণ জমি বিক্রয়ে তাকে বাধ্য করা যাবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৩৪১; আপকে মাসাইল আওর হল ১৮৫; ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১:১৭৫]

মসজিদের পরিত্যক্ত কুরআন শরীফ বিক্রয় করা

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে মসজিদ বা মাদরাসায় দান বা মান্নতের জিনিস বা কুরআন শরীফ দিয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন শরীফ পড়ার লোক কম, তাই তা শুধু মসজিদে পড়ে থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত জিনিস বা কুরআন শরীফ বিক্রি করে মসজিদের কাজে ব্যবহার করা জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ মসজিদের জন্য মান্নত হয় না। কারণ মান্নতের জিনিস ঐ সমস্ত খাতে ব্যয় করতে হয় যে, যে সকল খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা চলে। আর মসজিদে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যায় না। তাই মসজিদের নামে মান্নত সহীহ হবে না। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি মসজিদের নামে মান্নত করে, তবে তা পূরণ করা জরুরী নয়। তার পরেও যদি কেউ দিয়েই দেয়, যেমন নগদ টাকা পয়সা, লাউ মুরগী, ইত্যাদি তাহলে সেই মাল বিক্রি করে সেই টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা যাবে। কারণ সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হয়েছে। মান্নত সাব্যস্ত হয়নি। তবে পায়েশ, বিস্কুট বাতাসা ইত্যাদি যা গরীব মুসাল্লীদের খাওয়ানোর জন্য মান্নত মানে, তা সহীহ আছে। কারণ এক্ষেত্রে মসজিদের নামে উল্লেখ করলেও মসজিদ উদ্দেশ্য থাকে না বরং মুসল্লীরা উদ্দেশ্য থাকে।

লোকজন মসজিদে যে সমস্ত কুরআন শরীফ দেয়, তা সাধারণতঃ মসজিদের মুসল্লীদের পড়ার জন্য মসজিদে ওয়াকফ করে থাকে। আর ওয়াকফকৃত জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। সুতরাং তা বিক্রি করা জায়িয হবে না। তবে অন্য কোন মসজিদে প্রয়োজন পড়লে, সেখানে দেওয়া জায়িয হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৩৯৬; ৩৬০ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:৭৭; ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১২৯; ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১:১৮৪; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৬৭১]

মসজিদে হারিকেন জ্বালানো

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদে হারিকেন জ্বালানোর যায় কিনা?

জবাবঃ মসজিদের মধ্যে হারিকেন জ্বালানোর মাকরূহে তাহরীমী। কেননা-কেরোসীন তৈল দুর্গন্ধ থাকে। আর প্রতিটি দুর্গন্ধ জিনিস মসজিদে আনা নিষেধ। এতে ফেরেস্তাগণের কষ্ট হয়। এ জন্য তো হাদীসে শরীফে কাঁচা পিয়াজ, কাচা রসুন খেয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর না করে মসজিদে আসতে নিজেধ করা হয়েছে। হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, খাওয়া মাকরূহ এবং এগুলো খেয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর না করে মসজিদে আসাও মাকরূহে তাহরীমী। তাই মসজিদের বাহিরে দেয়ালে হারিকেন রাখবে যাতে জানালার মধ্যে দিয়ে আলো মসজিদে পৌঁছে।

মসজিদের জায়গায় লাগানো গাছের ফল খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের জায়গায় লাগানো গাছের ফল ইমাম, মুয়াযযিন কিম্বা সভাপতি, সেক্রেটারির জন্য বিনামূল্য খাওয়া জায়িয কিনা? উল্লেখ্য যে, গাছের ফল দেখা শুনা করেন ইমাম ও মুয়াযযিন সাহেব। সঠিক মাসাআলা জানলে খুশি হব।

জবাবঃ মসজিদের জায়গায় যিনি গাছ লাগিয়েছেন তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তিনি কোন নিয়্যতে গাছ লাগিয়েছেন। যদি তিনি নিজের জন্য লাগিয়ে থাকেন, তাহলে তার অনুমতি ছাড়া কারো জন্য উক্ত গাছের ফল খাওয়া জায়িয হবে না। আর যদি সর্ব সাধারণের জন্য উক্ত গাছ লাগিয়ে থাকেন তাহলে সকলের জন্যই খাওয়া জায়িয হবে। আর যদি মসজিদের জন্য লাগানো অথবা যদি উদ্দেশ্য জানা না থাকে, বা মসজিদের অর্থ ব্যয় করে লাগানো হয়ে থাকে তাহলে ঐ ফল বিক্রি করে টাকা মসজিদের কাজে খরচ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কারোর জন্য তা খাওয়া জায়িয হবে না ।

উল্লেখ্য যে, যদি গাছ নিজের জন্য বা সর্ব সাধারণের জন্য লাগানো হয় তাহলে মসজিদ কমিটির এই অধিকার আছে যে, তার যে,তারা যে কোন মুহূর্তে গাছ কেটে ফেলতে পারেন। [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৪:৪৩২; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৬১১; আজীজুল ফাতাওয়া ২০৪]

মসজিদের ভিতর উচ্চস্বরে সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মসজিদে ফজর নামাযের বাদ ইমাম সাহেব সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত বা অন্য কোন ছোট সূরা পাঠ করেন। আর উপস্থিত মুসল্লীরা ইমাম সাহেবের সাথে জোরে জোরে পড়তে থাকেন। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা সঠিক হচ্ছে কি?

জবাবঃ সকালে ও বিকালে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করার অনেক ফজীলত হাদীস শরীফের বর্ণানা করা হয়েছে। অনুরূপ আরো বিভিন্ন সূরা, দু'আ ও যিকর আযকার করারও উল্লেখ্য রয়েছে।

কিন্তু এগুলো ব্যক্তিগত ওজীফা বলে পরিগণিত। সুতরাং সকলে এক সাথে ও একই সুরে তাল মিলিয়ে পড়ার কোন প্রমাণ নেই ।

তবে যে সমস্ত মুসল্লীরা মুখস্ত পড়তে জানে না, তাদেরকে নিয়ে সাময়িক কিছু দিন পর্যন্ত এক সাথে পড়া যেতে পারে। আর যাদের মুখস্ত আছে, তারা নিজ নিজেই পড়বে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সকলে মিলে জোরে পড়লে এটা শোরগালের আওতার পড়বে না এবং তখন যাতে কারো নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদি কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরী। [প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ২:১২০; মিশকাত শরীফ ১৮৮; তাফসীরে মাযহারী ৯:২৫৭; আলমগীরী ৫: ৩১৭; ইমদাদুল আহকাম, ১:২৪২]

মসজিদে ছবি বিশিষ্ট ঘড়ি রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামের কাছেই একটি গ্রামের মসজিদের মিম্বারের দক্ষিণে একটি দেয়াল ঘড়ি ঝুলানো আছে। ঘড়ির ডায়ালে ১২ টি ঘরে হজ্জ সম্পর্কিত ১২ টি ছবি আছে। তম্মধ্যে একটি হাজরে আসওয়াত চুম্বনরত মুখ সহ মানুষের মাথাটুকু পরিষ্কার দেখা যায়। আবার কোন অভিজাত শ্রেণীর বাসার শো কেসে বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি বা পুতুল, আবার দেয়ালে কাঁচে বাঁধানো কোনো পূর্ব পুরুষ কিংবা গৃহকর্তার নিজেরই বা সন্তানাদির ছবি ঝুলানো থাকে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এসবের হুকুম কি? এরূপ ছবি লটকানো বা মূর্তি রাখা ঘরে নামায শুদ্ধ হবে কিনা?

জবাবঃ প্রানীর ছবি অথবা মূর্তি বানানো বা ঘরে রাখা হারাম ও নাজায়িয। বর্তমানে আভিজাত্যের দাবীদার অধিকাংশ লোকদের ড্রইংরুমে এ ধরণের ছবি ও মূর্তি দেখা যায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রাণীর ছবি বা মূর্তি রাখা হারাম। ছবি বা মূর্তি রাখা ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না বলে হাদীসে রয়েছে। আর রহমতের ফেরেশতা ঘরে

প্রবেশ না করলে, সে ঘরে বরকত ও দ্বীনদারী থাকে না। সুতরাং নিজের বা পরলোকগত কোন মুরব্বীর অথবা ছেলেমেয়েদের ছবি লটকিয়ে রাখা বা কোন প্রাণীর ছবি যুক্ত ক্যালেণ্ডার রাখা অথবা গ্লাসে বাঁধাই করে সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম।

তবে প্রাণী ব্যতিত অন্য কোন জিনিসের ছবি তোলা বা ঘরে লটকিয়ে রাখা জায়িয আছে। যেমন, গাছ-পালা, ফুল-ফল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদি প্রানহীন বস্তুর ছবি। যে রুমে প্রানীর মূর্তি লটকানো থাকে বা গ্লাসে বাঁধাই করা থাকে অথবা শো কেসে কোন প্রাণীর মূর্তি থাকে, উক্ত ঘরো নামায আদায় করা মাকরূহ তাহরীমী। চাই সে ছবি সামনে, উপরে, ডানে, বামে বা যে কোন পার্শ্বেই হোক, সর্ব অবস্থায় মাকরুহে তাহরীমী হবে। তবে সরাসরি নামাযীর সামনে ছবি লটকানো থাকাটা অধিকতর মাকরূহ।

প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদে লটকানো ঘড়ির হাজরে আসওয়াত চুম্বনরত ছবির হুকুম এই যে, যেসব ছবির মাথা কাটা বা মোছা কিংবা মাথা ও চেহারার অঙ্গসমূহ অস্পষ্ট, অথবা মাথার পিছনের দিক দিয়ে ছবি নেয়া হয়েছে, সে সব ছবি অন্য কোন জায়িয ছবির সাথে চিহ্নিত হয়ে গেলে, তা ঘরে রাখা বা ব্যবহার করাও জায়িয আছে। পক্ষান্তরে যদি মাথা এবং চেহারার অঙ্গসমূহ স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং সেটা স্পষ্ট মানুষের ছবি বলে বুঝা যায়, তাহলে সে ছবি অন্য কোন জায়িয ছবির সাথেও ঘরে বা মসজিদে রাখা নাজায়িয। সুতরাং হাজরে আসওয়াত চুম্বনরত ছবি যদি স্পষ্ট ছবির আওতায় পড়ে, তাহলে তা মসজিদে লটকিয়ে রাখা জায়িয হবে না। আর যদি অস্পষ্ট ছবি হয়, যার চেহারার গঠন স্পষ্ঠভাবে বুঝা যায় না, তাহলে সেটা জায়িযের আওতায় পড়বে।

চেহারা স্পষ্ট ও অস্পষ্টের ব্যাখ্যা এই যে, এমন ছোট ছবি যা জমিনের উপর রাখা থাকলে, মধ্যম ধরণের চোখের জ্যোতি সম্পন্ন ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থার তার চেহারার অঙ্গসমূহ তথা চোখ, কান, নাক, ইত্যাদি স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না, তাই অস্পষ্ট ছবি। আর যদি চেহারার অঙ্গ সমূহ পরিষ্কার দেখা যায়, তাহলে সেটা স্পষ্ট ছবি। প্রমাণঃ বাদায়িয়ুস সানায়ি ১:১১৬; ইমদাদুল মুফতীয়ান ৯৩৩; জাওয়াহিরুল ফিক্বহ ৩:২৩৩]

মসজিদে কা'বার ছবি

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের ভিতরের কা'বা শরীফের ফটো রাখা হয়েছে; কিন্তু তাতে অনেক মানুষের ছবিও দেখা যায়। এমতাবস্থায় সে কা'বা শরীফের ছবি মসজিদের ভিতর রাখা ঠিক কিনা?

জবাবঃ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শরী'আত কাউকে কোন প্রাণীর ছবি আঁকা'বা যন্ত্র দিয়ে ছবি উঠানোর অনুমতি দেয়নি। আর কোথায়ও বাইতুল্লাহ শরীফের ফটো রাখার কোন ফজীলতও কুরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়নি। মুসলমানদের ঐতিহ্য হিসাবে কেউ রাখতে চাইলে তা রাখতে পারে। তবে তার জন্য শর্ত হল সে মসজিদের ছবিতে প্রাণীর স্পষ্ট কোন ছবি থাকতে পারে না। প্রশ্নোক্ত কা'বা শরীফের ফটোর সাথে যে সমস্ত মানুষের ছবি রয়েছে সেগুলি যদি এমন ছোট বা অস্পষ্ট হয় যে, কোন দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের সামনে সে ফটোগুলো জমিনে রেখে দিলে সে সোজা হয় যে, কোন দৃষ্টিতে সে ছবিগুলির নাক, কান ইত্যাদিসহ বিস্তারিত আকৃতি দেখতে পারে না অথবা যদি উক্ত ছবিগুলো মানুষের পিছন দিক থেকে উঠানো থাকে কিংবা সেগুলোর মাথা মোছা থাকে, তাহলে এরূপ ছবিযুক্ত কা'বা শরীফের ফটো ঘরে বা মসজিদে টাঙ্গিয়ে রাখা জায়িয আছে। অন্যথায় নয়। তবে কোন একান্ত অপরাগতা ছাড়া কোন প্রাণীর ছবি তোলা সর্বাবস্থায় নাজায়িয এ হারাম।

উল্লেখ্য, জায়িযের সুরতে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালে কোন চিত্র না ঝুলানোই ভাল। একান্ত ঝুলাতে হলে একটু উপরে ঝুলারনা যেতে পারে যেন মুসল্লীদের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে না আসে। কেননা, এতে নামাজের একাগ্রতা নষ্ট হয়। [প্রমাণঃ বাদায়িউস সানায়ি ১:১১৫; তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ১৫৫,১৫৯ জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩:২০১ ও ২০৮]

মিম্বারের তাকে কুরআন শরীফের বা ধর্মীয় পুস্তকাদি রাখা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের মিম্বরে কুরআন শরীফ, তাবলীগী নিসাব ও ধর্মীয় পুস্তকাদি রাখা ঠিক কিনা?

জবাবঃ মসজিদে খুৎবাহ দানের যে মিম্বার থাকে, তার উপর ইমাম সাহেব বসা থাকা অবস্থায় উক্ত মিম্বারের কোন তাকেই কুরআন মাজীদ বা অন্য কোন দ্বীনী পুস্তকাদি রাখা জায়িয হবে না। কেননা, এ সুরতে হয়তো কুরআন কারীম ইমাম সাহেবের পিছনে থাকবে বা বসার জায়গার নীচে থাকবে, যা কুরআনকে মারাত্মকভাবে বে-হুরমতী করার নামান্তর।

এমনিভাবে ইমাম সাহেব উক্ত মিম্বারে বসা না থাকা অবস্থায়ও কুরআন কারীম ও দ্বীনী পুস্তকাদি মিম্বারের সিঁড়ির উপর রাখা আদবের খেলাফ। কারণ সিঁড়িতে বসা হয় এবং পা রাখা হয়। সুতরাং, সেখানে (মিম্বারে) সরাসরিভাবে কুরআন-কিতাব রাখা বে-হুরমতির কাজ। তবে মিম্বারের উপরের তাকে যেখানে কুরআন মাজীদ ও দ্বীনী পুস্তকাদি রাখাও হয়, উক্ত স্থানে কুরআন-কিতাবে রাখতে কোন অসুবিধা নেই। আর এটাকে উরফ তথা লোক সমাজে খেলাফ আদব মনে করা হয় না। সুতরাং প্রয়োজনে উক্ত কুরআন শরীফ ও দ্বীনী পুস্তকাদি রাখা জায়িয হবে। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদের পূর্ণ আদব রক্ষার্থে আলাদাভাবে রাখার

জন্য কোন ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্য মসজিদ কর্তৃপক্ষের দ্বায়িত্ব হলো কুরআন কারীম ও দ্বীনী পুস্তাকাদি রাখার জন্য ভিন্নভাবে কোন ব্যবস্থা করা, যেন কুরআনের পূর্ণ আদব রক্ষা পায়। [প্রমাণঃ সূরা হজ্জ আয়াত নং ৩২; ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫:৩২৩; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৬২২; আগলাতুল আওয়াম ৭৬-৭৭]

মসজিদে তালীম করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মহল্লার জামে মসজিদে মুসল্লীদের ইশার নামাযের পর বেতের/নফল নামায পড়া অবস্থায় তাবলীগের সমর্থক মুসল্লীগণ মূল মসজিদের মধ্যস্থলে কিতাবী তালীম আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় যাদের নামায বাকী থাকে, তারা বারান্দায় গিয়ে বাকী নামায আদায় করেন। এহেন অবস্থায় জনৈক মাওলানা সাহেব সূরা বাকারার ১১৪ নং আয়াতের উল্লেখ্য করে তাবলীগী ভাইদেরকে এমনি পরিস্থিতিতে মসজিদে তালীমের কাজ না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা সে নির্দেশ মানেন নি। বরং এমনিভাবে বেতের/নফল চলাকালীন সময়ে মূল মসজিদের ভিতর নামাযরত মুসল্লীগণের অসুবিধা করে তালীমের কাজ চালিয়ে আসছেন। এখন প্রশ্ন হল,

১) মসজিদের বারান্দা থাকা অবস্থায় মূল মসজিদে তালীমের কাজ চলতে পারে কি না?

২) সূরা বাকারার ১১৪ নং আয়াতের হিদায়াত এ পর্যায় প্রযোজ্য কিনা?

জবাবঃ মসজিদে বয়ান করা, তালীম করার প্রচলন রাসূল ﷺ থেকেই পাওয়া যায়। মসজিদে যেমনভাবে নামায পড়ার কথা আছে, তেমনিভাবে তালীম করার কথাও আছে। তবে তালীমের কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন এতে মুসল্লীগনের নামাযের ব্যাঘাত না ঘটে।

মসজিদের বারান্দা থাকলে, বারান্দায় তালীম করার ব্যবস্থা নিলে, সেটাই উত্তম। এতে মসজিদের ভিতরের নামাযীগন ইচ্ছামত নামায পড়তে পারবেন। আর তালীমও যথাসময় শুরু করতে সহজ হবে। অবশ্য যদি মসজিদের ভিতরের তালীম হতে পারে। সে ক্ষেত্রে যদি দু'একজন মুসল্লী ইজতিমায়ী আমলে না বসে নফল পড়তে চায়, তাহলে উচিত মসজিদের বারান্দার বা নিজের বাসস্থানে গিয়ে নফল উত্তম। অবশ্য তাদের উচিত-ইজতিমায়ী আমলের সময় তার মধ্যে শরীক হওয়া। কারণ, শরী'আতে ইজতিমায়ী আমলের গুরুত্ব অত্যাদিক।

সূরা বাকারার ১১৪ নং আয়াতের তাফসীরে প্রসঙ্গে মুফতী শফী রহ. বলছেন, মসজিদে যিকির ও নামাযে বাধা দেওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত করার যত পন্থা হতে পারে, তার সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা, দ্বীতীয়তঃ মসজিদে হট্টগোল করা যাতে মুসল্লীদের ইবাদতে অসুবিধা হয়। এমনিভাবে ইত্যাদিতে নামাযীদের নামায বিঘ্ন সৃষ্টি করা বাধাদানের নামান্তর। তাই উপরে বর্ণিত সুরতের উপর আমল করলে, সব সমস্যারই সহজ সমাধান হয়ে যায়। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬৬০; তাফসীরে মা'আরীফুল কুরআন ১:২৪১/৪২]

মসজিদের জন্য ধর্ম মন্ত্রালয়ের অনুদান গ্রহণ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে আর্থিক অনুধান প্রদান করা হয়। এ অর্থ মসজিদ ফান্ডে গ্রহণ করা জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় মসজিদসমূহের যে অর্থ প্রদান করা হয়, তা মসজিদে কমিটি বা মুতাওয়াল্লীর জন্য গ্রহণ করা এবং তা মসজিদে যে কোন উন্নতির কাজে ব্যবহার করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয হবে। কারণ - এ অর্থটা রাষ্ট্রের সম্পদ। আর রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় যে কোন উন্নতির কাজে বৈধ পন্ধায় ব্যবহার করা যায়। কাজেই উক্ত টাকা হারাম বা নাজায়িয হওয়ার কোন কারণ নেই। শুধু সন্দেহের কারণে কোন অর্থ সম্পদকে হারাম ফাতাওয়া দেয়া যায় না। হাদীসে শরীফ বিনা দলীল খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের টাকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আপনার নিকটে কোন দলীল থাকলে, তা পেশ করতে পারেন। তখন আমরা যাঁচাই করে সিদ্ধান্ত দেবো। হিজরী ১৭ (সতের) সনে ২য় খলীফা হযরত উমর রা. মসজিদে নব্বী ﷺ কে রাজকোষের টাকা দ্বারা বাড়িয়েছেন। এমনিভাবে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রা. হিজরী ২৬ সনে রাজকোষের টাকা দ্বারা কিছু জমিন ক্রয় করে মসজিদে হারাম (বাইতুল্লাহ শরীফ) সম্প্রসারণ করেছেন। [প্রমাণঃ তারীখুল খুলাফা (উর্দু) ১৬৭,১৯৭]

মসজিদে পত্রিকা পড়া ও রেডিও শ্রবণ

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদে রেডিও নিয়ে গিয়ে শ্রবন করা জায়িয আছে কিনা?

জবাবঃ পবিত্র মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের স্থান। দুনিয়াবী কোন আলোচনা মসজিদে জায়িয নয়। এ কারণে মসজিদের ভিতরে বসে রেডিওর খবর শুনা জায়িয হবে না। তাছাড়া বর্তমানে খবরের আগে ও পরে রেডিওতে গান বাজনা পরিবেশিত হয়। তেমনিভাবে দ্বীনী নয়, তেমন সব দুনিয়াবী পত্রিকাও মসজিদে নিয়ে পড়া নিষেধ। বিশেষতঃ ছবিওয়ালা পত্রিকা

মসজিদে নেয়া খুবই অন্যায়। [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১:৬৬০; আদাবুল মাসজিদ (মুফতী শফী র.) পৃঃ ৩৮]

মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা

জিজ্ঞাসাঃ অনেক সময় মসজিদসমূহের বিভিন্ন রকম দুনিয়াবী আলোচনাও করা হয়। এখন জানতে চাই যে উপরোক্ত কাজসমূহ মসজিদে বৈধ কিনা?

জবাবঃ মসজিদে কেবল ইবাদত বন্দেগী এবং দ্বীনী কাজের জন্য। ইবাদত বন্দেগী ছাড়া সেখানে অন্য কোন কাজ করা কিংবা অনর্থক কথা বার্তা বলা নাজায়িয। তবে মসজিদে ইবাদতে-বন্দেগীতে উদ্দেশ্য প্রবেশ করার পর প্রয়োজনে মসজিদের আদব ঠিক রাখা, দুনিয়াবী জরুরী অল্প কথা বার্তা জায়িয আছে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬৬২; ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫:৩১২; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৫৬; আযীযুল ফাতাওয়া ১:২১২]

وكره تحريما والكلام المباح وقيدة في الظهيريه بان يجلس لأجله تحت قوله بان يجلس لاجله فانه حينئذ لايباح بالاتفاق وفي صلاة الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وان كان الأولى أن كر الله تعالى (الشامي (//

কা’বা শরীফের ছবি সম্বলিত জায়নামায ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ প্রায় প্রত্যেকটি মসজিদেরই ইমাম সাহেব, মুয়াযযিন সাহেব ও নিদিষ্ট কয়েকজনের জন্য কয়েকটি জায়নামায সার্বক্ষণিকভাবে বিছানো থাকে। উক্ত জায়নামায সমূহে কা’বা শরীফের ছবি আছে। ইমাম সাহেব, মুয়াযযিন সাহেবসহ মসল্লীগন নির্দ্বিধায় উক্ত জায়নামাযে এবং কা’বা

শরীফের ছবির উপর পা রেখে হাটা চলা করেছেন, কোন সতর্কতা নেই, কোন আফসোস নেই। ধর্মীয় বিধানে এর ফয়সালা কি?

জবাবঃ মুয়াযযিন বা অন্য কোন মুসল্লীর জন্য এইভাবে জায়নামায বিছিয়ে রেখে জায়গা দখল করা ঠিক নয়। কারণ- মসজিদ আল্লাহর ঘর, এখানে বাদশাহ/ফকির সকলের সমান অধিকার। যে আগে পৌঁছবে সেই ইমামের পিছনের সামনের কাতারে জায়গা পাবে। জায়নামায বিছিয়ে মুসল্লীদের অধিকার খর্ব করার অধিকার কারো নেই।

কা'বা ঘর ও মসজিদে নববীর ﷺ ছবির উপর পা রাখা অনুচিত। তা বাহ্যতঃ আমাদের পরিপন্থী। এ ধরনের মুসল্লা ব্যবহার না করা উত্তম। তবে যেহেতু এটা ছবিই মাত্র তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়িও না করা চাই। [প্রমাণঃ খাইরুল ফাতাওয়া ২:৪১৯; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৫৭]

মিহরাবের স্থান মাঝখানে হওয়া চাই

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের মিহরাব কোন স্থানে থেকে হবে। আমাদের দেশের প্রায় মসজিদের মিম্বর মিহরাবের মিম্বর মিহরাবের ডান দিকে রেখে ইমাম সাহেব নামাযে দাঁড়ান। যার কারণে ডান দিকে নামাযের কাতার বড় হয়। এ নিয়ে কতটুকু শরী'আত সম্মত?

জবাবঃ মিহরাব মসজিদের একদম মাঝে এমনভাবে হতে হবে, যেন ইমামের উভয় দিকে সমান পরিমানে জায়গা থাকে এবং ইমামের পিছে একজন মুসল্লী দাঁড়ানোর পর উভয় পার্শ্বে মুসল্লীর সংখ্যা সমান থাকে। নতুবা নামায মাকরূহ হবে। কারণ বিনা ঠেকায় কোন একদিকে মুমল্লীর সংখ্যা বেশী হলে, নামায মাকরূহ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ মসজিদের মেহরাব বানান সহীহ হয় না। কারণ সাধারণতঃ ঠিক মাঝে মেহরাব বানিয়ে সেই মেহরাবের ডান পার্শ্বে মিম্বর

তৈরী করা হয়ে থাকে। তাতে কাতারের ডানে মুসল্লী বেশী হয়ে নামায স্থায়ীভাবে মাকরূহ হতে থাকে। এ জন্য উচিত হয়ত মিম্বরে মেহরাবের সম্পূর্ণ বাহিরে বানিয়ে মেহরাবের ভিতরেই বানাতে হয় তাহলে মেহরাব ঠিক মাঝে না বানিয়ে একটু ডানে সরিয়ে বানাবে, যাতে করে ইমামের দু'দিকে মুসল্লীর সংখ্যা সমান থাকে। [প্রমাণঃ শামী ১:৬৪৬]

মসজিদের টাকা দিয়ে মিষ্টি বিতরণ

জিজ্ঞাসাঃ কোন মসজিদের দানকৃত টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ কাজের শুরুতে মিষ্টি বিতরণ করা জায়িয আছে কি না?

জবাবঃ মসজিদের টাকা শুধু মসজিদের কাজেই ব্যয় করতে হবে। অন্য কোথাও ব্যয় করা জায়িজ নয়। সুতরাং, এ টাকা দিয়ে মিষ্টি ক্রয় করে বিতরণ করা আদৌ জায়িয হবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১:৪৯২; শামী ৪:৩৬৭]

ইফতারের টাকা মসজিদে খরচ

জিজ্ঞাসাঃ আমরা বিগত রমাযান মাসে মুসল্লীদের নিকট থেকে রোযাদারদের ইফতারী বাবদ কিছু টাকা সংগ্রহ করি। ইফতারী করানোর পর এই ফান্ডের কিছু টাকা বেঁচে গিয়েছে। টাকাগুলি আমরা মসজিদের কোন কাজে ব্যয় করতে পারি কি না? পারলে তা কিভাবে করলে ভাল হয়।

জবাবঃ অবশিষ্ট টাকাগুলোর ব্যপারে কোন সাধারণ বয়ানে আলোচনা করে মসজিদে ফান্ডে নেয়ার জন্য দাতাদের অনুমতি চাইবেন। দাতারা অনুমতি দিলে মসজিদ কমিটি মসজিদের যে কোন কাজে উক্ত টাকা ব্যয় করতে পারবেন। ভবিষ্যতে খাসভাবে ইফতারের জন্য পৃথক চাঁদা না তুলে মসজিদ এবং ইফতার উভয়ের জন্য একত্রে টাকা তুলবেন, তাহলে

আর অবশিষ্ট টাকা নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে না। [আযীযুল ফাতাওয়া ১:৫৮৮; আহকামুল মাসাজিদ ৮৫]

মকতবের জায়গায় মসজিদ তৈরি

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় একটি মসজিদে তাবলীগ জামা'আত আসার কারণে তাবলীগ বিরোধী লোকজন এই মসজিদ ছেড়ে ৬০/৭০ হাত দূরত্বে একটি মকতবে গিয়ে নামায পড়ে। সেই জায়গাটি মকতবের নামে ওয়াকফকৃত। তার মকতবের জায়গায় মসজিদ বানাতে চায়।

প্রশ্ন হলোঃ (ক) মসজিদ কাছে থাকা অবস্থায় মকতবে নামায শুদ্ধ হবে কি-না?

(খ) জামে মসজিদ থাকাবস্থায় ৬০/৭০ হাত দূরে দ্বিতীয় আরেকটি মসজিদ বানানো ঠিক হবে কি?

(গ) মকতবের নামে ওয়াকফকৃত জায়গায় মসজিদ বানানো ঠিক হবে কি?

জবাবঃ দ্বীনে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ উম্মদে মুহাম্মদিয়ার বিশেষ জিম্মাদারী। সুতরাং কোন মুসলমান দাওয়াত ও তাবলীগের বিরোধী হতে পারে না এবং কোন মুসলমানকে এ ধরণের মনে করা ঠিক নয়। হতে পারে কোন ব্যক্তির বা কারোর কোন কাজের ব্যাপারে তাদের আপত্তি আছে বা এ জবরদস্ত মেহনতটিকে তারা কাছে থেকে দেখার সুযোগ পায়নি। সেজন্য হয়ত বুজতে পারে না। তাই তাদেরকে দোস্ত মনে করুন এবং মেহনতের সাথে জরিত থাকার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ, সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যদিও তাদের নামায সহীহ হচ্ছে, কিন্তু অনুরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে নিজেদের গর্ব ও গোড়ামীর কারণে মসজিদের এতো সন্নিকটে দ্বিতীয় আরেকটি মসজিদে জামা'আত চালু করা বা নতুন করে মসজিদ বানানোর চেষ্টা করা জায়িয হবে না। কারণ, এতে পুরাতন মসজিদের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতে পারে এবং মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও দালাদলি সৃষ্টি হতে পারে। অথচ এসব কাজ নাজায়িয ও হারাম। সুতরাং তাদের তাওবা করে ফিরে আসা কর্তব্য।

প্রশ্ন বর্ণিত মকতবের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় দ্বিতীয় মসজিদ বানানো জায়িয হবে। [প্রমাণঃ তাফসিরাতে আহমাদিয়া ৩১২; দুররুল মুখতার ৪:৪৩৩; কাওয়ায়িদুল ফিকহ, ৮৫; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:১৬৬; ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১:১৭৩-১৭৪; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৬৬৯-৬৭০; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ১:২৫২]

মকতব

ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি

জিজ্ঞাসাঃ গ্রামের এক প্রান্তে একটি জামে মসজিদ অবস্থিত, আবার এই গ্রামেরই অপর প্রান্তে প্রায় আট বছর হয় মকতব ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। গ্রামের ঐ প্রান্তে অবস্থিত জামে মসজিদ থেকে অপর প্রান্তের মকতব এলাকাবাসীদের দূরুত্ব সাধারণভাবে পায়ে হাটলে চার থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা, যাতায়াতেও কোন প্রকার অসুবিধা নেই। এখন লোকেরা যদি এ মকতবটিকে জামে মসজিদে রুপান্তরিত করতে চায়, তবে তাকে কি শরী'আতের বিধি অনুযায়ি জামে মসজিদের হুকুম দেয়া যাবে? অবশ্য ঐ মসজিদের সাথে মকতবটি জামে মসজিদে রূপান্তরিত করলে, পূর্বতন মসজিদের আর্থিক ক্ষতি ও মুসল্লী কমে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে।

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী উল্লেখিত মকতবখানায় পাঁচ ওয়াক্ত পড়া জায়িয আছে। তবে তা শর'ঈ মসজিদ হবে না এবং এখন তাকে শর'ঈ মসজিদ বানানোও যাবে না। কেননা, গ্রামের লোকেরা এ জমি ও মকতবের আসবাবপত্র শুধুমাত্র মাদরাসা-মকতবের জন্যই ওয়াকফ করে দিয়েছে। তাই তা পরিবর্তন করে মসজিদ বানানো জায়িয হবে না।

এছাড়া মকতবকে মসজিদ বানানো হলে, তাতে মকতবের যে সব ছোট বাচ্চারা পড়তে আসবে, তারা মসজিদে সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতে পারবে না এবং নাপাক শরীরেও আসার সম্ভাবনা থাকে। যার দরুন অনেক মসজিদে মকতব পড়ানোর অনুমতি দেন না। [প্রমাণঃ আদদুরুল মুখতার ৪:৪৩৩; আহসানুল ফাতাওয়া ৪২২; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:২০]

কররস্তান ভেঙ্গে মসজিদ নির্মান

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে একটি কবর ছিল। বর্তমানে মসজিদটি ভেঙ্গে বড় করার ফলে উক্ত কবরটি মসজিদের বারান্দার পড়েছে। যার ফলে মুসল্লীদের বারান্দার নামায পড়ার অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত কবরটিকে ভেঙ্গে সমান করে ঢালাই প্লাষ্টার করে তার উপর নামায পড়া যাবে কি না?

জবাবঃ নিজস্ব মালিকানার মধ্যে যে সকল করব এত পুরাতন হয়ে গেছে যে, লাশ মাটিতে মিশে গেছে, সে সকল কবরে অন্যকে দাফন করা বা তার উপর ঘর নির্মাণ করা, চাষাবাদ করা জায়িয আছে। আর উক্ত কবর মসজিদের জায়গার মধ্যে হলে উক্ত কবর সমান করে তার উপর মসজিদ তৈরি করে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। বরং সেক্ষেতে যে ব্যক্তির কবরের উপর মসজিদ সম্প্রসারিত হবে, তিনি অন্ত্যন্ত ভাগ্রবান বিবেচিত হবেন। তবে ওয়াকফকৃত কররস্থানের উপর মসজিদ সম্প্রসারণ করা যাবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৩; ইমদাদুল আহকাম ২:৪৩৩; আযীযুল ফাতাওয়া ৫৯৩]

মসজিদের ওকাকফকৃত স্থানে লাশ দাফন

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের আশেপাশে মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জায়গায় কোন লাশ দাফন করা জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জায়গায় কোন লাশ দাফন করা জায়িয হবে না। হ্যাঁ, তবে ওয়াকফকৃত করার সময় লাশ দাফন করার অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে দাফন করতে পারবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৪৪৫; ইমদাদুল মুফতীন ৭৮৮; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:৯৩ কিফায়াতুল মুফতী ৩:১০৮]

ওয়াকফ বিহীন মসজিদে কি জুমু'আর নামায পড়া যায়? উক্ত মসজিদে দান করলে কি কোন সাওয়াব হবে?

জবাবঃ শর'ঈ মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফকৃত হওয়া জরুরী। মৌখিকভাবে ওয়াকফকৃত হোক বা লিখিতভাবে ওয়াকফকৃত হোক। ওয়াকফকৃত ছাড়া মসজিদ হলে সেটা, শর'ঈ মসজিদ হবে না। মালিকের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মসজিদ তৈরী করলে, নামাযের ঘর হবে এবং সেখানে জুমু'আ অন্য যে কোন নামাযের বিনা দ্বিধায় পড়া যাবে এবং জামা'আয়াতে সাওয়াব হাসিল হবে। তবে সেখানে শর'ঈ মসজিদের জামা'আতের ন্যায় সাওয়াব হাসিল হবে না। উক্ত নামাযের জন্য দান করলে, দানের সাওয়াব হবে। তবে ওয়াকফকৃত জমিতে নির্মিত শর'ঈ মসজিদে দান করার মত সাওয়াব হবে না। উল্লেখ্য যে, মালিক যদি কখনো উক্ত ঘর সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেয়, তাহলেও সরিয়ে নেয়া জরুরী। [প্রমাণ ইমদাদুল মুফতীন ৭৭১-৮১২-৮১৩; আলমগীরী ২:৪৫৪]

কবরস্থানের দোতলায় মসজিদ তৈরী করা

জিজ্ঞাসাঃ নীচে কবর আছে। এমতাবস্থায় দোতলায় মসজিদ করা যাবে কি না?

জবাবঃ নিজস্ব মালিকানাধীন জায়গায় যদি কেউ কবর দেয় এবং পরবর্তী তৈরী করা যাবে। আর যদি জায়গাটি গোরস্থানের জন্য ওয়াকফ করা হয়ে থাকে, তাহলে দোতলায় মসজিদ করা যাবে না [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:৮৪, ৯৩; কিফায়াতুল মুফতী ৩:১০৮; আযীযুল ফাতাওয়া ৫৯৩]

মসজিদের দেয়ালে নির্মাতাদের নাম লিখে রাখা

জিজ্ঞাসাঃ ১৯৯৬ সনে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ বর্তমানে পরিপূর্ণ জামে মসজিদ। প্রতিষ্ঠালগ্নে কিছু সমস্যা থাকলেও বর্তমানে এটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মসজিদ কমিটির কয়েকজন সদস্য মসজিদের ভিতরে পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালে মিহরাবের সাথে প্রতিষ্ঠাতা কমিটির নাম শ্বেত পাথরে খোদাই করে লিখে রাখতে চান। তবে বেশীর ভাগ মুসল্লীদেরই এতে আপত্তি রয়েছে। উক্ত স্থানে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা আদৌ শরী'আত সম্মত কি-না?

জবাবঃ মসজিদ আল্লাহর ঘর। এটা একমাত্র ইবাদতের জনই নির্মাণ করা হয়। দুনিয়ার কোন স্বার্থে মসজিদ নির্মাণ বা ব্যবহার করা যায় না। মসজিদের ভিতরে কমিটির সদস্যদের নাম শ্বেত পাথরে খোদাই করে রাখা যাবে না এটা মাকরূহ। কেকনা এতে রিয়া ও অহংকার প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, বরং এর ফলে মুসল্লীদের নামাযের খুশু খুজু বিনষ্ট হয়। সুতরাং, উক্ত স্থানে এমন ব্যবস্থা নেওয়া আদৌ শরী'আত সম্মত হবে না। [শামী ১:৬৫৮; ফাতওয়া আলমগীরী ৫:৩২১; ইমদাদুল মুফতীন ৩১২]

মসজিদ সম্পর্কিত মাসাইল

জিজ্ঞাসাঃ ক. হিংসা বা জিদের বশবর্তী হয়ে গ্রামে একটি মসজিদ বিদ্যমান থাকা সত্বেও আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নামাযের আদায় করলে তা সহীহ হবে কি?

খ. খাস জমি বা পত্তনী জমির উপর মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?

গ. পুরাতন মসজিদের জন্য আদায়কৃত টাকা বা ক্রয়কৃত বস্তু সামাগ্রী জিদের বশবর্তী হয়ে নব নির্মিত মসজিদের কাজে খরচ করা যাবে কিনা?

ঘ. পুরাতন মসজিদের জন্য ইট, বালু সিমেন্ট দেওয়াওয়ালা মসজিদে বসে করলে সেই ইট, বালু, সিমেন্ট নতুন মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি?

জবাবঃ ক. প্রশ্নে বর্ণিত গ্রামের নতুন মসজিদটি যদি ওয়াকফকৃত জমিতে প্রয়োজন ব্যতীত হিংসা-বিদ্বেষ আর জিদের বশবর্তী হয়ে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, তাহলে তা মাকরূহ হয়েছে। আর যদি এতে পুরাতন মসজিদেটি অনাবাদ হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে আরো বড় গুনাহ হবে এবং এর দ্বারা মসজিদ নির্মাণকারীর কোন সাওয়াব তো হবেই না, বরং গুনাহ হবে। কেননা, মসজিদ নির্মাণ করতে হবে প্রয়োজনের কারণে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

তবে নতুবা মসজিদটির ভিত্তি যদিও নাজায়িযও মাকরূহ তরীকায় হবে, তথাপি তাতে ইখলাসের সাথে নামায পড়েলে নামায আদায় হয়ে যাবে এবং পূর্ণ সাওয়াবও পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ।

জ্ঞাতব্যঃ যদি কোন শর'ঈ কারণে (যথাঃ পুরাতন মসজিদে মুসল্লীদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়া অথবা মসজিদ দূরে হওয়ার দরুন মসজিদে আসা মুসল্লীদের জন্য কষ্টকর হয় ইত্যাদি) নতুন মসজিদ নির্মাণ করায় কোন অসুবিধা নেই। বরং এমন অবস্থায় শরী'আতের মসজিদ নির্মাণ করা প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

তাফসীরে কাশশাফে উল্লেখ্য যে, হযরত উমর রা. এর যুগে যখন মুসলমানদের বিজয়ের ধারা চলছিল, তখন তিনি ফরমান জারী করেছিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করো না, যা একটির অপরটির জন্য ক্ষতিকারক হয়।

উল্লেখ্য, নির্মাণকারীর ভ্রান্ত নিয়্যতের কারণে মসজিদ তৈরীর বিশাল সাওয়াব থেকে মাহরূম হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের মসজিদকে মসজিদে যিরার বলা যাবে না। কেননা, যদিও জিদ করে এসব মসজিদ তৈরি করা হয়, কিন্তু এমন মসজিদ দ্বারা ইসলাম ধ্বংস করার কোন পরিকল্পনা থাকে না। [প্রমাণঃ সূরা জ্বিন ১৮ আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়াহ ৩১২; ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৬:১৭৮; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৬৭০; আযীযুল ফাতাওয়া ৬১০]

খ. সরকারী খাস জমিতে সরকারের অনুমতি ব্যতীত মসজিদ নির্মাণ করা জায়িয হবে না। কেননা, শর'ঈ মসজিদ হওয়ার জন্য মসজিদের জমি ওয়াকফকৃত হওয়া শর্ত। এ জন্যে সরকারী জায়গায় মসজিদ করতে হলে আগে বা পরে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। অতএব, খাস জমিতে যদি সরকারের অনুমতি নিয়ে মসজিদ বানানো হয় তাহলে তা জায়িয হবে এবং শরী'আত সেটা মসজিদ বলে গণ্য করবে, অন্যথায় নয়। সরকারী খাস জমি জদি পত্তনী অর্থাৎ সরকারের কাছ থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে লীজ নেয়া হয়, তাহলে উক্ত লীজ নেয়া জমিতেও শর'ঈ মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে সরকারীভাবে স্থায়ী অনুমোদন পাওয়া গেলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। আর সরকারীভাবে স্থায়ী অনুমোদন না পাওয়া গেলে অস্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করে নামায আদায় করলে জামা'আতের সাওয়াব পাওয়া যাবে এবং জুমু'আও পড়া যাবে। কিন্তু শর'ঈ মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১০:১৯৭; আযীযুল ফাতাওয়া ৬০০; আদ-দুররুল মুখতার ৪: ৩৯১]

গ. এক মসজিদের টাকা-পয়সা বা ক্রয়কৃত ইট, সিমেন্ট তথা ওয়াকফকৃত যে কোন সম্পত্তি অন্য কোন মসজিদে স্থানান্তর করা জায়িয

নয়। কেননা, কোন মসজিদে কোন জিনিস ওয়াকফ করলে তা ঐ মসজিদের জন্যই চিরস্থায়ী হয়ে যায়। তবে বেশী প্রয়োজন হলে এবং পুরাতন মসজিদের জিনিস প্রয়োজনাতিরিক্ত হলে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে কখনো প্রয়োজন না পড়লে তা নতুন মসজিদের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। [প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ৪:৩৫৯; আযীযুল ফাতাওয়া ৫৮৫; ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৬:১৯১]

ঘ. কোন মুমিন ওয়াদা করে বিনা উযরে ওয়াদা ভংগ করতে পারে না। কেননা, ওয়াদা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। তাছাড়া নতুন মসজিদটি যদি প্রয়োজন ছাড়া শুধু জিদের বশবর্তী হয়েই নির্মাণ করা হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে টাকা-পয়সা, ইট সিমেন্ট দ্বারা তাদের সহযোগিতা করাও ঠিক হবে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

তোমরা সৎকর্ম ও খোদা ভীতির কাছে একে অপরের সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরে সহযোগিতা কর না। [প্রমাণঃ সূরা মায়িদাহঃ ২]

জিদের বশবর্তী হয়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ বিগত ১৫/২০ বছর আগে আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে আমি ১২ শতাংশ জমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেই এবং মাদরাসা নির্মাণের শর্তে ঐ দাগের সর্বমোট ৪৪ শতাংশ ওয়াকফ করে দেওয়া অঙ্গিকার করি। পরবর্তীতে এলাকার গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তি আমার নিকট ৩২ শতাংশ জমি দাবী করলে তখনো আমি মাদরাসার কথা উল্লেখ্য করি। ইতিপূর্বে উক্ত মসজিদের ইমাম সাহেবের ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্কের কারণে কিছু সংখ্যক লোক এ মসজিদ থেকে ১৮০ হাত দূরে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এমতাবস্থায় এ নতুন মসজিদ নামায জায়িয হবে কি না? জনৈক আলিম সাহেবের নিকট এ প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি জানালেন, মৌজা ও সমাজ পৃথক হলে উক্ত মসজিদে জুমু'আর নামায প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ যে এ নতুন মসজিদ নির্মাণের কারণে পুরাতন মসজিদের মুসল্লী সংখ্যা এবং মসজিদের সৌন্দর্য বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সুতরাং উক্ত নতুন মসজিদে জুমু'আর নামায সহীহ হবে কি-না? এবং উল্লেখিত আলিম সাহেবের এতদসংক্রান্ত ফাতাওয়া সঠিক হবে কি-না? আর সূরা তাওবাহর ১০৭-১১১ নং আয়াতে মসজিদ সম্পর্কে কি আলোচনা করা হয়েছে? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ প্রশ্ন উল্লেখিত গ্রামটি আয়তন বড় হয় এবং সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র সচরাচর পাওয়া যায়, তাহলে নতুন মসজিদের বিভেদ সৃষ্টি করে এত কাছে মসজিদ নির্মাণ করা যদিও সঠিক হয়নি, কিন্তু সেখানে জুমু'আর নামায সহীহ হবে। পাশাপাশি দুই বা ততোদিক মসজিদে জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য মৌজা ও সমাজ পৃথক হওয়া আবশ্যকীয় নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত মাওলানা সাহেবের বক্তব্য সঠিক নয়।

সূরা তাওবার ১০৭-১১১ আয়াতে মসজিদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

মদীনার খৃষ্টান ধর্মালম্বী আবু আমের নামক এক ব্যক্তির পরামর্শক্রমে মুসলমানদের ক্ষতি করার লক্ষে মদিনার উপকন্ঠে মসজিদে কুবার নিকটে মসজিদের নামে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়, যাকে পবিত্র কুরআনে "মসজিদে জিরার" নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ঘরটি নির্মাণের

উদ্দেশ্য ছিল, তথায় যুদ্ধের সরঞ্জামাদি রেখে সেখানে সকলে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কিন্তু পরবর্তীতে রাসূলে আকরাম ﷺ এর নির্দেশে তা ধ্বংস ও ধুলিস্যাৎ করা হয়। কেননা, সেটা প্রকৃতপক্ষে মসজিদ ছিল না, এবং নামায আদায়ের জন্যও তা নির্মিত হয়নি।

"মুসজিদ জিরার" এর উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকরণ বা পূর্ববর্তী মসজিদের কাছাকাছি বিনা প্রয়োজনে ওয়াকফ সম্পত্তিতে অন্য আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করা হলে নির্মাতার কোন সাওয়াব তো হবেই না, বরং সে গুনাহগার হবে। এতদসত্ত্বেও শরী'আতের বিধান মোতাবিক সেটাকে মসজিদ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মসজিদের যাবতীয় আদব ও আহকাম এ স্থানের জন্যও প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, তাদের নামায শুদ্ধ হবে। সেটাকে মসজিদে জিরার হিসাবে অভিহিত করা যাবে না। তবে এটাকে মসজিদে জিরারের মত বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এরূপ প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা সকলের জন্যই অপরিহার্য। কেননা, হযরত উমর রা. এতদসংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ এভাবে নির্মাণ করবে না, যাতে পুরাতন মসজিদের মুসল্লীদের সংখ্যা ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৪৪; আত তাফসিরাতুল আহমাদিয়া, আযীযুল ফাতাওয়া ৬১০; মাহমূদিয়া ৬:১৭৮]

মসজিদ স্থানান্তরিত করার পর পূর্ববর্তী স্থানের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি মৌখিকভাবে মসজিদ নির্মাণের জন্য কিছু জমি নির্দিষ্ট করে ওয়াকফ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ না করে অন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে জামা'আতে নামাযের ব্যবস্থা

করেছে। এখন প্রথম স্থানটি খালি রয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এ জায়গার হুকুম কি?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের নামে প্রথম জমির ওয়াকফ সহীহ হয়ে গেছে। তাই উক্ত স্থানে মসজিদের প্রয়োজন হলে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। আর যদি মসজিদের প্রয়োজন না থাকে তাহলে উক্ত জমির ফসলাদি ও অন্যান্য আয় পার্শ্ববর্তী মসজিদের কল্যাণে খরচ করতে হবে। [আলমগীরী ২:৩৫৭]

মসজিদের জমিতে দোকান ঘর করে ভাড়া দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ কুষ্টিয়া জেলায় হরীনারায়ণপুর গ্রামে সরকারী জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এতে সরকারী কর্তৃপক্ষেরও সমর্থন ছিল। আর.এস.রেকর্ডেও মসজিদের স্থান বলে দেখানো হয়েছে। এখন উক্ত মসজিদের পাশে ও মসজিদের কিছু অংশ নিয়ে দোকানঘর করে তা ভাড়া দেয়া যাবে কিনা?

সরকারের নিকট থেকে এখন মসজিদের জন্য অনুমতি নিতে হবে কি-না?

জবাবঃ সরকারী কোন জায়গায় মসজিদ করার প্রয়োজন হলে সে মসজিদ করার দ্বায়িত্ব সয়ং মুসলিম সরকারেরই। সরকারী কর্তৃপক্ষ নিজে মসজিদ না বানিয়ে জনগনকে বানানোর অনুমতি দিলে বা অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে জনগণ মসজিদ বানালে বা প্রথমে বানিয়ে পরে অনুমোদন করিয়ে নিলে সেটাও শর'ঈ মসজিদ হয়ে যাবে। শর'ঈ দৃষ্টিকোন থেকে এ অনুমোদন মৌখিক হলেও যথেষ্ট, তবে লিখিত অনুমোদন নিয়ে নিলে আইনের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু প্রশ্নের বিবরণ উক্ত মসজিদ নির্মাণে সরকারী কর্তৃপক্ষের সমর্থনের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া আর.এস রেকর্ডেও মসজিদের স্থান বলে স্বীকার করা হয়েছে। সেহেতু উক্ত মসজিদ শর'ঈ মসজিদ হিসাবেই গণ্য হবে। মসজিদের কাজে ব্যবহৃত তৎসংশ্লিষ্ট জায়গায়টিও সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তাও মসজিদেরই গন্য হবে। উপরোক্ত আলোচনার পর প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমিক উত্তর নিম্নরূপ।

খালি জায়গায় মসজিদের উন্নয়নেকল্পে দোকানঘর করা যাবে। তবে সেগুলোর পজিশন বিক্রি করা বা দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে ভাড়া না দেওয়া চাই। বরং অনুর্ধ এক বছর মেয়াদের চুক্তি করা চাই। অতঃপর মেয়াদ শেষে পুনরায় চুক্তি নবায়ন করে নিবে।

যে স্থান জুড়ে পূর্বে মসজিদ ছিল, সেটা চিরকাল মসজিদ থাকবে। সুতরাং সেখানে দোকান করা যাবে না বরং তা মসজিদ হিসাবে বহাল রাখতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর এবং মসজিদ হিসাবে সরকারী রেকর্ডভুক্ত হওয়ার পর শরী'আতের দৃষ্টিতে বাড়তি অনুমতির প্রয়োজন নেই। যদিও আইনী দৃষ্টিতে কাগজপত্র করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। [মিশকাত ২৫৪; ফাতাওয়া শামী ৪:৩৮৫, ৩৫৬; ফাতাওয়া আলমগীরী ২:৪১৯]

আবাদকৃত জমিতে মসজিদ স্থানান্তর ও সেখানে নামাজের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বৃটিশ আমল থেকে আমাদের এলাকায় ওয়াকফবিহীন জমিতে একটি মসজিদ ছিল। সত্তর গজ মাটি খুদে মসজিদ স্থানান্তরিত করা যায় জেনে সেই সুবিধার জন্য পাকিস্তান আমলে উক্ত কায়দায় মসজিদখানা সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের দায়ে আত্মসাৎকৃত জমিতে স্থানান্তর করা হয়।

পরবর্তীতে মসজিদটি বৈধ ও অবৈধ টাকায় বিল্ডিং এ রুপান্তর করা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত মসজিদে নামায আদায় বৈধ হবে কি না?

জবাবঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বৃটিশ আমলের মসজিদটি ওয়াকফকৃত জমিতে না হওয়ার কারণে, সেটা শরী'আতের দৃষ্টিতে মসজিদ ছিল না। আর শর'ঈ মসজিদ না হলে সেটা স্থানান্তর করা দোষণীয়ও নয়। তবে 'সত্তর গজ মাটির খুদে নিলে কোন মসজিদ স্থানান্তর করা যায়' -এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, মসজিদ বরাবর মাটির নীচে পাতাল থেকে উপরের আসমান পর্যন্ত সম্পূর্ণ জায়গা মসজিদের হুকুমের শামিল।

এখন লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রশ্নে বর্ণিত পাক আমলে যে জমিনে মসজিদটি সুদের জমিতে স্থানান্তর করা হয়, তা সম্পূর্ণই সুদের দায়ে আত্মসাৎকৃত, না-কি সেটার সঙ্গে হালাল মালের বিনিময়ে ক্রয়কৃত জমিও ছিল। যদি সম্পূর্ণ জমিন সুদের দায়ে আত্মসাৎকৃত বা অন্য কোন হারাম পন্থায় অর্জিত মূল্য দ্বারা ক্রয়কৃত হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত মসজিদ শর'ঈ মসজিদ হবে না এবং উক্ত মসজিদে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী হবে। তবে মাকরূহ তাহরীমী থেকে বাঁচার জন্য এলাকাবাসীর কর্তব্য হবে মসজিদের জন্য এলাকার লোকদের নিকট থেকে চাঁদা গ্রহণ করা এবং উক্ত জমির মালিক জীবিত না থাকলে, বাজার দর হিসেবে তাকে জমির মূল্য পরিশোধ করা। আর মালিক জীবিত না থাকেলে, তার উত্তরাধিকারীগণকে উক্ত টাকা প্রধান করতে হবে। মালিক বা ওয়ারিশগনণ সে টাকা গ্রহণ করে যেহেতু এ টাকা তাদের জন্য হালাল নয় সুতরাং তারা আবার মুল মালিকদের ফিরিয়ে দেবে। আর মালিক বা ওয়ারিশগণ মধ্যে কেউ জীবিত না থাকলে, মূল মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যতে উক্ত পরিমাণ টাকা গরীব-মিসকীনদেরকে সদকা করে দিবে। এ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সেটা শর'ঈ মসজিদরূপে

পরিগণিত হবে। তখন আর উক্ত মসজিদে নামায আদায় করা মাকরূহ হবে না। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত মসজিদে নামায পড়া মাকরূহ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য উল্লেখিত পদ্ধতি বাস্তাবায়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী অন্য যে কোন মসজিদে জামা'আতের সাথে নামায পড়া সম্ভব হলে, সেখানে নামায আদায় করবে। আর তা সম্ভব না হলে অবৈধ টাকায় নির্মিত উক্ত অবস্থাতেই জামা'আত পরিত্যাগ করা যাবে না। পক্ষান্তরে উক্ত মসজিদের জমিতে যদি হালাল মাল দ্বারা ক্রয়কৃত কিছু জমি মিশ্রিত আছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে উক্ত মসজিদ শর'ঈ মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদে নামায় আদায় করার কোন প্রকার অসুবিধা থাকবে না। তবে হারাম টাকার সমপরিমাণ অর্থ মালিককে ফেরত দিবে এবং অবৈধ পন্থায় গ্রহণ করেছে, তাদের অর্থ তাদের নিকট অথবা ওয়ারিশগণের নিকট ফেরত দিয়ে হুক্কল ইবাদ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬৫৮; ফাতাওয়া শামী ৫:২৩৫; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬:১৬৯; আযীযুল ফাতাওয়া ১:৫৮৯; কিফায়াতুল মুফতী ৭:৬৪; আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪২৮; ইমদাদুল মুফতীন ৮০০]

মসজিদের পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করা

জিজ্ঞাসাঃ আধুনিক ডিজাইনের নির্মাণাধীন একটি জামে মসজিদের দ্বিতল ভবনের প্রথম তলার নির্মাণ কাজ চলছে। প্রশ্ন হল, পুরাতন মসজিদের আসবাবপত্র যেমন, ইট, কাঠ, টিন, দরজা, জানালা ইত্যাদি সাধারণ লোকের নিকট বিক্রি করে ঐ টাকা উক্ত মসজিদ নির্মাণকল্পে ব্যয় করা যাবে কি-না? এমনকি মসজিদ চত্বরে এ গুলো দিয়ে দোকান ঘর নির্মাণ করে দোকান ভাড়ার টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা জায়িয কি-না?

মসজিদের পুরাতন পাত কুয়ার রিং সাধারণ লোকের নিকট বিক্রয় করা যাবে কি না?

জবাবঃ মসজিদ সংস্কার করার কারণে আগের মসজিদের জিনিসপত্র যেমর ইট,কাঠ, টিন, দরজা, জানালা ইত্যাদির প্রয়োজন এ মসজিদের না থাকলে মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা মসজিদ কমিটি উল্লেখিত মালামাল বিক্রয় করে মসজিদের উন্নতিকল্পে ব্যয় করতে পারেন। তবে মসজিদ সংস্কার করার পর যদি আগের মসজিদের এমন কোন জিনিস থাকে, যা পরবর্তীতে মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি আসবাবপত্র এমন হয় যে, রেখে দিলে তা পরবর্তীতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাহলে বিক্রি করা জায়িয আছে। সারকথা, যথাসম্ভব বিক্রয় না করতে চেষ্টা করা উচিত। তবে যদি বিক্রয় করলে মসজিদের উপকার হয় বা বিক্রয় না করলে ক্ষতি হয় তখন বিক্রয় করা জায়িয হবে। এমনি ভাবে সেগুলো দিয়ে মসজিদ চত্বরে দোকান নির্মাণ তরে দোকান ভাড়া দেয়া বা মসজিদের উন্নয়মূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে। এসব আসবাবপত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, যে ব্যক্তি অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে এবং তার নিকটই বিক্রয় করবে। এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি যে কেউ হোক বা না কেন এবং ক্রেতার জন্য জরুরী যে, এ জিনিসগুলো যেন নিকৃষ্ট স্থানে ব্যবহার না হয়। [প্রমাণঃ আল-বাহরুর রায়িক ৩:২১৯-২২০; ফাতাওয়া শামী ৪:৩৫৯-৩৬০; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:১৮১; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২:৪৫৯-৪৬৩]

পুরাতন মসজিদকে নতুন মসজিদের বারান্দা বানানো

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলকায় পুরাতন জামে মসজিদ সংলগ্ন আরেকটা বড় জামে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। যদ্দরুন আগের মসজিদটি নতুন মসজিদের বারান্দা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কোন ক্ষতি আছে কিনা?

জবাবঃ পুরাতন মসজিদকে নতুন মসজিদের বারান্দা হিসেবে রাখতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ বারান্দা মসজিদের মধ্যে শামীল এবং তাতে নামাযের সাওয়াবও কম হবে না। তা হুকুম ও মর্যদার দিক দিয়ে বারান্দা নয়, বরং মসজিদের অন্তভুক্তই গণ্য হবে। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৬৯৩]

ওয়ারিশদের অন্যায় কর্তৃত্ব দেখানোর দায়ে নতুন মসজিদ নির্মাণ?

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় একজন ব্যক্তি তার নিজের জমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেয়, পরবর্তীতে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে জনৈক আলেম স্থায়ীভাবে ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিছু দিন আগে গ্রামের নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং মুসল্লীদের মধ্যে দু'টি গ্রুপ হয়ে যায়। ইমাম সাহেব হকের উপর ছিলেন বলে ওয়াকফকারীর সন্তানরা এককভাবে প্রভাব খাটিয়ে ইমাম সাহেবকে তার ইমামতি থেকে বরখাস্ত করে দেন। ইমাম সাহেবের কোন দোষ ছিল না। এলাকার মুসল্লীগণের প্রতিবাদ করলে তারা বলে, এটা আমাদের বাবা দাদার মসজিদ। আমাদের ইচ্ছা মত মসজিদ চালাব, এতে কারো বাধা দেয়ার অধিকার নেই। এখন এলাকার লোকেরা তাদের কাজকর্মের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আনুমানিক ১০০ হাত দূরে আরেকটি মসজিদ তৈরি করতে ইচ্ছুক। এখন প্রশ্ন হলো, ২য় মসজিদ তৈরী করা জায়িয হবে কি না?

জবাবঃ ওয়াকফকারী জমি ওয়াকফ করার পরে মসজিদ নির্মাণ করে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পরেই জমি তার মালিকানা থেকে বাহির হয়ে গেছে। দলীলের মধ্যে জমিদাতা বা তার ওয়ারিশগণের মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত থাকলেও ইমাম রাখা বা বরখাস্ত করার ব্যাপারে তাদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকবে না। বরং এটা দ্বীনদার নিয়মিত মুসল্লীদের উপর

ন্যস্ত থাকবে। এখন মহল্লাবাসী উক্ত মসজিদে আযান-ইকামত দিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবে বা মহল্লার দ্বীনদার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলে পরামর্শের ভিত্তিতে ইমাম, মুয়াযযিন নিয়োগ করবেন। যদি কেউ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বাঁধা দেয়, তাহলে সে জালিম বলে গন্য হবে। ইমাম সাহেবকে ব্যাক্তিগত কোন্দলের কারণে তার ইমামতী থেকে বরখাস্ত করা মারাত্মক অন্যায় হয়েছে। সুতরাং, তাদের উচিৎ হবে দ্বীনদার গণ্যমান্য মুসল্লীদের মতানুসারে মসজিদ পরিচালনা করা এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করে ইমাম সাহেবের নিকট মাফ চেয়ে নিয়ে তাকে ইমাম পদে পুনবর্হাল করা। তারা এতে রাজি না হলে, এলাকাবাসী একমত হয়ে চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে এ সহীহ মাসআলা মানাতে চেষ্টা করবে। মহল্লাবাসীর যদি এরূপ ক্ষমতা না থাকে, এবং নতুন ইমাম অযোগ্য হয়, তাহলে তারা পরামর্শ করে মুনাসিব কোন স্থানে নতুন মসজিদ তৈরি করে হক্কানী আলেমের মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারবে। অবশ্য যদি নতুন ইমাম যোগ্য হয় এবং মসজিদেও স্থান সংকুলান হয়, তাহলে দ্বিতীয় মসজিদ বানাবে না। [প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়েক ৫:২৪৯; ইমদাদুল মুফতীন ৭৭৫; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৬৬৯]

মসজিদের উন্নয়ন কাজে লিল্লাহ ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ কল্যানপুর জামে মসজিদ ও জামি'আ দ্বীনীয়া ইসলামীয়া একই কমপ্লেক্স এর আওতাধীন এবং একই কমিটি কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ ও মাদরাসার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক একাউন্টও রয়েছে। বর্তমানে মসজিদের উন্নয়ন কাজে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, দান ফান্ড ও লিল্লাহ ফান্ড নামে মাদরাসায় দু'টি ফান্ড আছে এবং লিল্লাহ ফান্ড থেকে মসজিদের জন্য ঋণ গ্রহণ করলে লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনায় আর্থিক

কোন অসুবিধা হবে না। এমতাবস্থায় মসজিদের উন্নয়ন কাজে জন্য মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণ করা যাবে কি-না?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত লিল্লাহ ফান্ড থেকে মসজিদের উন্নয়ন কাজের জন্য সাময়িকভাবে ঋণ গ্রহণ করার শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। তবে পরবর্তীতে কোন অনিবার্য কারণে মসজিদ ফান্ড উক্ত ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে, বর্তমান কমিটির সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:১৭]

মসজিদে দ্বীনী তালীম দিয়ে ভাতা গ্রহণ করা জায়িয হবে কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদে দ্বীনী তালীম দিয়ে বেতন গ্রহণ করা জায়িয হবে কি-না? উল্লেখ থাকে যে, যদি মসজিদ ছাড়া মাদরাসার কামরা থাকে এ অবস্থায় তালীমের কি হুকুম? বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ মসজিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘর। এই ঘরের হিফাজত সংরক্ষণ, ইজ্জত-ইহতিরাম করা সকল মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আর বাচ্চাদের দ্বারা তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই যদি মসজিদ ছাড়া মাদরাসা ভবনের বাইরে ছাত্রদের তালীম বা শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় বেতন নিয়ে মসজিদে তালীম দেয়া জায়িয হবে না, বরং মাকরূহ হবে। তবে যদি বিনা বেতনে সওয়াবের উদ্দেশ্য কেউ তালীম দেয়, তাহলে মসজিদেও তা জয়িয হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মসজিদের বে- ইহতিরামী যেন না হয়। আর তালীমের উপযোগী জায়গা না থাকা অবস্থায় একান্ত জরুরত বশতঃ নিম্মে বর্ণিত কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে বেতনধারী উস্তাদের জন্য অস্থায়ীভাবে মসজিদে তালীম দেয়া জায়িয হবে।

(১) মুসল্লীদের নামায, যিকির, তিলাওয়াত কুরআন ইত্যাদি ইবাদতে কোন প্রকার ব্যঘাত না হওয়া ।

(২) মসজিদের আদব-ইতহিরাম, পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে পূর্ণ খেয়াল রাখা।

(৩) শিশু ও অবুঝ বাচ্চাদের মসজিদে না আনা।

(৪) ইতিকাফের নিয়্যাত করে মসজিদে অবস্থান করা।

উল্লেখ্য যে একান্ত জরুরত বশতঃ অস্থায়ীভাবে তালীম দিলে অন্যত্র ব্যবস্থা হওয়ার যে রকম প্রচেষ্টা করতে হয়, সে সব প্রচেষ্টা জারী রাখা কর্তব্য এবং যখনই মাদরাসার জায়গার ব্যবস্থা হয়ে যায়, তখন সেখানে মাদরাসা স্থানান্তরিত হওয়া জরুরী। [প্রমাণঃ গুনিয়াতুল মুতামাল্লি ফী শরহে মুনিয়াতুল মুসল্লী ৬১১-৬১২; ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া ১:৮২; আল আশবাহ ওয়ান্নাজায়িয ২০২; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৮৫- ৪৫৯; ইমদাদুল আহকাম ২;৫৫; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:২০০]

হিন্দুর জমিনে মসজিদ নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ হিন্দু ব্যক্তির যমিনে মসজিদ, ইদগাহ, খেলার মাঠ প্রভৃতি নির্মাণ করা জায়িয হবে কি না? তার মধ্যে নামায আদায় হবে কি না?

জবাবঃ যদি হিন্দু ব্যক্তি মসজিদ ও ঈদগাহ নির্মাণ করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে, তার নিজের জমি মসজিদ মাদরাসা বা ঈদগাহ এর জন্য ওয়াকফ করে দেয়, অথবা প্রথমতঃ মুসলমানদেরকে হেবা করে দিয়ে দেয়, তারপর মুসলমানরা নিজেরদের পক্ষ থেকে সেই মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে মসজিদ বা ঈদগাহ নির্মাণ করে, তাহলে তা জায়িয হবে এবং সেখানে নামায আদায় করাও বৈধ হবে। তার মধ্যে নামায পড়তে

কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের সহিত কোন ষড়যন্ত্ররূপে তা দিলে, তাতে মসজিদ-ইদগাহ নির্মাণ ঠিক হবে না। [রাদ্দুস মুহতার ৪:৩৪১; আলমগীরী ২:৩৫০; ইমদাদুল মুফতিয়ীন ৭৯৬]

মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ইমামের লাশ দাফন

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার একটি জামে মসজিদের ইমাম সাহেবে মারা গেলে মসজিদ কমিটি মসজিদের পার্শ্বে মসজিদের জায়গায় মৃত ইমামকে দাফন করার জন্য তার বাবা-মার কাছে অনুমতি চায়। তখন মৃত ইমামের বাবা-মা মসজিদ কমিটিকে শর্ত দেন যে, যদি মৃত ইমামের ছোট ভাই (হাফেজ)-কে উক্ত মসজিদের ইমামতীর চাকুরী দেয়া হয়, তাহলে ইমামের লাশ দাফন করার জন্য মসজিদ কমিটিকে অনুমতি দেয়া হবে। উক্ত প্রস্তাবে মসজিদ কমিটি রাজি হয়ে মৃত ইমামকে মসজিদের জায়গায় দাফন করেন এবং তার ছোট ভাইকে উক্ত মসজিদে ইমাম নিয়োগ করেন। উল্লেখিত ঘটনার আলোকে আমাদের জিজ্ঞাসা, (১) মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গায় মৃত ইমামের লাশ দাফন করা জায়িয হয়েছে কি-না?

(২) যদি জায়িয না হয়, তাহলে উক্ত ইমামের কবর মসজিদের জায়গায় থাকবে, না লাশ স্থানান্তর করতে হবে?

জবাবঃ (১) মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জায়গায় মৃত ইমামের লাশ দাফন করা জয়িয হয়নি। তবে হ্যাঁ, যদি ওয়াকফকারী ওয়াকফ করার সময় মসজিদের জায়গায় কিছু অংশ লাশ দাফন করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা, অর্থাৎ তখন জায়িয হবে, অন্যথায় নয়।

(২) যদি মাসআলা না জানার কারণে কাউকে ওয়াকফকৃত জায়গায় দাফন করে থাকে, তাহলে কবর খনন করে লাশ বাহির করে স্থানান্তর

করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাতে মৃত ব্যক্তির লাশের অবমাননা হয়। অবশ্য জমিনে তার অনুমতি ছাড়া লাশ দাফন করলে এবং আসল মালিক তার জমিনে লাশ রাখার অনুমতি না দিলে, লাশ স্থানান্তর করা জরুরী। সেরূপ ক্ষেত্রে কবর খনন করে লাশ বাহির করে অন্যত্র দাফন করা জায়িয। কারণ এক্ষেত্রে না সরালে অন্যের হক নষ্ট হয়।

বর্ণিত সুরতে যেহেতু কারো হক বা প্রাপ্য নষ্ট হচ্ছে না, ওয়াকফকারীরও না। এই জন্য যে, তার মালিকানা নেই। আর সাধারণ মুসলমানের হক নষ্ট এই জন্য হচ্ছে না যে, তারা উক্ত স্থানে নামায পড়ে না। তাই সেই কবর সেখানেই থাকতে পারে। তবে ভবিষ্যতের জন্য মসজিদের জায়গা সংরক্ষন করবে, যেন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন না করা হয়।

বর্তমানে দাফনকৃত ব্যক্তির লাশ বাহির করবে না। তবে ১০/১২ বছরের মধ্যেই যখন লাশ মাটি হয়ে যাবে, তখন কবরটিকে জমিনের সমান করে দিবে। অতঃপর তাতে চলাফেরা, নামায পড়া এবং প্রয়োজনের সময় সেখানে মসজিদ সম্প্রসারণ করা জায়িয হবে। [প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতীন ৭৮৮; ফাতাওয়ায়ে রাহিমীয়া ৬:৯৩; মাহমূদীয়া ৬:১৭৫; আলমগীরী ১:১৬৭]

মসজিদের তহবিল কোন খাতে খরচ হবে

জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র কুরআন পাক যাতে সহীহ শুদ্ধ করে পড়তে পারে, সে জন্য আমাদের মসজিদে বয়স্কদের জন্য একটি কোর্স চালু করা হয়েছে। এ কোর্সের কৃতী ছাত্রদেরকে মসজিদ তহবিল থেকে পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা জায়িজ হবে কি?

জবাবঃ মসজিদের তহবিল থেকে ছাত্রদের পুরস্কার দেয়া জায়িয হবে না। মসজিদের তহবিল শুধু মসজিদের নির্মাণ ও সংরক্ষণমূলক জরুরী কাজে

এবং ইমাম, মুয়াযযিন ও খাদেমগণের বেতন-ভাতা বাবদ খরচ করা যাবে। [ইমদাদুল মুফতীন ৭৭৯; আদদুররুল মুখতার ৪:৩৬৬]

বিধর্মী কতৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক বিধর্মী। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তারই নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, উক্ত মসজিদে নামায আদায় করা, ইমামতি করা ও বেতন-ভাতা গ্রহণ করা জায়িয হবে কি-না ?

জবাবঃ যদি কোন বিধর্মী পুণ্যের কাজ মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে, তাহলে সেই মসজিদে নামায আদায় করা জায়িয আছে । তেমনিভাবে সেখানে ইমামতি করা ও বেতন-ভাতা গ্রহন করাও জায়িয আছে। [প্রমাণ: আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪৩৯; বাদায়িউস সানারি ৭:৩৪১]

ফাসিকদের দ্বারা মসজিদ মাদরাসা পরিচালনা করা

জিজ্ঞাসাঃ ফাসিকদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা মসজিদ মাদরাসা পরিচালনা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কিরূপ?

জবাবঃ মসজিদ মাদরাসা কিংবা যে কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সদস্যদের জন্য শরী'আতের অনুসারী, দ্বীনদার, আমানতদার সৎ ও খোদাভীরু হওয়া আবশ্যক। সুতরাং কোন ফাসিক খেয়ানতকারী, শরী'আত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির্গের সমন্বয়ে মসজিদ অথবা কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন করা একেবারে অনুচিত। কখনো ঘটনাক্রমে এরূপ হয়ে গেলে সেটা সংশোধনের জন্য পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া একান্ত জরুরী। [প্রমাণঃ সূরা তাওবাহঃ ১৮; ফাতাওয়া শামী ৪:৩৮০; ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহ ২:৪০৮]

মসজিদ কমিটি কেমন হওয়া উচিত?

জিজ্ঞাসাঃ (ক) কোন মসজিদ অথবা দ্বীনী প্রতিষ্টানে পরিচালনার ক্ষেত্রে শরী'আত সম্মত কমিটি কিরূপ হওয়া উচিত ? এবং বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদ গঠন ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে কতটুকু গ্রগণযোগ্য?

(খ) নিয়মিত নামায আদায় ও জামা'আতের পাবন্দ নয়, এমন ব্যক্তি মসজিদ পরিচানার দ্বায়িত্বে বহাল থাকা বৈধ কি-না?

(গ) মসজিদ সংকান্ত কোন বিষয়ে চূরান্ত ফায়সালা প্রদানের ক্ষমতা কার? প্রধান উপদেষ্টা, সভাপতি, না সংখ্যাগরিষ্ঠের? সেক্রেটারীর প্রাধান্য গ্রহণযোগ্য কি-না?

(ঘ) ইমাম সাহেবকে মসজিদ কমিটির অধীনস্থ কর্মচারী মনে করা সমীচীন কি-না?

জবাবঃ (ক) মসজিদ অথবা যে কোন দ্বীনী প্রতিষ্টানের পরিচালক দ্বীনদার, আমানতদার, শরী'আতের পাবন্দ, খোদাভীরু ও পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া জরুরী। ফাসিক, খিয়ানতকারী শরী'আতের খেলাফ চাল-চলনে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তিকে মসজিদ বা কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বানানো জায়িয নয়। এমনিভাবে কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরন করা তথা শরী'আতের দৃষ্টিতে যোগ্যতর লোক থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা পরিষদ বা অযোগ্য ব্যক্তিকে দ্বীনী প্রতিষ্টানের পরিচালক নিযুক্ত করা জায়িয নয়।

বলাবাহুল্য, মানুষের মাঝে দ্বীনী ইলম না থাকার দরুন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদের দিকে খেয়াল করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসল্লীর রায় অনেক সময়

অযোগ্য ব্যক্তির দিকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই সেরূপ নির্বাচন পন্থা পরিহার করে এলাকার বা আশ-পাশের উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনদারগণের পরামর্শ অনুযায়ী কমিটি গঠন করতে হবে।

(খ) যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে না, শর'ঈ উজর ব্যতীত নামায কাজা করে অথবা প্রায়ই জামা'আত তরক করে, সে ফাসিক বলে গণ্য হবে। ফাসিক ব্যক্তিকে মসজিদের পরিচালক নির্বাচন করা জায়িয নয়।

(গ) মসজিদ সংকান্ত বিষয়ে চুড়ান্ত ফায়সালা প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী মুতাওয়াল্লী অথবা সভাপতি। যোগ্যতার ভিত্তিতে যিনি মুতাওয়াল্লী অথবা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি উপস্থিত সকলের পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠানের জন্য যেটাকে অধিক কল্যাণকর মনে করেন, সে অনুপাতেই ফায়সালা প্রদান করবেন। চাই সেটা অধিকাংশ সদস্যের প্রস্তাব হোক বা স্বল্পসংখ্যক সদস্যের প্রস্তাব হোক, কিংবা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হোক। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ন্যায় অধিকাংশের প্রস্তাব বা ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইসলামী শরী'আতে জরুরী নয়। বরং চুড়ান্ত ফায়সালা মুতাওয়াল্লী বা সভাপতির স্বাধীন রায়ের উপর নির্ভরশীল। তিনি মুনাসিব মত ফায়সালা দিবেন, শরী'আতের খেলাপ না হলে সেটা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য জরুরী।

তবে যদি কোন বিষয় এমন হয় যে, উভয় পক্ষের নিকটই মজবুত যুক্তি ও প্রমাণ আছে এবং উভয় পক্ষের দাবীর মধ্য থেকে কোনটিই প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর নয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে সভাপতির জন্য অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদান করা উত্তম। উল্লেখ্য যে, শরী'আতের দৃষ্টিতে কোরাম কোন বিষয় নয়। যারা উপস্থিত হবেন। তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কিছু লোকের অনুপস্থিতির কারণে অযথা কষ্ট করে ও সময়ের অপচয় করে যারা উপস্থিত হয়েছেন, তাদের শ্রম ও মেহনত ব্যর্থ

হতে পারে না। যার উপস্থিত হতে পারেনি, প্রয়োজনে এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরবর্তীতে তারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেবেন। সভাপতির অনুমোদনের সময় তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হলে, তা বিবেচনায় রেখে চূড়ান্ত ফায়সালা প্রদান করবেন।

(ঘ) ইমাম সাহেবকে কর্মচারী মনে করে তার সাথে নিজেদের কর্মচারীর ন্যায় আচরণ করা জায়িয নয়। কারণ, তিনি নবী ﷺ এর ওয়ারিশ। তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের অঙ্গ। শর'ঈ কোন কারণ ছাড়া তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। [প্রমাণঃ হিনদিয়্যাহ ২:৪০; ফাতাওয়া মাহমীদিয়া ২:৪৫২]

ব্যাংকের সুদের টাকা দ্বারা-মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ ব্যাংক থেকে সুদের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা যাবে কি-না? মসজিদের পায়খানায় সুদের টাকা খরচ করার জন্য তামলিকের প্রয়োজন আছে কি-না? মসজিদের পায়খানাও তো মসজিদের অংশ। সুতরাং মসজিদের পায়খানা নির্মানে উক্ত টাকা খরচ করা গেলে উক্ত টাকায় মসজিদ নির্মাণে অসুবিধা কি? সুদের টাকা দিয়ে মসজিদের বারান্দা বা ইমামের কামরা বানানো যাবে কি-না?

জবাবঃ সুদী ব্যাংকে একাউন্ট খোলা নাজায়িয ও হারাম। তবে জান-মালের নিরাপত্তার জন্য একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যাংকে চলতি একাউন্ট খোলা জায়িয আছে। কিন্তু সেভিংস একাউন্ট খোলা জায়িয নয়। তবে না জেনে কেউ এরূপ একাউন্ট খুলে থাকলে এতদসম্পর্কিত বিধান জানার পর একাউন্ট পরিবর্তন করা উচিৎ এবং এরূপ ক্ষেত্রে তার সুদের টাকা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া কোন গরীব মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবে

কিংবা জনসাধারণের কল্যাণমূলক কোন কাজে ব্যয় করবে। যেমন, রাস্তা-ঘাট, পুল-ব্রিজ, পানির হাউজ, নলকূপ ইত্যাদি।

সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সুদের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসার বাথরুম তৈরি করা যেতে পারে। তামলীকে বা হিলার পন্থ্য অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। সুদের টাকা দিয়ে গরীব আত্মীয়দের সাহায্য করবে। এ ধরনের নিয়্যতে সুদি একাউন্ট খোলার জায়িয নেই, হারাম মাল দ্বারা দান খয়রাত করাও হারাম।

আর সুদের টাকা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা জায়িয হবে না। এমনকি তামলীক করেও তা মসজিদ-মাদরাসায় ব্যয় করা জায়িয হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মহা পবিত্র; অতএব, তাঁর ঘরও পবিত্র রাখার জন্য সেখানে হালাল মাল খরচ করতে হবে, হারাম মাল খরচ করা যাবে না। অবশ্য যদি কোন গরীব ব্যক্তি উক্ত টাকার মালিক হয়, তাহলে সে ব্যক্তি উক্ত টাকা তার দ্বীন-দুনিয়ার যে কোন বৈধ কল্যাণে ব্যায় করতে পারবে।

আর আপনি বলেছেন যে, মসজিদের পায়খানাও মসজিদের অংশ। এ কথা ঠিক নয়। কারণ, এটা যদি মসজিদের অংশ হত, তাহলে সেখানে নামায পড়াও জায়িয হত। বাথরুম ও পায়খানা শুধুমাত্র মাসালিহে মসজিদের মধ্যে গণ্য। সেটা মূল মসজিদের কোন অংশ নয়।

অতএব, মসজিদ এবং মসজিদের পায়খানা ও বাথরুমের হুকুমও ভিন্ন। আর মসজিদের জন্য কোন অবস্থায় সুদী টাকা ব্যয় করা যাবে না, কিন্তু মসজিদের পায়খানা ও বাথরুমের জন্য সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত তা খরচ করা যেতে পারে।

সুদের টাকা আপনি উপরোল্লিখিত মাসরাফ তথা ব্যয়ের স্থানে খরচ করবেন। তবে মসজিদের বারান্দা বা ইমামের কামরা নির্মাণের কাজে ব্যয় করবেন না। [প্রমাণঃ আততারগীব ওয়াতারহীব ২:৫৪৫, রদ্দুলমুহতার ১:৬৫৮; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৩:১৭১; কিফায়াতুল মুফতী ৫:৫৮:৫৯]

অবৈধ টাকায় নির্মিত মসজিদের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ অবৈধ (সুদ, ঘুষ) টাকার দ্বারা নির্মিত মসজিদে নামায পড়া জায়িয হবে কিনা? যদি কোন ব্যক্তি উক্ত মসজিদে নামায পড়ে বাড়ির বা অন্য কোথাও নামায পড়ে, তবে কি সে জামা'আত তরক করার ব্যাপারে হাদীসে যে ধমকি এসেছে, তার আওতায় পড়বে?

জবাবঃ ওয়াকফকৃত স্থানে কারো অবৈধ টাকায় নির্মিত মসজিদে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। তবে মাকরূহ থেকে বাঁচার জন্য মহল্লাবাসীদের কর্তব্য- অবৈধ টাকা দানকারীকে তার প্রদত্ত পরিমাণ টাকা ফেরত দেয়া। তখন আর উক্ত মসজিদে নামায পড়া মাকরূহ হবে না। উল্লেখ্য যে উক্ত মসজিদে মাকরূহ থেকে বাঁচার জন্য উল্লেখিত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী অন্য কোন মসজিদে জামা'আতে শরীক হয়ে নামায পড়তে থাকবে। কিন্তু যদি অন্য কোন মসজিদ না থাকে, তাহলে উক্ত অবৈধ টাকায় নির্মিত মসজিদেই জামা'আতে শরীক হয়ে নামায পড়তে থাকবে। জামা'আত তরক করা যাবে না। এমন ক্ষেত্রেও জামা'আত তরক করে ঘরে নামায পড়লে, হাদীসের ধমকির আওয়াতাভুক্ত হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬১২; কিফায়াতুল মুফতী ৭:৬৩; ফাতাওয়া রশীদিয়া ৫২৭; ফাতাওয়া রাহমানিয়া ৬:৯৯; ফাতাওয়া শামী ১: ৬৮৫]

মসজিদের সভাপতি কিংবা সদস্য অমুসলিম হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের কোন সদস্য কিংবা সভাপতি অমুসলিম হলে কোন অসুবিধা আছে কিনা? উল্লেখ্য, আমাদের মসজিদের কমিটিতে সকলে সরকারী চাকুরীজীবি, প্রায় তারা পরিবর্তন হয়ে থাকে। কোন কোন সময় মুসলমান অফিসারের পরিবর্তে হিন্দু অফিসার এসে থাকে। এমতাবস্থায় অধিকার বলে হিন্দু অফিসার মসজিদ কমিটির সদস্য কিংবা সভাপতি বা সেক্রেটারি হলে কোন অসুবিধা হবে কিনা?

জবাবঃ শরী'আতের আলোকে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে ওয়াকফকৃত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। এর বিরোধিতা বৈধ হবে না। আর সে নীতিমালার উপর চালানোর জন্য মুতাওয়াল্লী ও ক্যাশিয়ার এবং সেক্রেটারী অবশ্যই তার নিয়মাবলী ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অন্যথায় নাজায়েয ও অনধিকার চর্চা করে ফেলবে। যা শরী'আতে জায়িয নেই।

সেহেতু কোন হিন্দু বা অমুসলিম ব্যক্তিকে মসজিদ বা মাদরাসার সেক্রেটারী, সভাপতি অথবা ক্যাশিয়ার বানানো জায়িয হবে না। বরং তার স্থলে কোন দ্বীনদার আমানতদার ও প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানী ব্যক্তিকে মনোনীত করা চাই। কোন পরহেজগার আলিম হলে আরো ভাল এবং সাধারণ সদস্যও উপরোক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া চাই।

তবে যদি কোথাও এ ধরনের কোন হিন্দু বা অমুসলিমকে নিয়মানুযায়ী সভাপতি, সেক্রেটারী বা ক্যাশিয়ার বানানো হয়ে থাকে, তাহলে তাকে হিকমত তথা কোন কৌশলে উক্ত পদ অপসারণ করতে হবে। যেন এ

জন্য কোন ফিতনার সম্মুখীন না থেকে হয়। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৩৮০; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:১৬৪; বুখারী ২:১০৬১]

মাদরাসা

মসজিদ মাদরাসার টাকা ঋণ প্রদান

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদ মাদরাসার টাকা কোন ব্যক্তিকে ঋন দেয়া যাবে কি?

জবাবঃ মসজিদ মাদরাসার টাকা কাউকে ঋণ হিসাবে প্রদান করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয নয়। কারণ, মসজিদ মাদরাসার পরিচালক ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী। তারা আমানতদার হিসাবে উক্ত ধন-সম্পদ থেকে কাউকে ঋণ দেয়ার অধিকার তাদের নেই। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১:৫২৬; ফাতাওয়া শামী ৪:৩৮০; আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪১৭]

মাদরাসার জন্য দানকৃত টাকা নিজ কাজে ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ এক ব্যক্তি আমার নিকট এই বলে ছয়শত টাকা দিয়েছে যে, তার পিতা-মাতার রূহের মাগফিরাতের জন্য আরবী এক সেট বুখারী শরীফ ক্রয় করে কোন একটা মাদরাসায় দান করে দিতে। এখন আমি যদি সেই টাকাগুলো দিয়ে আরবী বুখারী শরীফ ক্রয় না করে এবং মাদরাসায় না দিয়ে ধর্মীয় কিছু কিতাব ক্রয় করে আমার নিকট রেখে নিজে পড়ি, তাহলে তা আমার জন্য জায়িয কি-না?

জবাবঃ বর্ণিত অবস্থায় আপনি ছয়শত টাকা দিয়ে আরবী বুখারী শরীফ ক্রয় করে মাদরাসায় দান করার জন্য দাতার পক্ষ থেকে উকিল হয়েছেন। আর উকিলের জন্য মুআক্কিলের পক্ষে থেকে উল্লেখিত খাত ছাড়া ভিন্ন কোন খাতে ব্যয় করা বা নিজের জন্য ব্যয় করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয ও খিয়ানতের সমতুল্য। যদি আপনি এ ধরনের কোন কিছু করে থাকেন, তবে আপনার করণীয় হল উল্লেখিত পরিমাণ টাকা জরিমানা দিয়ে শর্ত অনুযায়ি এক সেট আরবী বুখারী শরীফ ক্রয় করে কোন মাদরাসায়

ওয়াকফ করে দেয়া। [প্রমাণঃ সূরা মুমিনুন ৮; সূরা নিসা ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৩১৯]

ব্যক্তিগত কাজে মসজিদ মাদরাসার জিনিস ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের বা মাদরাসার কোন আসবাবপত্র কোন ধর্মীয় বা বিবাহ অনুষ্ঠানে, ইমাম বা মহল্লার অন্য কোন লোক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে কিনা? যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে ব্যবহার নিষেধ হয়ে থাকে, অথবা ইলম না থাকার কারণে ব্যবহার করে থাকে তবে শরী'আতের বিধান মত ফায়সালা কি? এবং মসজিদের পুরাতন, ছিড়া তাবুর কাপড় ইস্তেঞ্জার কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

জবাবঃ মসজিদের আসবাবপত্র ব্যক্তিগত কাজে বা অন্য কোন দুনিয়াবী কাজে ব্যবহার করা জায়িয নয়। এমনিভাবে মসজিদের জিনিস মসজিদের বাহিরে কোন ধর্মীয় কাজেও ব্যবহার করা জায়িয নয়।

তবে হ্যাঁ, ঐ সব জিনিসের ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ করার সময় মসজিদ ও মসজিদের আমানদারী জন্য অন্যান্য দুনিয়াবী বা দ্বীনী কাজে ব্যবহার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে ওয়াকফকারী যতটুকু অনুমতি দিয়েছেন, ততটুকু মধ্যে মসজিদের আয়ের জন্য ধর্মীয় বা অন্য কোন দুনিয়াবী কাজে ব্যবহার করা যাবে।

তেমনীভাবে মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত জিনিসও কেউ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। পিছনের ভুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করে নিবে এবং মসজিদ মাদরাসায় কিছু টাকা দিয়ে দিবে।

মসজিদের জিনিস মসজিদের কাজে না আসলে তা খরিদ করে নিজস্ব কাজে লাগানো যাবে, তবে কোন নাপাক স্থানে ব্যবহার না করা চাই।

মসজিদে ব্যবহৃত তাবু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মসজিদের ইহতেরামের পরিপন্থী বিধান, না করাই উচিৎ। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৩৬৬; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:১০৬; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬:২০৫]

বদলী হজ্জের টাকা দিয়ে মাদরাসার জন্য জমি ক্রয়

জিজ্ঞাসাঃ আমার পিতা প্রায় পঁয়ষট্রি বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন। জীবিতবস্থায় তার উপর কখনো হজ্জ ফরজ ছিল না। তাছাড়া মৃত্যুর আগে তিনি এ মর্মে কোন ওসীয়্যতও করেননি । তবে ছেলে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার বদলী হজ্জ করবে বলে নিয়্যাত করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ছেলে শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল, সুতরাং তার পক্ষে পিতার বদলী হজ্জ আদায় করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ছেলে পিতার রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশে বদ্দলী হজ্জের টাকা দিয়ে মাদরাসা চালু করেছে এবং মাদরাসার জন্য জমি ক্রয় করেছে দিয়েছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ছেলের জন্য পুনরায় পিতার বদলী হজ্জ করানো জরুরী কি না?

জবাবঃ যেহেতু পিতার উপর হজ্জ ফরজ ছিল না এবং তিনি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করানোর জন্য ওসীয়্যতও করে যাননি; সুতরাং কেবলমাত্র নিয়্যাত করার দ্বারা ছেলের উপর তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো জরুরী হয়নি।

সুতরাং আবেদনকারীর পিতার পক্ষ থেকে বদলী নফল হজ্জ আদায় না করে উক্ত টাকা দিয়ে মাদরাসা চালু করা ও মাদরাসার জমি ক্রয় করা উত্তমই হয়েছে। এর দ্বারা তার পিতা সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাবেন। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ২:৬২১; ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ২:৫৭৬]

ছাত্রদের দ্বারা মাদরাসার কাজ নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন কউমী মাদরাসার মুহতামিম (প্রিন্সিপাল) মাদরাসার উন্নতির জন্য অনেকগুলো পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করেন এবং কয়েকটি ডিপ টিউবওয়েলে শেয়ারে শরীক হন। মাছ চাষ ও ধানের ফসলের সময় কয়েকদিন পরপরেই ছাত্রদের দ্বারা (ক্লাশ না থাকাবস্থায়) কাজ করানো হয়। মাদরাসার আর্থিক উন্নতির জন্য মৌসুমে মৌসুমে ধান কালেকশন করা হয়।

জবাবঃ মাদরাসা, মসজিদ বা কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতা করা জরুরী। বর্তমান যুগে মাদরাসা বাকী থাকার অর্থ পূর্ণ দ্বীনী বাকী থাকা। মাদরাসা বাকী থাকলে মসজিদ, খানকা, তাবলীগ ইত্যাদি বাকী থাকবে। সুতরাং মাদরাসাকে বাকী রাখা সকলের জন্য জরুরী। আর সেজন্য মাদরাসার যত ধরনের কাজ আছে সবগুলোতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করা এবং সেখানে শারীরিক ও আর্থিক সাহায্য- সহযোগিতা করাও অপরিহার্য।

আর এসব কাজ কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত নয়। বরং সকলের জন্যই জরুরী। সুতরাং, মাদরাসার কোন কাজে যদি কোন ছাত্রকে লাগানো হয়, তাহলে সেটা উক্ত ছাত্রের জন্য আনন্দের সাথে গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত মাদরাসার ছাত্রদের দ্বারা ক্লাসের অবসরে মাদরাসার যে কোন কাজ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং ছাত্ররা যদি এরূপ কাজে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে, তাহলে তারাও দ্বীন বাকী রাখার সহযোগিতা করার দরুন সাওয়াব লাভ করবে। তবে মাদরাসার কর্তৃপক্ষ, মুহতামিম ও শিক্ষকগণের এদিকেও লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, তারা যেন ছাত্রদের দ্বারা এত বেশী কাজ না নেন, যাতে তাদের অধিক কষ্ট হয় বা পড়া-লেখার ক্ষতি হয়। কারণ, মাদরাসা তো ইলমে দ্বীন শিক্ষা করাই জন্যই। আর সেটাই যদি নষ্ট হয়ে

যায় বা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে সেই মাদরাসা কালেকশন করে বাকী রাখায় লাভ কি? [প্রমাণঃ সূরা বাকারাহ ১৪৮; সূরা মায়িদাহ ২; বুখারী শরীফ ১:১৯; আল ইলমু ওয়াল উলামা ৫৭-৬০]

মসজিদ-মাদরাসার পরিচালকের যোগ্যতা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদ-মাদরাসার পরিচালকদের কি ধরনের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন? এবং তাদের কতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন?

জবাবঃ মসজিদ অথবা যে কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক দ্বীনদার, আমানতার, শরী'আতের পাবন্দ, খোদাভীরু হওয়ার সাথে সাথে তাদের এতটুকু জ্ঞান ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া জরুরী, যার দ্বারা তারা পরিচালনার কাজে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়। পরিচালনার যোগ্যতা ব্যতীত এবং এতটুকু পরিমাণ জ্ঞান থাকা ব্যতীত শুধু মাত্র দ্বীনদার, পরহেযগার হলেই যথার্থ হবে না। বরং তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মজলিসের মুরুব্বী ও বড়দের সাথে পরামর্শ করার এবং জিজ্ঞাসা করার গুণও থাকতে হবে।

পক্ষান্তরে কোন ফাসিক, খেয়ানতকারী ও শরী'আতের খেলাফ চাল-চলনে অভ্যস্ত, পরিচালনায় অদক্ষ কোন ব্যক্তিকে মসজিদ বা কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বানানো জায়িয হবে না। এ সম্পর্কে হযরত ইমাম মালিক রহ. বলেন, মুসলমানের পথ প্রদর্শক সে ব্যক্তিই হতে পারে, যে হুযুর ﷺ এর উত্তম আদর্শের দৃষ্টান্ত হয়। হাদীস শরীফ হুযূর ﷺ অযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করাকে কিয়ামতের আলামত হিসাবে উল্লেখ্য করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর বাণী উদ্ধৃত করে বলেন

যে, কোন কাজের দায়িত্বভার অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত।

তাই দ্বীনদার, আমানতদার, খোদাভীরু, দ্বীনী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই এ সমস্ত কাজের হক্বদার। তাছাড়া কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের গলদ পদ্ধতি অনুস্মরন করা, মুসলমানদের কোন প্রয়োজন নেই।

শরী'আতের দৃষ্টিতে যোগ্যতর লোক থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের উপর ভিত্তি করে অযোগ্য লোককে পরিষদের সদস্য করা বা অযোগ্য ব্যক্তিকে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত করা জায়িয নয়। [প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ২:১০৬১; ফাতাওয়ায়ে শামী ৪:৩৮০; ফাতাওয়া হিনদিয়্যায়ে মাহমূদিয়া ২:৪৫২; ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ২:১৬৪]

মাদরাসা সরিয়ে ব্র্যাক স্কুল তৈরি

জিজ্ঞাসা: আমাদের বাড়ির পার্শ্বে একটি ইবতিদায়ী মাদরাসার জমির উপর ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ একটি স্কুল তৈরি করছে। এই মাদরাসার জমি তারাই দান করেছিল। কাজেই এই ব্র্যাক স্কুল সরাতে বললে, তারা মাদরাসা সরাতে বলে এবং তারা বলে যে, যদি এ ব্যবস্থা না হত, তাহলে আমরা খেতে পারতাম না। তাদের এ ধরনের আকীদার হুকুম কি? এবং সে সমস্ত অভিভাবকরা নিজ সন্তানদেরকে এ স্কুলেও পড়ায় এবং যারা এই ব্র্যাক সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের হুকুম কি?

জবাবঃ শরী'আতের বিধান অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে কোন মসজিদ বা মাদরাসার ওয়াকফকৃত জিনিস অন্য মসজিদ বা মাদরাসার কাজে লাগান জায়িয নয়, সে ক্ষেত্রে কোন মাদরাসার ওয়াকফকৃত জমিতে মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টানদের চক্রান্তে মুসলমাদের দ্বীন থেকে সরানোর উদ্দেশে

প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক স্কুল ঐ মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত জায়গায় তৈরি করার প্রশ্নই উঠে না। এটা আল্লাহর দেয়া সম্পদ তার নাফরমানীর কাজে ব্যয় করা বৈ কিছু নয়। অধিকন্তু ব্র্যাক সংস্থা কর্তৃক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেবামূলক দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে এটা একটি ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের কৌশল। কেননা-এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের সন্তানদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা-সংস্কৃত থেকে বিমুখ করে বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে কু-আদর্শে আদর্শিত করে তোলা। সুতরাং এ দৃষ্টি কোন থেকে ব্র্যাক সমিতিকে মাদরাসার জমিতে স্কুল প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়া ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের সহায়তা ছাড়া আর কিছু নয় । তাই যারা এ কাজে অনুমতি দিয়েছে, বা সহায়তা করেছে, তাদের একান্ত উচিত, সেখানে থেকে ব্র্যাক স্কুল সরিয়ে মাদরাসার উন্নতির কাজেই সম্পূর্ণ জমি ব্যবহার করা এবং কৃত এ অপরাধমূলক কাজ থেকে তাওবা করা। [প্রমাণঃ সূরা মায়িদা আয়াতঃ ২]

তারা বলে যে, ‘এ ব্র্যাক ব্যবস্থা যদি না হতো তাহলে তারা খেতে পারতো না, তাদের এ উক্তি এবং আকীদা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত’। কারণ আল্লাহ তা‘আলা রিযিকদাতা। তিনি বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই রিযিক দিবেন। [প্রমাণঃ সূরা হুদ, ৬ আয়াত]

আমাদের দেশে ব্র্যাক স্কুল ছাড়া অনেক স্কুল-কলেজ আছে। কাজেই ব্র্যাক স্কুল ভর্তি করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, ব্র্যাক স্কুলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে। মুসলমানদের দ্বীন থেকে সরিয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা বা কমপক্ষে খৃষ্টান সমাজের সেবাদাস তৈরি করে শেষ পর্যন্ত সেবার নামে এদেশের কর্তৃত্ব দখল করা। যেমন, তারা ইতিপূর্বে ব্যবসার নামে এদেশে এসে এদেশ দখল করে মুসলমানদেরকে দুইশত বছর গোলাম বানিয়ে

রেখেছিল। কাজেই ব্র্যাক স্কুলে কোন মুসলমানদের সন্তানদের ভর্তি করা জায়িজ হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত ব্র্যাক সমিতিতে অংশগ্রহণ করা ও শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। কারণ, ব্র্যাক সমিতি সম্পূর্ণ সুদের উপর পরিচালিত হয়। এদের যে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার অর্থ মুসলমানদেরকে এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করা। উল্লেখ্য, এসব এনজিওদের আসল চেহারা প্রথম পর্যায়ে বুঝার কোন উপায় নাই। কারণ তারা মুসলমানদের বড় বেশী খায়ের খাহ ও কল্যানকামী বেশে কোন এলাকায় কাজ শুরু করে, এরপর যখন তাদের ভিত মজবুত হয় এবং এলাকায় তাদের যথেষ্ট তাবেদার সৃষ্টি হয় এবং তাদের পেতে রাখা বড়শী মুসলমানদের গলায় ভালভাবে আটকে যায়, তখন তাদের আসল রূপ প্রকাশ পায় এবং তখন তারা স্পষ্টভাবে খৃষ্টধর্মের দিকে দাওয়াত দেয়া শুরু করে। আর সরল প্রাণ মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান হরণ করে নেয়। তখন আর এলাকার দ্বীনদার দেশপ্রেমিক লোকদের কিছু করার থাকে না।

কারণ তখন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে, বখাটে যুবক ও বেহায়া উচ্ছৃঙ্খ মেয়েদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে হয়।

প্রচলিত মহিলা মাদরাসা

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে নিয়ম-পদ্ধতিতে মহিলা মাদরাসামূহের প্রচলন রয়েছে, এ নিয়ম অনুযায়ী মহিলা মাদরাসা করা, শিক্ষকতা ও শিক্ষাগ্রহণ করা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জায়িয কিনা?

যদি প্রচলিত পদ্ধতিতে মহিলা মাদরাসা জায়িয না থাকে তাহলে মহিলা মাদরাসা জায়িযের পদ্ধতি কি?

জবাবঃ ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর উপরই ফরয। বিশেষ করে ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে মহিলাদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন। এর মধ্যে ঐ সব হাদীস উল্লেখ করেছেন যে গুলোর মধ্যে মহিলাদের একটি স্থানে একত্রিত করে ইলম দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার প্রতি গুরত্বারোপ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা জরুরী।

বর্তমানে আমদের দেশে যে সকল মহিলা কওমী মাদরাসা চালু আছে সাধারণত অধিকাংশ মাদরাসায় মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়। যেখানে পুরুষ শিক্ষক রয়েছে তারা পর্দা রক্ষা করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সুতরাং বাস্তবিক এভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা করে থাকলে তা জায়িজ আছে। তবে মহিলা দ্বারা পড়ানোই ভাল। আর যদি মহিলা শিক্ষিকা না পাওয়া যায় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে বিবাহিত, বয়স্ক, খোদাভীরু, মুত্তাকী পুরুষও বালিগা মেয়েদের পড়াতে পারবেন ।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ মহিলা মাদরাসাগুলো আবাসিক, সেখানে ছাত্রীবাসে রেখে ছাত্রীদের পড়ানো হয় এবং শিক্ষা শেষ করে বাহির হওয়ার পর তাদেরকেও মাওলানা বলা হয় বা মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড থেকে তাদেরকে পরীক্ষা নিয়ে সনদও দেওয়া হয়। এগুলো তাদের অনেকের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়।

এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হলো মহিলা মাদরাসা করা খুবই ঝুকিপূর্ণ কাজ। এতে লাভের চেয়ে অনেক ক্ষতি বেশী হয়ে যায়। এ জন্য হক্কানী, বিচক্ষন ও বিজ্ঞ উলামাদের তত্ত্বাবধানে তা করা উচিত এবং মহিলাদের উপযোগী সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো উচিত। পুরুষদের ন্যায় লম্বা সিলেবাস তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

মুত্তাকী পরহেযগার পুরুষ শিক্ষক দ্বারা পড়াতে হলেও পূর্ণ পর্দা ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে বেপর্দার কোন সুরত না হতে পারে এবং প্রত্যেক এলাকায় মহিলা মাদরাসা থাকবে, যাতে দূর থেকে না আসতে হয় এবং মাদরাসা অনাবাসিক হবে। মেয়েরা আশ-পাশ থেকে এসে পড়ে যাবে। বিভিন্ন স্বভাবের মেয়েরা দীর্ঘ সময় একত্রে থাকা তাদের চরিত্রের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এতে করে অনেক মেয়ে চরিত্রহীনাও হয়ে যেতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনে স্বামীর অনুগত হয়ে চলা তার জন্য সম্ভবপর হয় না। সে কারণে স্বামী-স্ত্রীর অনেক পেরেশানী উঠাতে হয়।

এসব কারণে অনেক উলামাগণ মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করার পক্ষে মত দিয়ে থাকেন এবং মহিলাদেরকে নিজের মাহরাম আত্মীয়ের নিকট দ্বীন শিক্ষা করতে উৎসাহিত করেন। [প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ১:২০; কিফায়াতুল মুফতী ২:২৬ ও ৩৫]

মহিলা মাদরাসায় শিক্ষকতা

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েদের মাদরাসায় পড়ানো যাবে কিনা? প্রচলিত স্বতন্ত্র এসব মহিলা-মাদরাসা ভবন গড়ে উঠেছে, যেখানে ঘরোয়া পরিবেশ অবশিষ্ট থাকে না, এ ধরণের মাদরাসা কায়িম করা কতটুকু ঠিক? মহিলাদের দ্বীনী তালীম দেয়ার ভালো পদ্ধতি কি হতে পারে? এ ব্যাপারে বিশেষভাবে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মাসলাক জানতে চাই।

জবাবঃ আমাদের আকাবিররগনের মধ্যে স্বতন্ত্র মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম ছিল না। পরিবারে পিতা, স্বামী বা ভাই অধীনস্থ মহিলাদেরকে দীন শিক্ষা দিতেন- এ নিয়ম চলে আসছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে দ্বীন শিক্ষা দিতেন এ নিয়মই চলে আসছে। কিন্তু সময়ের

পরিবর্তনে যেহেতু অধিকাংশ পুরুষ অভিভাবরাই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ মেয়েদেরকে দ্বীন শিখানো ফরজ তাই এ দায়িত্ব পালনে স্বল্প পরিসরে ঘরোয়া পরিবেশের মাদরাসায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা শর্তাধীন জায়িয হবে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও জরুরত পরিমাণ ইলম দ্বীন শিক্ষা দেয়া ফরয আইন। যাতে ইলম দ্বীন শিখে মেয়েরা তাদের ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা লাভ করে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক যিন্দেগী পরিচালনা করতে পারে। এখন জানতে হবে, এর জন্য কি ব্যবস্থা উপকারী, কি ব্যবস্থা ক্ষতিকর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বতন্ত্র মহিলা বিদ্যালয় অথবা মহিলা মাদরাসার মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষা দেয়া বিষতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি মহিলা মাদরাসা মোটেই পছন্দ করি না। যদিও সে মহিলা মাদরাসা কোন বিজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হোক না কেন। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, স্বতন্ত্রভাবে পুরুষদের মাদরাসার ন্যায় মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্টা করা আদৌ ঠিক হবে না। আমার এ পরামর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যদি কেউ এ কাজ করে, তাহলে পরবর্তীতে তার আফসোস করতে হবে। কাজেই তোমরা মহিলা স্কুল এবং মহিলা মাদরাসা ছেড়ে দাও। সেখানে মেয়েদেরকে না পাঠিয়ে বাড়িতেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর। যদি পবিত্র কুরআন ও দ্বীনী আরবী কিতাব শিক্ষা দাও, তাহলে তো ভালই, তা না হলে, মাতৃভাষায় রচিত দ্বীনী কিতাবের মাধ্যমে তালীমের ব্যবস্থা করা উচিত ।

তিনি বলে, হুকুকুল বাইত নামে আমার একটি নসীহতনামা আছে। সেখানে এ ব্যপারে বিস্তারিত বলেছি, দেখে নেয়ার অনুরোধ করছি। তিনি বলেন, সম্মানী লোকেরা কখনো স্বতন্ত্র মহিলা মাদরাসা পছন্দ করতেন

না। বড় গ্রাম-গঞ্জের অনেক মেয়েই দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে থাকে, কিন্তু তারা মাদরাসায় না গিয়ে নিজ-নিজ বাড়িতেই শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কেউই মাদরাসায় গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেনি। থানভী রহ. বলেন, স্বীয় বাড়িতে থেকে শিক্ষিত হলে মেয়েদের চারিত্রিক বা অন্য কোন দিকের ক্ষতির কোন আশংকা থাকে না। কেননা সেক্ষেত্রে শিক্ষিকাও উপযুক্ত থাকে এবং পর্দাও রক্ষা হয়ে যায়। আর মেয়েরাও পর্দায় থেকে দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করতে পারে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা গেছে যে, বর্তমান সমাজে স্বতন্ত্র যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় বা বালিকা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হযরত থানভী রহ. বলেন, এখন প্রশ্ন হল, এ সমস্ত মেয়েদের স্কুল বা মাদরাসা ক্ষতিকর হল কিভাবে? কেউ কেউ বলে থাকেন, মহিলা মাদরাসা বা স্কুলে পর্দার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এমন কি পর্দা রক্ষা করে গাড়ি দ্বারা মেয়েদেরকে মাদরাসা বা স্কুলে পৌঁছানো হচ্ছে। তারপরও কিভাবে ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে? হযরত থানভী রহ. বলেন, কারণটা কি, তা আমার জানা নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা এতটুকু বুঝা যায় যে, স্কুল বা মাদরাসার তালীম মেয়েদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা, এর দ্বারা মেয়েরা স্বাধীনমনা এবং লজ্জাহীনা হয়ে যায়, পর্দার প্রতি তাদের অনীহা ভাব সৃষ্টি হয়। মহিলাদের সব চেয়ে বড় একটি গুণ হল হায়া বা লজ্জা। এই হায়াই হল সমস্ত কল্যাণ বা মঙ্গলের চাবি-কাঠি। মেয়েদের মধ্যে যদি এই হায়া (লজ্জা) না থাকে, তাহলে তাদের থেকে কখনো কোন প্রকারের কল্যাণের আশা করা যায় না। এক হাদীসে হুযূর ﷺ বলেন, যখন তুমি নির্লজ্জ হয়ে যাবে তখন তুমি যা খুশি তা করতে পারবে।

অবশ্য এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো এটা আমার নিজস্ব মতামত, কোন ফাতাওয়া নয়।

হযরত থানভী রহ. আরো বলেন, ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের জন্য নিয়ম মাফিক স্বতন্ত্র মকতব, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষটা আমার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। কেননা, এতে এমন কতগুলো সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর লক্ষ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহিলাদের জন এ ধরণের ধারাবাহিক মকতব, মাদরাসার ব্যবস্থা মোটেই ভাল বলে মনে হয় না। এটা পরীক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর এর কারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে একথা লক্ষণীয় যে, এটা আমার কোন ফাতাওয়া নয়, বরং আমার ব্যক্তিগত মতামত। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মহিলাদের তালীমের জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং তাতে কোন প্রকার ক্ষতিরও আশংকা না থাকে, তাহলে তা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করবেন। তবে যে কোন উপায়ে হোক না কেন, মেয়েদের জন্য ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। যার দ্বারা তারা ঈমান-আকীদা, আমল- আখলাক শিক্ষা অবশ্যই করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে আধুনিক শিক্ষা দিবে না। এতে তাদের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক নষ্ট ও বরবাদ হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে হযরত থানভী রহ. মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষার বিবেচনা করে এর পক্ষে যে মত প্রকাশ করছেন এবং স্বয়ং তিনি নিজে মেয়েদের ঘরোয়া পরিবেশের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে এর যে রুপরেখা পছন্দ করেছেন, সে সম্পর্কে হযরত রহ. বলেন,

আমি থানভবনে মেয়েদের জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি। তার পদ্ধতি হল এই যে, মেয়েরা একজন দ্বীনদার শিক্ষিকার নিজস্ব ঘরে শিক্ষার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, সেই ঘরটাকেই পক্ষান্তরে মহিলা মাদরাসা মনে করা হত। অর্থাৎ মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র কোন ঘর বা মাদরাসা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এমন নয়, শিক্ষিকার আবাসই

মেয়েদের মাদরাসা রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমি এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করেছি যে, আমি নিজে কোন মেয়েকে ঐ বাড়িতে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করিনি। বরং ঐ শিক্ষিকাকে বলে দিয়েছি, ছাত্রী জমা করার দায়-দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা যত বেশি পরিমাণ ছাত্রী জমা করাতে পারবে, সেই হিসাবে অতিরিক্ত ভাতাও প্রদান করা হবে। এই মাদরাসা মাসিক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা দেয়ার জন্য মেয়েরা নিজারাই আমার বাড়িতে চলে আসে। আমার স্ত্রীর বা আমার পরিবারের কোন মেয়ে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করে। আমি নিজে কখনো তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করি না এবং তাদেরকে পরীক্ষার জন্য আমার বাড়িতে ডাকাও হত না। বরং তারা নিজেরাই সময়মত পরীক্ষা দেয়ার জন্য চলে আসে, আর পরীক্ষা গ্রহণকারীণীরা তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করে। আমার কাছে শুধু পরীক্ষার ফলাফল পেশ করা হয়। নাম্বারের উপর আমার কোন প্রকার দখল বা কর্তৃত্ব থাকে না। বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীণীরা নাম্বার দেয়। আর আমি নাম্বারের উপর পুরস্কারের সিদ্ধান্ত করে দেই।

আলহামদুলিল্লাহ, এই পদ্ধতিতে নিয়মিতভাবে মেয়েদের মাদরাসা চলে আসছে, এতে কোন প্রকার বদনাম হয়নি। মোটকথা, মেয়েদের তালীমের ইন্তেজাম এভাবে হবে যে, মেয়েরা তালীমের জন্য স্বতন্ত্র কোন মাদরাসায় একত্রিত হবে না, বরং তারা নিজেদের ঘরে থেকেই দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করবে। কিন্তু বর্তমানে তালীমের এই নিয়মটাও পালন করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে অগত্যা যদি কোথাও একত্রিত হয়ে তালীম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে এতটুকু অবশ্যই করতে হবে যে কোন পুরুষেকে তালীমের জিম্মাদার বানাবে না। বরং পুরুষগণ নিজেদের পরিবারবর্গের মহিলাদের মাধ্যমে মেয়েদের তালীম তরবিয়্যত ও

দেখাশুনা ব্যবস্থা করবে। পুরুষ সরাসরি ঐ সব মেয়েদের সাথে কোনভাবেই কথা বলবে না।

এক্ষেত্রে অন্য একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা জরুরী। তা হলো, সেক্রেটারী বা অন্য যে ব্যক্তি উক্ত মাদরাসার বাহ্যিক যিম্মাদার, তিনি মুত্তাকী ও খোদাভীরুতা অবলম্বনকারী হবেন। যদিও তিনি আলেম নন, কিন্তু তাকে আলেম-মাওলানাদের বেশ-ভূষা অবশ্যই ধারন করা কর্তব্য। যাতে করে তার এই তাকওয়ার বেশ-ভূষা মহিলাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আমার জ্ঞান বা মতামত অনুযায়ী মহিলাদের দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার এটাই নীতী। এখন অন্যান্য লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে যদি কোন আরো ভাল ত্রুটিমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ করে যেতে পারে, তাহলে আমার খেয়াল বা মতামতের অনুস্মরণ করা জরুরী নয়।

হযরত থানভী রহ. বলেন, মেয়েদের তালীমের জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি যা দীর্ঘ দিন যাবৎ চলে আসছে, তা হল-২/৪ জন মেয়ে নিজেদের পরিচিত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দ্বীনদার শিক্ষিকার বাড়িতে এসে লেখাপড়া করবে। সম্ভব হলে, এমন মহিলার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে, যিনি তালীমের কোন বিনিময় গ্রহণ করেন না। তাহলে সেই তালীম খুবই বরকতময় হবে। তবে প্রয়োজনে অপরাগতার ক্ষেত্রে বেতন দিয়েও পড়া-লেখা করতে পারবে। তাতে কেন প্রকার অসুবিধা নেই। যদি কোথাও পড়ানোর মত কোন যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষিকা পাওয়া না যায়, তাহলে নিজের পরিবারের পুরুষ লোকে মেয়েদের দ্বীনী ইলম দিবে। পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি আলেম হন, তাহলে তো তিনিই পড়াবেন। আর যদি পুরুষদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আলেম না হন, তাহলে পরিবারের মেয়েদের

মধ্যে যদি কেউ শিক্ষিতা হন, তখন তিনিই পড়াবেন। তাও যদি সম্ভবপর না হয়, তাহলে অন্য কোন দ্বীনদার মহিলা দ্বারা পড়ানোর ব্যবস্থা করবেন।

হযরত থানভী রহ. এর এ আখিরী বয়ান দ্বারা উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও শর'ঈ পর্দা বজায় রেখে মেয়েদের ঘরোয়া পরিবেশের মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাশওয়ারা পাওয়া যায়। তাই মেয়েদের ঘরে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার মত বন্দোবস্ত করতে না পারলে, মাদরাসায় পড়াতে পারে। মোট কথা, যেভাবেই হোক, শরী'আতের গন্ডি বজায় রেখে মেয়েদের দ্বীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। [প্রমাণঃ হযরত থানভী রহ. এর ইসলাহে খাওয়াতিন ৩৩৭ পৃঃ]

পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকের সমন্বয়ে মহিলা মাদরাসা করা

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান যামানায় মহিলাগণ বেপর্দাভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজও এনজিওদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিজেদের ঈমানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এমন, মুহূর্তে বালেগা মহিলা মাদরাসা করে আবাসিকভাবে তাদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দেয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা আছে কিনা? উস্তাদ যদি মহিলা হয় কিংবা কোন পুরুষ উস্তাদ পর্দা রক্ষা করে সাউন্ডবক্স এর মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারবেন কিনা?

জবাবঃ ফরযে আইন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা সকল মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। এই ফরয আদায়ের জন্য ছেলে-মেয়ে সকলের জন্য ব্যবস্থা থাকা জরুরী। কারণ, সকল মাতাপিতা এতটুকু দ্বীনী জ্ঞান রাখেন না, যার দ্বারা নিজের ছেলে মেয়েদের ফরযে আইন পরিমাণ ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারেন। উক্ত জরুরতের প্রেক্ষিতে নাবালিগা অল্প বয়স্কা মেয়েদের জন্য মাদরাসা করার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অনুরূপভাবে বালিকা মহিলাদের জন্যও শর'ঈ পর্দা রক্ষার পুর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে নিরাপদ

ও ঘরোয়া পরিবেশে মকতব বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা জায়িয আছে। হাদীস শরীফে এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন, ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফে মহিলাদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে একটি ভিন্ন অধ্যায় কায়িম করেছেন এবং এর আওতায় ঐ সব হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে মহিলাদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করে ইলম দ্বীন শিক্ষা দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়ছে। (বুখারী ১ম খন্ড ২০ পৃঃ) তবে বালিগা মেয়েদের জন্য মহিলা মাদরাসা করা খুবই ঝুকিপূর্ণ কাজ। পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন না করলে, এতে বিপরীত হওয়া সম্ভাবনাই বেশী। তাই মহিলাদের জন্য আবাসিক বা অনাবাসিক মাদরাসা কায়িম করতে হলে, তার জন্য নিম্মের শর্ত দু'টি পূরণ করতে হবেঃ

(১) হক্কানী উলামায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শপূর্বক তাদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে মহিলা মাদরাসা কায়িম করা। কেননা মহিলাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের ফিতনার আশংকা থাকে। তত্ত্বাতধায়ক আলেম কোন ফিতনা বা কোন রকম খিলাপে শরা কাজ যাতে না হয়, বা দুর্ঘটনা না ঘটে, তার প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং দেখাশুনা করবেন ও খবরাখবর নিবেন। তিনি সব ধরনের জটিলতা ও সমস্যার সমাধান করবেন।

(২) ছাত্রীদের তালীম ও তরবিয়্যত এবং তাদের দেখাশুনায় দক্ষ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা মাদরাসা আভ্যন্তরীন কাযর্কলাপ পরিচালনা করা। প্রয়োজনে বয়স্ক, আলেম, বিবাহিত, পরহেজগার, মুত্তাকী পুরুষ শিক্ষকদের দ্বারাও পর্দার ব্যবস্থা করে মহিলাদের দ্বীনী তালীম দেয়া যেতে পারে। [কিফায়াতুল মুফতী ২:৩৫]

মাদরাসা শিক্ষাকতার পূর্ব থেকে বেতন ধার্য করা

জিজ্ঞাসাঃ মাদরাসার শিক্ষকতা করার জন্য পূর্ব থেকে বেতন ধার্য করা ঠিক হবে কি-না?

জবাবঃ ঠিক না হওয়া কোন কারণ নেই। কারণ উলামায়ে কিরাম দ্বীনী তালীমের পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়িজ বলেছেন। তবে যিনি দ্বীনী তালীম দিবেন, তিনি ইখলাসের সাথে তালীম দিতে চেষ্টা করবেন, জরুরতের কারণে ভাতা হিসেবে কিছু গ্রহণ করবেন এবং সম্ভব হলে, সেই ভাতা কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিবেন। [ফাতাওয়া শামী ৬:৫৫]

বিনা যাচাইয়ে মাদরাসায় দান গ্রহণ করা

জিজ্ঞাসাঃ বেসরকারী মাদরাসাসমূহ অনেক সময় যে টাকা দান করা হয়, তার মধ্যে অনেক টাকা অবৈধ ভাবে আয় করা থাকে। আবার অনেকে যাকাতের টাকাও দিয়ে থাকে। এ সব টাকা ধনী-গরীব সব ছাত্রদের জন্য খাওয়া বৈধ হবে কি?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে মাদরাসা পরিচালকদের জন্য জরুরী নয় যে, প্রত্যেক দানকারীকে জিজ্ঞাসা করবে যে, আপনার এ টাকা হালালভাবে আয় করেছেন, না হারামাভাবে আয় করেছেন। কারণ, এরূপ জিজ্ঞাসাবাদ রাসূলে পাক ﷺ থেকে প্রমাণিত নেই। [প্রমাণঃ নাসাই শরীফ ১:৩৬৬]

রাসূলে পাক ﷺ দানকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি হারাম মাল আল্লাহর রাস্তায় দিবে না। এতে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহগার হবে। বরং এ হারাম টাকা পাওনাদারকে ফিরত দাও। আর পাওনাদারকে না পাওয়া গেলে তার পক্ষ থেকে দান কর। অন্য দিকে দান গ্রহণকারীকে এবং সকল মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা অন্য ভাইয়ের প্রতি সু-ধারণা পোষন কর। খামাখা কারোর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করবে না। সুতরাং, যার সম্পর্কে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কিছুই জানা নেই, তার সম্পর্কে কু-

ধারনা বা সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই। সবাইকে ভাল মনে করবে এবং সবার দান গ্রহণ করবে। তবে কোন দাতা সম্পর্কে যদি কর্তৃপক্ষের পূর্ণ জানা থাকে, বা প্রবল ধারণা থাকে যে, ঐ ব্যক্তির দানকৃত মালের আয়ের সোর্স হারাম, তাহলে তার দান গ্রহণ করবে না।

সুতরাং, এ প্রশ্ন করা সহীহ হবে না যে, মাদরাসায় অবৈধভাবে আয় করা টাকা আসে। কারণ এরূপ কেউ দান করলে, দানকারী গুনাহগার হবে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বা গরীব ছাত্র যারা বোর্ডিং এ লিল্লাহ খায়, তারা দায়ী হবে না। এখন রইল, যাকাতের টাকা ধনী-গরীব সবাই খেতে পারবে কিনা, তার সমাধান এই যে, যাকাতের টাকা শুধু গরীবদের হক, এতে ধনীদের কোন হক নেই।

সুতরাং ধনীরা ছেলেদের বা ধনী ছাত্রদের জন্য তা খাওয়া জায়িয হবে না। তবে কর্তৃপক্ষ যদি শর'ঈ তামলীকের মাধ্যমে যাকাত আদায়ের ঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর তার দ্বারা বোর্ডিং পরিচালনা করেন, তাহলে সে মাসআলা ভিন্ন।

যেহেতু শর'ঈ তামলীকের জন্য মাসআলা জানা দরকার এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তা করা দরকার, কাজেই এ পথে সকলের জন্য চলা ঠিক নয়। অনেকে শর'ঈ তামলীক না জেনে হিলা করে যাকাতের টাকা অন্যত্র ব্যায় করে, তাতে যাকাত দাতাদের যাকাত সহীহ খাতে ব্যয় হবে না এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এ জন্য দায়ী হবে। [ফাতাওয়া শামী ৫:৯৯; ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ৩:৩০; ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:১৯৭; আযীযুল ফাতাওয়া ৩৬২]

পুরুষ শিক্ষক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে পড়ানো

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় মিশকাত শরীফ পর্যন্ত ছেলেদের একটি মাদরাসা আছে। উক্ত মাদরাসায় যুবতী বালেগা মেয়েরা পড়তে আসে। যবুতী মেয়েদেরকে পড়াতে অস্বীকৃতি জানালে, এলাকার লোকজন মাদরাসা ভেঙ্গে ফেলতে চায়। এমতাবস্থায় মাদরাসার উস্তাদদের জন্য উক্ত বালেগা যুবতী মেয়েদেরকে পড়ানো উচিত হবে কিনা? বা এ পরিস্থিতিতে শিক্ষকবৃন্দের করণীয় কি? উল্লেখ্য, বালেগা মেয়েদের পর্দার সাথে পড়ানোর কোন ব্যবস্তা নেই।

জবাবঃ কঠোর শর'ঈ ব্যবস্থা ছাড়া পুরুষ উস্তাদদের জন্য যুবতী বেগানা মেয়েদেরকে পড়ানো জায়িয হবে না। কারণ, আল্লাহর হুকুম বিসর্জন দিয়ে মাদরাসা টিকিয়ে রাখার কোন মূল্য নেই, অথচ পর্দা রক্ষা করা সর্ব অবস্থাই ফরজ। তদুপরি মাদরাসা কায়িম করা হয় আল্লাহর বিধান জানী করার জন্য; আল্লাহর বিধান লংঘন করার জন্য নয়। তাই উক্ত কারণে এলাকাবাসী মাদরাসা ভেঙ্গে দিলে, তারা জালিম এবং গুনাহগার হবে এবং মাদরাসা ভাঙ্গার যাবতীয় দ্বায়-দ্বায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। মাদরাসার উস্তাদগন কোন প্রকার দায়ী হবেন না। তবে সেক্ষেত্রে তাদের উচিত, অন্যত্র মাদরাসা কায়িম করে সেখানে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেয়া। অথবা উক্ত মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শরী'আত সম্মত পন্থায় মেয়েদের দ্বীন শিক্ষার জন্য উক্ত এলাকায় আলাদা একটি মহিলা মাদরাসা যদি স্থাপন করতে পারেন, তবে তার মাধ্যমে উক্ত মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। উল্লেখ্য, বালেগা মহিলাদের জন্য আবাসিক মাদরাসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। হাক্কানী উলামায়ে কিরামের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে এবং পর্দার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্তকতার ব্যবস্থা না করে, এ পথে পা বাড়ালে, দ্বীনের লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকা বেশী। [সূরা আহযাবঃ ৫৩; কিফায়াতুল মুফতী ২:৩৫,৬৩]

লিল্লাহ বোর্ডিং ফান্ডের ব্যয়ের ক্ষেত্র

জিজ্ঞাসাঃ এতিমখানা বা লিল্লাহ বোডিং ফান্ডে যে সব অনুদান আসে সেগুলো কি কেবলমাত্র এতিমদের ভরন-পোষণের জন্য ব্যয় করতে হবে? না অন্যান্য খাত যেমন, প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র ক্রয়, আবাস গৃহ নির্মাণ, এতিমদের শিক্ষক মণ্ডলীর ভাতা প্রদান করাও দুরস্ত হবে।যদি তা করা দুরস্ত হয় তবে এর পদ্ধতি কিরূপ হবে? আর যদি তা দুরস্ত না হয়, তাহলে যেখানে মাদরাসা ও ছাত্রাবাস, আসবাবপত্র একত্রে রয়েছে, সেখানে এতিমদের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রাবাসে, আসবাবপত্র, বাবুর্চি ইত্যাদি সবকিছু আলাদা নিয়োগ করতে হবে কি-না? বিস্তারিত জানাবেন বলে আশা করি।

জবাবঃ এতিমদের জন্য যেসব মাল আসে, সেগুলো যদি সদকায়ে ওয়াজিবা হয়, যেমন যাকাত, কুরবানীর চামড়া, মান্নত, কাফফারা ইত্যাদি তাহলে উক্ত টাকার মালিক বা মাসরাফ কেবলমাত্র এতিম ও গরীব ছাত্রগণই, এছাড়া অন্য কোন কেউ নয়। আর এসব সদকা-খায়রাত কেবলমাত্র এতীম ও গরীবদের জন্যই খরচ করতে হবে। (সূরা আত তাওবা ৬০)

আর যদি উল্লেখিত দান সমূহ নফল সদকা হয় অথবা সাধারণ দান হয়ে থাকে, তাহলে তো এতিম ও গরীবদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজেও খরচ করা যাবে। যেমন, আসবাবপত্র ক্রয়, শিক্ষকদের বেতন প্রদান, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি। এতিম-গরীবেরদের জন্য দেয়া টাকা পয়সা তাদের জন্য সুষ্ঠভাবে খরচ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রাবাস, বাবুর্চি ইত্যাদি পৃথক করার প্রয়োজন নেই। [আদদুররুল মুখতার ২:৩৫১; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৮২; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১:৩৫; মাহমূদিয়া ১২:২২৭-২২৯]

মান্নত / কসম- কাফফারা

অন্যের জিনিস মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় এক মেয়েলোক তার ছেলের অসুখ হওয়ায় এই বলে মান্নত করল যে, যদি আমার ছেলের অসুখ ভাল হয়, তবে আমি ওমুক গরুটি আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করব। কিন্তু গরুটি ছিল তার স্বামীর। এখন ছেলেটি সুস্থ হওয়ার পর সেই গরু কুরবানী করা জরুরী কি-না? এবং উক্ত গরুর গোশ্ত খেতে পারবে কি-না?

জবাবঃ ইসলামী শরী'আতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে প্রত্যেকের মালিকানা ভিন্ন। এমন কি সন্তানদের মালিকানাও ভিন্ন ভিন্ন। আর মান্নত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- যে জিনিসের মান্নত করা হয়, সে জিনিস মান্নতকারীর মালিকানাধীন হতে হয়। আর মহিলা যে গরুটি কুরবানী করার মান্নত করেছে, সেই গুরুটি যেহেতু তার মালিকানাভুক্ত নয়, তাই তার এ মান্নতও সহীহ হয়নি। সুতরাং উক্ত মহিলার জন্য এ মান্নত পূর্ণ করাও জরুরী নয়। তবে ছেলের অসুখ ভাল হলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে স্বরূপ স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত গরু কুরবানী করতে পারে। আর উক্ত কুরবানীর গোশত সে নিজে খেতে পারবে, কারণ, এটা মান্নত হয়নি, বরং সাধারণ কুরবানী হয়েছে বিধায় তার গোশত অন্যান্য কুরবানীর গোশতের ন্যায় খাওয়া যাবে। (প্রমাণঃ আবু দাউদ শরীফ: ৪৭০, ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া ৫:৪২, বাদায়িউস সানায়ি ৫:৯০, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১:১২৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১২:১৭০)

মান্নত পুরা করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি তার শিশু বাচ্চার কথা বলার বয়স হওয়ার পরও কোন রোগের কারণে কথা বলতে না পারার কারণে বলে যে, আমার বাচ্চা যদি কথা বলতে পারে, তাহলে দশজন হুজুর দ্বারা খতম পড়িয়ে গরু জবাই করে গরীব মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াব। এখন রোগ সেরে বাচ্চা কথা বলতে পারার পর, তার এটা পূর্ণ করতে হবে কি-না? এবং যেহেতু সে গরীব মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের কথা উল্লেখ করেছে, আর আত্মীয়দের মদ্যে ধনীরাও শামিল রয়েছে। অতএব, প্রশ্নে উল্লেখিত গরুর গোশত ধনী ব্যক্তিরা খেতে পারবে কি-না?

জবাবঃ উক্ত ব্যক্তিরা জন্য কিছু করা জরুরী নয়। কেননা, "বাচ্চা কথা বলতে পারলে খতম পড়িয়ে গরু জবাই করবে" বাক্যটি দ্বারা নেক কাজের নিয়্যাত বা ইচ্ছা পোষণ করা বুঝায়। সুতরাং, এর দ্বারা মান্নতই হয় না। তাই তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব নয়। তবে সে যদি চায়, তাহলে শুকরিয়া আদায় স্বরূপ নিজে নিজে বা কোন নিকটাত্মীয়ের মাধ্যমে খতম পড়াতে পারে। তদ্রূপ গরু জবাই করে গরীব মিসকীন, ধনী-গরীব ও আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতে পারে। (প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ৩:৭৩৫-৭৩৬, ফাতাওয়া শামী ৩:৭৪০, ফাতাওয়া শামী ২:১২৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১২৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১৫০-১৫১, ও ১১০, আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৮৪)

সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে মিসকিনকে খাওয়ানোর নিয়্যত করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মহিলা সন্তান প্রসবকালে কষ্ট পাওয়ার ভয়ে মান্নত করল যে, হে আল্লাহ! আমার সন্তান যদি সুস্থভাবে হয়, তাহলে আমি

কয়েক জন মিসকীনকে খাওয়াব। কিন্তু মিসকীনের নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেনি। এমতাবস্থায় মান্নতকারীর কতজন মিসকীন খাওয়াতে হবে?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যেহেতু মান্নতকারী মিসকীনদের সংখ্যা উল্লেখ করেনি, সুতরাং তার জন্য দশজন মিসকীনকে দু'বেলা পেটপুরে খাওয়ানো অথবা দশ জন মীসকীণকে "নিসফে সা" অর্থাৎ ১ সের ১২ ছটাক গম বা আটা অথবা এর মূল্য দিয়ে দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেছে। কারণ, সংখ্যা উল্লেখ না করে খাওয়ানোর মান্নত করলে দশ জনকে খাওয়াতে হয়। (প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৩:৭৪২, আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৯০)

অন্যের মালে মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ ছোট ভাইয়ের নিজের কোন অর্থ নেই। অভিন্ন সংসারে সে তার বড় ভাইয়ের খরচে চলে। বড় ভাই কোন বিপদে পড়লে, বড় ভাইয়ের অর্থের উপর সে মান্নত করেছে। উক্ত বিপদ দূর হয়ে যাওয়ার পর মান্নত ওয়াজিব হবে কি-না?

জবাবঃ অন্যের মালে মান্নত করা সহীহ নয়। তাই সেই মান্নত পুরা করাও জরুরী নয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, নিজের মালেরও মান্নত করা ভাল নয়। কারণ- হাদীসে এসেছে মান্নত ভাগ্যের পরিবর্তন করে না, তবে এর দ্বারা বখীলদের থেকে মাল বের করা হয়। সুতরাং বিপদ-আপদ দেখা দিলে, বা নেক মাকসুদ পূর্ণ করতে হলে, বেশী করে তাওবা-ইস্তিগফার করে সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে এবং ফকীর-মিসকীনদেরকে সম্ভাব্য দান খাইরাত করবে। এটাই সুন্নাত তরীকা। তবে যেহেতু মান্নত মূলতঃ জায়েয কাজ, তাই কেউ করলে, কার্যসিদ্ধি হলে

মান্নত ওয়াজিব হবে। কিন্তু আমাদের দেশের ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকেরা মান্নত করার সঠিক নিয়মও জানে না এবং তা আদায় করার পদ্ধতি সম্পর্কেও অবগত নয়। তাই কেউ করতে চাইলে, আলেমের নিকট মাসআলা জেনে নিবে। কিন্তু মাকসুদ হাসিলের আসল নিয়ম সেটাই, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২, পৃষ্ঠা, ১০৭)

শর্ত পুরা না হলে মান্নত পুরা করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে মান্নত মানে যে, যদি ঐ ব্যক্তি মারা না যায়, তাহলে তার পরিবর্তে একটি ছাগল বা গরু সদকা করে দিব। এখন যদি ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে সদকা না করলে কোন ক্ষতি আছে কি ?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী, লোকটি সুস্থ না হওয়া এবং মারা যাওয়ায় যেহেতু শর্ত পাওয়া যায়নি, সে জন্য তার উপর মান্নত পুরা করা জরুরী বা ওয়াজিব না। তবে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিতে পারে, সেটা ভিন্ন কথা। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:৭৩৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২: ১০২: ১২৪: ১৬৬, হিদায়া ২:৪৮৩)

মান্নত পুরা করতে অসমর্থ হলে কি করণীয়?

জিজ্ঞাসাঃ আমি নিম্নলিখিত মান্নতগুলো করেছিঃ

(১) আমি যদি প্রয়োজনের বেশী একটি বাক্য বলি, তবে একটি রোযা রাখবো।

(২) মিথ্যা, গীবত করলে, একটি রোযা রাখবো।

(৩) ইচ্ছাকৃত কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে ১০ টি রোযা রাখবো।

(৪) হিংসা, অহংকার, রিয়া, ক্রোধ বিরক্তি এর বশবর্তী হয়ে কোন কিছু বললে বা কোন কিছু করলে, একটি রোযা রাখবো।

(৫) হুককুল ইবাদ সংক্রান্ত গুনাহ হয়ে গেলে, নফসকে শাস্তি দেয়ার জন্য, একটি রোযা রাখবো।

(৬) হারাম উপার্জন করলে, হারাম মাল ছদকা করে দিবো ও একটি রোযা রাখবো।

(৭) ইচ্ছাকৃত কোন মাকরূহে তাহরীমী গুনাহ করলে (বা ওয়াজিব তরক করলে), ১টি রোযা রাখবো।

মান্নতগুলো সারা জীবনের জন্য করেছি বলা

মান্নত করার পর যখন আমি দেখলাম যে, আমি এগুলোর উপর আমল করতে পারতেছি না, তখন তা'আলার কাছে মাফ চাইছি। "আল্লাহ আমার মান্নতগুলো মাফ করে দিন।"

এখন প্রশ্ন হলো এ মান্নতগুলো আমার দায়িত্ব থেকে উঠিয়ে দেয়ার উপায় কি? কোন কাফফারা দিলে বা তাওবা করলে হবে কি?

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি রোযা রাখার যে মান্নত করেছে, তা পূরণ করাই তার জন্য কর্তব্য। কিন্তু শরী'আতের বিধান হলো- প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একটি করে ফিদিয়া প্রদান করবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার প্রতিটি বিষয়কে একটি করে কসম ধরে প্রত্যেক কসমের জন্য একটি করে কাফফারা আদায় করবে।

প্রশ্নে ৭টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং, ৭ টি কাফফারা দিবে। কসমের কাফফারা হলো- দশ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়ানো, অথবা দশ জন মিসকীনকে শরীর ঢাকার মত দুইটি করে কাপড় দেয়া।

এটার সংগতি না থাকলে, প্রতিটি কসমের জন্য একাধারে তিনটি করে রোযা রাখা।

আর যদি এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা-ইস্তিগফার করে নিবে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:২৭৫, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১:১৪১, আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৫)

কসম পুরা না করলে কি করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ এক ব্যক্তি কসম করল যে (খোদার কসম) আমি এ হালাল কাজটি করবো। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে, সেই কাজটি করেনি। ভুলবশতঃ হোক, বা ইচ্ছা করেই হোক। এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ কি?

জবাবঃ যদি সে সময় বেঁধে নিয়ে থাকে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কাজটি না করে থাকে, তাহলে ঐ কাজটি না করার কারণে কসমের দিতে হবে। কারণ- সে কসমকে রক্ষা করতে পারেনি। বরং তার কসম ভঙ্গ হয়ে গেছে। কসমের কাফফারা হল ১০ জন মিসকীনকে দু বেলা তৃপ্তিসহ খানা খাওয়ানো বা সতর ঢেকে রাখা যায় পরিমাণ কাপড় দিবে। অর্থাভাবে তা সম্ভব না হলে, ধারাবাহিকভাবে ৩ দিন রোযা রাখবে। আর যদি কোন মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট না করে থাকে, তবে যথাসম্ভব তড়িৎ কসম পুরা করে নিবে। অন্যথায় মৃত্যুর পর তার কসম ভঙ্গ ধরা হবে। (আদ-দুররুল মুখতার ৩:৭০৮,৭২৫)

মসজিদ মাদরাসায় মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ (ক)মসজিদ মাদরাসায় মান্নত মানা জায়েয কিনা? যদি জায়েয হয় তাহলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব কিনা?

(খ) কোন ব্যক্তি মান্নত মানলে যে, আমার ছেলে রোগ থেকে সুস্থ হলে দু টি বকরী গরীবদেরকে দান করব। এখন সেই ছেলে সুস্থ হলে, ঐ বকরী দুইটি দান করা ওয়াজিব কিনা? যদি ওয়াজিব হয়, তাহলে দুই বকরীই দেয়া ওয়াজিব, নাকি একটি দিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে? আর মান্নতকারী যদি গরীব হয়, তাহলেও কি মান্নত পুরা করা ওয়াজিব?

জবাবঃ মান্নতের স্থান এবং যাকাতের স্থান একই। সুতরাং,যাকাত যে স্থানে খরচ করা যায়, মান্নত সেখানে খরচ করা যায় এবং সে স্থানের জন্য মান্নত করা সহীহ হয়। সেই হিসাবে যেসব মাদরাসায় লিল্লাহ বোর্ডিং এবং গরীব ছাত্র আছে, তাদের জন্য মান্নত মানা যায়। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে মান্নত পুরা করা জরুরী। সরাসরি মসজিদে বা মাদরাসার জন্য মান্নত মানা যায় না। কেউ মানলে, তা ওয়াজিব হয় না। তার পরেও যদি দেয়, তাহলে তা জায়েয আছে, নফল দান হিসাবে গণ্য হবে।(বাদায়িউস সানায়ি ৫:৮২, আদ দুররুল মুখতার ৩:৭৩৫, দারুল উলূম ১২:১২৯/১৩২, আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৭৭)

(খ) বর্ণনা অনুযায়ী উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে দু'টি বকরী বা দু'টির মূল্য গরীবদেরকে দান করা ওয়াজিব। একটি দান করলে, ওয়াজিব পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে না। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১৩১, ফাতাওয়া শামী ৩:৭৩৫)

কিছু মান্নতকারী যদি গরীব হয় এবং তার মাল না থাকে, তাহলে মান্নত পুরা করা জরুরী নয়। কেননা, মালবিহীন গরীব লোকের মালের মান্নত সহীহ (শুদ্ধ) হয় না। সুতরাং, পুরা করা জরুরী নয়। তবে যদি তার কিছু

পরিমাণ মাল থাকে, এবং সেই মালের মধ্যে মান্নত মানে, তাহলে সহীহ হবে এবং মান্নত পূর্ণ করা জরুরী হবে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১৩৭, ফাতাওয়া শামী ৩:৭৪২)

মসজিদের নামে মান্নত করে অন্য ক্ষেত্রে দেয়ার বিধান

জিজ্ঞাসাঃ আমি গত এস এস সি পরীক্ষার সময় কিছু টাকা মান্নত করেছিলাম মসজিদ অথবা ভিক্ষুককে দেয়ার জন্য। বলেছিলাম-যদি পাশ করি, তাহলে দিব। অতঃপর পাশ করেছি, কিন্তু এখনো টাকা দেইনি। টাকাগুলো কি মসজিদে দিব, না ভিক্ষুককে দিব? মসজিদে টাকা মান্নত করা কি জায়েয আছে?

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলার ঘর কোন মিসকীন নয়। সুতরাং, সেখানে যাকাত বা মান্নতের টাকা দেয়া জায়েয নয়। কাজেই আপনার ঐ টাকা মিসকীনদেরকেই দিতে হবে। মসজিদের জন্য মান্নত হয় না। কাজেই কেউ মসজিদের জন্য মান্নত করলে, তা পুরা করা জরুরী নয়। তবে যদি পুরা করে তাহলে নফল দান হবে। অবশ্য মসজিদের গরীব মুসল্লীদের জন্য মান্নত জায়েয আছে। (প্রমাণ বাদায়িউস সানায়ি ৫:৮২, আদ-দুররুল মুখতার ৩:৭৩৫, দারুল উলূম ১২:১২৯:১৩২)

মসজিদের নামে ছেড়ে দেয়া হাসা-মুরগী খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে একটি পুরানো মসজিদ আছে। সেখানে লোকেরা মুরগী, ছাগল, গরু ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে যায়। এখন ঐ মুরগী-ছাগল, খাওয়া জায়েয হবে কিনা?

জবাবঃ আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর নামে গরু, ছাগল মুরগী ইত্যাদি ছাড়ার প্রথা রয়েছে। এর দ্বারা উক্ত গরু, ছাগল মুরগী ইত্যাদি ঐ ব্যক্তির মালিকানা বহির্ভূত হয় না। অতএব, উক্ত প্রানীগুলোকে অন্য কে

ব্যবহার করতে বা জবাই করে খেতে পারবে না। তবে ইচ্ছা করলে, ঐ ব্যক্তি নিজেই জবাই করে খেতে পারবে বা অন্য কোন ভাল কাজে লাগাতে পারবে।

তবে উক্ত প্রাণীগুলো যদি কোন মসজিদের নামে মান্নত বা নজর করে থাকে, তাহলে তার মান্নত অশুদ্ধ হওয়ার সেগুলো যদিও মান্নত হবে না, তবে সেগুলো সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে, মসজিদের জন্য নফল সাদকা হিসেবে দিতে পারবে এবং মসজিদ কমিটি সেগুলো বিক্রি করে মসজিদের যে কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে। (প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ৩:৭৩৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১৩০)

মাজারে মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন পীরের মাজারে গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা, শিরণী ইত্যাদি মান্নত করা জায়েয আছে কিনা?

জবাবঃ মান্নত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নামে বা আল্লাহ তা'আলার সুন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে। আল্লাহ ছাড়া অন্য বা কারোর জন্য মান্নত করা জায়েয নয়। অতএব, কোন পীর-বুযুর্গের নামে বা তার মাজারে গরু, ছাগল ইত্যাদি মান্নত করা জায়েয হবে না, বরং এ ধরনের মান্নত নাজায়েয ও হারাম। এমনিভাবে প্রতি বছর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে, সাওয়াবের কাজ মনে করে কোন নির্দিষ্ট দিনে উরস, শিরণী ইত্যাদি করা নাজায়েয ও বিদ'আত।

(ফাতাওয়া শামী ২:৪৩৯, দারুল উলূম ১২:৯৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৫৫৫, মাহমূদীয়া ১:২১০)

মসজিদে হিন্দু কর্তৃক শুকর মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ এক হিন্দু ব্যক্তি শুকর পালত। শুকরটি প্রত্যেক বছর বাচ্চা প্রসব করত, কিন্তু একটি বাচ্চাও জীবিত থাকত না। দেব-দেবীর নামে মান্নত করে সে এর কোন ফল পায়নি। সুতরাং, একবার সে মান্নত করল যে, এবার যদি বাচ্চাগুলো জীবিত থাকে, তাহলে মসজিদে দান করবে। ঘটনা ক্রমে বাচ্চাগুলো বেঁচে গেল। বাচ্চা বড় হবার পর উক্ত হিন্দু ব্যক্তির বাচ্চাগুলো নিয়ে মসজিদে এল। এ মুহূর্তে ইমাম সাহেবের করনীয় কি?

জবাবঃ যাকাত ও মান্নতের বস্তুর হুকুম একই । সুতরাং, যেহেতু মসজিদে যাকাত দেয়া যায় না, তেমনিভাবে মান্নতও মসজিদে আদায় করা যায় না। তাছাড়া অমুসলিম ব্যক্তির মান্নত পুরা করা জরুরীও নয়। এর পরও যদি সে মান্নত পুরা করতে চায়, তাহলে সরাসরি বাচ্চাগুলো প্রদান না করে, সেগুলোর বিক্রয়লব্ধ টাকা কেবল ইস্তিঞ্জাখানা নির্মাণ ও তার সংস্কারমূলক কাজে ব্যয় করবে। মূল মসজিদের কাজে ব্যয় করবে না।

(প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১০২, ফাতাওয়া শামী ২:৩৪৪, ফাতাওয়া শামী ৩:৭৩৫)

পীরের নামে বা তার মাজারে মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ কেউ মান্নত মানল যে, যদি আমার ছেলে হয়, অথবা অসুখ ভাল হয়, তবে অমুক পীরের মাজারে যাব ও জিয়ারত করবো। এ মান্নত জায়েয আছে কি না? ছেলে হলে, বা ছেলে সুস্থ হল, মান্নত পুরা করা এবং মাজার জিয়ারত করা জরুরী কিনা?

জবাবঃ পীরের মাযারে যাওয়া বা যিয়ারতের মান্নত করলে তা মান্নত হয় না। সুতরাং ছেলে হলে বা ছেলের অসুখ ভাল হলে উক্ত কাজ করা জরুরী নয়।

মাজারে বাতি জ্বালানো এবং মান্নতকৃত বস্তু খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ মাজারে মান্নত করা, বাতি দেওয়া, মাজারে মান্নতকৃত দ্রব্য ভক্ষন করা শরী'আতের সম্মত কিনা? দলিল সহ জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ মাজারে মান্নত করা বা সজ্জার উদ্দেশে বাতি দেওয়া জায়েয নাই এবং আউলিয়াদের নামে মান্নতকৃত বস্তু ভক্ষণ করা হারাম ও নাজায়েয। অবশ্য যদি বাতি কোন প্রয়োজনে দেয়া হয় তাহলে তা জায়েয আছে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪৩৯, আদদুররুল মুখতার ২:৪৩৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৫৫৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১৩৬)

পীর সাহেবের বাড়ী, মাজার বা মসজিদে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় অনেকেই বলে থাকে যে, আমার অমুক কাজ সমাধা হলে পীর সাহেবের বাড়ী বা অমুক মাজারে এত টাকা বা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি দিব। এমন কথা বলা ও করা শরী'আত সম্মত কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের বিধান অনুযায়ী মান্নত এবং সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য খাছ। সুতরাং কোন পীর বা তার মাজারে মান্নত করা হারাম। এরূপ মান্নত করার পর কাজ পূর্ণ হলেও পীরের দরবারে যেয়ে সে মান্নত পূর্ণ করবে না। এমনকি অন্য কোন মসজিদেও তা আদায় করা জরুরী নয়। মান্নত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই শুদ্ধ হয়। আর মান্নতের বস্তু ফকীর মিসকীনদেরকে দান করতে হয়। (প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ২:৪৩৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:৩২২, কিফায়াতুলমুফতী ২:২১০)

শবীনা করার মান্নত করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, আমার রোগ ভাল হলে, শবীনা পড়াব। এখন সে ব্যক্তির রোগ ভাল হলে, শবীনা পড়ানো জরুরী কিনা?

জবাবঃ ঐ ব্যক্তির জন্য কোন কিছু করা জরুরী নয়। কেননা আমার রোগ ভাল হলে, শবীনা পড়াব বাক্যটি মান্নতই হয় না। তাই তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তবে তিনি যদি চান, তাহলে শুকরিয়া স্বরূপ মকতব-মাদরাসা ও গরীব-দুঃখীদেরকে কিছু দান-সদকা করতে পারে। তদ্রুপভাবে নিজে নিজে কুরআন খতম করতে পারেন। তবে তা শুকরিয়া স্বরূপ, জরুরী হিসেবে নয়। (দুররে মুখতার, ৩:৭৩৮ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১২০)

নির্দিষ্ট জন্তু মান্নত করলে করনীয়

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি নির্দিষ্টভাবে একটি গরু বা বকরী দান করার জন্য মান্নত করল, অথবা দান করার মান্নত করে ক্রয় করল। এমতাবস্থায় তার জন্য হুবহু ঐ গরু বা বকরী দান করা জরুরী, নাকি অন্য কোন গরু-বকরী বা মূল্য দিলে মান্নত আদায় হয়ে যাবে ?

জবাবঃ মান্নতের উদ্দেশে কোন গরু, বকরী খরীদ করলে হুবহু ঐ গরু বা বকরী দান করা জরুরী নয় বরং অন্য কোন গরু বা বকরী বা সম পরিমাণ টাকা দান করে দিলেও মান্নত আদায় হয়ে যাবে। (দারুল উলূম ১২:১১২, আদ-দুররুল মুখতার ৩:৭৪১, ফাতাওয়ায় রহীমিয়া ৬:৬৯)

সারা জীবন রোযা রাখার মান্নত

জিজ্ঞাসাঃ কেউ যদি সারা জীবন রোযা রাখার মান্নত করল, কিন্তু তার রাখার শক্তি নাই। এখন তার জন্য কি করণীয় ?

জবাবঃ যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন রোজা রাখার মান্নত করে তাহলে তার উপর মান্নত পুরা করা জরুরী। তবে যদি তার শারীরিক অবস্থা এরূপ হয় যে তার পক্ষে সবগুলো রোযা রাখা সম্ভব নয় তাহলে যে পরিমাণ সম্ভব রাখতে থাকবে। বাকিগুলোর ক্ষেত্রে রোযা না রেখে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে তৃপ্তিসহকারে দু বেলা খানা খাওয়াবে। যদি সে এত দরিদ্র হয় যে, তার পক্ষে ফিদিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাহলে সে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা চাইবে (তাওবা করবে) আশা করা যায় আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:১৪৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২০৯, ফাতাওয়া শামী ৩:৭৪১)

রোগা গরু বা মহিষের মান্নত

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি মান্নত করে যে, আমার গরু বা মহিষের রোগ ভাল হলে, আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানী করব, তাহলে সেই মান্নতকৃত প্রাণীর দ্বারা ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে কিনা এবং সেই গোশত নিজে বা ধনী লোক খেতে পারবে কিনা?

জবাবঃ মান্নতের কুরবানী দ্বারা ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না বরং ওয়াজিব কুরবানীর জন্য আলাদাভাবে কুরবানী করতে হবে। অর্থাৎ দুইটি প্রাণী কুরবানী করতে হবে। একটি মান্নতের জন্য, অপরটি ওয়াজিব কুরবানীর জন্য।

মান্নত কুরবানীর গোশত নিজেও খেতে পারবে না এবং ধনী লোকদেরকেও দিতে পারবে না। বরং গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ২:১০০, ফাতাওয়া শামী ৬:৩২০)

ওয়াকফ-মান্নতের বিবিধ আহকাম

ওয়াকফ এর শর'ঈ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ আমি নিজস্ব একটি প্লট মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াকফ করার ইচ্ছা করেছিলাম এবং ওয়াকফ করার জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছিলাম। যেমন, আমার জীবদ্দশায় আমি নিজেই এর মুতাওয়াল্লী থাকব। আমার অনুপস্থিতিতে হক্কানী উলামায়ে কিরামের মনোনীত ব্যক্তি এর মুতাওয়াল্লী হবেন। আমার মসজিদের ইমাম নিয়োগের দায়িত্ব আমার ন্যস্ত থাকবে। মসজিদটি তাবলীগ জামাআতের মারকায হিসেবে থাকবে ইত্যাদি। তবে এ শর্তগুলো এলাকাবাসী মেনে নিতে রাজী নয়। এমতাবস্থায় আমার পূর্ববর্তী কথার দ্বারা উক্ত জমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ হয়ে গিয়েছে কি-না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ কোন কিছু ওয়াকফ করার জন্য বিশেষ কিছু শব্দ রয়েছে। যেমন, আমি এ জমি ওয়াকফ করলাম অথবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ। এ জাতীয় ওয়াকফ করার ইচ্ছা করার দ্বারাই ওয়াকফ করলে তা ওয়াকফ হয়ে যায়। কেবলমাত্র ওয়াকফ করার ইচ্ছা করার দ্বারাই ওয়াকফ হয় না। প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, এখানে আপনি কেবল ওয়াকফ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। মুখে ঘোষণা দেননি। সুতরাং, উক্ত জমির প্লট মসজিদের জন্য ওয়াকফ হয়নি।

ওয়াকফকারীর জন্য শরী'আতসম্মত সবরকম শর্ত আরোপ করার অধিকার আছে এবং ওয়াকফকারী যেসব শর্ত আরোপ করবে, সেগুলো অবশ্যই পালনীয় হবে। অন্যদের তা অমান্য করার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। আর প্রশ্নে যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো শরী'আত বিরোধী নয়। সুতরাং, ওয়াকফকারীর জন্য এসকল শর্ত আরোপ করা বৈধ। তিনি এ সকল শর্তের সাথে ওয়াকফ করলে সকলেরই এগুলো

মানতে হবে। (প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ৪:৩৪০/ ৩৪৩/ ৩৭৯ ও ৪৩৩, ফাতহুল কাদীর ৫:৪১৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪২১)

এক মসজিদের ওয়াকফকৃত জমিতে দ্বিতীয় আরেকটি মসজিদ নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ রহীমুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ১৯৭৫ সালে কুরিয়াদি হাজীবাড়ী মসজিদের জন্য হারিয়াদি গ্রাম থেকে একখন্ড জায়গা ওয়াকফ করে। এতদিন যাবত উক্ত জায়গার আয় হাজীবাড়ী মসজিদেই আসত। আজ থেকে কয়েক মাস আগে রহীমুদ্দীনের ছেলেরা হাজীবাড়ী মসজিদের মুতাওয়াল্লীদের নিকট জিজ্ঞাসা ছাড়াই হারিয়াদি গ্রামের উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে। এখন প্রশ্ন হল তাদের এ জায়গা মসজিদ নির্মান জায়েয হয়েছে কি?

জবাবঃ যদি প্রকৃত অর্থেই গ্রাম বা এলাকাবাসী দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের দায়িত্বশীলগণ এ ব্যাপারে একমত হন যে, প্রথম মসজিদে স্থান সংকুলান হচ্ছে না, তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদেরই ওয়াকফকৃত স্থানে ভিন্ন আরেকটি মসজিদ বানানো যেতে পারে। এতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য এ ব্যাপারে মুতাওয়াল্লীকে অবগত করানো উচিৎ ছিল।

আর যদি তা পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানির কারণে হয়ে থাকে, তাহলেও সেটা শর‘ঈ মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে এবং সেখানে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। তবে এমন মসজিদে নামায পড়া উত্তম নয় এবং এবং সেক্ষেত্রে নির্মাণকারীগণ মসজিদ তৈরীর বিরাট ফযীলত থেকে মাহরূম থাকবে।

উল্লেখ্য যে, শর'ঈ মসজিদ হিসেবে এ মসজিদের পূর্ণ আদব ও সম্মান বজায় রাখতে হবে উক্ত মসজিদে সম্পর্কে কোনরূপ কটূক্তি বা মুসল্লীদের সাথে কোন প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না। (প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়িক ৫: ২৫০ ও ২৫৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ২: ৪৫৬, ইমদাদুল মুফতীন ৭৮৯)

মসজিদের ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি তার কিছু জমি মসজিদ ও গরীবদের জন্য ওয়াকফ করে। কিন্তু বেশ কিছু দিন পর তাঁর একজন পুত্র উক্ত জমি বিক্রি করে সে তার ছেলেকে বিদেশে পাঠায়। এবং ঐ ছেলে বিদেশে গিয়ে উক্ত টাকা দিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, উক্ত জমির মূল্য ৪০,০০০ টাকা এবং জমির পরিমাণ চারকাঠা কিন্তু বর্তমানে উক্ত টাকা দ্বারা ঐ পরিমান জমি কেনা আদৌ সম্ভব নয়। এই জন্য উক্ত টাকা দ্বারা বর্তমানে কিছু জমি বন্ধক রাখা হয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে জমি বন্ধক রাখার হুকুম কি? এবং এই টাকা দ্বারা কি জমি বন্ধক রাখা ঠিক হয়েছে কি না। এবং বর্তমানে এই টাকা দ্বারা কি করলে ভাল হবে। সেই বিষয়ে পরামর্শ দানে বাধিত করবেন।

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে ওয়াকফকৃত জমি শর'ঈ কারণ ব্যতীত পরিবর্তন বা বিক্রি করা জায়েয নাই। বরং বিক্রি করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে জমি ওয়াকফকৃত জমি হিসাবেই বহাল থাকবে। সুতরাং, কেউ ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করে দিলে তার দায়িত্ব হল ক্রেতাকে যেভাবেই হোক বুঝিয়ে ও অনুরোধ করে তার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে জমি ফিরিয়ে নেওয়া। আর বেচা-কেনা নাজায়েয হওয়ার কারণে ক্রেতার উপরও জমি ফিরিয়ে দেওয়া জরুরী এবং ইতিপূর্বে

যতদিন সে উক্ত জমি ভোগ করছে, ততদিনের ভাড়া পরিশোধ করে দেয়া, অন্যথায় সে গুনাহগার হবে।

আর এলাকার মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব হল, তারা তাদের সামর্থ্য এবং ক্ষমতানুযায়ী চেষ্টা করবে, যেন ওয়াকফকৃত জমিটি ক্রেতার হাত থেকে উদ্ধার করে তার প্রকৃত খাতে অর্থাৎ মসজিদ এবং গরীবদের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়।

আমাদের দেশে জমি বন্ধক রাখার যে প্রচলিত নিয়ম আছে অর্থাৎ কিছু টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক রাখার পর যতদিন জমির মালিককে সম্পূর্ণ টাকা শোধ করতে না পারবে, ততদিন গ্রহীতা জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করবে, তা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও সুদের কারবার। কেননা, শরী'আতে বন্ধক গ্রহণকারীর বন্ধকের জিনিস ভোগ করা, বা তা থেকে কোন প্রকার ফায়দা হাসিল করা সুদ ও হারাম। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াকফকৃত জমির টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রাখা নাজায়েয হয়েছে। (প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৪:৩৫১, শামী ৪:৩৯৬, হিদায়া ২:৬৪১, রদ্দুল মুহতার ৫:৫৭, ফাতাওয়া রাহীমিয়াহ ৯: ১৭২, ফাতাওয়া রশিদিয়াহ ৫০৬ পৃঃ, আহসানুল ফাতাওয়া ৮:৪৯৮)

মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমি নিজ ভোগ করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি মসজিদের নামে কিছু জমি ওয়াকফ করে দেয়ার পরও প্রায় ১৫/২০ বছর যাবত সেই জমি নিজে ভোগ করছে। অতচ ওয়াকফ নামায় লেখা আছে- এই জমির আয় ব্যয় সবই মসজিদ ফান্ডে জমা হবে। তবে ওয়াকফ নামায় নির্দিষ্ট কোন মসজিদের নাম উল্লেখ নেই। এখন প্রশ্ন হল মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জমি নিজে ভোগ করতে পারবে কি?

জবাবঃ মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জমি ওয়াকফকারী ব্যক্তি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না। তেমনিভাবে উক্ত জমির উৎপাদিত ফসল অথবা উক্ত জমি হতে অর্জিত সম্পদও নিজে খরচ করতে পারবে না। এতোদিন যা খরচ করেছে, তা বছর বছর ধরে ওয়াকফ সম্পত্তি আত্মসাৎ ও আল্লাহর ঘর মসজিদের সম্পত্তি আত্মসাৎ ও অবৈধ ভোগ করার কারণে অগণিত গুণাহে কবীরা বলে গণ্য হবে। (আল্লাহ তা'আলা এমন জঘন্য পাপাচার হতে পানাহ দিন) এই জমি সম্পূর্ণভাবে মসজিদের হক। এর যাবতীয় আয় মসজিদের কাজেই ব্যয় করতে হবে। অতএব, বিগত ১৫/২০ বৎসরের আত্মসাৎকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ মসজিদে ফিরিয়ে দেয়া ব্যতীত আত্মসাৎকারীর মুক্তির আর কোন পথ নেই।

উল্লেখ্য যে, ওয়াকফ দলিলে নির্দিষ্ট কোন মসজিদের নাম উল্লেখ না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। ওয়াকফকারী যে মসজিদের নিয়্যত করেছে বা বলেছে, সেই মসজিদের নামেই ওয়াকফ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট মসজিদের নিয়্যত না করে থাকে এবং মুখেও উল্লেখ না করে থাকে, তাহলে নিজের মহল্লার মসজিদে বা অন্য কোন মসজিদে এর আয় থেকে খরচ করা যাবে।

আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত ব্যক্তির এত বড় খিয়ানত ধরা পড়ার পর মহল্লার গণ্য-মান্য ও ক্ষমতাসীনদের কর্তব্য হচ্ছে, তাকে সরিয়ে তার জায়গায় আমানতদার, সৎ, দায়িত্ব সচেতন কাউকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করা এবং পূর্বে আত্মসাৎকৃত সকল অর্থ তার কাছ থেকে উদ্ধার করে মসজিদের কাজে ব্যয় করা।

উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তি ওয়াকফ নামায় যদি একথাও লিখে থাকে যে, এ সম্পত্তি আমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করলাম। কিন্তু আমি যত দিন বেঁচে আছি, এর আয় আমি ভোগ করবো এবং আমার মৃত্যুর পর এ

সম্পত্তির সমুদয় আয় মসজিদ পাবে। এ ধরনের কথা উল্লেখ থাকলে, তার জীবদ্দশায় ঐ সম্পত্তি ভোগ করা তার জন্য জায়েয হবে এবং ওয়াকফও সহীহ হবে। সেই পন্থায় তার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি মসজিদে ব্যয় হবে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪:৩৫২, ৩৮০ আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪১৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৬: ১৭৪)

ইজমালী সম্পত্তির কিয়দাংশ ওয়াকফ করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ওয়ারিশ যদি তার পৈতিক সম্পত্তির কিয়দাংশ ইজমালী থাকাবস্থায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ওয়াকফ করে। তাহলে ঐ ওয়াকফ বৈধ হবে কি ?

উল্লেখ্য, বোন ভাইকে না জানিয়ে ভাইয়ের অবর্তমানে ইজমালী সম্পত্তি মসজিদে দান করে ফেলেছে, তবে বোন কখনও উপরোল্লিখিত জায়গা নিজে ভোগ দখল করে নাই। আশা করে সঠিক মাসআলা দিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ পৈত্রিক সম্পত্তি ইজমালী থাকা অবস্থায় কোন ওয়ারিশ কোন সুরতেই ওয়াকফ করতে পারবে না। তবে বন্টনের পর প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ ওয়াকফ করতে পারবে। (প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪১৭, ইমদাদুল মুফতীন ৭৪৬, আল বাহরুর রায়িক ৫: ১৭৯)

মাদরাসার জমিতে মসজিদ তৈরী

জিজ্ঞাসাঃ (১) ফুরকানিয়া মাদরাসার জন্য দানকৃত সম্পত্তি ও ঘরের মধ্যে মসজিদ দেয়া যাবে কি না? মাদরাসার কিছু সম্পত্তি মসজিদের আওতাভুক্ত করা যাবে কিনা?

(২) মসজিদের সম্পত্তি মাদরাসায় (বা মাদরাসার ঘর ইত্যাদিতে) ব্যবহার করা যাবে কি না?

(৩) এলাকাবাসী মাদরাসার জন্য পাশে অন্য সম্পত্তি দিয়ে মাদরাসার জায়গায় মসজিদ করতে ইচ্ছুক। কারণ ঐ মাদরাসার ঘর ও জায়গাটা সেন্টারের মত এবং সামনে পুকুর।

জবাবঃ (১) যদি মাদরাসার নিকটে কোন মসজিদ না থাকে, যেখানে গিয়ে ছাত্ররা জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতে পারে, অথবা মসজিদ রয়েছে কিন্তু মসজিদে সমস্ত ছাত্রদের সংকুলান হয় না অথবা সেখানে নামায পড়তে গেলে মাদরাসার ছাত্রদের পড়া-শুনার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। যেমন অধিক সময় ব্যয় হয় অথবা মাদরাসার সম্পদের হেফাজত থাকে না। তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে মাদরাসার জমিতে মাদরাসার স্বার্থে মসজিদ নির্মাণ করা মাদরাসার প্রয়োজনের মধ্যে গন্য হবে। তাই এক্ষেত্রে মাদরাসার অতিরিক্ত জমিতে শর'ঈ মসজিদ তৈরী করতে পারবে। আর যদি উল্লেখিত জরুরতগুলো না থাকে বরং পার্শ্ববর্তী মসজিদ দ্বারা মাদরাসার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মাদরাসার জমিতে আরেকটি মসজিদ করার প্রয়োজন নেই।

(২) মসজিদের অতিরিক্ত সম্পত্তিতে মসজিদ আবাদ করার জন্য মাদরাসা করতে পারবে। তবে কখনো মসজিদ সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে মাদরাসার ঘর সরিয়ে নিতে হবে। আর মসজিদের আয়ের স্থানে আয় বন্ধ করে মাদরাসা করতে হলে মাদরাসার পক্ষ হতে মসজিদের জমি বা ঘর ভাড়া দিয়ে দিতে হবে।

(৩) ওয়াকফকৃত জমি শর'ঈ উজর ব্যতীত পরিবর্তন করা জায়েয নেই। সুতরাং, এলাকাবাসীর জন্য উচিত হবে না মসজিদের জায়গা মাদরাসাকে

দিয়ে মাদরাসার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা। তবে যদি এখানো মসজিদের নামে জায়গা ওয়াকফ হয়ে না থাকে, তাহলে এলাকাবাসী এ সুরত অবলম্বন করতে পারে যে, অপর জায়গাটিও মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দিবে। অতঃপর সুবিধাজনক স্থানে মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করে একই কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করবে। (ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ২:৪৬৬)

ঈদগাহ ও মসজিদের ওয়াকফকৃত জমিতে মাদরাসা তৈরি করা

জিজ্ঞাসাঃ ঈদগাহের ওয়াকফকৃত জায়গায় মাদরাসা করা বা মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গায় মাদরাসা করা জায়েয কিনা?

জবাব: ঈদগাহের ওয়াকফকৃত জায়গায় মাদরাসা করা বা মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গা স্থায়ী মাদরাসা করা জায়েয নয়। তবে যদি ওয়াকফকারী ওয়াকফ করার সময় একথা বলে থাকেন যে, উক্ত জমিতে দীনী মাদরাসাও করতে পারবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে মাদরাসা করা জায়েয হবে। তেমনিভাবে মসজিদ বানানোর পর অতিরিক্ত জায়গা থাকলে মসজিদ আবাদের নিয়্যতে অস্থায়ীভাবে দীনী মাদরাসা করা জায়েয আছে। তেমনিভাবে ঈদগাহের ভিতরে এমনভাবে অস্থায়ী দীনী মাদরাসা করা যাবে যে, ঈদগাহের কোন অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ উক্ত মাদরাসা ঘরের ভিতরও মুসল্লীরা ঈদের কাতার করতে পারে। (প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৭:১০০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬:২১০, আহসানুল ফাতাওয়াঃ ৬:৪৮১)

ওয়াকফ বিহীন নির্মিত মসজিদে নামাজ আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ আছে, যা প্রায় ৮০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। সে মসজিদের জায়গায় অবস্থা নিম্নরূপঃ

দুই ভাই মিলে ৬ ডিসিমাল জমি গ্রামবাসীর ব্যবহারের জন্য দান করেন। তারপর সেই জায়গায় উভয় দাতা জীবিত থাকা অবস্থায় মসজিদটি নির্মাণ করা হয় ও যথারীতি সেখানে নামায আদায় করা হয় এবং অদ্যাবধি সেই মসজিদেই ওয়াক্তিয়া ও জুমু'আর নামায আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু সেই জায়গার কোন দলীল মসজিদের নামে নেই, বরং মালিকের নামে রেকর্ড আছে। আর মন্তব্যের কলামে মসজিদের নামে লেখা আছে। অতপর এক ভাইয়ের পুত্র অপর ভাইয়ের কন্যাদের নিকট থেকে ৩ ডিসিমাল জমি ক্রয়সূত্রে দলীল করে নিয়েছে এবং সে বর্তমানে উক্ত জমির দাবীদার। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদে ওয়াক্তিয়া ও জুমু'আর নামায দুরস্ত হবে কি ?

জবাবঃ ওয়াকফ ও হিবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য দলীল বা রেজিষ্ট্রির প্রয়োজন নেই, মৌখিক ভাবে ওয়াকফ করাই যথেষ্ট। এখানে যেহেতু দুই ভাই মিলে গ্রামবাসীর ব্যবহারের জন্য জমি দান করেছেন, তাই যে কোন হালাল কাজে সেটাকে ব্যবহার করার অধিকার তাদের আছে। তাই তারা যখন সর্বসম্মতিক্রমে মূল মালিকের অনুমোদনক্রমে ৮০ বছর যাবৎ এখানে মসজিদ নির্মাণ করে যথারীতি নামায আদায় করে আসছেন, তখন এটাই মসজিদ হিসাবে ওয়াকফ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সুতরাং, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মসজিদটি শর'ঈ মসজিদ বলেই গণ্য হবে। এখানে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। এই জমির মালিকানা দাবী করা বা বিক্রি করা সবই অবৈধ। কেননা, ওয়াকফকৃত বস্তু বিক্রি করা জায়েয নয়।

এখন মূল মালিক বা তাদের অবর্তমানে ওয়ারিশদের কর্তব্য হচ্ছে, যেহেতু জমিটি শরী'আতের দৃষ্টিতে মসজিদের নামে ওয়াকফ হয়ে গেছে, সুতরাং কাগজপত্র সেভাবে তৈরী করে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে।

(প্রমাণঃ রাদ্দুল মুহতার ৪:৩৫৬, দুররে মুখতার ৪: ৩৫৫/৩৫৭/৩৩৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ২:৪৫৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১: ৪৮৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৬:১৭০)

কবরস্থানের উপর বাড়ী-মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা

জিজ্ঞাসাঃ কবরস্থানের উপর বাড়ী কিংবা মসজিদ তৈরী করা জায়েয কি না? যদি জায়েয হয়, তাহলে উভয়ের তৈরীর ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধানের কোন তারতম্য আছে কি না ?

আমি একটি বাড়ি খরিদ করেছি। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম যে, বাড়ীটিতে ৫০/৬০ বছর পূর্বে অনুমান ১০/১৫ জন লোককে দাফন করা হয়েছে। উক্ত বাড়িতে ঘর দরজা তৈরী করে বাড়ী হিসাবে বসবাস করায় শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ যদি কবরস্থানটি গোরস্থানের জন্য ওয়াকফকৃত না হয়, বরং কারো মালিকানাধীন হয়, আর স্থানটি এত পুরাতন যে, দাফনকৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে মাটির সাথে মিশে গেছে, তাহলে ঐখানে মালিক ঘরবাড়ী কিংবা ওয়াকফ এর মাধ্যমে মসজিদ তৈরী করতে পারে। এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। মোদ্দাকথা, অন্যান্য জমিনের যে হুকুম, উক্ত ওয়াকফ বিহীন কবরস্থানটির সেই হুকুম, সেখানে ঘর বা মসজিদ তৈরীর একই হুকুম।

আর যদি কবরস্থানটি ওয়াকফকৃত হয়, তাহলে সেখানে বাড়ী ঘর বা মসজিদ বানানো জায়েয নয়।

(প্রমাণঃ শামী ২:২৩৩, ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ৭: ২৩৮-২২১, ফাতাওয়া মাহমূদীয়া, ১০:৩০০ পৃঃ ৩০০-২৮৭)

কবরের উপর ঘর নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ আমি বিগত প্রায় দশ বছর পূর্বে তিনটি কবর বিশিষ্ট একখন্ড জমা ক্রয় করি। অতঃপর জেনে বুঝেই তার চারিপার্শ্বে বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করি। বর্তমানে কবরগুলো অন্যান্য ঘরের মধ্যখানেই অবস্থিত। কবরের স্থলেও একটি ঘর তৈরী হয়েছে। উপরে ছাদও হয়ে গেছে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে আমার পরিবার নানান ধরনের বালা-মুসবিতে দিন কাটাচ্ছে। তাই সকলের ধারণা, কবরগুলো জন্যই এমন ঘটছে। এখন সকলের মত কবরটা স্থানান্তরিত করার। তাই কবরটি খনন করে লাশের অবশিষ্টাংশ সরিয়ে ফেলা এবং কবর অবস্থিত ঘরের ছাদের উপর অন্য কোন ঘর করা যাবে কিনা?

জবাবঃ বর্ণনানুযায়ী উক্ত কবরগুলো ওয়াকফকৃত গোরস্থানে নয়, বরং ব্যক্তি মালিকানার মধ্যে। আর ব্যক্তি মালিকানার মধ্যে কোন কারণে কবর দেয়া হলে, কবরগুলো মুর্দা যখন মাটির সাথে একদম মিশে যায়, অর্থাৎ ১০/১২ বছর পর কবরগুলো সমান করে তার উপর চাষাবাদ বা ঘর-বাড়ী তৈরী করা জায়েয আছে। তাতে কবরের কোন অসম্মান প্রদর্শন করা হয় না। সুতরাং আপনার জন্য কবর খনন করে লাশের অবশিষ্টাংশ স্থানান্তর করার দরকার হবে না। কেননা, কবর বহুদিনের পুরনো হওয়ার তাতে আপনার ঘর নির্মাণ বৈধ হয়েছে, এবং এখন আপনি দ্বিতীয় তলা নির্মাণ করতে পারেন।

উল্লেখ্য, এই কবরের কারণেই সন্তানদের অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, এটা আপনাদের একটি অমূলক ধারণা মাত্র। এর কোন বাস্তবতা নেই। সুতরাং, এর জন্য কবর স্থানান্তর করা। জায়েয হবে না।

সন্তানদের অসুস্থতা ও বালা-মুসীবতের বিভিন্ন কারণ হতে পারে। নিজ গুনাহের কারণে বা কোন অন্যায়ের জন্যও হতে পারে। তাই নিজেদের আমলের মুহাসাবা করুন এবং বেশী বেশী তাওবা ইস্তিগফার করুন, সাথে সাথে কিছু দান সাদকাহ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ এ পেরেশানী থেকে মুক্তি দিবেন। এটা মর্তবা বুলন্দীর জন্যও হতে পারে। সুতরাং, ইবাদত বন্দেগী একটু বেশী করে করুন, ইনশাআল্লাহ পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। (প্রমাণঃ শামী ২:২৩৩, হিন্দীয়াহ ১:১৬৭, বাহরুর রায়িক ২:১৯৫, মাহমূদিয়া ৭:২৩৭/ ৬:১৯৭/ ৬:১৯৮)

খোদায়ী ষাঁড় মাদরাসার ছাত্রদের খাওয়ানো

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের অঞ্চলের বিভিন্ন লোক খোদার নামে ষাঁড় ছেড়ে দেয় এবং এটাকে খোদায়ী ষাঁড় বলে। এ ষাঁড় নির্দ্বিধায় মানুষের জমির ফসল খেয়ে বেড়ায়। অবশেষে বৃদ্ধ হয়ে একদিন মারা যায়। উল্লেখ্য যে, ষাঁড় দ্বারা মানুষের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিই সাধিত হয়। এ ধরণের ষাঁড় মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং এর ছাত্রদেরকে জবাই করে খাওয়ানো জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ আল্লাহর নামে ষাঁড়, গরু, ছাগল ইত্যাদি পশু ছেড়ে দেয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তা শরী'আত সম্মত নয়। বরং তা নাজায়েয ও হারাম। কেউ যদি আল্লাহর নামে গরু, ছাগল ইত্যাদি ছাড়ার মান্নত করে থাকে, তাহলে তা পুরা করাও জরুরী নয়। কেননা, এ মান্নতই জায়েয হয়নি। সুতরাং, কেউ যদি এ জাতীয় গরু, ছাগল আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে। তবে উক্ত পশুর মালিক সেই ব্যক্তিই থাকবে। এভাবে ছেড়ে দেওয়ার দরুণ মালিকানা বাতিল হবে না।

এখানে যেহেতু আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়ার পরও মালিকানা বাতিল হচ্ছে না, তাই মালিকের অনুমতি ব্যতিত কেউ তা জবাই করে খেতে পারবে না এবং কোন মাদরাসার ছাত্রদেরকেও তা জবাই করে খাওয়ানো জায়েয হবে না। বরং এ ধরণের পশুর উপর মালিকের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সে তা নিজেও ভক্ষন করতে পারবে, অথবা জবাই করে অন্যদেরকেও খাওয়াতে পারবে। কিংবা কোন মাদরাসায় দানও করতে পারবে। অর্থাৎ মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে তা যে কোন বৈধ খাতে ব্যবহার করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি আল্লাহর নামে গরু ছাগল ছেড়ে দেয় এবং সেই গরু, ছাগল মানুষের ফসলাদি নষ্ট করে তাহলে জমির মালিক বিচার-সালিসের মাধ্যমে সেই ব্যক্তি থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করেত পারবে। আর জনগণও তার ব্যাপারে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা, সে গরু, ছাগল আল্লাহর নামে ছেড়ে দিয়ে ফসলাদি নষ্ট করেছে এবং শরী'আত বিরোধী কাজ করেছে। (প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার ৩:৭৩৫, বাদায়িয়ুস সানায়ি ৫:৮২, ফাতাওয়া সুলতানিয়া ৪:৪১০, ফাতাওয়া দারুল উলূম,১২:১৩০)

ওয়াকফকৃত জমি পরির্তন করা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি ৪ কাঠা জমি ওয়াকফ করেন। পরবর্তীতে উক্ত ওয়াকফকারীর ছেলে সেই জমি বিক্রি করে বিক্রিত জমির টাকা দিয়ে তার ছেলেকে (ওয়াকফ কারকের নাতি) বিদেশ পাঠান। উল্লেখ্য যে, ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করা হয়েছিল ৫০,০০০/- টাকায়। অবশ্য ওয়াকফকারীর নাতি বিদেশে গিয়ে ৫০,০০০/- টাকা ফেরত দেন। কিন্তু এখন জমির বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত টাকায় ৪ কাঠা জমি ক্রয় করা

সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে উক্ত টাকা কি করতে হবে, জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত টাকা দিয়ে এখন জমি ইজারা রাখা হয়েছে এবং ইজারার ফসল স্থানীয় মসজিদ ও গরীবদের দেয়া হচ্ছে। ইজারায় গ্রহণকৃত জমির বাৎসরিক খাজনাই উক্ত টাকা থেকে আদায় করা হচ্ছে। এটা জায়েয হচ্ছে কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে ওয়াকফকৃত জমি পরিবর্তন বা বিক্রি করা জায়েয নয়। সুতরাং, কেউ যদি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিক্রি করে থাকে, তাহলে তার মারাত্মক অপরাধ হবে। তবে তার জন্য উচিত, ক্রেতাকে যেভাবেই হোক রাজি করিয়ে তার টাকা ফেরত দিয়ে জমি ফিরিয়ে নেয়া। আর বেচা-কেনা নাজায়েয হওয়ার কারণে ক্রেতার উপরও জরুরী জমি ফিরিয়ে দেয়া এবং ইতিপূর্বে যতদিন সে উক্ত জমি ভোগ করেছে, ততদিনের ভাড়া দেয়া। অন্যথায় গুনাহগার হবে।

তারপরও যদি ক্রেতা জমি ফেরত দিতে অস্বীকার করে, তাহলে বিক্রেতার উক্ত জমির টাকা দিয়ে ঐ ওয়াকফ খাতের নামে এ শ্রেণীর অন্যস্থানে উল্লেখিত পরিমাণ জমি ক্রয় করে দিতে হবে। আর যদি বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত টাকা দিয়ে এ পরিমাণ জমি পাওয়া না যায়, তাহলে বিক্রেতার নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত টাকা সংযোজন করে দিতে হবে। যতদূর সম্ভব ওয়াকফ খাতের নিকটবর্তী এলাকার জমি খরিদ করে দিতে চেষ্টা করবে, যাতে বেশী উপকার হয়। আর নিজেদের কৃত অন্যায়ের জন্য আল্লাহর দরবারে ইসতিগফার করতে থাকবে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করাই যেহেতু নাজায়েয, তাই উক্ত টাকা দ্বারা জমি ইজরা রাখা জায়েয হবে না। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী

৪:৩৯৬-৪২৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২:৪১৩, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১: ৪৯৭, আযীযুল ফাতাওয়া ৫৯৩)

ওয়াকফ বিহীন মসজিদে নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক লোক নিজের জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করল। কিন্তু এই জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াকফ করল না। সেই মসজিদে এলাকার লোকদের নামায সহীহ হবে কিনা এবং ওয়াক্তী জামা আত ও জুমু আর নামায শুদ্ধ হবে কিনা?

জবাবঃ বাস্তবে মসজিদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য মসজিদের জমীন ওয়াকফ কৃত হওয়া যেহেতু শর্ত, তাই উক্ত স্থান শর'ঈ মসজিদ গণ্য হবে না বা মসজিদের মর্যাদা লাভ করবে না।

তাই কেউ যদি তার নিজস্ব মালিকানাধীন জমিনে ওয়াকফ ব্যতিরেকে মসজিদ নির্মাণ করে, তাহলে উক্ত মসজিদ শরী'আতের দৃষ্টিতে মসজিদ সাব্যস্ত হবে না। তবে কেউ যদি উক্ত মসজিদে মালিকের অনুমতিক্রমে নামায আদায় করে, অথবা এলাকার জনগণ জামা'আতের সাথে নামায আদায় করে, অথবা এলাকার জনগণ জামা'আতের সাথে নামায পড়ে, তাহলে নামায সহীহ হবে এবং জামা'আতের সাওয়াবও পাবে। তবে শর'ঈ মসজিদের ফজীলত (২৭ গুণ বেশী সাওয়াব) পাবে না। অনুরূপভাবে মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে জুমু'আর নামায আদায় করলেও নামায সহীহ হবে, মাকরূহ হবে না। তবে শর'ঈ মসজিদের মাত সাওয়াব হবে না। জুমু'আ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াকফ হওয়া শর্ত নয়। ইজনে আম অর্থাৎ সর্ব সাধারণের প্রবেশ অনুমতি থাকাই যথেষ্ট। (প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪: ৩৫৬, ইমদাদুল মুফতীন ৮১২, ইমদাদুল আহকাম ১:৩৫৫)

এক মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গা অন্য মসিজদের জন্য জোরপূর্বক দখল করা

জিজ্ঞাসাঃ এক মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গা অন্য কোন মসজিদের জন্য জোরপূর্বক দখল করে নেয়া জায়েয আছে কি ? সমাজে কিছু লোক দলাদলি করে অন্যত্র একটি মসজিদ তৈরী করেছে এবং পুরাতন মসজিদের ওয়াকফকৃত জমি দখল করে নিয়েছে। শরী'আতেএর হুকুম কি?

জবাবঃ এক মসজিদের ওয়াকফকৃত জমি অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করা বা জোরপূর্বক দখল করা হারাম ও গুনাহের কাজ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পূর্বোক্ত মসজিদের ওয়াকফকৃত জায়গা নতুন মসজিদের জন্য জোরপূর্বক দখল করা জায়েয হয়নি। বরং মারাত্মক গুনাহ হয়েছে। তাই উক্ত জমি অবশ্যই পূর্বোক্ত মসজিদে ফিরিয়ে দিতে হবে। নতুবা এভাবে মসজিদের খিদমত করে তারা কোন সাওয়াব তো পাবে না বরং গুনাহগার হবে। (প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ২:৪৪৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১২-২৮১, ইমদাদুল মুফতীন ৭৮৯)

কবরের উপর গরু চরানো

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে গোরস্থানের উপর দিয়ে জনসাধারণ আসা-যাওয়া করে এবং প্রায়ই গরু-ছাগল চরানো হয়ে থাকে। এতে কি কোন গুনাহ হচ্ছে ? পবিত্র কুরআন, হাদীসের দৃষ্টিতে উত্তর জানালে কৃতজ্ঞ হব।

জবাবঃ হাদীস শরীফে মুর্দাকে সম্মান করতে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তার সম্মানার্থে কবরের উপর বসতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং, কবরের উপর দিয়ে চলাচল করা বা তার উপর গরু-ছাগল চরানো নিষেধ।

উল্লেখ্য যে, দু'আ দরুদ পড়ে সাওয়াব রিসানী করা এবং কবর যিয়ারতের জন্য ঠেকার কারণে কবরের উপর দিয়ে যাওয়ার অবকাশ আছে।

(শামী ২:২৪৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৪৯৯, আল-ফিকহুল ইসলামী ২:৫২৬, আহকামে মায়্যিত ৯০ পৃঃ)

ঈদগাহে ফুটবল খেলা

জিজ্ঞাসাঃ ঈদগাহ্‌র জন্য ওয়াকফকৃত মাঠে ফুটবল খেলা জায়েয হবে কি-না?

জবাবঃ অনেক ক্ষেত্রে ঈদগাহ মসজিদের হুকুমে হয়ে থাকে। তাই এর প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা জরুরী। সুতরাং, এতে খেলাধূলা করা অথবা অন্য কোন গর্হিত কাজ জায়েয হবে না। (ফাতাওয়া শামী ৪:৩৫৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫: ২১৫)

মসজিদে ওয়াকফকৃত মাইক ভাড়া দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের মাইক ভাড়া দেয়া জায়েয আছে কি? উক্ত মাইক দিয়ে কোন অনুষ্ঠানে গান চালানো জায়েয আছে কি? উল্লেখ্য যে, ঐ মাইকটি যে ব্যক্তি দিয়েছে, সে তা মসজিদের নামে ওয়াকফ করে দিয়েছে। ওয়াকফ করা মাইক কোন ওয়াজ বা গানের অনুষ্ঠানের চালানো যাবে কি?

জবাবঃ মসজিদের মাইক মসজিদের ভিতরের ধর্মীয় কাজ যেমন নামায, জামা'আত ইত্যাদির এলান, ওয়াজ-বয়ান ইত্যাদিতেই ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন বিষয়ের (সন্তানদি, গরু, ছাগল হারানো) ইলান করার জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে ওয়াকফকারী ওয়াকফ করার সময় এসব বৈধ কাজের ব্যবহার আনুমতি দিয়ে থাকলে, এলান ইত্যাদি

করা যেতে পারে। এমনি ভাবে মসজিদের জায়নামায, ফ্যান, বা অন্যান্য আসবাবপত্র ব্যক্তিগত কাজে বা অন্যান্য দুনিয়াবী কাজে বা মসজিদের বাইরে ধর্মীয় কজে (বয়ান, ওয়াজ ইত্যাদি) ব্যবহার করা জায়েয নয়।

আর মসজিদের মাইক গানের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হওয়া এবং তার জন্য ভাড়া দেয়া তো কখনও জায়েয হবে না।

মসজিদের মাইকে কেন, অন্য কোন মাইকে বা মাইকে ছাড়াও এমনিতেই গান-বাজনা জায়েয নয়। মসজিদের আসবাবপত্র বা মাইক ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফের সময় মসজিদের বাইরে ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে ওয়াকফ করে তাহলে যতটুকু অনুমতি দিবে, ততটুকু ব্যবহার জায়েয হবে। তবে ধর্মীয় কাজে বা জায়েয কাজে ব্যবহার হতে হবে। (প্রমাণঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৫৯৬, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:১০৬, খাইরুল ফাতাওয়া ২:৭৩২)

জায়িয/নাজায়িয

নির্বাচনী শ্লোগান

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে নির্বাচনের সময় প্রচার উপলক্ষে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মীরা এই শ্লোগান দেয় যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (অমুক মার্কার) মালিক তুই আল্লাহ’’- এই ধরনের শ্লোগান শরী‘আত সম্মত কিনা?

জবাবঃ কালিমায়ে তায়্যিবা মুমিনের ঈমাণের ভিত্তি। এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাপক। কালিমায়ে তায়্যিবাকে তার লক্ষ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়িয। যেমন, কোন পাহারাদার পাহারাদারী করা অবস্থায় নিজের জাগ্রতাকে প্রকাশ করার জন্য বা ঘুম তারানোর জন্য উচ্চৈঃস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবার যিকির করলে শরী‘আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয হবে। ঠিক তেমনিভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে এবং শ্লোগান মিলাতে গিয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....মার্কার মালিক তুই আল্লাহ। এমন শ্লোগান দেয়া সম্পূর্ণ নাজায়িয।

অধিকন্তু কালিমায়ে তায়্যিবার মাঝে দু’টি অংশ আছে।

(১) তাওহীদ তথা আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদের বিশ্বাস করা।

(২) রিসালাত তথা আমাদের প্রিয় নবী ﷺ আল্লাহর রাসূল এ কথা বিশ্বাস করা। যার সারকথা আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই। একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে এবং রাসূল তাঁর হুকুম মত চলতে হবে এবং তাঁর হুকুমকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মত করতে হবে।

সুতরাং, কালিমায়ে তায়্যিবার দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামের আদর্শ তরীকাতেই

বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও কামিয়াবী। তা বাদ দিয়ে অন্য কোন তরীকায় শান্তি আসাতো দূরের কথা; বরং এর আশা করাও গুনাহ। এখন যদি কালিমায়ে তায়্যিবার প্রথম অংশের সাথে নির্বাচনী প্রতীক যোগ করা হয়, তাহলে তাদের নিয়্যাত যাই থাকুক, আগে পরে মিলিয়ে এর অর্থ দাঁড়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ছাড়াও তাদের নির্বাচনী প্রতীকের মধ্যেও শান্তি ও কামিয়াবী রয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোর এ শ্লোগান পরিহার করে অতীত গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে খাঁটি মনে তাওবা করতে হবে। (আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়িয ৫৩)

শরী'আতের দৃষ্টিতে ভোট

জিজ্ঞাসাঃ অনেক হক্কানী উলামায়ে কিরাম প্রচলিত নির্বাচন তথা ভোটকে জায়িয বলেন। আবার অনেক হক্কানী আলিম গণতন্ত্রের প্রতি সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া এবং একে কুরআন-হাদীস বিরোধী বলেন। এখন আমরা কোনটির উপর আমল করব? যদি নির্বাচন জায়িয হয়, তাহলে-

(ক) কাকে ভোট দিতে হবে? কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি বা কাফিরকে ভোট দেওয়া যাবে কিনা?

(খ) কোন এলাকায় যদি খোদাভীরু না দাঁড়ায় তাহলে কি ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে?

(গ) যাকে ভোট দিব তার পক্ষে ব্যপকভাবে প্রচারণা চালানো যাবে কিনা?

(ঘ) প্রচলিত নির্বাচন জায়িয হলে মসজিদ-মাদরাসার কমিটি বা অন্য ক্ষেত্রে ঐরুপ ভোট আদান-প্রদান ও প্রচারণা জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ (ক-খ) প্রচলিত গণতন্ত্র যেমন ইসলাম বিরোধী তেমন গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতিও ইসলামী নীতি বিরোধী। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া কোন মুসলমানের জন্য জায়িয হবে না। এতে ঈমানের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির আশংকা রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর প্রণীত "কিতাবুল ঈমান" বইটি পড়তে পারেন ।

তবে যেহেতু গণতন্ত্র ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যক্তি বিশেষের জন্য এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল ব্যাপার। তাই গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হয়ে শুধু ভোটের সময় সকল প্রার্থীদের মাঝে তুলনামূলক ইসলাম, দেশ ও জাতির মঙ্গলজনক বা কমপক্ষে ইসলামের জন্য তুলানামূলক কম ক্ষতিকর এমন প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা জায়িয আছে। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো সকল সৎ মানুষ যদি ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকে তাহলে অসৎ লোকেরা অসৎ প্রার্থীকে নির্বাচিত করে নিবে। তখন সকলেরই অসৎ লোকেরা ফিতনায় পড়তে হবে এবং ইসলামের আরো বেশী ক্ষতি হয়ে যাবে। তাছাড়া পদ্ধতি ভুল হলেও (অর্থাৎ বোকা আর বুদ্ধিমান সবার রায় সমান হওয়া) ভোট দান মূলতঃ সাক্ষ্য প্রদান করা। আর ন্যায়ের ব্যপারে সাক্ষ্য প্রদান করা জরুরী, তাই উযর ছাড়া তুলনামূলক যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দান থেকে বিরত থাকলে গুনাহ হবে ।

(গ) মানুষকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া এবং কারো সম্পদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন ব্যতীত ভদ্রভাবে শরী'আতের গণ্ডিতে থেকে সৎপ্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণা জায়িয ।

(ঘ) মসজিদ বা মাদরাসা কমিটি নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করার আদৌ প্রয়োজন নেই। তাই এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনে

না করে, দ্বীনদার সমঝদার মুসল্লীরাই পরার্মশের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে কমিটির সদস্য বানিয়ে নিবে। [সূরা আল-আনআম ১১৭, আবু দাউদ ৪:১২২, সূরা বাকারা ২৮৩, সূরা নিসা ১৩৫, জাওয়াহিরুল ফিকহী মাকালা ২:২৮৬]

হরতাল পালন

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামের দৃষ্টিতে হরতাল করা জায়িয আছে কিনা? জায়িয হলে কোন পদ্ধতিতে জায়িয ? প্রয়োজনীয় উদাহরণ বা প্রমাণসহ জানতে চাই। নাজায়িয হলে অধিকার আদায়ে কিংবা জোরালো প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে ইসলাম কোন ধরণের কাজ করতে উৎসাহিত করে ?

জবাবঃ প্রচলিত হরতাল সাধারণতঃ জবরদস্তিমূলক করা হয়ে থাকে এবং এতে জনগণের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে। সুতরা তা কোন ক্রমেই জায়িয নয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা হারাম ও নিষিদ্ধ।

অবশ্য আল্লাহ পাক সর্বপ্রকার বাতিলের প্রতিরোদ করা জরুরী ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তার জন্য একক কোন পন্থা বা নিয়ম বেধে দেননি। যাতে করে স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে যে পন্থাই বাতিল প্রতিরোধ কার্যকরী হয়, তা যেন গ্রহণ করার রাস্তা খোলা থাকে। বর্তমান যুগে যদি জনগণকে বুঝিয়ে দ্বীন ও ঈমানের দাবী হিসাবে তাদের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল করানো যায়-অর্থাৎ তারা নিজেরা নিজেদের দোকান পাট বন্ধ রাখবে এবং গাড়ী-ঘোড়া চালাবে না, এবং অযথা মানুষের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি না করা হয় তাহলে এসব শর্ত পালন স্বাপেক্ষে দ্বীনী জরুরত ও বাতিল প্রতিরোধ হরতাল, লংমার্চ, মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করা জায়িয বরং জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তীর, তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করা সত্ত্বেও বর্তমান যুগে যুদ্ধের সময় আধুনিক সমরাস্ত্রে অবলম্বন করা জরুরী অথচ এসব অস্ত্রের নাম কুরআন-হাদীসে নেই। তাই বলে কি তা নাজায়িয? দুশমনদের তৈরি অস্ত্র দিয়ে দুশমনদের প্রতিরোধ এবং ইসলামের হিফাজত কি নিষেধ? আজকাল অনেক সম্প্রদায় বিভিন্ন সাধারণ দাবী আদায়ের জন্যও হরতাল ডাকছে। সে ক্ষেত্রে দ্বীনের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য অবশ্যই এসব কর্মসূচী জায়িয, বরং ক্ষেত্র বিশেষে জরুরীও বটে। এগুলো নাজায়িয বলার অর্থ হলো বাতিল প্রতিরোধের ফরয দায়িত্ব আদায় ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা, মার খেতে থাকা, মাদরাসা-মসজিদ বন্ধ হতে দেয়া এবং গোটা সমাজ ফিতনা-ফাসাদে ভরে যেতে দেয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হক্কের শক্তি দ্বারা যদি বাতিল শক্তি প্রতিহত না করা হয় তাহলে পৃথিবী বিশৃংখলায় পূর্ণ হয়ে যাবে। অন্যত্র আছে, ইবাদতগাহ সমূহ বরবাদ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা হজ্জঃ ৪০) আর এ জন্যই আকাবিরে দেওবন্দ দ্বীনের জন্য মিটিং-মিছিল ইত্যাদি নতুন উদ্ভাবিত কর্মসূচিকেও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। (আসীরানে মাল্টাঃ) অবশ্য এর এ অর্থ নয় যে, এগুলোকেই জিহাদ ধরে নিয়ে জিহাদের জযবা ও প্রস্তুতি থেকে দূরে সরে পড়া।

তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হরতাল ও লংমার্চ ইত্যাদি দুনিয়াদারদের আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও আর্দশ ভিত্তিক হওয়া অবশ্যই জরুরী। সে হিসাবে বাতিল প্রতিরোধ বা শরী'আত সম্মত দাবী আদায়ের লক্ষ্য হরতাল বা লংমার্চ ডাকতে হলে, তা আগে অবশ্যই সমাজ সচেতন উলামায়ে কিরাম ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীদের এ ব্যপারে ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে এবং হরতাল ইত্যাদি ডাকার আগে প্রাথমিক স্তরসমূহ অবশ্যই পাড়ি দিতে হবে। যথা সংশ্লিষ্ট

কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী পৌঁছানো ও সঠিক বিষয় বুঝানো। তাতে কাজ না হলে সভা-সমতি করা, স্মারকলিপি দেয়া, সেই সাথে সর্ব সাধারণকে বিষয়টির হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত করা ইত্যাদি। এতে কাজ না হলে হরতাল বা লংমার্চ এর ঘোষণা দিবে। পাশা-পাশি উল্লেখিত কর্মসূচী চলাকালে নাজায়িযভাবে যেন কোন জান বা মালের ক্ষয়-ক্ষতি না হয় এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে কোন নাজায়িয ও হারাম কাজ প্রকাশ না পায় তার জন্য তার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও সর্তক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কারণ আন্দোলনকারীদের দ্বারা হারাম বা নাজায়িয কাজ প্রকাশ হলে তা আর ইসলামী আন্দোলন থাকবে না। ঐ আন্দোলনের রূহানিয়াত এবং তাছীর নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা বাতিলের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। এর দ্বারা আখিরাতেও কামিয়াবীর আশা করা যায় না। উক্ত শর্ত সমূহ মান্য করা সম্ভব না হলে নাজায়িয হরতাল করে দ্বীনের ক্ষতি না করা জরুরী। [জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১:৬০৫, ইসলাহী খুতবাত ৩:১৪৭]

শরী'আতের দৃষ্টিতে কদমবুছী করা

জিজ্ঞাসাঃ পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুরী ও শিক্ষক মণ্ডলী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে পা ছুয়ে কদমবুছী করা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ কি-না?

জবাবঃ মাথা না ঝুঁকিয়ে তাদেরকে কদমবুছী করা জায়িয আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকেরা মাথা ঝুঁকিয়ে কদমবুছী করে, যা সম্পূর্ণ নাজায়িয। হাদীসে নিজের মুরুব্বীদেরকে যেমন, পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন ও শিক্ষকদেরকে সম্মান করতে তাকিদ দেয়া হয়েছে। মুরাব্বীগণের বড় সম্মান হলো তাদের কথা এবং কাজের অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুরুব্বীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রাখে না। তাদের কথার কোন প্রকার অনুকরণ করা তো দূরের কথা, তাদের অবাধ্যতাই বেশী করা হয়। তাই মুরুব্বীগণের সম্মানের জন্য তাদের তাদের অনুসরণ-অনুকরণকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করতে হবে। [ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫:৩৪৫; আযীযুল ফাতাওয়া ১:১০২]

ঝিনুকের দানা দিয়ে তৈরী করা মালা ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ অনেককে দেখা যায় কক্সবাজার থেকে ছোট ছোট ঝিনুকের দানা দিয়ে তৈরী করা মালা কিনে ব্যবহার করে বা ঘরে সাজিয়ে রাখে। এটা কি ঘরে মূর্তি রাখার শামিল কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ ঝিনুকের তৈরী মালা, গহনা ইত্যাদি ব্যবহার করা বা ঘরে সাজিয়ে রাখা জায়িয আছে। এটাকে মূর্তি বলা যায় না। তবে যদি ঝিনুক দিয়ে কোন প্রাণীর আকৃতি বানানো হয়, তাহলে সেটা মূর্তি হবে। এ ধরনের মূর্তি বানানো এবং তা দ্বারা ঘর সাজানো হারাম। [ফাতাওয়ায়ে শামী ৬:৩৫৯; ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫:৩৩৫]

গোবর বা পায়খানা থেকে তৈরী গ্যাস দ্বারা খানা পাকানো

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে খবরের কাগজে প্রায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্থানে গোবর এবং পায়খানা থেকে গ্যাস তৈরী করে তার দ্বারা খানা পাকানো হচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে উল্লেখিত গ্যাস পাকা কি-না? এবং তার দ্বারা পাকানো খাদ্য খাওয়া জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ গোবর শুকিয়ে তার দ্বারা যেমন পাকানো জায়িয, তেমনিভাবে তার গ্যাস বা পায়খানার গ্যাস দ্বারা পাকানো খাদ্য খাওয়াও জায়িয। উল্লেখ্য, পাকানো খাদ্য জায়িয হওয়ার জন্য আগুন জ্বালানোর উপকরণ পাক হওয়া কোন জরুরী বিষয় নয়। [ফাতাওয়া রহিমীয়া ৬:৩৩৬]

মেয়েলোকের নাক-কান ছিদ্র করণ

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েলোকের নাক-কান ছিদ্র করা শরী'আতের জায়িয হবে কি? কখন থেকে এর প্রচলন শুরু হয়? বর্তমানে কিছু সংখ্যক যুবককেও কান-ছিদ্র করে দুল পরতে দেখা যায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি?

জবাবঃ অলংকার পরিধানের উদ্দেশ্য মহিলাদের নাক-কান ছিদ্র করা জায়িয। তবে নাক ছিদ্র করার ব্যাপারে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে বলে নাক ছিদ্র করা না করাই উত্তম।

কান ছিদ্র করার প্রচলন হযরত ইবরাহীম আ. এর যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিবি হাজেরাকে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইসমাঈল আ. এর নূর তার থেকে প্রকাশ পাওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হল, তখন বিবি সারা কসম করে বললেন, নিশ্চয় আমি হাজেরার কান ছিদ্র করে দিব। এরপর বিবি সারা হযরত ইবরাহীম আ. এর নির্দেশে কসম পূর্ণ করার উদ্দেশ্য হাজেরার কান ছিদ্র করে দেন। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১:১৪৫]

অনুরূপভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম এর যুগেই মহিলা সাহাবীগণের মাঝে কান ছিদ্র করার প্রচলন ছিল। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাযের পর মহিলা সাহাবীগণের মজলিসে কিছু নসীহত করেন এবং দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তখন তার কানের অলংকার ও গলার হার খুলে দেয়া শুরু করেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অলংকার ব্যবহার করার জন্য নাক-কান ছিদ্র করা জায়িয।

তবে পুরুষের জন্য নাক-কান ছিদ্র করে অলংকার পরিধান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়িয। কেননা, তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষকে মহিলা সাদৃশ্য অবলম্বন করা ও মহিলাদের জন্য পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করার ব্যাপারে লা'নত করেছেন। তাই পুরুষদের জন্য এগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

উল্লেখ্য যে, অলংকার পরিহিত অবস্থায় মহিলাদের ফরজ গোসলের সময় নাকা-কানের এবং উযুতে নাক ফুলের ছিদ্রপথে পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তকতা অলবম্বন করা উচিত। [প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ২:৮৭৪; তিরমিযী শরীফ ২:১০৬; ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ৬: ৩৬২; বেহেশতি জেওর ১:৪৭]

জিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে অনেক লোক শুধু কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্য আজমির শরীফ, মাইজ ভান্ডারীতে সফর করে। অর্থাৎ ঐ সব স্থানে সফর করার উদ্দেশ্য, কবর যিয়ারত করে বরকত হাসিল করা এবং মনের মাকসুদ পূর্ণ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য বা আত্মীয়-স্বজনদের দেখা সাক্ষাৎ এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য নয়। এখন আমার প্রশ্ন হল, এরূপ নিয়্যতে যিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর করা জায়িয আছে কি?

জবাবঃ যে কবর দূরে অবস্থিত, দীর্ঘ সফর করে সেখানে পৌঁছাতে হয়, আর সফরের একমাএ উদ্দেশ্য হয় উক্ত মাযারকে পবিত্র স্থান বা পুণ্যভূমি ও বরকতের স্থান মনে করে বা সেখানে গেলে মাকসুদ পূর্ণ হবে, বিপদ দূর হবে মনে করে সফর করা শরী'আতে নাজায়িয। কোন আলেমর

মতেই এ ধরনের সফর করা জায়িয নয়। নবী কারীম ﷺ এরূপ সফর করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা রা. ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানকে পুণ্যস্থান মনে করে তার উদ্দেশ্য সফর করবে না। মসজিদ তিনটি হচ্ছে, মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী। [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ১খঃ ৪৪৭ পৃঃ]

সুতরাং, কোন পীর আউলিয়ার মাযারকে পুণ্যস্থান মনে করে বেশী সাওয়াবের জন্যে তার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ হবে না।

যেমন, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আরফাজা রা. বর্ণনা করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর নিকট বললাম, আমি তূর পাহাড়ে যাওয়ার ইচ্ছা করছি। তিনি বললেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানকে পুণ্যস্থান মনে করে তার উদ্দেশ্যে সফর করা যায় না। মসজিদ তিনটি হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা। তাই তুর পাহাড়ে সফরের ইচ্ছা ত্যাগ কর। [প্রমাণঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫ম ১৩৫ পৃঃ]

ইমাম আহমদ হাম্বল রহ. উল্লেখ্য করেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন তুর পাহাড় থেকে প্রত্যাবর্তন কালে আবু বসরা গিফরী রা. এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে আসলেন? উত্তরে আমি বললাম, তূর পাহাড় থেকে, তিনি বললেন, তূর পাহাড়ে যাওয়ার আগে যদি আপনার সাথে সাক্ষাৎ হতো, তাহলে আমার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধ বাণী শ্রবণ করতঃ আপনি আর তূর পাহাড়ে যেতেন না। কেননা, আমি নবী কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি,

তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানকে পূর্ণ স্থান মনে করে তার উদ্দেশ্য সফর করবে না। [মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ মুয়াত্তা ইমাম মালেক ৩৮ পৃঃ]

এজন্য নবী করীম ﷺ এর রওজা মুবারক যিয়ারত যেহেতু মসজিদে নববীর সাথেই হয়ে যায়, এ জন্য তা ব্যতিরেকে অন্য কোন ওলী-বুযুর্গের মাযারকে পুণ্যস্থান মনে করে তার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসা জায়িয নয়। [প্রমাণ হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১খঃ ১৬২ ও ৪৫৪ পৃঃ]

তবে যদি ব্যপারটি এমন হয় যে, মাযার যিয়ারত ছাড়া অন্য কোন বৈধ উদ্দেশ্যে কেউ দুরে কোথাও সফর করে। সেখানে কোন একজন বুযুর্গের কবরও রয়েছে এবং সেখানে কোন মেলা বা শিরক বিদ'আত ঐ মুহূর্তে চালু নেই। তাহলে সুযোগ মত তার কবর যিয়ারত করে আসতে এবং সেই বুযুর্গের মাযারে সাওয়াব রিসানী করতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, মূল সফর ঐ মাযারকে পুর্ণস্থানে মনে হয়নি, বরং সফর অন্য কোন বৈধ প্রয়োজনে করা হয়েছে? [প্রমাণ ফাতাওয়া শামী ২খঃ ২৪২ পৃঃ; ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৫ খঃ ৪৫৮ পৃঃ]

আর যদি মাযারে শিরক-বিদ'আত চলতে থাকে, তাহলে সে মুর্দা ব্যক্তি বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও শিরক বিদ'আত চালু অবস্থায় তার মাযারে যাওয়া যাবে না। আর ভন্ড পীরদের মাযারে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। সেখানে যাওয়া সর্ববস্থায়ই হারাম। [প্রমাণ ইমাদুল মুফতীন ১৬৬ পৃঃ; ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া ১৫০]

মুসলমানের শরীক অমুসলিমের রক্ত প্রবেশ করানো

জিজ্ঞাসাঃ মুসলিম ও অমুসলিমের রক্তের গ্রুপ মিলে গেলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে একের শরীরের রক্তে অন্য শরীরে প্রবেশ করানো জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের ব্যাখ্যা প্রদানকারী উলামায়েকিরাম যেহেতু কোন রকম পার্থক্য করা ব্যতিতই একান্ত অপারাগতার ক্ষেত্রে রক্ত গ্রহণকে জায়িয বলেছেন। সুতরাং মুসলমানের শরীরে কোন বিধর্মীর রক্ত গ্রহণ করা এবং বিধর্মীর শরীরে মুসলমানের রক্ত প্রবেশ করানো জায়িয হবে। তবে যেহেতু রক্ত মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে দরুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাই অমুসলিম ও পাপীদের রক্ত থেকে সাধ্যনুযায়ী বিরত থাকাটাই অধিকতর শ্রেয়। [হিদায়াহ ২:৩৫১ আল আশবাহ ওয়ান নাজায়েয; ১:১৪০ আল বাহরুর রায়িক ১:১১৫; ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৫৫]

চিংড়ি মাছ খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের ক্লাসে এক ছাত্র বলে চিংড়ি মাছ খাওয়া মাকরূহ। আরো বলে যে বাঙ্গালীদের জন্য নাকি জায়িয। এই কথা কুরআন ও হাদীসে আছে কি-না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ চিংড়ি মাছ খাওয়া শরী'আত অনুযায়ী মাকরূহ নয়। বরং চিংড়ি মাছ খাওয়া জায়িয ও হালাল। আর এ হুকুম শুধু বাঙ্গালীদের জন্য নয় বরং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য।

এর স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। যেমন, আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে। মুফাসাসিরীনগণ সমুদ্রের শিকার দ্বারা যে কেবল মাছ উদ্দেশ্য ঐ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেন।

আর চিংড়ি মাছ হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ মাছ বিশেষজ্ঞগণ এবং ভাষাবিদগণ একমত পোষণ করেন। সুতরাং চিংড়ি মাছ খাওয়া যে হালাল তা কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। এছাড়া হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, একদল সাহাবায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্রের পানি এবং মাছ সম্পর্কে কয়েকবার প্রশ্ন করলে, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই জবাব দিলেন সমুদ্রের পানি পাক এবং মাছ হালাল।

তাছাড়া ফেকাহাবিদগণের মতে সকল প্রকার মাছ পাক এবং হালাল।

শামসুল আইম্মা সারাখসী মাবসূত নামক গ্রন্থে লিখেন, সকল প্রকার মাছ খাওয়া হালাল এবং খাদ্যের উপযোগী। এটা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল ﷺ দ্বারা প্রমাণিত। [প্রমাণঃ আহকামুল কুরআন আল-মাবসুত ২১/২৩; বাদায়েউস সানায়ে ৫:৩৬]

গুল বা জর্দা খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ গুল ব্যবহার করা ও পানের সাথে জর্দা ব্যবহার করা শরী'আত অনুযায়ী জায়িয হবে কি না?

জবাবঃ গুল ব্যবহার করা ও পানের সঙ্গে জর্দা ব্যবহার করা জায়িয আছে। তবে যতদূর সম্ভব, এ সমস্ত জিনিষের অভ্যাস না করা উত্তম। কারণ, এগুলোর অভ্যাস হওয়ার পরে, না পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়। আর নিজের পক্ষ থেকে পেরেশানীর কোন কারণ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। তবে মুখের বা দাঁতের সমস্যার কারণে কেউ যদি ঔষধ হিসেবে গুল ব্যবহার করতে বাধ্য হয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। [প্রমাণ ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:২৪১; ফাতাওয়া রশীদিয়া ৪৬২]

বে-নামাযী বা অমুসলিমের হাতের রান্না খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন বে-নামাযী বা অমুসলিমের হাতের রান্নাকৃত হালাল খাদ্যদ্রব্য আহার করা দ্বীরদার-পরহেযগার ব্যক্তির জন্য জায়িয কিনা বা উহা রূহনিয়্যাত জন্য ক্ষতিকর কি-না?

জবাবঃ কুরআন শরীফ আল্লাহ তা'আলা মুশরীকদের অপবিত্র বলেছেন। কিন্তু এর দ্বারা বাহ্যিক অপবিত্রতাকে বুঝানো উদ্দেশ্য নয় বরং আত্মীক অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে। বাহ্যিক দিক দিয়ে তারা নাপাক বা অপবিত্র নয়। ফলে বাহ্যিক পবিত্রতার সাথে সম্পৃক্ত আহকামের ব্যাপারে বাতিনী অপবিত্রতার কারণে কোন পরিবর্তন হবে না। সুতরাং কোন অমুসলিমের হাতের রান্নাকৃত খাবার ততক্ষন পর্যন্ত খাওয়া জায়িয যতক্ষন পর্যন্ত নাপাক কিছু দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যায়।

আর যদি খাবার অপবিত্র কোন কিছু মেশানোর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা থাকে তখন তা সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে।

বে-নামাযী ব্যক্তির হাতের রান্নাকৃত খাবার খাওয়া জায়িয আছে। তবে যদি তাকে সর্তক করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে খাবে না। আর যদি উক্ত বে-নামাযী পবিত্রতার পাবন্দী না করে, বরং অধিকাংশ সময় অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার হাতের রান্নাকৃত খাবার বর্জন করাই উত্তম। বে-নামাযী বা অমুসলিম ব্যক্তির রান্নাকৃত খাবার খেলে রূহানিয়্যাতে প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। [ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৪৭; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১৫৫, ৪:২৭০]

দেয়ালে চিত্র অংকন করা

জিজ্ঞাসাঃ বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে আমাদের দেশে ঘরের মাঝখানে, দেয়াল বিভিন্ন চিত্র অংকন করা হয়ে থাকে। যাকে আলপনা বলা হয়, এটা জায়িয কি-না?

জবাবঃ ছবি দু'ধরণেরঃ (১) প্রাণবিহীন, (২) প্রাণীর ছবি। প্রাণীর ছবি ঘরে আঁকা বা লটকানো সর্বাবস্থাই নাজায়িয ও হারাম। প্রাণবিহীন জিনিষের ছবি তোলা, আঁকা ঘরে রাখা বা ব্যবহার করা জায়িয আছে। যেমন, গাছপালা, ফুল-ফল, ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির ছবি। দেয়ালে প্রাণবিহীন বস্তুর দৃশ্য আঁকা যায়। তবে তা নামাযের স্থানের সম্মুখপানে না হওয়া বাঞ্চনীয়। [শামী ১:৬৪৭]

সেন্ট ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ (ক) বর্তমান বাজারে যে সমস্ত সেন্ট পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করা ঠিক-না?

(খ) স্নো, ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার করা ঠিক কি-না?

জবাবঃ বর্তমান বাজারে প্রাপ্ত সেন্টে এ্যালকোল ব্যবহার হয়ে থাকে। দামী এ্যালকোহল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আঙ্গুরের শরাব থেকে বের করা হয়। যার ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম। আঙ্গুর বা মুনাক্কা ছাড়া অন্য কোন বস্তুর রস থেকে বের করা এ্যালকোহল মিশ্রিত সেন্ট জামা-কাপড়ে ব্যবহার করা হালাল জিনিষ হারাম হয় না। তাই যতক্ষন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে না জানা যায় যে, কোন ধরনের এ্যালকোহল মিশানো হয়েছে, ততক্ষন কোন সেন্টকে হারাম বলা যাবে না।

সুতরাং, কোন সেন্টের মধ্যে কোন প্রকার এ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়েছে, তা ঠিকভাবে জানা না থাকায় তাকে হারাম বলা যায় না। তবে সতর্কতা স্বরূপ সেন্ট ব্যবহার না করা উচিত এবং সেন্ট ব্যবহার করে নামায পড়া বাঞ্ছনীয় নয়। খোশবুর জন্য আতর ব্যবহার করা যেতে পারে। [ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৬:২৭৭; ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৫:১৮৩; জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১: ৩৮]

(খ) আমাদের জানা মতে, প্রচলিত ক্রীম সাধারণতঃ হারাম কোন জিনিষের সংমিশ্রন থাকে না। তাই তা ব্যবহার কোন অসুবিধা নেই। তবে বিদেশী ক্রীম এই সম্ভাবনা থাকে বিধায় তা ব্যবহার না করা ভাল।

ভাতের মধ্যকার কালো ভাতের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ভাতের যে কালো ভাত থাকে, সেটা খাওয়া যায় কি-না?

জবাবঃ হানাফী মাযহাবের একটা বিশেষ কায়দা এই যে, খবীস জিনিষ খাওয়া হারাম। এ কায়দার উপর ভিত্তি করে হযরত থানবী রহ. জানোয়ারের হারাম মগজ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সুস্থ রুচিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি কোন জিনিষ ঘৃণা করে, তাহলে তার মধ্যে মাকরূহ হওয়ার হুকুম প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে যেহেতু পরিষ্কার কোন বর্ণানা নেই, সেজন্য একে অর্থাৎ ভাতের ভিতর যে কালো ভাত থাকে, সেটা খাওয়া অনুচিত বলা যেতে পারে। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৯১৭]

গরু ছাগল বর্গা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ গরু-ছাগল বর্গা দেয়া জায়িয আছে কি-না ?

জবাবঃ হানাফী মাযাহাব অনুযায়ী গরু-ছাগল ইত্যাদি বর্গা বা ভাগে দেয়া জায়িয নয়। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মে যদি কেউ ভাগে দেয় এবং তাদের মধ্যে কোন গোলমাল না হয়, তাহলে তা নিয়ে বিবাদের দরকার নেই। কারণ আমাদের মাযহাব অনুযায়ী উক্ত মু'আমালা জায়িয না হলেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের রহ. মতে জায়িয আছে। বর্তমানে উক্ত মু'আমালা ব্যাপক আকার ধারণ করার কারণে হযরত থানবী রহ. হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী ফাতাওয়া দিয়েছেন। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কেউ উক্ত মু'আমালা করতে চাইলে, তার নিয়ম এই যে, গরু

দাতা অন্যকে বলবে আমার গরুটা তুমি এক বছর লালন-পালন কর। তোমাকে ৫০০ টাকা দিব। এর পরে ঐ টাকা না দিয়ে যদি তার পরিবর্তন গরুর বাছুর বা ছাগলের বাচ্চা দিয়ে দেয়, তাহলে তা জায়িয হবে। কিন্তু প্রথমেই উভয়ের সন্তুষ্টির মাধ্যমে এই শর্ত করা যে এক বছরে বাচ্চা আমার। দ্বিতীয় বছরের বাচ্চা তোমার। এরূপ করা হানাফী মাহযাব অনুযায়ী জায়িয নয়। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৩৪৯]

নাচ-গানের অনুষ্ঠানে তিলাওয়াত করা

জিজ্ঞাসাঃ যে অনুষ্ঠানে নাচ-গান হবে সে অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত জায়িয আছে কি?

জবাবঃ যে কোন অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় বরকত হাসিলের জন্য। গান-বাদ্যের মতো হারাম কাজে বরকত হাসিল তো দুরের কথা, সেই নিয়্যাত করাও কুফুরী কাজ।

সুতরাং, এ ধরনের অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করলে কুরআনের সাথে উপহাস হওয়ার কারণে এতে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২:৪৩৬ সূরা মায়িদা ২]

পড়ার অযোগ্য কুরআন শরীফ সম্পর্কে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ ছেঁড়া-ফেটা বা পুরাতন পড়ার অযোগ্য কুরআন শরীফ কি করতে হবে? তা আগুনে পুরে ফেলানো জায়িয আছে কিনা?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে ছেঁড়া ফাটা বা পুরাতন পড়ার অযোগ্য কুরআন শরীফ হিফাজতের সবচেয়ে ভাল নিয়ম এই যে, ঐগুলোকে কোন পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে গোরাস্থানে বা এমন স্থানে দাফন করবে, যেখানে সাধারণতঃ লোকজন চলাফেরা করে না।

যদি কেউ ঐগুলো পুড়ে ফেলে তাও জায়িয আছে। তবে সে ক্ষেত্রে ছাইগুলো পাক পানির মধ্যে মিশিয়ে দেয়া ভাল। উল্লেখ্য যে, হিফাজতের নিয়্যাতে ছেঁড়া ফাটা কুরআন শরীফ পুরে ফেললে, তাতে কোন গুনাহ হবে না। [ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৫৫]

ছবি আঁকা

জিজ্ঞাসাঃ কি কি ছবি আঁকা জায়িয ও কি কি ছবি আঁকা নাজায়িয? ঘরে ছবি টাঙ্গানো যায় কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রাণী ছাড়া অন্যান্য জিনিষের ছবি আঁকা বা তোলা জায়িয আছে। কিন্তু কোন প্রাণীর ছবি আঁকা, বা ছবি তোলা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। হাফ ফটো করাও শরী'আতসম্মত উযর ব্যতীত নাজায়িয। তবে মাথাবিহীন বা মাথা মিটানো ছবি আঁকা বা ছাপা জায়িয আছে, যদি উক্ত ছবির সতরের কোন অংশ খোলা না থাকে। ঘরে কোন প্রাণী বা মানুষ ও পশু-পক্ষীর ছবি টাঙ্গানো নাজায়িয। তবে মাথা বিহীন বা মাথা মিটানো হলে দোষ নেই। এরূপ মসজিদ, ঘর-বাড়ী, ফুল-ফল ও গাছ-পালা ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তুর ছবি টাঙ্গানোতে কোন অসুবিধা নেই। [কিফায়াতুল মুফতী ৯:২৩৩,৩৪, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩:২২৩,৩১]

ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণে জরিমানা আদায়

জিজ্ঞাসাঃ বাংলাদেশের অনেক মাদরাসা ও স্কুলের ছাত্ররা অনেক সময় অনুপস্থিত থাকলে তাদের কাছে থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা জায়িয কি-না? এবং এ টাকার মালিককে হবে?

জবাবঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কোন অন্যায়ের প্রেক্ষিতে আর্থিক জরীমানা উসুল করা জায়িয নয়। যদি কোথাও জরিমানা উসুল করা হয়, তাহলে ঐ টাকা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজীব। কারণ, এ টাকার মালিক সেই

অন্যায়কারীই থাকে। আর হাদীস শরীফ এসেছে, কোন মুসলমানের মাল তার অন্তরের সন্তুষ্টি ব্যতিরকে অন্যের জন্য হালাল নয়। তবে শাস্তি হিসাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তার টাকা আটক রেখে বছর শেষে বা এ প্রতিষ্টান হতে বিদায় নেয়ার সময় ফিরিয়ে দেয়া যায়।

পীর সাহেবকে কেবলা সম্বোধন করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন পীর সাহেবকে কিবলা সম্বোধন করা যাবে কি-না?

জবাবঃ উস্তাদ বা পীর সাহেবের উপাধী কিংবা সম্বোধন কিবলা শব্দটি না বলাই উচিত। প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করে নিছক সম্মানার্থে এই শব্দটি বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ বুঝানোই যদি এই শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জায়িয হবে না। [ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২৭৪; ফাতাওয়া রশীদিয়া ৪৬৩]

একসাথে কুরআন ও গীতা পাঠ করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক মাসিক শিক্ষা সংক্রান্ত সভায় শতকরা প্রায় ৭৫ জন মুসলমান শিক্ষক এবং শতকরা প্রায় ২৫ জন হিন্দু শিক্ষক উপস্থিত থাকেন। সভার শুরুতে প্রথমে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর সঙ্গে সঙ্গেই গীতা পাঠ করা হয়। এটা নিয়ম হিসাবে বিগত কয়েক বছর যাবৎ চালু রয়েছে। ইসলামের শরী'আতের দৃষ্টিতে এমনটা করা মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে কি-না? এ জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, কুরআন তিলাওয়াতকারী, শ্রবনকারী ও যোগাদানকারী মুসলমানদের সাওয়াব হবে, না-কি গুনাহ হবে?

জবাবঃ ঈমান আর কুফর এক সাথে চলতে পারে না। অথচ এখানে উভয়টাকে সমান মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ ধরনের মাহফিলে কুরআন তিলাওয়াত সুন্নাত-মুস্তাহাব কিছুই নয়। শর্তের সাথে অনুমিত

(জায়িয) আছে। এখন জায়িয করতে যেয়ে যদি আরেক নাজায়িয করতে হয় এবং সেটা বন্ধ করার ক্ষমতা না থাকে বা বিশৃংখলা দেখা দেয়, তা হলে এক্ষত্রে উত্তম হলো জায়িযকে তরক করা এবং উভয়টার কোনটাই পাঠ না করা। যারা এ ধরনের পদ্ধতি চালু করেছে, তারা গুনাহগার হবে। তারা তাওবা করে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা রাখবে। সেটাও লোক জমা করার জন্য নয়। বরং অনুষ্ঠান শুরু করার আগে বরকতের জন্য পড়তে পারে যদি উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন-সুন্নাহের খিলাফ কোন আলোচনা না হয়। আর যদি শুধু একটা চালু রাখতে সমস্যা হয়, তাহলে কোনটাই পাঠ করার দরকার নেই। আল্লাহর কালাম উক্ত অনুষ্ঠানে পাঠ না করলে ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২:৪৩৬, সূরা মায়িদা ২]

দাবা খেলা

জিজ্ঞাসাঃ দাবা খেলা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয কি-না?

জবাবঃ হানাফী মাহযাব অনুযায়ী দাবা খেলা নাজায়িয। যে ব্যক্তি দাবা খেলবে, তার বিশ্বস্ততা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কারণ, দাবা খেলাও জুয়ার মধ্যে গণ্য। [ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৫২; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২৪০-২৪১; ইসলাহুর রুসূম ১৩:১৪]

ছবি তোলার শর'ঈ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ হাদীস শরীফ আছে , ছবি অঙ্কনকারী ও ছবি গ্রাফাররা জাহান্নামী। মাসআলা বলে, ছবি তোলা হারাম। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন সভা মিছিল ও মাহফিলে সাংবাদিকরা এ দেশের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামগণের ছবি কোন ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়াই অনায়াসে তুলে নিচ্ছেন। এ সম্পর্কে শরী'আতের রায় কি?

জবাবঃ শর'ঈ জরুরত ব্যতীত ছবি তোলা না জায়িয। এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন হক্কানী আলেম শরী'আত সম্মত উযর ব্যতীত ছবি তুলতে পারেন না। কোন আলেম যদি প্রয়োজন ব্যতীত নিজের ছবি তুলতে অনুমতি দেন তাহলে এ ব্যাপারে ঐ আলেমকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, কেন তিনি এ না-জায়িয কাজের অনুমতি দিলেন? ছবি ঘরে রাখা ও পুতুল বানানো ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত মাসআলা হক পয়গাম সেপ্টেম্বর-৯৪ সংখ্যায় দেয়া হয়েছে। ঐ সংখ্যাটি দেখে নিন। ইসলামী আন্দোলন যদি এসব হারাম কাজের তোয়াক্কা না করা হয় তাহলে সমস্ত প্রচেষ্টা ও আন্দোলন বে-আসর ও নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে। যে কোন ধরনের নাজায়িয কাজের মাধ্যমে আন্দোলন চলতে পারে না। যমনার পরিবর্তনে যদি বলা হয় যে, ছবি ছাড়া আন্দোলন চলে না, দাবী-দাওয়া আদায় হয় না, তাহলে একথা বাস্তব সম্মত হলে এমনভাবে ছবি তোলার অনুমতি দেয়া যেতে পারে যে, চেহারা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যেমন পিছনের সাইড থেকে ছবি তোলা।

বাড়ীতে কুকুর বা অন্যান্য স্মৃতি রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আজকাল অনেকে সখ করে বাড়ীতে দেশী বিদেশী কুকুর পালে এবং তার জন্য অনেক টাকা পয়সা খরচ করে। আবার অনেকে ঘর সাজানোর জন্য কুকুর বা অন্য প্রাণীর ছবি ও মূর্তি রাখে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এগুলোর হুকুম কি?

জবাবঃ আমাদের দেশের তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের কুকুর প্রীতির সৌখিন ষ্টাইল মূলতঃ ইউরোপিয়ান বন্য সভ্যতা থেকে আমদানীকৃত। মহানবী ﷺ এর আবির্ভাবের আগে আইয়ামে জাহিলিয়্যাতে আরবদেরও অন্যতম একটি অপসংস্কৃতি ছিল এই কুকুর প্রীতি। কিন্তু মানুষ মাত্রই

অবগত যে, কুকুরের চরিত্রে স্বভাবগতভাবেই কি পরিমাণ খারাপ গুনাবলী বিদ্যমান। যেমন, নোংড়ামী, হিংসা ও বিশেষতঃ স্বজাতির প্রতি তার চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা ইত্যাদি। বর্তমান ইংরেজ ও ইউরোপিয়ান সমাজ কুকুর প্রেমের এত নিকৃষ্টতম পর্যায় পৌঁছেছে যে, কুকুরের ন্যায় নোংরা জানোয়ার তাদের অনেক মহিলাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের অত্যন্ত প্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সে সব দেশে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, কুকুরে প্রতি অত্যাধিক ভালবাসার পরিণামে একজন বিবাহিতা নারীর নিকট তাদের বাড়ীর পোষ্য কুকুরটিই তার স্বামী অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পশু সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে আমাদের এই মুসলিম দেশের অভিজাত এলাকার অনেক বড় লোকদের কুকুর নিয়ে স্বগর্বে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় বা ড্রয়িংরুম ইত্যাদি কুকুরের মুর্তি দ্বারা সাজাতে দেখা যায়। কুকুরের খাবাসাতের কারণে ইসলাম কখনই কুকুর প্রীতির এই নোংড়ামীকে সমর্থন করে নাই। বরং তৎকালের নও মুসলিম আরবদের অন্তর থেকে কুকুর প্রেম উৎপাটনের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ওহী আসার পর প্রথমে সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-কে কুকুর দেখলেই হত্যার নির্দেশ দেন এবং সাথে সাথে কুকুর পালনে জঘন্যতম একটি দ্বীনী ক্ষতির কথা উল্লেখ পূর্বক ইরশাদ ফরমান, যে ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর মূর্তি বা ছবি থাকে তথায় রহমতের ফেরেস্তাগণ প্রবেশ করেন না। তিনি আরো ইরশাদ করেন যে, ব্যক্তি শিকার বা পাহারাদারীর উদ্দেশ্য ব্যতীত (শুধু সৌখিনতা বশত) কুকুর প্রতিপালন করবে, প্রতিদিন তার আমলের একটি বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য নেক আমল কোন বড় ধরণের গুণাহের কারণই নষ্ট হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, শরী'আত সম্মত উযর ব্যতীত কুকুর পালনই যখন একটি জঘন্য গুনাহ, তাহলে কুকুরের প্রতি ভালবাসা পোষণই বা কার্যতঃ তা প্রদর্শন যে কত বড় জঘন্য অন্যায়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এজন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর প্রেম সমূলে উৎপাটনের জন্য দেখামাত্রই কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন। ক্রমান্বয়ে যখন কুকুর প্রীতি কমে আসে, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কালো কুকুরই হত্যার নির্দেশ দেন এবং ইরশাদ করেন যে, সেটা শয়তান অর্থাৎ মানুষের ক্ষতিকারী।

হাদীসে এরূপ দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ঘোষণার কারণে কোন মুসলমানের জন্য সৌখিনতা বশতঃ কুকুর পালন সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়িয। তাছাড়া এটা বিজাতীয় সংস্কৃতি হওয়ার কারণেও মুসলমানদের জন্য তা গ্রহণ করা হারাম। কেননা, মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিজাতীয় সংস্কৃতী গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

তবে শিকার ও চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা ও সম্পদের পাহারাদারী বা অন্য কোন শরী'আত সম্মত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কুকুর পালন করা জায়িয। যার স্পষ্ট ঘোষণা পূর্বোল্লিখিত হাদীসেই বিদ্যমান রয়েছে।

মূর্তি বানান, প্রাণীর ছবি অংকন এগুলো দ্বারা ঘর সাজানোও ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক উল্লেখ করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে প্রাণীর মূর্তি নির্মাতা ও প্রাণীর ছবি অংকনকারী। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে, কিয়ামতের দিন তাদের নির্মিত মূর্তি বা ছবিতে রূহ দিতে বলা হবে। আর যতক্ষন না তারা তাতে রূহ স্থাপন করতে পারবে, ততক্ষন তাদের শাস্তি হতে থাকবে। কিন্তু তারা কখনো রূহ স্থাপনে সক্ষম হবে না।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট এসে উযর পেশ করলো যে, আমার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে মূর্তি বা ছবি নির্মাণ। তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তাকে প্রাণবিহীন বস্তুর ছবি বানিয়ে জীবিকা নির্বাহের পরামর্শ দেন।

হযরত আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি স্থাপিত বা অংকিত কোন কাপর বা বস্তুর ঘরে পেলে তা ভেঙ্গে ফেলতেন, ছিঁড়ে ফেলতেন বা নষ্ট করে ফেলতেন।

এজন্য কোন স্থানে প্রাণীর মূর্তি স্থাপন বা ছবি টাঙ্গানো হারাম। কিন্তু তাই বলে ইসলাম ঘর সাজানো ও সৌখিনতাকে নিষিদ্ধ করে নাই। প্রাণী মূর্তি বা ছবি বাদ দিয়ে ফুল, ঝর্ণা, গাছপালা, বাগান ও সুন্দর নির্মাণ শৈলী ইত্যাদির ছবি বা ক্যালিওগ্রাফী ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজাতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফঃ ৩৫৯ ও ৩৮৫]

মেয়েদের মাথার চুল কাটা

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েদের মাথার চুল কাটা সম্পর্কে শরী'আতের কি বিধান রয়েছে? বর্তমানে প্রচলিত বিউটি পার্লারে মেয়েদের যে চুল কাটা হয়, তা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

জবাবঃ বালেগা মেয়েদের মাথার চুল কাটা জায়িয নয়। আদদুরুল মুখতার কিতাবে এ ধরনের মহিলাদেরকে পাপী ও অভিশপ্ত বলা হয়েছে। নারীর মাথার চুল কারার মধ্যে দু'টি পাপ বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য (১) নারীর জন্য নরের সাদৃশ্য অবলম্বন করার গুনাহ। (২) কাফির ও বিজাতীয়দের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার গুনাহ।

বর্তমানে প্রচলিত বিউটি পার্লারগুলো বিজাতীয়দের রীতি প্রভাবিত ও নানা রকম গুনাহের কেন্দ্র। কাজেই কোন মুসলিম নারীর জন্য বিউটি

পার্লারে যাওয়া এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি জন্য চুল ছোট করা জায়িয নয়। [ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৫৮; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১:৩৭৪; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২২৮-২২৯; মিশকাত শরীফ ২:২৮০-২৮১; বেহেশতী গাওহার ১১:১১৫; ফাতাওয়া শামী ৬:৪০৭; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৪১]

সরকারী চাকুরীজীবিদের বেতন

জিজ্ঞাসাঃ সরকারী অফিস-আদালতে চাকুরী করে বা স্কুল-কলেজে চাকুরী করে যে বেতন পাওয়া যায় সেটা হালাল কি-না? যেহেতু সেটা সরকারী পয়সা। আর সরকারী খাতে পতিতালয়ের পয়সা, সিনেমার অবৈধ ব্যবসা, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি পয়সা অর্থাৎ হালাল ও হারাম মিশ্রিত পয়সা রয়েছে। এমতাস্থায় হুকুম কি?

জবাবঃ দাতার যিম্মাদারী হচ্ছে পাওনাদারকে হালাল টাকা দিয়ে পাওনা পরিশোধ করে দেয়া। দাতা যদি এ যিম্মাদারী আদায় না করে এবং দাতার টাকা হারাম মিশ্রিত হয়, তাহলে গ্রহীতা যদি তা বৈধ উপায়ে বা স্বীয় অধিকার রূপে গ্রহণ করে, তাহলে গ্রহীতার জন্য তা হালাল হবে। বিনিময় বা প্রারিশ্রমিকের মধ্যে ত্রুটি থাকলে, তার জন্য দাতা দায়ী হবে। গ্রহীতা এ টাকা যে কোন ভাল কাজে ব্যবহার করতে পারবে। [ফাতাওয়া শামী ৬:৩৯১; ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩:১৫৩]

প্যাকেটজাত গোশতের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্যাকেটকৃত গোশত পাওয়া যায়। তা খাওয়া শরী'আত সম্মত কি-না?

জবাবঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে প্যাকেটকৃত গোশত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে যদি জানা থাকে যে, এগুলো মুসলমানের হাতে শরী'আত সম্মত

পদ্ধতিতে যবেহকৃত হালাল জন্তুর গোশত, তাহলে উক্ত গোশত খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রুপ বাস্তবে আহলে কিতাব তথা শুধু আদম শুমারীতে নয় বরং বাস্তবে ইয়াহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক আল্লাহর নামে যবেহকৃত জন্তুর গোশত হালাল হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে অধিকাংশ আহলে কিতাব বাস্তবে নাস্তিক। তারা নামে মাত্র আহলে কিতাব। সুতরাং তাদেরকে আহলে কিতাব মনে করে বিধান জারী করা মারাত্মক ভুল। আর যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে এগুলো কোন কাফির বা মুশরিকের যবেহকৃত, অথবা মুসলমান বা বাস্তব আহলে কিতাবদের পক্ষ থেকেই; কিন্তু শর'ঈ পন্থায় আল্লাহর নাম নিয়ে ধারালো চাকু বা অন্য কিছু দিয়ে যবেহ করা হয়নি, বরং মেশীনে বা অন্য কোন পন্থায় আল্লাহর নাম নেয়া ব্যতীত কাটা হয়েছে। আর বর্তমানে সাধারণতঃ এ সব প্যাকেটকৃত গোশত থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

আর যদি প্যাকেটকৃত গোশতের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে এটা মুসলমান, কাফির, না মুশরিকের যবেহকৃত গোশত, তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত প্যাকেটকৃত গোশত পরিহার করা জরুরী। [সূরা আনআম ১২; বুখারী শরীফ ১:২৭৫; নিযামুল ফাতাওয়া ১:১৮৭]

যুব কল্যাণ প্রজেক্ট এর নামে সদস্যপদ গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ সম্প্রতি যুব কল্যাণ প্রজেক্ট নামে সরকার অনুমোদিত একটি সংস্থা আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচন করা। সদস্য হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, নিধারিত মূল্য পরিশোধ করে সংস্থার ফরম সংগ্রহ করতে হয়। অতঃপর সেটা পূরণ করে জমা দিলে তাকে আরো দু'টি ফরম দেয়া হয়। (প্রথমোক্ত ফরমের টাকার কিছু অংশ সংস্থা ও সংস্থার

সদস্যদের নামে জমা থাকে) সে উক্ত ফরম দু'টি একটি বিক্রয় করে অন্যদেরকে সদস্য বানাবে। অতঃপর তাদের প্রত্যেকে আবার দু'জন করে সদস্য বানাবে। এরপর এ চারজন বানাবে আটজন সদস্য। এভাবে সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলতেই থাকবে। উল্লেখ্য যে, যখন প্রথম ব্যক্তির দ্বারা সদস্য সংখ্যা দাঁড়াবে আট-এ তখন যে, সংস্থার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে ৪০০/- টাকা। আর যখন এরূপ সদস্য সংখ্যা হবে চৌষট্রি, তখন সে পাবে ৩২০০/- টাকা। তেমনিভাবে যখন এরূপ সদস্য সংখ্যা হবে এক হাজার চব্বিশজন, তখন সে পাবে, ১,০২৪০০/- টাকা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উল্লেখিত সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করা ও সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি-না?

জবাবঃ প্রশ্ন বর্ণিত নব আবিষ্কৃত অল্প সময়ে স্বল্প পরিশ্রমে দারিদ্র্য বিমোচনের যে উপায় প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা বৈধ হওয়ার কোন উপায় নাই। কারণ, লেন-দেনের ক্ষেত্রে শরী'আত যেসব ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, এটা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। অধিক মুনাফা অর্জন করার নিয়্যাত কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াই ফরম ক্রয় করার পর তা বিক্রয় করার জন্য ফরম প্রচারের নব আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি সুদ ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এটা সম্পূর্ণ হারাম। [সূরা বাকারাহ ৩:২৭৫, ২৭৬; সূরা আলে ইমরান ৪:১৩০; মিশকাত শরীফ ২৪৪]

সন্তান গ্রহণে বিলম্ব করা

জিজ্ঞাসাঃ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর দ্বিতীয় সন্তান গ্রহণের আগে দু'তিন বছর পর্যন্ত সন্তান বন্ধ রাখার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ যদি শর'ঈ কোন উযর থাকে এবং দ্বীনদার অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের মতে মহিলার গর্ভধারণে স্বাস্থ্য অধিক খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা অন্য কোন শর'ঈ উযর থাকে, তাহলে সাময়িকভাবে এ জাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তথাকথিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব-অনটনের ভয়ে গ্রহণ করা হয় থাকে, যা কুরআন হাদীসের সাথে সরাসরি বিরোধপূর্ণ এবং তা মহান আল্লাহ যে একমাত্র রিযিকদাতা এ বিশ্বাসের চরম পরিপন্থী। সুতরাং এ উদ্দেশে জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণ করা নাজায়িয ও হারাম। [ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৩৪; সূরা হুদঃ ৭; সূরা যারিয়াত]

অমুসলিমের জন্য দু'আ করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক হিন্দু লোকের মুসলমান কন্যা তার পিতার রোগ মুক্তির জন্য স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট মীলাদ পড়ে দু'আ করতে বললেন। ইমাম সাহেব বলেন, তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা যাবে না। তবে হিদায়াতের দু'আ করা যাবে। ইমাম সাহেব মীলাদ পড়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ ! এক সন্তান তার পিতার জন্য দু'আ চেয়েছেন, তুমি তাকে হেদায়েত কর। এমন দু'আ করা ইমাম সাহেবের জন্য কি ঠিক হয়েছে? এ ব্যাপারে শরী'আতের ফায়সালা জানতে চাই।

জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী আপনাদের স্থানীয় ইমাম সাহেবের জন্য উক্ত মুসলমান মহিলার হিন্দু পিতার হিদায়াতের দু'আ করা বৈধ হয়েছে। ইমাম সাহেব লোকটির রোগ মুক্তির জন্যও দু'আ করতে পারতেন। মুসলমানদের জন্য অমুসলিম ব্যক্তিদের হিদায়েতের দু'আ করাই উচিৎ। শরী'আত তাদের জন্য ঈমান আনার আগে মাগফিরাতের দু'আ করার কোন অনুমতি নেই। [মিশকাতঃ ১:১৩৭]

স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ গত আগষ্ট, ৯৩ সংখ্যার একটি প্রশ্নের জবাবে উল্লেখিত ছিল যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হল, আংটি বা ঘড়ি ইত্যাদিতে স্বর্ণ ব্যবহার নাজায়িয হলেও দাঁতের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা যাবে কি-না?

জবাবঃ দাঁত এবং নাকের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার জায়িয হবে। অর্থাৎ যদি কোন পুরুষের দাঁত পড়ে যায় বা কোন কারণে ফেলে দেয়, কিংবা জিহাদের ময়দানে বা অন্য কোন কারণে নাক কাটা যায় তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে স্বর্ণ দ্বারা ঐ দাঁত বা নাক বাঁধাই করতে পারবে। তাঁর একটা বিশেষ কারণ হল স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ দ্বারা যদি এগুলো বাধাই করা হয়, তাহলে দুর্গন্ধ হবে এবং ময়লা ইত্যাদি জমে একটা বিশ্রী পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। তাতে লোকটি সমাজে ঘৃণিত হবে। তাই দাঁত এবং নাক স্বর্ণ দ্বারা বাঁধাই করা জায়িয। [ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:২৭৩]

পাঠা ছাগল দ্বারা মিলন ঘটানো

জিজ্ঞাসাঃ পাঠা ছাগলের দ্বারা মিলন ঘটিয়ে টাকা নেয়া জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ ধার্য্য করে এ কাজের বিনিময়ে টাকা-প্রয়সা গ্রহণ করা জায়িয হবে না। তবে ছাগীওয়ালা যদি খুশী হয়ে কিছু সম্মান করে, তা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। [মিশকাত শরীফ ১:২৪৭]

উলামা কর্তৃক অনুমোদিত হালাল গোশত

জিজ্ঞাসাঃ সিঙ্গাপুরে হালাল প্রাণীর গোশত পাওয়া খুবই দুষ্কর। এদিকে এখানকার উলামায়ে কিরাম কর্তৃক অনুমোদিত হালাল বলে প্রচলিত

বাজার যেসব হাঁস-মুরগীর গোশত পাওয়া যায়, সেগুলোর বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

হাঁস-মুরগী যবেহ করার আগে সেগুলোর গায়ে বৈদ্যুতিক তারের শক দেয়া হয়। আর যবেহ করার পর পেট কেটে নাড়ি-ভুড়ি না বের করেই পশম ছাড়ানোর জন্য গরম পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। পানি প্রথম অবস্থায় পাক থাকলেও পরে আর তা পাক থাকার কথা নয়। কেননা, যবেহ করার সময় অনেক হাঁস-মুরগীই পায়খানা করে দেয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবেই ফেলা হয়। উল্লেখ্য যে, এ হাঁস-মুরগীরগুলো মুসলমানরাই যবেহ করে থাকেন। সুতরাং এসব হাস-মুরগীর গোশত খাওয়া জায়িয জবেহ কি-না?

জবাবঃ প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত হাঁস-মুরগীগুলোকে যবেহ করার আগে বৈদ্যুতিক শক দেয়ার ফলে যদি এগুলোর রক্ত জমে যায় এবং মারা যায় অতঃপর সেগুলো যবেহ করা হয়, তাহলে কোনভাবেই এসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

আর যদি এসব হাঁস-মুরগীরকে দুর্বল করার জন্য বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়। অতঃপর সেগুলো শর‘ঈ বিধান মুতাবিক যবেহ করা হয় এবং যবেহ করার পর সেগুলো থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। তাহলে এসব হাঁস মুরগীর গোশত খাওয়া হারাম হবে না।

আর যদি হাঁস-মুরগী যবেহ করার পর পর পালক ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য পেটের নাড়ি-ভুড়ি বা নাপাক বর্জ্য সহ গরম পানিতে ফেলা হয়, এমতাবস্থায় তার এর দু’টি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ উক্ত গরম পানি যদি এত গরম হয় যে, আগুনের উত্তাপে তা টকবগ করতে থাকে এবং সেই পানিতে যবেহকৃত হাঁস-মুরগী এত সময় রাখা হয়, যার ফলে

গোশতের মাঝেও পেটের অপবিত্র বর্জ্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহলে সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

দ্বিতীয়তঃ পানি যদি সাধারণ গরম হয়, অথবা বেশী মাত্রায় গরম পানিতে অল্প সময় রাখা হয়। যার দ্বারা কেবলমাত্র চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে গোশতের মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না বা নাপাক পানি গোশতের ভিতর পৌঁছে না, তাহলে উক্ত হাঁস-মুরগীকে তিন বার ধৌত করে তা খাওয়া জায়িয হবে।

[সূরা মায়িদাহঃ ৩, মুসলিম শরীফ ২:১৫৬; মারাফিল ফালাহ ১২৮, ফাতাওয়া শামী ১:৩৩৪, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২:৩৬৭, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ২:৪১৯; ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৮৫]

বিধর্মীকে সালাম দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন বিধর্মীকে সালাম দেয়া জায়িয কি-না এবং কোন বিধর্মী যদি কোন মুসলমানকে সালাম দেয়, তখন মুসলমান ব্যক্তি উক্ত সালামের জবাব দিবে কি-না? বা জবাব দেয়া কতটুকু জরুরী হবে?

জবাবঃ কোন বিধর্মী বা কাফির, মুশরিক, হিন্দু, শী'আ, কাদিয়ানী, নাস্তিক, মুরতাদ এদের কাউকে কখনও সালাম দেয়া জায়িয নয়। কারণ, সালামের অর্থ হল- কারো শান্তির জন্য দু'আ করা। মুসলমানদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হলে সালামের মাধ্যমে একে অপরকে অভিবাদন পেশ করবে এবং তার শান্তি ও সালামতীর এরা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ প্রাপ্ত। সুতরাং তাদের জন্য শান্তি ও সালামতীর জন্য দু'আ করা জায়িয নয়। একান্ত এদের কেউ যদি কোন মুসলমানকে সালাম দেয় এবং সে সরাসনি সালামের বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার উত্তরে শুধু ওয়া আলাইকা বলে দিবে অথবা হাদাকাল্লাহুল ইসলাম বলবে। আর যদি

আদাব বা নমস্কার বলে তাহলে তার উত্তরে হাত উঁচু করে ইশারা করাই যথেষ্ট। তবে এখানেও হাদাকাল্লাহুল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে ইসলাম কবুল করার তাওফীক দান করুন বলে উত্তর দেয়া ভাল। [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১৩৮- ২২১]

পিতার সম্পত্তি থেকে দান করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলা বিবাহের পরে বাবা মায়ের বাসায় থাকে এবং উক্ত মহিলা কোন উস্তাদকে অথবা কাউকে মা-বাবার সংসার হতে কোন কিছু দিলে যাকে দিল তার জন্য নেয়া জয়িয হবে কি-না? আর যে দিল তারই বা কোন গুনাহ হবে কি-না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

জবাবঃ যদি পিতা-মাতা বা অভিভাবক কাউকে কোন কিছু দান করার অনুমতি তাকে দিয়ে থাকে অথবা কাউকে কোন কিছু দান করার কথা জানতে পেরেও নিষেধ না করে, তাহলে মেয়ের জন্য দেয়া এবং অন্যের জন্য গ্রহণ করা জায়িয আছে। পক্ষান্তরে যদি অনুমতি বা মৌন সমর্থন না পাওয়া যায় তাহলে মেয়ের দেয়া এবং অন্যের জন্য জেনে শুনে গ্রহণ করা জায়িয হবে না। অবশ্য এক্ষেত্রে গ্রহণকারীর উচিৎ যাঁচাই করে গ্রহণ করা। কারণ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, কোন মুসলমানের মাল অন্য ব্যক্তির জন্য তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়। যেহেতু এখানে মালের মালিক পিতা-মাতা। সে হিসাবে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি একান্ত জরুরী। [মিশকাত শরীফঃ ১:২৫৫, ১৭২]

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জিজ্ঞাসাঃ (ক) ইসলামের দৃষ্টিতে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নাজায়িয কেন? ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি আছে কি?

জবাবঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ শব্দটাই আপত্তিকর। কারণ মানুষের যখন মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। তখন জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে কোথা থেকে? বরং উভয়টাই আল্লাহ তা'আলার একক নিয়ন্ত্রণে। প্রচলিত তথাকথিত জন্মনিয়ন্ত্রণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার ভয়ে এবং সুখী পরিবারে গড়ার লক্ষ্যে করে থাকে। অথচ এটা ইসলামী আকীদার সুস্পষ্ট পরিপন্থী। রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আল্লাহ। সমস্ত মাখলূকের রিযিকের যিম্মাদারী তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। তিনি এমন কোন নিয়ম নির্ধারণ করেননি যে, সন্তান কম থাকলে তাকে বেশী রিযিক দান করতে পারেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা আল্লাহ রিযিক দাতা এ আকীদার পরিপন্থী এবং ঈমাণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, তোমরা সন্তানদেরকে দরিদ্রতার কারণে ধ্বংস করো না। আমি তোমাদেরও রিযিকের ব্যবস্থা করবো এবং তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবো। [সূরা আনআম ১৫১]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমরা সন্তানদেরকে দরিদ্রতার আগাম আশংকায় তোমাদের সন্তানদের ধ্বংস করো না। আমিই তাদের এবং তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবো। (সূরা বণী ইসরাঈল -৩১) তাছাড়া সন্তান বৃদ্ধি করা আখেরী উম্মতের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ অসিয়্যত। এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এমন বংশের মেয়েদেরকে বিবাহ কর যে, বংশের মেয়েরা অধিক সন্তান জন্ম দেয়। কেননা, কিয়ামতের দিন আমি উম্মতের আধিক্যের দ্বারা গর্ব করবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অমান্য করে কিভাবে হাশরের ময়দানে তার সুপারিশ আশা করা যায়।

সুতরাং কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য দ্বারা একথাই প্রমাণিত হল যে, প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ হারাম এবং নাজায়িয।

অতএব, কুরআন- হাদীসের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে, সে কখনো কুরআন পরিপন্থী কোন কাজ করতে পারে না। তাছাড়া বাস্তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইসলামের দুশমনদের একটা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। তারা মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য শংকিত। তাই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ লেবেলে তারা এক মুকাবিলা করতে চায়। তারা চায় মুসলিম সমাজে এ পদ্ধতির মাধ্যমে যিনা ব্যভিচারের জোয়ার দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর আযাব ও গযবে নিক্ষিপ্ত করতে।

নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের আযল ও বর্তমানের পদ্ধতি এক জিনিস নয়। আযল তো নিশ্চিত কোন পদ্ধতি নয়। তদুপরি নবী ﷺ আযলকে কখনও পছন্দ করেননি। বরং তিনি ঘোষণা করেছেন। কোন মুসলমান এরূপ করে আমার ধারণা ছিল না। (মুসলিম শরীফ) কোন রিওয়ায়াতে আযলকে তিনি আরো বলেছেন, তোমরা যদি আযল না করো, তোমাদের কোন ক্ষতি তো হবে না। দুঃখের বিষয় অনেক সরকারী নামধারী আলেম সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোতে আযলের হাদীসের অর্থ বিকৃত করে এর দ্বারা প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়িয প্রমাণিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায় এবং জনসাধারণকে গোমরা করে।

তবে শর'ঈ কোন উযর যেমন মুসলমান দ্বীনদার বিজ্ঞ ডাক্তারের মতে, দুর্বল মহিলার গর্ভধারণে যদি স্বাস্থ্য বেশী খারাপ হওয়ার প্রবল সম্ভবনা থাকে, তাহলে তখন সাময়িকভাবে গর্ভরোধ করা জায়িয রয়েছে। কিন্তু এমনভাবে করতে হবে, যাতে হারাম কাজের আশ্রয় নিতে না হয়। অথবা যদি স্ত্রীর কোন কারণে গর্ভধাণের ক্ষমতাই না থাকে, বরং গর্ভধারণের মৃত্যু আশংকা থাকে এবং স্থানীভাবে গর্ভরোধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়

না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে মুসলিম দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশেনের মাধমে বা অন্য কোন উপায় স্থায়ীভাবে গর্ভরোধ করতে পারবে।

ওরস করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান যমনায় অনেক পীর সাহেব নির্ধারিত সময় ওরস করে এবং মুরীদরা গরু ছাগল নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের যোগ দেয়া ঠিক হবে কি না? এবং এই ধরণের ওরস করা জায়িয কি-না?

জবাবঃ ওরস বলতে আমরা বুঝি কোন পীরের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে তার মাযারে কয়েকদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান করা এবং খানা-পিনার ব্যবস্থা করা। এ ব্যপারে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যু বা তার স্বরণে কোন দিবস পালন করা জায়িয নয়। যদিও তিনি ওলী বা কতুব হন। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার কবরকে তোমরা ঈদ বা মেলা বানাবে না। আমার কববকে তোমরা পূজার মূর্তি বানাবে না। তাই এ ধরনের ওরস পালন করা শরী'আতে জায়িয নয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে অধিকাংশ ওরসে পরুষ মেয়ে বিনা পর্দায় একসাথে একত্রিত হয় এবং সেখানে শরী'আত বিরোধী ও অসামাজিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এসব ওরসে শরীক হওয়া পালন করা হারাম। উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিয়ীনের যুগে এসবের কোন প্রচলন ছিল না। আর এখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়াজ বা কোন নবীর কবরে কিংবা কোন সাহায়াবে কিরামের কবরস্থলে কোন ওরস হয়না। সুতরাং এটা আমাদের দেশের একটা বিদআতী রুসুম। [খাইরুল ফাতাওয়া. ৫৭৩]

পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার জায়িয কি-না?

জবাবঃ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার জায়িয নয়। তবে রৌপ্যের আংটি এক তোলার এক তৃতীয়াংশের সামান্য কম পরিমাণ ব্যবহার করতে পারে। রাজা-বাদশাহ কাযী ও মুতাওল্লীর জন্য সীল মহর হিসেবে রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করা জায়িয। [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৫:৯৭, ৪:৪৪১]

হাউস মাছ ও শাপলা মাছ খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ হাউস মাছ বা শাপলা মাছ খাওয়া জায়িয আছে কি-না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি যে সকল নেয়ামত সমূহ দান করেছেন মাছ তার মধ্যে অন্যতম। সকল প্রকারের মাছ খাওয়া তিনি হালাল করেছেন। তবে মাছের প্রকার অধিক হওয়ার কারণে এবং মাছের সংজ্ঞার ব্যাপারে একাধিক কাওল বা উক্তি থাকরা কারণে এবং অনেক সময় সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে কোনটি মাছ এবং কোনটি মাছ নয়, তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এ সমস্যা সমাধানের জন্য ফুকহায়ে কিরামগণ মাছ চিহ্নিত করার একটি সাধারণ নিয়মের বর্ণনা দিয়েছেন। মৎস প্রধান এলাকায় সেখানকার প্রচলন বা পরিভাষায় যেটা মাছ নামে পরিচিত হবে, সেটাই মাছ বলে গণ্য হবে এবং তা খাওয়াও জায়িয হবে। তবে এর কোন প্রকারের মধ্যে বা কোনটার মধ্যে কোন প্রকার বিষাক্ত ক্রিয়া পাওয়া গেলে সেটা খাওয়া মাকরূহ হবে।

উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী হাওস মাছকে যেহেতু আমাদের দেশের লোকেরা মাছ বলে এবং জেলেরাও এটাকে মাছ বলে বাজারে বিক্রয় করে এবং তার মধ্যে কোন প্রকার বিষক্রিয়া দেখা যায় না তাই এটা মাছ

হিসাবেই গণ্য হবে এবং এটা খাওয়া জায়িয, এতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। তবে কারো তবীয়ত যদি এটা খেতে ঘৃনাবোধ হয়, তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার ব্যক্তিগত ঘৃণার কারণে এটাকে সে হারাম মনে করতে পারবে না। [প্রমাণঃ মাসবূত ১১:২৩০; ফাতাওয়া কাযী খান ১:১৭৫; বাদায়েয়ুস সানায়ে ৫:৩৬]

বিধর্মীদের মৃত্যুতে কুরআনখানী করা

জিজ্ঞাসাঃ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম অনেক স্থানে মুসলমানগণ প্রিন্সেস ডায়না ও মাদার তেঁরেসার মৃত্যুতে কুরআনখানী বা মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করেছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে বিধর্মীদের জন্য এ ধরনের ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান করা জায়িয আছে কি-না? যদি কোন মুসলমান করে তাহলে তার সম্পর্কে শরী'আতের মাসআলা কি?

জবাবঃ কোন মুমিন মুসলমানের জন্য কোন বিধর্মীর মৃত্যুতে তার মাগফিরাত বা সাওয়াব রিসানীর নিয়মে মীলাদ-মাহফিল, কুরআনখানি বা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা বা তার অংশগ্রহণ করা জায়িয নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

অর্থাঃ নবী ও মুমিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা আল্লাহর দরবারে মুশরীকদের জন্য মাগফিরাত কামণা করবে, যদিও তারা নিকটতম আত্মীয় হয়, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা (মুশরিকরা)দোষখী। [সূরা তাওবাঃ ১১৩]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

অর্থঃ হে নবী! আপনি তাদের (কাফির ও মুশরীকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর নাই করুন, তাদের কোন উপকারে আসবে না। যদিও আপনি তাদের জন্য সত্তর বার অর্থাৎ অসংখ্য বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তথাপি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত করেন না। [সূরা তাওবা -৮০]

এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াতে স্পষ্টভাবে বিধর্মীদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

তবে জীবিত বিধর্মীদের হিদায়াতের জন্য দু'আ করা জায়িয আছে। [প্রমাণঃ তাফসীরে মাযহারী ৪:৩০৬]

যেমন- স্বয়ং রাসূল কারীম ﷺ ওহুদের ময়দানে কাফিরদের হাতে আহত অবস্থায় কাফিরদের জন্য এই বলে দু'আ করেছিলেন,

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার কাওমকে ক্ষমা করে দাও, তারা তো বুঝে না। হুযূর ﷺ এর উক্ত বাণীতে মাগফিরাতের দু'আ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে ঈমান ও ইসলামের তাওফীক দিয়ে মাগফিরাতের উপযুক্ত করে নেন। (মা আরিফুল কুরআন ৪: ৪৭২ পৃঃ) সুতরাং, কোন অবস্থাতেই বিধর্মীদের মাগফিরাতের জন্য মীলাদ-মাহফিল, কুরআনখানী বা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা জায়িয হবে না। এখন যদি কোন মুসলমান এরূপ করে থাকে তাহলে

সে মারাত্মক কবীরা গুণাহের জড়িত হবে। এবং এ জন্য তার তাওবা-ইসতিগফার করা জরুরী।

আত্মহত্যাকারীর শাস্তি কি? তাদের ঈসালে সাওয়াব করা যাবে কি?

জিজ্ঞাসাঃ আত্মহত্যাকারীর প্রতি আল্লাহ পাকের ঘোষণা তারা জাহান্নামী। একথা ঠিক কি-না? তাদের জন্য কুরআন খতম, দু'আ কালাম পড়ে ঈসালে সাওয়াব করা যাবে কি-না? লোকজনদেরকে খাওয়ানো এবং সে অনুষ্ঠানে খাওয়া যাবে কি-না? কুরআন-হাদীসের আলোকে দয়া করে জানাবেন ।

জবাবঃ আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে কঠোর ধমকি এসেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে গড়ীয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামের মধ্যে অনবরত নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। সে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সেই বিষ তার হাতে থাকবে যা সে জাহান্নামের মধ্যে পান করতে থাকবে এবং সে জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহ অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সেই অস্ত্র তার হাতে থাকবে; যার দ্বারা সে জাহান্নামের মধ্যে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

উল্লেখ্য, আত্মহত্যার জায়িয মনে করে করলে ঈমান নষ্ট হয়ে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর আত্মহত্যাকে জায়িয মনে না করলে মানুষ বেঈমান হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে যে কোন গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন।

হাদীসে শরীফে আত্মহত্যাকারীকে ধমকি স্বরূপ চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা হয়েছে এই অর্থে যে, সে দীর্ঘকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। অথবা

চিরকাল শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আত্মহত্যাকে জায়িয বলে বিশ্বাস করবে।

সুতরাং, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য শরী'আতসম্মত পন্থায় ঈসালে সাহওয়াবের উদ্দেশে কুরআন খতম করে বখশিয়ে দেওয়া বা নিজের হালাল মাল থেকে গরীব-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানো জায়িয, এতে কোন অসুবিধা নাই।

উল্লেখ্য যে, ইসালে সাওয়াবের নামে আমাদের দেশে অনেক গর্হিত কাজ প্রচলিত রয়েছে যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিদ'আত ও মনগড়া। যেমন-নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ ত্রিশা, চল্লিশা, ইত্যাদি উপলক্ষ্যে এলাকার গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজনসহ ধনী-গরীব সকলের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা। টাকার বিনিময়ে কুরআন শরীফ খতম করানো, মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন না করে ইয়াতীমদের সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা ইত্যাদি। এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সেগুলোতে যোগ দেওয়া উভয়টাই বিদ'আত ও নাজায়িয। বরং সাওয়াব রিসানীর সহীহ তরীকা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ব্যক্তিগতভাবে তাকে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যাতে সময়ে সময়ে কুরআন খতম করে বা কালিমা তাইয়্যেবা পাঠ করে বা নফল নামায পড়ে সাওয়াব রিসানী করে দিবে। আর যখন যার যেরকম সামর্থ্য হয় নিজের হালাল মাল দ্বারা গরীব-মিসকীন ও ইয়াতীম-অসহায়দেরকে খানা খাওয়াবে। তাদেরকে কাপড়-চোপড় ও টাকা-পয়সা ইত্যাদি দান করবে এবং তার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে সাদকায়ে জারিয়াসহ অন্যান্য নেক কাজ করে তাকে সাওয়াব রিসানী করতে থাকবে। [মিশকত শরীফ ২৯৯; মিশকাতঃ ১:১২৭; মাযাহেরে হক ৩:৫১৫; ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ৬:৮৫; আহসানুল ফাতাওয়া ১:৩৬১; ইমদাদুল আহকাম ১:১১২; আযীযুল ফাতাওয়া ৩৪৪]

বিড়ালের ঝুটা

জিজ্ঞাসাঃ বিড়ালের ঝুটা পাক, না নাপাক? তা খাওয়া যাবে কি-না?

জবাবঃ বিড়ালের ঝুটা মাকরূহ। তবে অসচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য খাওয়ার অনুমতি আছে।

চলাফেরা ও কাজ করা অবস্থায় যিকির করা

জিজ্ঞাসাঃ কাজে থাকা বা হাঁটা-চলা অবস্থায় যিকির, তিলাওয়াত করা যাবে কী?

জবাবঃ কাজে থাকা অবস্থায় বা হাঁটা-চলা অবস্থায় সব ধরনের যিকির করা যায়। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১:৪৯, মাসূরা, ৬:৬৪]

শ্বশুরকে আব্বা বলা

জিজ্ঞাসাঃ শ্বশুরকে আব্বা বলা ঠিক কিনা? এতে কি নিজের বংশের অন্যের দিকে নিসবত করা হয় না?

জবাবঃ শ্বশুরকে আব্বা বলার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, পূর্ণশ্রদ্ধা ও সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা বুঝানোর জন্যই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। আর এতে নিজের বংশের নিসবত শ্বশুরের দিকে করা হয় না। হাদীস শরীফে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তার অর্থ হল, নিজের আসল পিতৃ পরিচয় না দিয়ে অন্যের দিকে নিজেকে নিসবত করা, যাতে কিছুটা সামাজিক বা ব্যক্তিগত নাজায়িয ফায়দা হয়। অবশ্য সেটা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু শ্বশুরকে আব্বা বলায় সে ধরণের কিছু থাকে না। ছোটকে স্নেহ করা, বড়কে শ্রদ্ধা করাই শরী'আতের নির্দেশ। [তিরমিযী শরীফ ২:১৪]

যে অবস্থায় ফটো তোলা জায়িয

জিজ্ঞাসাঃ আমি কিছু সংখ্যক আলিমের নিকট শুনেছি যে, ফটো তোলা হারাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ফটো তোলা কি সর্বক্ষেত্রেই হারাম? না বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর অনুমতিও আছে? যদি অনুমতি থাকে, তাহলে সেগুলো কি-কি?

জবাবঃ ছবি তোলা হারাম হলেও ধর্মীয় বা দুনিয়াবী বৈধ প্রয়োজনে অপরাগতার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছে। অবশ্য অপরাগতা ছাড়া ছবি তোলা কোন অবস্তাতেই জায়িয নয়। [প্রমাণঃ জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩:২৩২; ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৪:২২১]

হিন্দু ঘরের নিকটবর্তী রুমে নামায-কুরআন তিলাওয়াত করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি এক হিন্দু পরিবারের সাথে আছি। তাদের সমস্ত ঘরে এবং দরজায় মূর্তির ছবি লাগানো। তবে আমার রুমে কোন মূর্তি বা ছবি নেই। এভাবে হিন্দু পরিবারের সাথে আমার রুমে নামায বা কুরআন তিলাওয়াত করা শরী'আতের দৃষ্টিতে ঠিক হবে কি?

জবাবঃ আপনার রুমে নামায, তিলাওয়াত এবং শর'ঈ সকল আহকাম পালন করাই সবই ঠিক হবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন প্রকার বাধা নেই। কেননা, সেখানে তো কোন প্রকারের মুর্তি ইত্যাদি নেই। তবে উল্লেখ যে মুশরিক বা বিধর্মী পরিবারের সাথে একত্রে বসবাস করার ব্যাপারে শরী'আতে নিষেধ রয়েছে। আপনার বাসস্থান উক্ত হিন্দু পরিবার থেকে পৃথক করে অন্যত্র নেয়া উচিত। যাতে বার বার হিন্দুদের মূর্তি দেখতে না হয়।

গোবরের জ্বালানী বিক্রয় করা

জিজ্ঞাসাঃ গরু-মহিষের গোবর শুকিয়ে যে জ্বালানী তৈরী করা হয়, তা বিক্রয় করা বৈধ কি-না?

জবাবঃ গরু-মহিষের গোবর শুকিয়ে তার দ্বারা যেমন খানা পাকানো জায়িয তেমনিভাবে তা বাজারে বিক্রি করাও জায়িয।

বিনা যাঁচায়ের হোটেল ও রেস্টুরেন্টর যবেহকৃদ জন্তুর গোস্ত খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ অনেক সময় দেখা যায় আমাদের দেশের হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে বা বড় ধরণের অনুষ্ঠানে হাঁস মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি জন্তু শরী'আত মুতাবিক যবেহ করা হয় না। এমতাবস্থায় সন্দেহের ভিত্তিতে উক্ত স্থানসমূহে উল্লেখিত প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়িয কি-না?

জবাবঃ কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বলে তাহলে উক্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া নাজায়িয। তবে যদি কেউ অনিচ্ছায় বা বেখিয়ালিতে বিসমিল্লাহ না বলে বা বলতে ভুলে গিয়ে থাকে, তাহলে উক্ত যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়িয এবং সম্পূর্ণ হালাল হবে।

হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা অনুষ্ঠানাদিতে সাধারণতঃ মুসলমানরাই যবেহ করে থাকে। আর মুসলমান কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ না বলে পারে না। যদি ভুলে বিসমিল্লাহ ছাড়া যবেহ করে ফেলে, তা খাওয়া নাজায়িয হবে না। সুতরাং, উল্লেখিত অনুষ্ঠানে গোশত খাওয়া জায়িয। বিসমিল্লাহ পড়েছে কি-না নিছক এ সন্দেহের উপর ভিত্তি করে গোশত খাওয়া ত্যাগ করা যায় না। তাছাড়া মুসলমানদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করাই শরী'আতের বিধান। আর প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে তো বিসমিল্লাহ আছেই।

হযরত আয়িশা রা. কর্তৃক এমনিরূপ এক প্রশ্নের জবাবে নবী ﷺ বলেন, এ ধরনের সন্দেহ পরিত্যাগযোগ্য। [হিদায়াঃ ৪:৪৩৫ আল-আশবাহ ওয়ান-নাজায়েয]

কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ পান্তা ভাতের সাথে কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়া জায়িয কি-না?

জবাবঃ কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে কাঁচা পিঁয়াজ খেয়ে দুর্গন্ধ দূর করা ব্যতীত মসজিদ অথবা মাহফিলে যাওয়া মাকরূহ। কারণ, এতে সাধারণ মানুষের ও ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। আর অন্যকে কষ্ট দেয়া শরী'আতে নিষেধ। [তিরমিযী ২:৩]

ড্রইংরুমের পুতুল ও প্রাণীর মূর্তি রাখা

জিজ্ঞাসাঃ হক পয়গাম সীরাত সংখ্যায় কভার ও পোষ্টারে যথাক্রমে মসজিদে নববী ও গারে হেরার সহীত আশ-পাশে বিদ্যামান লোকদের যে ছবি দেওয়া হয়েছে। এ ছবি সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম কি? আমরা জানতে চাই। শরী'আতে যে ছবি নাজায়িয বলা হয়েছে, এটা তার আওতায় পড়ে কি-না? তেমনিভাবে আজকাল ড্রইংরুমে অনেকেই বিভিন্ন ধরণের পুতুল, সিংহ বা অন্য প্রাণীর মূর্তি রাখে। আবার কেউ নিজের বা নিজের ছেলে-মেয়ের ছবি বাঁধাই করে লটকিয়ে রাখে। এগুলোর কি হুকুম?

জবাবঃ পুতুল, ঘোড়া ও সিংহ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর মূর্তি বানানো বা ঘরে রাখা সর্বাবসস্থায় নাজায়িয। বর্তমানে অভিজাত শ্রেণীর দাবীদার অধিকাংশ লোকদের ড্রইংরুমে এ ধরনের মূর্তি দেখা যায়। তা খুবই গর্হিত ও গুণাহের কাজ। মূর্তি রাখার কারণে ঐ সব ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। আর রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করলে সে ঘরের দ্বীনদারী থাকে না। মূর্তি যে কোন প্রাণীর হোক তা রাখা হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মূর্তি দেখলে ভেঙ্গে ফেলতেন।

তেমনিভাবে সাহাবাগণকে তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিতেন। (মুসলিম শরীফ) ছবি সম্পর্কিত বিস্তারিত মাসআলা হল,

(ক) বাড়ীতে নিজের বা মুরুব্বীর অথবা ছেলে-মেয়েদের ছবি লটকিয়ে রাখা সর্বাবস্থায় নাজায়িয ও হারাম। এতে ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা ঢুকবে না। আর এ উদ্দেশ্যে ছবি তোলা নাজায়িয ও কবীরা গুনাহ।

(খ) তবে প্রাণবিহীন জিনিষের ছবি তোলা বা আঁকা জায়িয এবং তা ঘরে রাখা বা ব্যবহার করাও জায়িয। যেমন, গাছ-পালা, ফল-ফুল ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির ছবি।

(গ) যদি প্রাণীর ছবি হয় তাহলে শরী'আত সম্মত উযরের কারণে ছবি তোলা বা রাখা জায়িয। যেমন, পাসপোর্টের জন্যে, হজ্জের জন্য বা বিদেশে দ্বীনী বা দুনিয়াবী দরকারী কাজে যাওয়ার জন্য ছবি তোলা।

(ঘ) এ ধরণের ছবি হয় তাহলে শরী'আত সমর্থিত কারণ না থাকলে প্রাণীর ছবি তোলা নাজায়িয ও হারাম। চাই সেই ছবি স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট হোক, সর্বাবস্থায়ই নাজায়িয। আর সেই ছবির চেহারা স্পষ্ট হলে যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে তা ব্যবহার করা বা নিজের কাছে রাখাও নাজায়িয।

(ঙ) তবে জায়িয জিনিষের ছবি তুলতে গিয়ে যদি প্রাণীর ছবি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এসে যায়। যেমন, মসজিদের ছবি তুলতে গিয়ে ২/৪ জন মুসল্লীর ছবিও এসে গেলো, সে ক্ষেত্রে প্রাণীর ছবি তোলার গুনাহ হবে না। তবে ঐ ছবির চেহারা অস্পষ্ট হলে যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে ব্যবহার করা যাবে। আর প্রাণীর ছবি স্পষ্ট হলে এবং উক্ত মূল মসজিদ ইত্যাদির ছবি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়লে চেহারা মুছে দিতে হবে।

(চ) তবে যে সব ছবির মাথা কাটা, কিংবা মাথা ও চেহারা অঙ্গসমূহ অস্পষ্ট অথবা মাথার পিছনের দিক দিয়ে ছবি নেয়া হয়েছে, কিংবা খুব ছোট সেসব ছবি ব্যবহার করা বা ঘরে রাখা জায়িয।

(ছ) চেহারা অস্পষ্ট তেমনিভাবে অনেক ছোট ছবি এর ব্যাখ্যা, যা জমিনের উপর রাখা থাকলে, মধ্যম ধরনের চোখের জ্যোতি সম্পন্ন লোক দাঁড়ানো অবস্থায় তার চেহারার অঙ্গসমূহ (তথা চোখ, নাক ও কান ইত্যাদি) স্পষ্টতঃ দেখতে পায় না, উহাকেই অস্পষ্ট ছবি বলে। নতুবা তাকে স্পষ্ট ছবি বলা হয়। আর অস্পষ্ট ছবি মাথা মুছা বা মাথা কাটা ছবির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা ঘরে রাখা বা ব্যবহার করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয। তবে এরূপ ছবিও ইচ্ছাপূর্বক বিনা উযরে তোলা যাবে না। তবে জায়িযের ছবি তুলতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত প্রাণীর ছবি এসে গেলে সেটা ভিন্ন কথা তা আগেই বলা হয়েছে। প্রাণীর ছবি হলো মাথা ও চেহারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাওয়া। সুতরাং, মাথা কাটা ও চেহারা মুছা হলে, তা প্রকৃতপক্ষে আর ছবি থাকে না। তাই তা জায়িয গণ্ডিতে চলে আসে। উল্লেখিত ব্যাখ্যা দ্বারা আশা করি ছবির ব্যাপারে কারো অভিযোগ থাকবে না। কারণ প্রথমতঃ উক্ত ছবিগুলো ইচ্ছাকৃত তোলা হয় নি। বরং জায়িয জিনিষের (পাহাড়-মসজিদ) ছবি তুলতে যেয়ে অনিচ্ছাকৃত মানুষের ছবি এসে গেছে। দ্বিতীয়তঃ ছবিগুলো ছোট এবং অস্পষ্ট যার চোখ, নাক, কান ও ইত্যাদি দাঁড়ানো অবস্থায় মধম্য শ্রেণীর জ্যোতি বিশিষ্ট লোকেরা তো দুরের কথা, উত্তম শ্রেণীর জ্যোতীওয়ালারাও স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হবে না। সুতরাং তা জায়িয ও শরী'আত সম্মতরূপেই হয়েছে। [জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩:২৩৩; ইমদাদুল মুফতীন ৯৯৩]

তাবীযের টাকা দিয়ে ঘর নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব তাবীযের পরিবর্তে তথাকথিত হাদিয়া হিসেবে হাজার হাজার টাকা গ্রহণ করেন। এই হাদিয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ এবং মসজিদ থেকে মাসিক ভাতা পান মাত্র ১০,০০০ টাকা। তিনি ঢাকা শহরের এলাকায় ২তলা ১টি বাড়ি করেছেন এবং দেশেও অনেক জায়গা-জমি কিনেছেন। তাবীযের টাকা দ্বারা বাড়ী ঘর করা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ আমাদের সকল কাজ সেটা যত ছোটই হোক না কেন তার লক্ষ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আখিরাত ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। তাই তাবীয ও ঝাঁড় ফুকের বেলায় আমাদেরকে খিদমতে খালক তথা মানব সেবার প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। তাবীয লিখে নিয়ম মাফিক বিনিময় নেয়া জায়িয। এবং তার দ্বারা বাড়ী তৈরী ও জমাজমি ক্রয়ও জায়িয। তবে প্রতি তাবীযে হাজার হাজার টাকা বিনিময় নেয়া জায়িয নয়। কাগজ কালি ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্রয় মূল্যের সাথে ইনসাফ ভিত্তিক সামান্য পরিমাণ পারিশ্রমিক নেয়া উচিত। এতে মানব সেবার সাথে সাথে লোকজন অধিক পরিমাণে উপকৃত থেকে পারবে। তাছাড়া দুনিয়াবী ও উভয় ব্যাপারে মহল্লার মুসল্লীদের খোঁজ খবর নেয়া ও তাদের সমস্যার সমাধান করা ইমামেরেই দায়িত্ব। [খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৪৫; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১৬৬]

ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য ছবি তোলা

জিজ্ঞাসাঃ ভোটার পরিচয় পত্রের জন্য ছবি তোলা জায়িয কি-না?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে ছবি তোলা এবং ছবি উঠানো উভয়টাই হারাম ও নাজায়িয। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যা না হলেই নয়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক ছবি তোলার অনুমতি রয়েছে। দেশের আইন ও

পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ পরিচয় পত্রের প্রয়োজন আছে। কেননা, এটা নাগরিকত্বের প্রমাণসহ আরো অনেক স্থানে এর প্রয়োজন পড়তে পারে। তাই এ দিকে লক্ষ্য করে অনুরূপ ছোট আকারের ছবি উঠানো জায়িয হবে।

উল্লেখ্য, প্রয়োজন যেহেতু মহিলাদেরও হয়ে থাকে, তাই তাদের জন্যও ছবি তুলতে দেওয়া জায়িয হবে। তবে শুধু চেহারার ছবি তুলবে। আর ছবি তোলার পর উক্ত ছবি বিনা প্রয়োজনে অন্য কোন পুরুষকে দেখানো যাবে না এবং প্রয়োজরতিরিক্তগুলো নষ্ট করে দিবে। পুরুষ-মহিলা সকলেই সর্বাবস্থায় ছবি তোলার পর আল্লাহর নিকট তাওবা ইস্তিগফার করবে। [জাওয়াহিরুল ফিকহ ২:২৩২; ক্বাওয়াহিদুল ফিকহ ৮৯; ফাতাওয়া শামী ১:৬৪৮; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২:৩৩৩-৩৩৪; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২৫৩]

কিবলার দিকে পিঠ যবেহ করা

জিজ্ঞাসাঃ কেউ যদি কিবলার দিকে পিঠ করে পূর্ব দিক ফিরে মোরগ যবেহ করে, এতে কোন ক্ষতি আছে কি না?

জবাবঃ হাঁস-মুরগী যবেহ করার সুন্নাত তরীকা হলো এগুলোকে কেবলামুখী করে যবেহকারীর কিবলামুখী হয় যবেহ করা। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যবেহকৃত মোরগ খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এখানে কাজটি মাকরূহ হলেও জানোয়ার মুর্দার হুকুম হওয়ার মত কিছু পাওয়া যায় নি। [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৩৪০]

চামচ দিয়ে বা ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ চামচ দিয়ে খাওয়ায় কোন দোষ আছে কি? রাসূল ﷺ কখনও চামচ দিয়ে খাদ্য খেয়েছেন কি-না? এরূপ ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে গোশত খাওয়ার কি হুকুম ?

জবাবঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও চামচ দিয়ে খাদ্য খাননি। তাই খাদ্য বিনা প্রয়োজনে চামচ বা কাটা চামচ ইত্যাদি দিয়ে খাওয়া সুন্নাতের খিলাফ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে খেতেন এবং খাওয়ার শেষে আঙ্গুল চেটে পরিষ্কার করতেন। গোশত ইত্যাদি ছুরি দিয়ে কেটে দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া সুন্নাত। তবে জরুরতের বেলায় ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়ার অনুমতি আছে। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কোন কোন সময় ছুড়ি দিয়ে কেটে গোশত খেয়েছেন। কারণ, সেই সময় খুবই শক্ত ছিল। দাঁত দিয়ে কাটার উপযোগী ছিল না। [প্রমাণঃ জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১৮০]

দেশী-বিদেশী সাবান ও প্রসাধনী ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ দেশী-বিদেশী সাবানসহ বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী যেমন, ক্রিম ও সেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন বাধা আছে কি-না?

জবাবঃ দেশী-বিদেশী সাবান ও ক্রীমসহ অন্যান্য প্রসাধনী ব্যবহার কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য কোনটির উপাদান সামগ্রীতে যদি হারাম বস্তু নাম লেখা থাকে, তাহলে সেটা ব্যবহার না করা চাই। সেন্টের ব্যাপারে কথা হল, এসব সেন্ট এ্যালকোহল ব্যবহৃত হয় থাকে। কিন্তু এ্যালকোহল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আঙ্গুরের শুরা থেকে বের হয় বিধায় এর ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম। তবে আঙ্গুরের শুরা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু থেকে নির্গত এ্যালকোহল মিশ্রিত সেন্ট জামা-কাপড়ে ব্যবহার করা হারাম নয়। তবে সেন্টের মাঝে কোন ধরনের এ্যালকোহল ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করে

বলা যায় না। তবে কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সেন্ট ব্যবহার করা হারাম এরূপ বলা যাবে না। তবে এ ধরণের সন্দেহযুক্ত জিনিস ব্যবহার না করাই উত্তম। [প্রমাণঃ রাদ্দুস মুহতার ১:৩১৬; ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৫:১৮৩-১৮৭; ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া ৬:২২৭; ফিকহী মাসাইল ১:৩৮-৪৫]

হাত দ্বারা ইশারা করে সালাম বা উত্তর দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে দূরে থেকে হাত দ্বারা ইশারা করে সালাম দেয়। আবার উত্তরদাতাও হাত দ্বারা ইশারা করে উত্তর দেন। এতে কোন ক্ষতি আছে কি?

জবাবঃ দূর থেকে সালাম দেয়াতে যদি শ্রোতা আওয়ায শুনবে না বলে সন্দেহ হয়, তাহলে হাত দ্বারা ইশারা করে শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিতে পারে। তবে হাতের তালু নিজের চেহারার দিকে থাকবে। ইংরেজদের স্যালুট দেয়ার মত যেন না হয়। কিন্তু নিকট থেকে হাত দ্বারা ইশারা করে সালাম দিলে মাকরূহ হবে। উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। তবে সর্বাবস্থায় সালামদাতাকে উত্তর শুনিয়ে বা জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:২২৮; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৯৫]

কুরআন শরীফ পড়ে গেলে কাফফারা

জিজ্ঞাসাঃ গ্রাম দেশে একটা প্রথার প্রচলন আছে যে, কুরআন শরীফ হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেলে কুরআন শরীফের সমপরিমাণ ওজনে চাল ফকীর-মিসকীনদের দিতে হয়। এ প্রথা ঠিক কি-না? কাফফারা দিতে হয় কি-না?

জবাবঃ কুরআন শরীফ অসতর্কতার দরুন পড়ে গেলে, তার জন্য ইস্তিগফার করা কর্তব্য। তার সমপরিমাণ চাল বা অন্য কোন কিছু দেয়া

জরুরী নয়। তবে নিজের নফসের উপর অসাবধানতার শাস্তি স্বরুপ কিছু কঠোরতা করা জরুরী নয়। তবে নিজের নফসের শাস্তি স্বরূপ কিছু দান করা এটা বৈধ। কুরআন শরীফ পাল্লা দ্বারা ওজন করার কথা কোথাও প্রমাণ নেই। এটা শুধু লোকদের মনগড়া কথা। তবে অন্যায়ের মূল যিম্মাদার ইস্তিগফার করার পর যদি এমনিতেই কিছু সদকা করে দেয়, সেটা উত্তম। কেননা তাওবা ইস্তিগফারের পর সদকার দ্বারা গুনাহের পূর্ণ কাফফারা হয়ে যায়। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রশীদিয়া ২২১; ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৬০]

চুল ছোট রাখা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি সামনের চুল বড় রাখে, আর পিছনের চুল ছোট রাখে, তবে এরূপ করা জায়িয আছে কি-না? জানালে উপকৃত হব।

জবাবঃ মাথার কিছু অংশ চুল মুণ্ডানো কিংবা বেশী ছাটা এবং কিছু অংশের চুল বাকী কিংবা কম ছাটা উভয় অবস্থা সম্পর্কে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।

ইহা কাফের এবং ফাসিকদের শিআর। তাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণেই এটাই নিষেধ করা হয়েছে। তাই মাথার অগ্রভাগে চুল বড় রাখা এবং পিছনের চুল ছোট রাখা বিধর্মীদের সামঞ্জস্যের কারণে শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ। [আহসানুল ফাতাওয়া ৮:৮৩; আবু দাউদ ২: ৫৭৭; ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৫৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৮:৮৫]

দাড়ি মুণ্ডানো

জিজ্ঞাসাঃ আমার বয়স ১৭ বছর। আমি ছোটবেলা থেকেই নিয়্যাত করেছি যে দাড়ি রাখবো। কিন্তু আমার দাড়ি খুবই পাতলা হয়ে গজিয়েছে।

দেখতে খুবই বিশ্রী দেখা যায়। এমতাবস্থায় আমি দাড়ি সেভ করলে এবং কিছুদিন পরে দাড়ি রাখলে কি গুনাহ হবে?

জবাবঃ চার মাযহাবের সকল মাযহাব মতেই দাড়ি রাখা ওয়াজিব। ইহা ইসলামের নিদর্শন ও শি'আর। আর কেটে ছেটে এক মুষ্টির কম করা বা এক মুষ্টির আগেই কাটা-ছাটা, মুণ্ডানো সম্পূর্নরূপে হারাম ও কবীরা গুনাহ। চাই তা ঘন করার উদ্দেশে হোক বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যই হোক বা অন্য কোন কারনে হোক। দাড়ি পুরুষ মানুষের মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও চেহারায় পৌরুষত্ব ফুটিয়ে তোলে। ইহা কোন বিশ্রীর কারণ হতে পারে না। চাই তা পাতলা হোক বা ঘন দাড়ি হোক। তাছাড়া এ ধরনের পাতলা দাড়ি অনেক সময় সেভ করা ছাড়াই আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যায়। সুতরাং সেভ করার কোন অনুমতি নেই। এ ছাড়া আপনার বয়স মাত্র সতের। দাড়ি গজানো মাত্রই তো ঘন হয়ে যাবে না কিংবা ২/৩ মাসেই ঘন হয়ে যাবে না। বরং ধীরে ধীরে ২/৩ বছরের মধ্যে দেখবেন দাড়ি ঘন হয়ে গেছে। ক্ষেত্র বিশেষ ৫/৭ বছরও লেগে যায়। তা সেভ করা ছাড়াই হবে।

এছাড়াও দাড়ি পাতলা বা কম হলে অপেক্ষাকৃত কম সুন্দর হওয়া এটা খোদায়ী বিধান। সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তা'আলা যাকে সৌন্দর্য কম দান করেছেন এর প্রতি সবর করতে হবে। সবর করার পরিবর্তে সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশে স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে দাড়ি মুণ্ডালে তা খোদায়ী কুদরতে হস্তক্ষেপ করার শামিল। যা কখনো জায়িয হতে পারে না। মানুষের জীবন-মরণের কোন নিদিষ্ট সীমা জানা নেই। আল্লাহ না করুক যদি আপনি দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফের রাখার আগেই মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে পরকালে আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন? বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করবেন। আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের বিধানের বড়ত্ব ও মহত্ব অন্তরে রাখতে

চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ, দাড়ি মুণ্ডানো সহ অন্যান্য গুনাহের ওয়াসওয়াসা কম হবে। যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থাকা সহজ হবে। [বুখারী ২:৮৭৫, ফাতহুল বারী ১:৩৪৯, তিরমিযী ২:১০৫, ফাতাওয়া শামী ৬:৪০৭, ফাতাওয়ে আলমগিরী ৫:৩৫৮, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২:৪১৭, আযীযুল ফাতাওয়া ১:২০২, আহসানুল ফাতাওয়া ২:২৮৭, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:২৩৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬:৩৫৯]

স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয কি-না? যদি না-জায়িয হয় তাহলে যারা পূর্ব থেকেই চাকরিরত আছে তাদের হুকুম কি?

জবাবঃ আমাদের দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদেরকে এক সাথে বে-পর্দায় শিক্ষা দেয়া হয় বিধায় সেখানে শিক্ষকতা করলে পর্দার ফরয তরক হয়। এ কারনে শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা বৈধ নয়। এখন ঐ শিক্ষকের করনীয় হল, চাকুরীতে বহাল থেকে তাওবা–ইস্তেগফার করতে থাকা এবং কোন বৈধ পন্থা তালাশ করতে থাকা। হালাল সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে সেই হালাল পন্থা অবলম্বন করা।

হ্যাঁ, যদি এমন কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থাকে যেখানে শুধু ছেলেরা লেখাপড়া করে সেখানে পুরুষ শিক্ষকদের জন্য শিক্ষকতা করা বৈধ। [হিদায়া ৪:৪৪২, আদ দুররুল মুখতার ৬:৩৭০, মাহমূদিয়া ১০:৪৩৯]

কনডম ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি নব বিবাহিত। আমার স্ত্রী কনডম ব্যবহার করতে চায়। অথচ এটা ইসলামী শরী'আতে জায়িয নেই। এখন কিভাবে আমি আমার স্ত্রীকে এই অনৈসালামিক পথ থেকে বিরত রাখতে পারি। কুরআন–সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে দিলে উপকৃত হব।

জবাবঃ স্ত্রী যদি মুসলমান পরহেযগার বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন আসুবিধার কারণে এ সব পদ্ধতি গ্রহণ করতে চায়, তাহলে নাজায়িয ও অনৈসালামিক কাজ হবে না। বরং সাময়িকভাবে তা ব্যবহার করতে পারবে। তবে যদি অভাব-অনটনের ভয়ে বলে থাকে, তাহলে আকীদাগত খারাবীর কারণে তা হারাম ও নাজায়িয হবে। এমতাবস্থায় আপনি আপনার স্ত্রীকে মুহাব্বতের সাথে সঠিক আকীদার ব্যাপারে বুঝাতে থাকেন। ইনশাআল্লাহ, সঠিক বুঝ এসে যাবে। [প্রমাণঃ সূরা আন'আম ১৫১]

হাদিয়াকৃত তাফসীর গ্রন্থ ক্রয় করা

জিজ্ঞাসাঃ সৌদি বাদশাহ ফাহাদের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া সংখিপ্ত মা'আরিফুল কুরআন আমরা না পাওয়ায় আমাদের পক্ষে তা খরিদ করা অথবা খরিদ করে বিক্রি করা জায়িয হবে কি-না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

জবাবঃ সৌদি বাদশাহ কর্তৃক বিতরণকৃত সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে লেখা হয়েছে যে, সেটা ওয়াকফকৃত। অতএব, এ তাফসীরের মালিকানা অধিকারই কারো অর্জিত হয় না। সুতরাং, আর ক্রয়- বিক্রয়ও জায়িয নয়। [আল-বাহরুর রায়িক ৫:২০৫, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ২:৩৫৬]

বে-নামাযীর দাওয়াত কবুল করা

জিজ্ঞাসাঃ যারা নামায পরে না তাদের বাড়ীতে দাওয়াত কবুল করা জায়িয কি–না?

জবাবঃ বেনামাযী ব্যক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক। ফাসিকের দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। যদি দাওয়াত কবুল না করার দ্বারা তার পরিশুদ্ধি ও ভাল হয়ে যাওয়ার আশা থাকে, তাহলে তার দাওয়াত কবুল করা নিষেধ। আর যদি দাওয়াত কবুল না করার দ্বারা তার ভাল হওয়ার আশা না থাকে, বরং পরবর্তীতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি বা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে দাওয়াত কবুল করে নেয়া উচিত। আর যদি দাওয়াত না কবুল করার দ্বারা তার ভাল হওয়ার কোন আশাও না থাকে এবং ফিৎনারও ভয় না থাকে, তাহলে তার দাওয়াত কবুল না করাই উত্তম। তবে কবুল করলেও এ কাজ হারাম হবে না। [আলমগিরী ৫:৩৪৩; ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮:২৫৬; মাহমূদিয়া ১৩:৩০৫ ও ৩৭৯]

তাফসীরে মানুষের ছবি

জিজ্ঞাসাঃ কোন তাফসীরে মানুষের ছবি থাকতে পারবে কি-না? প্রমানসহ জানতে চাই।

জবাবঃ শর'ঈ উযর ছাড়া কোন প্রানীর ছবি তোলা বা সংরক্ষন করা হারাম। হাদীস শরীফে আছে, ঐ ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কোন প্রানীর ছবি বা কুকুর থাকে। তাফসীরে ছবি রাখা বা থাকার তো কোন প্রশ্নই আসে না। কোন তাফসীরকারক প্রানীর ছবিসহ ছেপে থাকলে তা পড়া, খরিদ করা নাজায়িয। এমনিভাবে তাফসীর গ্রন্থের মাঝে কোন প্রানীর ছবিও রাখা নাজায়িয। [প্রমাণঃ মিশকাত ১:৩৮৫; আহসানুল ফাতাওয়া ৮:১৯১,২০৩]

উসীলা দিয়ে দু‘আ করা

জিজ্ঞাসাঃ দু‘আ করার সময় কারো উসীলা দিয়ে দু‘আ করা যায় কি? যেমন যদি বলা হয়, “হে আল্লাহ! বড় পীরের উসীলায় আমার দু‘আ কবুল করুন। আথবা বলা হয়, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উসীলায় আমার দু‘আ কবুল করুন।

অনেকে নবী-ওলী ও বুযুর্গের উসীলা নিয়ে দু‘আ করার বিপক্ষে আয়াত পেশ করেন।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ..... لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

“(হে নবী) বলুন, আমি আমার নফসের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না”। (সূরা আ’রাফ আয়াত-১৮৮)

এবং এ হাদীস পেশ করেন, “যখন তুমি কোন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন কোন সাহায্য কামনা করবে, আল্লাহর নিকটই করবে”। (তিরমিযী শরীফ) এ সম্পর্কে শরী‘আতের ফায়সালা কি?

জবাবঃ নবী-ওলীগনের উসীলা দিয়ে দু‘আ করা শরী‘আতে জায়িয আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। একবার হযরত উমর ফারুক রা. দুর্ভিক্ষের সময় হযরত আব্বাস রা.- এর উসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু‘আ করেছিলেন। [খাইরুল ফাতাওয়া ১৯৭]

একটি হাদীসের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একজন অন্ধ সাহাবীকে এভাবে দু‘আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة

[মা‘আরিফুল কুরআন ৩:১২৮, ইবনে মাযাহ ১০০ পৃষ্ঠা]

হযরত উমাউয়া রা. থেকে বর্ণিত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ফকির ও মুহাজিরদের উসীলা দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য দু'আ করেছেন। এছাড়া আরো অনেক হাদীস দ্বারাও উসীলা দেয়ার কথা প্রমানিত আছে। [মিশকাত শরীফ ৪৩৯; খাইরুল ফাতাওয়া ১:১৯৩; আবু দাউদ শরীফ ৪৩৯]

এমনিভাবে হযরত আবু বকর বিন খতীব রহ. থেকে বর্নিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত ইমাম শাফেঈ রহ.-কে একথা বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ.- এর উসীলা দিয়ে বরকত অর্জন করে থাকি। আমি তার কবর যিয়ারত করি, তার উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি। তারপরই আমার আশা পূর্ণ হয়। [খাইরুল ফাতাওয়া ১:১৯৪]

তবে বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের যমানায় মানুষদের মধ্যে আকায়িদের ইলম না থাকায় অনেকে এমন এমন কথা বলে ফেলে, যাতে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা থাকে। অনেক পীর-বুযুর্গকে সমস্যা সমাধানকারী বিশ্বাস করে। তাদের নিকট প্রার্থনা করে অনেকে বহক্কে আব্দুল কাদির জিলানী, বহক্কে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী বলে দু'আ করে থাকে। অথচ এভাবে দু'আ করা নিষেধ। [প্রমাণঃ তারিখে খতীব ১:১২৩]

নকল করে বৃত্তি পেয়ে বৃত্তির টাকা ভোগ করা

জিজ্ঞাসাঃ পরীক্ষায় নকল করে কেউ যদি বৃত্তি পায়, তবে বৃত্তির টাকা খাওয়া জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ ভাল নম্বরের জন্য যখন নকলের আশ্রয় নিতে হলো তার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ ছাত্র প্রকৃতপক্ষে মেধাবী ও যোগ্য নয় এবং উক্ত প্রকারের নকল করার দ্বারাই বৃত্তি পেয়েছে। সুতরাং, তার জন্য উক্ত বৃত্তির টাকা

খাওয়া জায়িয হবে না। কারণ, সরকার একমাত্র উপযুক্ত, যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রকেই বৃত্তির টাকা দিয়ে থাকে। অনুপযুক্ত ছাত্রের জন্য নয়। এখন যেহেতু সে মেধাবী ও যোগ্য না হয়েও অন্যায়ভাবে ঐ টাকা হাসিল করেছে। সুতরাং তা তার জন্য জায়িয হবে না। বরং কোনভাবে তা সরকারের ফাণ্ডে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

সুদী ব্যাংক ও টেলিভিশনের প্রচার করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন ধর্ম ও তামাদ্দুল বিষয়ক মাসিক পত্রিকার মধ্যে সুদী ব্যাংক ও টেলিভিশনের প্রচার করা জায়িয কি-না?

জবাবঃ শুধু ধর্ম ও তামাদ্দুল বিষয়ক মাসিক পত্রিকাই নয়, বরং সকল মুসলমানের জন্য যে কোন ভাবে সুদী ব্যাংক ও টেলিভিশন তথা হারাম কোন কাজে ব্যবহৃত হয় এমন জিনিষের প্রচারনা নাজায়িয। [সূরা মায়িদা ২]

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

উযু ব্যতীত ইসলামী বই পড়া

জিজ্ঞাসাঃ উযু ছাড়া ইসলামী কোন বই পড়া যাবে কি-না?

জবাবঃ উযু ছাড়া ইসলামী বই পড়া যায়। কুরআনের আয়াত থাকলেও তা পড়া যাবে। কিন্তু সে স্থান স্পর্শ করা যাবে না। [প্রমাণঃফাতাওয়া শামী ১:১৬]

হালাল প্রানীর যে সমস্ত অংশ হারাম

জিজ্ঞাসাঃ কথিত আছে, পায়ের উপরের অংশ (রানে) একটি গোশতের ছোট টুকরা থাকে, যা নাকি হারাম এটা কি সত্য?

জবাবঃ হালাল প্রানীর আটটি অংশ খাওয়া নিষেধ, যথা-(১) পুরুষ লিঙ্গ, (২) স্ত্রীলিঙ্গ, (৩) মূত্রথলি, (৪) মেরুদণ্ডের ভিতরের মগজ বা সাদা রগ, (৫) চামড়ার নীচের টিউমারের মত উঁচু গোশত, (৬) অণ্ডকোষ, (৭) পিত্ত (৮) প্রবাহিত রক্ত।

এসবের মধ্যে প্রবাহিত রক্ত খাওয়া অকাট্যভাবে হারাম আর অবশিষ্টগুলো খাওয়া মাকরূহে তাহরীমা। আপনার প্রশ্নে হাঁস- মুরগীর রানের যে অংশকে হারাম বলা হয়েছে, তা উপরে উল্লেখিত কোন নিষিদ্ধ অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং, তাকে হারাম বলার কোন কারন নেই। যা কথিত শুনেছেন তা ভুল। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১১৮; ফাতওয়া রহীমিয়া, ২:২২৩ আল-বাহরুর রায়িক ৮:৪৮৫]

চোরাই মার্কেট থেকে আসবাব পত্র ক্রয়

জিজ্ঞাসাঃ চোরাই মার্কেট থেকে জেনে-শুনে কোন জিনিষ ক্রয় করা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও চোরাই মার্কেট থেকে চোরাইকৃত মাল ক্রয় করা, এর দ্বারা চুরি তথা হারাম কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয় যা সম্পূর্নভাবে হারাম। তাছাড়া চুরির জিনিষটা তার নিজের নয় বরং মূল মালিকের যা বিক্রির অধিকার তার নাই। সুতরাং, চোরাই মার্কেট থেকে কোন জিনিষ ক্রয় করা জায়িয হবে না। [সূরা মায়িদা, ফাতাওয়া রশীদিয়া,৮৯৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১:২৮০]

আরামের জন্য ট্রেনে হাফ সিটের জন্য টিকেট করা

জিজ্ঞাসাঃ অনেকেই ট্রেনে আরামের জন্য একটা অতিরিক্ত হাফ সিটের টিকেট করেন। অথচ হাফ সিটটি শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য প্রযোজ্য। এটা কুরআন-হাদীস মতে জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ সাথে বাচ্চা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের আরামের জন্য মিথ্যা কথা বলে বাচ্চার নামে হাফ টিকিট কাটা জায়িয হবে না। [আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৮৮]

অমুসলিমদের মৃত্যুতে সাহায্য-সহযোগিতা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মুসলমানদের পক্ষে অমুসলিমদের মৃত্যুতে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা ও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করা জায়িয হবে কি-না ?

জবাবঃ কোন মুসলমানের পক্ষে অমুসলিমদের মৃত্যুতে সহযোগিতা করা বা তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করা জায়িয হবে না। কেননা, এর দ্বারা প্রকারান্তরে শরী'আত বিরোধী কাজে সহযোগিতা করা হয়। অথচ আল্লাহ পাক এরূপ করা থকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং, তা জায়িয নয়। তবে ঐ অমুসলিম ব্যক্তির যদি কোন আত্নীয়-স্বজন থাকে, তাহলে তাদের সম্ভাব্য ও শরি'আত সম্মত সাহায্য করা যেতে পারে এবং তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা যেতে পারে, যা সাধারণ ভদ্রতার মধ্য শামিল। [প্রমাণঃ সূরা মায়িদাহঃ ২]

দ্বীনী স্বার্থে মাযহাব ছেড়ে দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ (ক) কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় দ্বীনী স্বার্থে (যেমন, মসজিদ করে নেয়া) হানাফী মাযহাব ছেড়ে লা-মাযহাবে যেতে পারবে কি-না? যদি যাওয়া যায়, তাহলে কোন ক্ষতি হবে কি?

জবাবঃ (ক) সমস্ত উলামায়ে কিরাম একমত যে, দ্বীনের টিকে থাকার জন্য চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব মানা একান্ত জরুরী। তবে এতটুকু সুযোগ আছে যে, শর'ঈ কোন কারনে এক মাযহাব ছেড়ে সম্পূর্নভাবে অন্য মাযহাবে যেতে পারে। কিন্তু মাযহাব ছেড়ে লা-মাযহাবে যাওয়া

কখনো জায়িয হবে না। বরং জনসাধারণের জন্য এটা দ্বীন থেকে বের হয়ে গোমরাহ হওয়ার একটা রাস্তা মাত্র।

সুতরাং, মসজিদ তৈরী করে নেয়ার লোভে মাযহাব ছেড়ে লা-মাযহাবী হওয়া কোনক্রমেই জায়িয নাই। কেননা, এটা শর'ঈ উযর নয়। এজন্য লা-মাযহাবে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

এর কেউ লা-মাযহাবী হয়ে গেলে গোমরাহ হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ১:৪২১]

সিনেমা না দেখার কসম খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি দশ বছর আগে ইমান-আমলকে মজবুত করার জন্য নিজে নিজেই বলেছিল যে, সে এর কখনো সিনেমা দেখবে না। যদি দেখে তাহলে সে কাফির। কিন্তু সে তার কথা ঠিক রাখতে পারেনি। মাঝে ছবি দেখে ফেলেছে। এখনো মাঝে-মাঝে সে সিনেমা দেখে, এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ ঐ ব্যক্তি, যে সিনেমা দেখলে কাফির হয়ে যাবে, এ কথা বলার পরও সিনেমা দেখছে এবং তার পরেও সে এখনো মাঝে মাঝে সিনেমা দেখে। এ সমস্যার সমাধান তার নিয়্যাত ও আকীদার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, যদি বাস্তবেই সে কাফির হয়ে যাবে, এরূপ আকীদা পোষণ করে উক্ত কথা নিজে ভঙ্গ করে সেই অন্যায় করে থাকে, তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

সেক্ষেত্রে খালিস অন্তরে তাওবা করতঃ ঈমান আনয়ন করতে হবে ও বিবাহ দোহরাতে হবে। আর যদি সত্যিই কাফির হয়ে যাবে, এমন আকীদা রেখে বলে না থাকে, বরং কেবল কসমের নিয়্যতে বলে থাকে, তাহলে কসমের কাফফারা দিতে হবে এবং সিনেমা দেখার কারনে যে

কবীরা গুনাহ হয়েছে, সে জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হবে। আর কসমের কাফফারা হচ্ছে, দশজন মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়ানো বা দশজন মিসকিনকে এক জোড়া করে পোষাক দান করা। আর উভয়টা থেকে অপারগ হলে বিরতিহীন ভাবে তিনটি রোযা রাখা।

উল্লেখ্য যে, সিনেমা দেখা সম্পূর্নরূপে নাজায়িয, হারাম ও কবীরা গুনাহ। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিক দিয়েই এর মধ্যে বহু ক্ষতি রয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে হাজারো রকম অপকর্ম ও গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়ে পুরো সমাজটা ধ্বংস হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এর থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। [সূরা মায়িদাহ ৮৯, আদ-দুররুল মুখতার ৩:৭১৪, বাদায়ি ৩:৮, তাতারখানিয়া ৪:৪২২, আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৯৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:৩৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:৯০, নিযামুল ফাতাওয়া ২:৯৯]

মৃত ব্যক্তির অঙ্গ– প্রত্যঙ্গ কাটা-ছিড়ার বিধান

জিজ্ঞাসাঃ একজন মেডিকেল পড়ুয়াকে মৃত ব্যক্তির লাশ কেটে পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু আবূ দাউদ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে দেয়া জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতই অপরাধ। সুতরাং, ইসলামের দৃষ্টিতে বর্তমান মেডিকেল সায়েন্স পড়া জায়িয হবে কি?

জবাবঃ মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তার লাশ শরী'আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। সুতরাং, সেটাকে কাটা-ছিড়া বা তার উপর কোন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ন নাজায়িয। চাই সেই লাশ বা অঙ্গ ক্রয় করা হোক অথবা বিনামূল্যে প্রাপ্ত হোক। অনুরূপভাবে মুসলিম-অমুসলিম সকল লাশের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য। ডাক্তারী

পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য এর বিকল্প কোন পন্থা খুজে বের করা উচিত। মেডিকেল পড়াশুনায় শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই বটে, তবে এসব হারাম কাজ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। সরকার যেন এ পদ্ধতি পরিবর্তন করেন সেজন্য শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। বিকল্প কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে যে পন্থায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, সেভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে। একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষের জান বাঁচানোর জন্য এরূপ করলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন। তবে দায়িত্বশীলদের জন্য বিকল্প পদ্ধতি বের করার চেষ্টা-তদবীর করা জরুরী। যাতে লাশের বেহুরমতী না হয়; আবার শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনও পূর্ন হয়। [জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১:৩৫৯; নিযামুল ফাতাওয়া: ১:৪৫৬; জাওয়াহিরুল ফিকহ: ২:২৫]

বিধর্মীকে রক্ত দান করা

জিজ্ঞাসাঃ বিধর্মী ও মুসলমান সকলেই ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দান করেন। কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে মুসলমানদের রক্ত বিধর্মীদেরকে বা তার বিপরীত রক্ত দান করা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ ফুকাহায়ে কিরাম যেহেতু কোন রকম ব্যাখ্যা বা ভাগ করা ছাড়াই শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনে রক্ত দান বা গ্রহণ করাকে জায়িয বলেছেন। তাই শর'ঈ জরুরতের সময় মুসলমানের রক্ত বিধর্মী এবং বিধর্মীর রক্ত মুসলমান ব্যবহার করতে পারবে।

ব্লাড ব্যাংকে যেহেতু মুসলমান ও বিধর্মীর রক্তের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। তাই সেখান থেকে রক্ত নেয়ার সময় এ কথা জানার প্রয়োজন নেই যে, এটা মুসলমানের রক্ত, না অমুসলমানের। তবে যেহেতু রক্তের

প্রতিক্রিয়া হয় বলেও একটা কথা আছে, তাই অমুসলিমের রক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী পরহেজ করাই শ্রেয়।

[প্রমাণঃ জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১:১৯৯, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ২:৪০২; কিফায়াতুল মুফতী ৯:১৪৩]

চিংড়ী ও টেপা মাছ সংক্রান্ত শর'ঈ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ টেপা মাছ খাওয়া কি জায়িয? আমাদের এলাকার কোন কোন আলিম বলেন টেপা মাছ খাওয়া মাকরূহ। আবার কেউ বলেন, হারাম। আবার অন্যরা বলেন, সাগরের টেপা মাছ হালাল। তাই এতদসংক্রান্ত সঠিক সমাধান জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ মাছ আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামত। বান্দাদের জন্য তিনি সকল প্রকার মাছ ভক্ষণই হালাল ঘোষণা করেছেন। তবে কথা হচ্ছে, শরী'আতের দৃষ্টিতে মাছের সংজ্ঞা কি? কোন প্রানীকে মাছ বলা হবে? এক্ষেত্রে শরী'আতের বক্তব্য হচ্ছে, মৎস্য প্রধান এলাকার দ্বীনদার মুসলমানগণ সামুদ্রিক যে প্রানীকে মাছ হিসাবে আখ্যায়িত করে, সেটাই শরী'আতে মাছ হিসাবে গন্য হবে এবং তা খাওয়াও জায়িয হবে। তবে কোন প্রজাতির মাছের ভিতর যদি কোনরূপ বিষাক্ত ক্রিয়া থাকে, তাহলে সেটা খাওয়া জায়িয হবে না। কোন কোন টেপা মাচে বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় বিধায় সামুদ্রিক ও দেশীয় কোন প্রকার টেপা মাছই খাওয়া উচিত নয়। [প্রমাণঃ সূরা মায়িদাহ ৯৬, মিশকাত শরীফ ৩৬১, বাদায়িউস সানায়ি ৫:৩৬, আল-মাবসূত ১১:২৩০, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ২:৫৮৭, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:২৫৯]

আব্দুস সুবহান নাম রাখা সহীহ কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ আব্দুস সুবহান নাম রাখা যাবে কি?

জবাবঃ আব্দুস সুবহান নাম রাখা সহীহ নয়। কেননা, আবদকে আল্লাহর নাম অথবা সিফাত ব্যতীত অন্য শব্দের সাথে সংযোগ করা জায়িয নয়। আর সুবহান আল্লাহর নামও নয় সিফাতও নয়। বরং মাসদার বা মূল ধাতু। সুতরাং, আব্দুস সুবহান নাম রাখা সহীহ নয়। [প্রমাণঃ সিআয়াহ ২:১৬৪, বাদায়িয়ুল কালাম ৭]

চুলে কলপ ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান দেখা যায় অনেকের ১৫/২০ বছর বয়সেই চুল পাকতে আরম্ভ করে। এমতাবস্তায় যদি সে বর্তমান বাজারে প্রচলিত কালো খেজাব (কলপ) যেমন- হরস, মারলিন ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাহলে সেটা কতটুকু শরী'আত সম্মত হবে? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী পুরুষের জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরীমী। সম্পূর্ন কালো খেজাব ব্যতীত অন্য যে কোন ধরনের খেজাব ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অল্প বয়স্ক নওজোয়ানদের যদি বিশেষ কোন রোগে চুল সাদা হয়ে যায় তাহলে সাময়িকভাবে কালো খেজাব ব্যবহারের অবকাশ আছে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২:৩৮২, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫:৩৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩:২৯৪; ইমদাদুল আহকাম ৪:৩৪৮]

আল্লাহকে ভিন্ন নামে ডাকা

জিজ্ঞাসাঃ বাংলা ভাষা–ভাষীগনের জন্য আল্লাহকে তাঁর (আরবী) নামের পরিবর্তে অন্য কোনভাবে ডাকা যাবে কি-না? যেমন-খোদা, গড, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, ভগবান ইত্যাদি বলা যাবে কি-না?

জবাবঃ যে কোন ভাষায় যে সব শব্দ বাতিল মা'বুদদের জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে বা খাসভাবে বিধর্মীরা যে সব শব্দ আল্লাহর জন্য ব্যবহার করে,

সে সব শব্দ আল্লাহ তা'আলাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা জায়িয নয়। আর যে সব শব্দ এ ধরনের নয় এবং তাঁর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলীর প্রকাশ পায়, সে সব শব্দ আল্লাহ তা'আলাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করতে হলে কুরআন-হাদীস বা ইজমার সমর্থন থাকা অপরিহার্য। সে হিসাবে ইজমার কারণে আল্লাহকে খোদা বলে সম্বোধন করা যাবে। তেমনি ভাবে বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা বা প্রতিপালক বলাও জায়িয হবে। তবে আল্লাহ তা'আলাকে 'আল্লাহ' বলে বা আরবী সিফাতী নাম দ্বারা সম্বোধন করা ভাল। [প্রমাণঃ মিরকাত ৫:৭৩, শরহে আকাইদে নাফাসী নেবরাছ ১১২, ইমদাদুল মুফতীন ১০২৮]

ক্যাসেটে তিলাওয়াত বা গান শ্রবন করা

জিজ্ঞাসাঃ ক্যাসেটে ধারনকৃত তিলাওয়াতে কুরআন শ্রবণে সাওয়াব হবে কি-না? এবং ক্যাসেটে গান শুনলে গুনাহ হবে কি-না?

জবাবঃ টেপ রেকর্ডারের আওয়াজ পাঠকের নিজস্ব আওয়ায নয়। বরং প্রতিধ্বনির ন্যায় পাঠকের স্বরের নকল মাত্র। এজন্যই ধারণকৃত ক্যাসেটের তিলাওয়াত বস্তুতঃ তিলাওয়াত নয়। সুতরাং, টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে ক্যাসেট বাজিয়ে কুরআন তিলওয়াত শ্রবণে সরাসরি শ্রবণের সাওয়াব হয় না। তবে তা শ্রবন করা নাজায়িয নয়। কারন, এর দ্বারা সহীহ কিরা'আত শিক্ষায় সহযোগিতা হয়।

পক্ষান্তরে গান-বাদ্য ইত্যাদির আওয়াজ মানবাত্মাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ বিস্মৃত মানুষের ঐ অন্তরে অভিশপ্ত শয়তান কু-মন্ত্রণা দিতে প্রয়াস পায়। যে কারণে শরী'আতে মুহাম্মদীয়া গান-বাজনাকে অবৈধ তথা হারাম ঘোষণা করেছে। আর গান-বাদ্য শ্রবণের অবৈধতা চাই সরাসরি কিংবা যন্ত্রের

মাধ্যমে শুনবে এর মধ্যে শরী'আত কোন পার্থক্য করেনি। গান গাওয়া এবং শ্রবন করা সর্বাবস্থায়ই হারাম।

কাজেই ক্যাসেটে ধারণকৃত তিলাওয়াত শ্রবনে সাওয়াব না হওয়ার উপর ধারণকৃত ক্যাসেটের গান-বাজনা শ্রবণে গুনাহ না হওয়ার যুক্তি প্রদর্শনের কোন অর্থই হতে পারে না। কারন, গানের যে কোনরূপ অস্তিত্বই শরে'আত অবৈধ ঘোষণা করেছেন। [শামী ৬:৩৪৮-৪৯, আলাতে জাদীদাহ ২২১]

বিভিন্ন বিক্রিত জিনিসে দেয়া লটারী গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের বিভিন্ন পন্যের উপর দেয়া প্রচলিত লটারী গ্রহণ করা জায়িয হবে কি-না? যেমন, কোকাকোলা ইত্যাদির মাধ্যমে লটারী করা হয়।

জবাবঃ বর্তমানে পণ্যের উপর দেয়া প্রচলিত লটারী সরাসরি জুয়া না হলেও জুয়ার সাথে তার সাদৃশ্য বিদ্যমান। অতএব, এ লটারী পাওয়ার উদ্দেশে পন্য ক্রয় জায়িয হবে না। কেউ এ জাতীয় লটারীতে কিছু পেয়ে থাকে তাহলে তা সাওয়াবের নিয়্যাত না করে গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে।

দানকৃত কুরআন শরীফ বিক্রি করা

জিজ্ঞাসাঃ মাদরাসায় দানকৃত কুরআন শরীফ বেশ জমা হওয়ায় নষ্ট থেকে যাচ্ছে। এমতাবস্তায় তা বিক্রি করা জায়িয হবে কি-না? এগুলির বিক্রিত লব্ধ টাকা বা কুরআন শরীফের জন্য দানকৃত টাকা মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যয় করা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ যে কাজের জন্য দান করা হয়েছে, সে কাজেই ব্যবহার করা শরী'আতের বিধান। দানকৃত বস্ত অন্য খাতে ব্যবহার করা জায়িয নয়। মাদরাসায় কুরআন শরীফ দান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার তিলাওয়াত। তিলাওয়াত না করে অন্য কোন খাতে এর ব্যবহার শরী'আত সম্মত নয়। সুতরাং, আলোচ্য কুরআন শরীফগুলো যে সব মাদরাসা বা মসজিদে কুরআন শরীফের প্রয়োজন আছে, বা পড়নেওয়ালা আছে, তথায় দিয়ে দেয়া যেতে পারে। কুরআন শরীফের জন্য দানকৃত টাকারও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য। [ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৫৯৬, মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া ২:১১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩:৩১২, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:৭৭]

মসজিদ ও মাদরাসার টাকা কর্জ হিসাবে খরচ করা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদ-মাদরাসা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার অথবা পরিচালকের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের টাকা তার নিজস্ব ব্যবসার খাতে এরকমভাবে ব্যয় করা যে, যখন ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন দেখা দিবে, সাথে সাথে ঐ টাকা দিয়ে দিবে, এটা জায়িয কি-না?

জবাবঃ কোন মসজিদ বা মাদরাসা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থ ক্যাশিয়ার বা পরিচালকের নিকট আমানত হিসাবে জমা থাকে। সুতরাং, ক্যাশিয়ার বা পরিচালকের জন্য উক্ত আমানতের টাকা নিজস্ব ব্যবসার খাতে ব্যবহার করা আদৌ জায়িয হবে না। বরং তা খিয়ানত হবে। কাজেই উল্লেখিত খিয়ানত থেকে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য। [ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া ৫২৯, মাহমূদিয়া ১:৪৯২]

কুরআন শরীফ আগুনে পুড়ে ফেলা

জিজ্ঞাসাঃ ছেঁড়া, কাটা বা পুরাতন পড়ার অযোগ্য কুরআন শরীফ কি করতে হবে? তা হিফাযতের উদ্দেশে আগুনে পুড়ে ফেলা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ হিফাযতের উত্তম নিয়ম এই যে, ঐগুলোকে কোন পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে উপর দিয়ে বাঁশের চালা দিয়ে গোরস্থানে বা এমন স্থানে দাফন করবে, যেখানে সাধারণতঃ লোকজন চলা ফেরা করে না। আর যদি কেউ ছেঁড়া-ফাটা কুরআন শরীফ হিফাজত করার নিয়্যতে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে এবং ছাইগুলো পাক পানিতে ফেলে দেয়, তাহলে সেটাও জায়িয আছে। সুতরাং, হিফাযতের লক্ষ্যে ছেঁড়া-ফাটা কুরআন শরীফ কেউ পুড়িয়ে ফেললে, তাতে সে শরী'আতের দৃষ্টিতে অপরাধী বা গুনাহগার সাব্যস্ত হবে না। তবে এমন না করে প্রথম পদ্ধতি অবলম্বন করাই ভাল। [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪৫৫-৫৬, মাহমূদিয়া ১৪:২২, বুখারী ২:৭৪৬]

টেলিভিশনে ইসলামী অনুষ্ঠান দেখানো

জিজ্ঞাসাঃ ইসলাম প্রচারের স্বার্থে কোন প্রাণীর ছবি বা দৃশ্য ভিডিও করে সিনেমা বা টেলিভিশন দ্বারা ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে/নাটক ছায়াছবি করে দেখানো জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ শরী'আত যে সমস্ত জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছে তা সর্বাবস্থায় হারাম। চাই দুনিয়ার কাজের জন্য হোক, চাই দ্বীনের কাজের জন্য হোক। দ্বীনের প্রচারের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোন হারাম কাজের সাহায্য নিতে বলে নি। তাছাড়া হারামের সাহায্যে কখনো দ্বীনের প্রচার হতে পারে না। বরং দ্বীনের দাফন হতে পারে। সুতরাং, ইসলাম প্রচারের স্বার্থে হলেও কোন জানদার প্রাণীর ছবি বা ভিডিও করা বা তা সিনেমা-টেলিভিশনে দেখানো নাজায়িয। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৯৯১]

ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারে বসে আহার করা

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারে বসে খানা খাওয়ার যে পদ্ধতি চালু আছে, তা সুন্নাত বিরোধী বিজাতীয় অনুকরণ বলে আমরা জানি। কিন্তু যদি টেবিলের উপর দস্তরখানা বিছিয়ে তার উপর পাত্রে খানা রেখে এবং চেয়ারে বা বেঞ্চিতে সুন্নাতী কায়দায় বসে খাওয়া হয়, তা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ বিজাতীয় অনুকরনে বর্তমানে তাদের ষ্টাইলে যে খানা-পিনার নিয়ম চালু হয়ে গেছে, এটা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, আমাদেরকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের রীতিনীতি অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নবী ﷺ মেঝের মধ্যে দস্তরখান বিছিয়ে খানা খেতেন। আমাদের সেভাবে খানা খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। মাঝে-মধ্যে বিশেষ জরুরতে বা ঠেকায় চেয়ার-টেবিলে বসে খেতে হলে, তখন সুন্নাত তরীকায় বসে টেবিলের উপর দস্তরখান বিছিয়ে খেতে পারবে। তবে সর্বদার জন্য এটাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয়। [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১১৬, তিরমিযী শরীফ ২:১, মিশকাত শরীফ ১:৩৬৩]

মেলামাইনের তৈরী পাত্র ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ মেলামাইনের তৈরি পাত্র যথা, গ্লাস ও চায়ের কাপ ইত্যাদি ব্যবহার করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু জায়িয।

উত্তরঃ (১) মেলামাইনের তৈরি জিনিষপত্র যথা, চায়ের কাপ ও গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়িয। কারন, মেলামাইন পাক জিনিসের মধ্যে শামিল। নাজায়িয হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নাই। [বুখারী ১:২০২, দুররে মুখতার ১:২০৬]

ফরয তরককারী ফুটবল খেলায়াড়ের খেলা দেখা

জিজ্ঞাসাঃ ফরয তরক করে হ্যাঁটুর উপর কাপড় উঠিয়ে কেউ যদি ফুটবল খেলে, তবে তা দেখা জায়িয কি-না?

জবাবঃ হ্যাঁটুর উপর কাপড় উঠিয়ে ফরয তরক করে ফুটবল খেললে সে খেলাও হারাম, দেখাও সম্পূর্ণ হারাম। [মিশকাত শরীফ ২৬৯]

পুস্তকে ছবি ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ সম্প্রতি জামি'আ রহমানিয়া আরাবিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মুফতী মনসুরুল হক সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত 'মিষ্টার মওদূদীর নিউ ইসলাম' নামক বইটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। তবে বইটির শেষে মউদুদী সাহেবের ফটোও রয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, বই-পুস্তকে এভাবে ফটো ব্যবহার করা শরী'আত সম্মত কি-না? জানিয়ে কৃতার্থ করবেন বলে আশা করি।

জবাবঃ এ ব্যাপারে আমরা মুহতারাম মুফতী সাহেব হুযুর দা.বা.- এর সাথে যোগাযোগ করেছি। আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। যার সারসংক্ষেপ হলো, বইটির লেখক মুফতী মনসুরুল হক সাহেব নন। বরং অন্য একজন আলেম বইটির লেখক। তবে বইটির ব্যাপারে মুফতী সাহেব- এর একটি অভিমত আছে।

আর জানদার প্রানী বা মানুষের ছবি ছাপার ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, শর'ঈ মজবূরি ব্যতীত কোন প্রানীর ছবি ছাপা নাজায়িয ও হারাম। বইটিতে যে ছবি ছাপা হয়েছে, তা শর'ঈ মজবূরীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ ব্যাপারে তিনি একমত নন। সুতরাং, যারা এভাবে বইটি ছেপেছে এর দায়-দায়িত্ব তাদের কাঁধে অর্পিত হবে। মুফতী সাহেব হুযুর এভাবে ছবি ছাপাতে কাউকে অনুমতি দেন না বরং কঠোরভাবে নিষেধ করেন। আর উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব হচ্ছে হক কথা পৌঁছিয়ে দেয়া।

আর বইটির মূল প্রকাশকের নিকট থেকে জানতে পারলাম, তিনি ছবি ছাড়া প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রকাশিত সেই মূল বইতে ছবি নেই। পরবর্তীতে লাইব্রেরীয়ানরা কোত্থেকে যেন ছবি সংগ্রহ করে তার বিনা অনুমতিতে ছবি সংযোজন করে ছাপিয়েছেন।

বিধর্মীদের বাড়ীতে যাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ ইসলাম বিরোধী অর্থাৎ বিধর্মীদের বাড়ীতে খাওয়া বা পান করা জায়িয কি-না? অনেকে হারাম, আবার অনেকে বলে- জায়িয আছে। শরী'আতের বিধান জানতে চাই।

জবাবঃ বিধর্মীদের পাকানো বা হাতের তৈরি অন্য সব ধরনের হালাল খাদ্য- দ্রব্য খাওয়া ও পান করা জায়িয আছে। তবে শর্ত হল খানার পাত্র পরিষ্কার পাক হতে হবে। যদি তাদের খানা ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী হারাম বা নাপাক হওয়া জানা যায়, তাহলে উক্ত খানা খাওয়া জায়িয নয়। মনে রাখতে হবে, বিধর্মীদের বাড়ীতে খাওয়া জায়িয আছে বলে কোন প্রয়োজন ছাড়াই তাদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে না। একান্ত প্রয়োজনেই কেবল খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। [ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৪৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১১৫,৪:১০৭ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮:২৬২]

নাপাক পানীয় পান করা

জিজ্ঞাসাঃ বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম যে, কোকাকোলা মধ্যে ৫% অ্যালকোহল আছে। যা অপবিত্র বস্তু দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং, এই অপবিত্র পানীয় যদি কেউ পান করে, তাহলে তার আমলের দিক দিয়ে কোন ক্ষতি হবে কি?

জবাবঃ অ্যালকোহল প্রকৃতপক্ষে কড়া মদেরই একটি উপকরন মাত্র। বিশেষ পক্রিয়ায় তার নেশার ভাবটা দূর করে অ্যালকোহল নাম দেয়া হয়। যদি সেটা খেজুর, আঙ্গুর বা মুনাক্কা থেকে তৈরি করা হয়, তবে তা সম্পূর্ন হারাম। অপরদিকে যদি গম, যব, বরই ও আলু ইত্যাদি থেকে তৈরি করা হয়, তবে অধিকাংশ ইমামগনের মতে প্রয়োজনবোধে এই পরিমাণ পান করা জায়িয আছে, যা থেকে নেশা সৃষ্টি হয় না। সাধারণ দেশীয় ঔষুধ ও পানীয়তে ব্যবহৃত অ্যালকোহল, গম, যব, বরই ইত্যাদি থেকেই তৈরি হয়।

অপরদিকে ঔষুধ ও পানীয়তে অ্যালকোহল বা মদ মেশানোর পর যদি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার মূল অস্তিত্ব ও পদার্থকে নিঃশেষ করে দেয়া হয়, তখন সেটা আর অ্যালকোহল থাকে না। বরং অন্য জিনিসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় সমস্ত ইমামের নিকটই এর ব্যবহার জায়িয আছে। সুতরাং, কোকাকোলা বা এই ধরনের পানীয়ের মধ্যে অ্যালকোহল মেশানো সত্ত্বেও প্রথমোক্ত অ্যালকোহল না হওয়ায় বা তার মূল অস্তিত্ব ও পদার্থ বিলীন হয়ে যাওয়ার ফলে প্রয়োজনে এর ব্যবহার কোন অসুবিধা নাই। তবে পান করার সময় লবন মিশিয়ে নিলে তা সিরকার মত হয়ে যায়। তখন আর কোন সন্দেহ থাকে না। [প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর ৯:৩৪, হিদায়া ৪:৪৮৩, ফিকহী মাকালাত ১:২৫৩-২৫৫]

পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ যে সকল মহিলারা পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের হাতের রান্নাকৃত খাবার অথবা অন্য কোন কিছু খাওয়া জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ শরী'আত সমর্থিত ন্যায় সঙ্গত কোন উযর ব্যতিরেকে অপারেশনের মাধ্যেমে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম কবীরা গুনাহ। এহেন অপকর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে ভালভাবে তাওবা করা জরুরী। অবশ্য এই লাইগেশন যদি কোন উযরের কারনে না হয়ে থাকে। তবুও উক্ত মহিলার রান্না খেতে অসুবিধা নেই। তবে যদি কেউ সমাজের গন্য মান্য ব্যক্তি হয় এবং এ ধরনের মহিলার রান্নাকৃত খাবার না খাওয়াতে অন্যদের জন্য নসীহতের কারণ হয় অথবা উক্ত ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, তার এই খানা বর্জনের কারনে উক্ত মহিলা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার হাতের রান্নাকৃত খাবার গ্রহণ না করাই শ্রেয়। [প্রমাণঃ জাদিদ ফিকহী মাসাইল ১ম খণ্ড ১৬৩]

ধূমপানের শর'ঈ বিধান

জিজ্ঞাসাঃ হুক্কা ও বিড়ি-সিগারেট খাওয়া অর্থাৎ ধূমপান করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কি ধরনের গুনাহ?

জবাবঃ হুক্কা, বিড়ি, সিগারেটে যদি নাপাকী বা নেশা জাতীয় কোন জিনিস থাকে, তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর যদি এমন না হয়, তাহলেও তা পান করা মাররূহ হবে। যদিও তা পাক বস্তু দ্বারা তৈরি হোক না কেন। কেননা, পাক জিনিস দ্বারা তৈরি বস্তুও যদি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে তা খাওয়া নিষেধ বা মাকরূহ হয়ে যায়। যেমন, মাটি পাক হওয়া সত্ত্বেও তা খাওয়া নাজায়িয। কেননা, তাতে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিড়ি-সিগারেট পান করার দ্বারা শরীরের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কতেক এমন, যা মানুষকে মৃত্যু পর্যন্ত ঠেলে দেয়। যেমন, ক্যান্সার ও যক্ষা ইত্যাদি।

এমনকি ডাক্তারদের অভিমত অনুসারে ধূমপায়ী ব্যক্তির যে ক্ষতি হয় তার ৩০ ভাগ ক্ষতি হয় তার পার্শ্ববর্তীদের, যারা ধূমপায়ী নয়। আর মুখে, শরীরে এমনকি তার কাপড়ে পর্যন্ত এমন দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, যা অন্যের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর অন্যকে কষ্ট দেয়া হারাম এবং দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। তাছাড়া এর দ্বারা অনেক অর্থের ও অপব্যয় হয়, যা শরী'আতে নিষেধ। এসব অসুবিধার কারণে ধূমপান বর্জনীয় এবং এটা ছেড়ে দেয়ার জন্য সদিচ্ছা যথেষ্ট। সুতরাং, যারা এ মুসীবতে লিপ্ত আছে, তারা আস্তে আস্তে কমাতে কমাতে একদম ছেড়ে দিবে এবং এর বদলে দরকার হলে পান খাওয়ার অভ্যাস করবে এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৪২, মুসলিম শরীফ ১:২০৯]

মদ ও সিনেমার ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত টাকা হালাল কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ মদ ও সিনেমার ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত টাকা হালাল কি-না? এবং জেনে-শুনে যারা তাদের নিকট থেকে মসজিদ মাদরাসার জন্য দান গ্রহণ করেন ও তাদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করেন তাদের জন্য এটা জায়িয হবে কি-না? আর যদি কোন ইমাম সাহেব এসব করেন, তবে তাকে মসজিদে ইমাম হিসাবে বহাল রাখা ঠিক হবে কি-না?

জবাবঃ মদ ও সিনেমার ব্যবসা উভয়টি হারাম সুতরাং, যার সম্পদের সম্পূর্ন অথবা বেশীর ভাগ বা অর্ধেক হারাম, তার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া ও তার দান করা জায়িয নয়। কোন ইমাম জেনে-শুনে এসব নিষেধ অমান্য করলে মুসল্লিদের জন্য এমন ইমামের পিছনে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের জন্য এমন ব্যক্তিকে ইমাম হিসাবে বহাল রাখাও জায়িয হবে না। এমনকি তার জন্য ইমামতী করাও মাকরূহে তাহরীমী হবে। আর যদি মদ ও সিনেমা ব্যবসায়ী ব্যক্তির

অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয়ে থাকে, তাহলে সে লোকের দান গ্রহণ অনুচিত হলেও হারাম হবে না। এক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা সহীহ হবে না। কারণ, তিনি কোন হারাম কাজ করেননি। উল্লেখ্য, যার সম্পূর্ন টাকা-পয়সা হারাম, সে যদি উক্ত হারাম মাল দ্বারা মসজিদ নির্মান করেন, তাহলে উক্ত মসজিদ শর'ঈ মসজিদ হবে না এবং সেখানে নামায পড়াও মাকরূহে তাহরীমী হবে। [মিশকাত শরীফ ১:১৬৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৪৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮:২৫৬, কিফায়াতুল মুফতী ৩:১১১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:১২৪, কিফায়াতুল মুফতী ৭:৬৪]

পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে স্বীকার করা

জিজ্ঞাসাঃ নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে (টাকার লোভে) পিতা বলে স্বীকার করা কি ধরনের অপরাধ?

জবাবঃ নিজের পিতা ছেড়ে অন্য কাউকে পিতা বলে স্বীকার করা জায়িয নয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে পাকে ঘোষণা করেন, "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায় সঙ্গত"। এ আয়তের দ্বারা বুঝা যায় যে, অনেকে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহবান করে বা নিজের পিতা ছেড়ে অন্যকে পিতা বলে সম্বোধন করে, এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে বঞ্চনীয় নয়। নিজের বংশ, যে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করে তার সম্বন্ধে কঠোর সাবধান বাণী সম্বলিত হাদীস আছে। তা হলো, হুযুর ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবি করে, অথচ সে জানে যে, ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়। তার জন্য বেহেশত হারাম"। [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩:৭৩, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ১০৭০]

বিসমিল্লাহ শব্দ দিয়ে দোকান বা হোটেলের নাম রাখা

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে দু'একটি দোকান বা হোটেলের নাম রেখেছেন 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি দিয়ে। আমি একটি রেডিও মেরামতকারীর সাইনবোর্ডে দেখলাম, 'বিসমিল্লাহ রেডিও হাউস' লিখা। কোন দোকানের এ ধরনের নাম রাখা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ জায়িয ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ রকম নাম রাখা জায়িয আছে। যদি কেউ বরকত ও সাওয়াবের নিয়্যতে রাখে আল্লাহ বরকতও দান করতে পারেন।

তবে টেলিভিশন, ভিসিয়ার সিনেমা ইত্যাদি নাজায়িয ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামের শুরুতে বিসমিল্লাহ লাগানো নাজায়িয। কারন-এর দ্বারা আল্লাহর নামের অবমাননা করা হয়।

উলামায়ে কিরামকে মাওলানা বলে সম্বোধন করা

জিজ্ঞাসাঃ মাওলানা শব্দের অর্থ কি? অনেকে বলেছেন 'মাওলা' অর্থ প্রভু। এক্ষেত্রে মাওলানা হলেন স্বয়ং আল্লাহ। কোন মানুষকে মাওলানা বললে শিরক হবে। অথচ আমরা উলামায়ে কেরামকে মাওলানা বলে সম্বোধন করি। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত কি?

জবাবঃ আরবী অভিধানসমূহে 'মাওলা' শব্দের প্রভু অর্থ ছাড়াও আরো অনেক অর্থ রয়েছে। বিখ্যাত সুপ্রাচীন আরবী অভিধান গ্রন্থ 'আল-কামূস' এ মাওলা শব্দের একুশটি অর্থ লেখা আছে। যার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ মালিক, গোলাম, গোলাম আযাদকারী, আযাদকৃত গোলাম, সাথী বা বন্ধু, নিকট আত্নীয়, প্রতিবেশী, কোন বিশেষ অঙ্গীকারাবদ্ধ বন্ধু, মেহমান, অংশীদার, অভিভাবক, প্রভু, সাহায্যকারী, পুরুস্কার দাতা, পুরস্কৃত ব্যক্তি, প্রেমিক ও অধীনস্থ। তাছাড়া মনিব ও নেতার অর্থেও 'মাওলা' শব্দ

প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে একমাত্র ‘প্রভু’ ব্যতিরেকে অন্য সকল অর্থেই যে কোন মানুষই ‘মাওলা’ হতে পারে। আর ইসলামী শাস্ত্রে আলেম পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে যে ‘মাওলানা’ বলা হয় তার অভিধানিক অর্থ ‘নেতা’ বা ‘সাহায্যকারী’ বা অভিভাবক। এতে কারো দ্বিমত নেই যে, একমাত্র উলামায়ে কিরামই আমাদের ধর্মীয় নেতা বা আভিভাবক এবং তাঁরাই ধর্মীয় জ্ঞানহীন মানুষদের জন্য ধর্মীয় সকল বিষয়াবলীতে সাহায্যকারী।

অতএব, এ ব্যাখ্যায় পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মাওলানা উপাধি ব্যবহারে কোনরূপ শিরক, কুফর বা গুনাহের আশংকা নেই। উপরন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলাই সূরায়ে তাহরীমে নিজেকে ফিরিশতা ও মুমিনদেরকে রাসূল ﷺ এর মাওলা বলেছেন। এছাড়া রাসূলে আকরাম ﷺ এক হাদীসে সাহাবী হযরত যায়েদ রা.-কে এভাবে সম্বোধন করে বলেছেন, ‘আনতা আখুনা ওয়া মাওলানা’ অর্থ, তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু। (মিশকাত শরীফ, ২৯৩)

তাছাড়া আমাদের নিকটতম পূর্বপুরুষ আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের যে জগদ্বিখ্যাত ও বিশ্ববরেণ্য মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের যুগ থেকে আলেমদেরকে ‘মাওলানা’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়ে আসছে, তাঁরা এর ধর্মীয় যুক্তি ও ব্যবহারিক বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অবগত হয়েই এর ব্যবহার সমর্থন করেছেন। সুতরাং, এ ব্যাপারে কোনরূপ অযাচিত ও অনর্থক বিতর্ক সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন নেই। উলামাদের উপাধির মধ্যে কুফর-শিরক থাকবে-এটা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে?

এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে চাকুরী করে বেতন গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ অমুসলিমদের সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কোন স্কুলে শিক্ষক হিসাবে চাকুরী করে বেতন গ্রহণ করা কি জায়িয হবে?

জবাবঃ অমুসলিমদের সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওদের কার্যকলাপ সম্পূর্নরূপে ইসলাম, মুসলমান ও দেশের স্বাধীনতা পরিপন্থী। তাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা হচ্ছে, এদেশের শিশু-কিশোর ও মা-বোনদের ইমান-আকীদা বিনষ্ট করা। তাদের প্রচলিত স্কুলও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও এক ও অভিন্ন। সুতরাং,অমুসলিমদের সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিও কর্তৃক কোন স্কুলে মুসলমানদের চাকুরি করা বৈধ নয়। কারণ, এতে মুসলমানদের ইমান-আকীদা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করা হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

“গুনাহ ও যুলুমের কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা”।

তাছাড়া এনজিও কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের লেনদেন যুলুম ও সুদভিত্তিক। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এদেশের জনগণের ইমান-আকীদা আমল-আখলাক বিনষ্ট করা। সুতরাং, শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী সেখানে চাকুরি করা জায়িয নয়। কুরান-হাদীসের বহু স্থানে সুদের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীস শরীফে জাবের রা. থেকে বর্নিত হয়েছে, “যে ব্যক্তি সুদ প্রদান করে এবং গ্রহণ করে কিংবা সুদ সংক্রান্ত লেনদেনের উকীল বা স্বাক্ষী হয় অথবা সুদ লিপিবদ্ধ করে এদের সকলের প্রতি রাসূলে আকরাম ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন, “এরা সকলেই মূল গুনাহের সমানভাবে অংশীদার”। (মিশকাত শরীফ ২৪৪)

এর দ্বারা বুঝা যায় গুনাহের কাজে সাহায্য করা কিংবা তাতে অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। অন্য এক হাদীসে বর্নিত হয়েছে, সুদের (গুনাহের) সত্তরটি

স্তর আছে। তন্মধ্য থেকে সর্ব নিম্নস্তরের গুনাহ হচ্ছে, মায়ের সাথে যিনা করার সমতুল্য।

অপর একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহর নিকট সুদের একটি দিরহাম ছত্রিশ বার যিনা করার থেকেও নিকৃষ্টতর। সুতরাং, যে মুসলমানের অন্তরে কুরআন ও হাদীসের প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আছে, সে কখনো এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারে না। [ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:১৯৪]

মানুষের নাম সংক্ষেপে ডাকা

জিজ্ঞাসাঃ আমরা অনেকেই মহব্বতের খাতিরে যার নাম মনোয়ারা তাকে মনু, যার নাম হুমায়রা তাকে হুমা, আবার যার নাম তাহিরুন তাকে তাহি বলে ডাকি। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম জানতে চাই।

জবাবঃ কাউকে মহব্বতের খাতিরে আদর করে সংক্ষেপ নামে ডাকতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এমন বিকৃত করে ডাকবে না যাতে বিশ্রী অর্থ সৃষ্টি হয়। প্রশ্নে বর্নিত শুরুতে মনোয়ারাকে মনু, হুমায়রাকে হুমা, তাহিরুনকে তাহি বলে ডাকা জায়িয আছে।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও আবূ হুরাইরা রা.-কে আবূ হির বলে ডাকতেন। তেমনিভাবে হযরত আয়িশা রা.-কে আয়িস বলে ডাকতেন। আরবী ব্যাকরণে একে "মুনাদায়ে মুরাখখাম বা অন্তকর্তিত আহুত নাম" বলে। উল্লেখ্য, আরবীতে মনোয়ারা কোন নাম হয় না। মুনাওওয়ারাহ নাম হতে পারে। তেমনিভাবে সুফিয়া কোন নাম হয় না তবে সূফিয়্যাহ বা সাফিয়্যাহ হতে পারে।

তিলাওয়াত ও দু'আ- দরূদ পড়ে বিনিময় গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ (ক) বিভিন্ন উদ্দেশ্য দু'আ, দরূদ ও কুরআন তিলাওয়াত করে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয কি-না?

জবাবঃ যদি দু'আ, দরূদ ও কুরআন শরীফ পাঠের দ্বারা কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্য না থাকে; বরং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে বা সাওয়াব লাভের আশায় বা সাওয়াব রিসানীর উদ্দেশে তা করা হয়, তবে এর বিনিময় গ্রহণ করা বা পয়সা-কড়ি নেয়া কিংবা দেয়া জায়িয নয়। [প্রমাণঃ শামী ৬:৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭:২৯৬]

কিন্তু কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে যেমন, কোন রোগ থেকে মুক্তির জন্য কিংবা ব্যবসা-বানিজ্যের উন্নতির জন্য কুরআন তিলাওয়াতের পয়সা-কড়ি লেনদেন বৈধ। [বুখারী শরীফ ২:৮৫২, শরহে নববী আলা মুসলিম, ২২৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৭:২৯১]

গেম খেলা

জিজ্ঞাসাঃ কম্পিউটারে বিভিন্ন গেমস খেলা কেমন? পড়াশুনা করতে করতে শরীরে অস্বস্তিবোধ করলে কিছু সময় গেম খেলা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ অনর্থক খেলাধুলা ও রং- তামাশা মুসলমানদের জন্য কখনো উচিত নয়। সুতরাং, অস্বস্তি দূর করার জন্য কিছু হাটা-চলা করা যেতে পারে বা যে কাজে লেগে আছে, সে কাজ বন্ধ রেখে অন্য কোন কাজ করতে পারে বা পরস্পরে কিছু আলাপ-আলোচনা করতে পারে। [সূরা লুকমানঃ৬]

'বেসমল' ব্যবহারের শর'ঈ হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ‘বেসমল’ (কলপ জাতীয় এক প্রকার তৈল) ব্যবহার করা জায়িয কি-না? এবং তা খেজাব বা কলপ এর অন্তর্ভুক্ত কি-না?

জবাবঃ ‘বেসমল’ অর্থাৎ চুল কালো করার জন্য ব্যবহৃত কলপ জাতীয় এ তৈল খেজাবের অন্তর্ভক্ত। আর শরী‘আতের দৃষ্টিতে বয়স্ক পুরুষের জন্য মাথার চুলে বা দাঁড়িতে কাল খেজাব ব্যবহার করা নাজায়িজ ও হারাম। হাদীস শরীফে রাসূলে আকরাম ﷺ পুরুষদেরকে একদম কাল খেজাব ব্যবহার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। সুতরাং, ‘বেসমল’ বা প্রকৃতপক্ষে কাল খেজাব হিসাবে পরিগণিত। তা ব্যবহার করা শরী‘আতের দৃষ্টিতে জায়িয নয়। তবে কেউ যদি খেজাব ব্যবহার করতে চায়, তাহলে তার জন্য একদম কাল খেজাব ব্যতীত অন্য যে কোন রঙের খেজাব বিশেষতঃ মেহেদী রঙের খেজাব ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বৃদ্ধ পুরুষের জন্য মেহেদী রঙের খেজাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব। [প্রমাণঃ আবু দাউদ শরীফ ২:৫৭৮, মীশকাত শরীফ ৩৮২, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:১৮২; ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:২৯০]

ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি

জিজ্ঞাসাঃ (ক) ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা, ভলিবল খেলা ও লুডু খেলা জায়িয আছে কি?

(খ) টিভিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা বা ফুটবল খেলা দেখার কি হুকুম?

(গ) খেলার মধ্যে মুসলমান বা অমুসলিম কোন দলকে সমর্থন করা বা তারা বিজয়ী হলে আনন্দ অনুভব করার হুকুম কি?

জবাবঃ প্রচলিত খেলাধুলার মধ্যে ক্রিকেট ফুটবল ও ভলিবল প্রতিটি খেলাই শরী‘আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয ও হারাম। কারণ, এর মধ্যে

শরী'আতের দৃষ্টিতে অনেক নাজায়িয দিক আছে। তবে নাজায়িয বিষয়গুলো বর্জনের শর্তাবলী স্বাপেক্ষে ফুটবল, ক্রিকেট ও ভলিবল খেলা জায়িয আছে। শর্তগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলঃ (ক) হার-জিতের উদ্দেশ্যে খেলা যাবে না। উদ্দেশ্য একমাত্র শরীর চর্চা ও আন্তরিক প্রশান্তি হতে হবে। তাছাড়া জয়ী পক্ষকে যদি পরাজিত পক্ষ থেকে কোন মাল বা অর্থ দেওয়ার শর্ত থাকে তাহলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর জুয়া হল জঘন্য গুনাহ ও হারাম। [প্রমাণঃ মা'আরিফুল কুরআন ৭:২৫]

(খ) শর'ঈ সতরের সীমারেখা লংঘন করা যাবে না।

(গ) লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর দ্বারা নামায, জামা'আত বা শরী'আতের অন্য কোন হুকুম পালনে ত্রুটি না হয়।

উল্লেখিত শর্ত পাওয়া গেলে এগুলো খেলাতে কোন অসুবিধা নেই। বিশেষতঃ এসবে যথেষ্ট শারীরিক ব্যয়ামও হয়, আর শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখা শরী'আতের নির্দেশ। [প্রমাণঃ মা'আরিফুল কুরআন ৭:২৩]

শর্ত পালন না করলে এসবের প্রত্যেকটিই নাজায়িয ও হারাম হবে। আর লুডু খেলার মধ্যে যেহেতু শারীরিক কোন পরিশ্রমই হয় না, বরং তা সময় অপচয়ের আক্তা মাধ্যম মাত্র, কাজেই এটা মাকরূহ হবে।

(খ) বিশ্বকাপ ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা টিভিতে দেখা জায়িয নয়। প্রতমতঃ টিভিতে কোন প্রোগ্রাম দেখাই জায়িয নয়। এমনকি ইসলামী কোন প্রোগ্রাম ও বর্তমানে টিভিতে দেখা হারাম। আর ফুটবল তো এজন্য জায়িয নয় যে, এটাতে ফরয সতরের প্রকাশ্য লংঘন হয়। যা করাও হারাম, দেখাও হারাম। আর ক্রিকেটের বেলায় যদিও সতর ঠিক থাকে, কিন্তু এখানে জয়-পরাজয় মুখ্য থাকার কারণে তা হারাম। আর এটা দেখার মাধ্যমে প্রকারান্তরে ঐ সকল হারামের প্রতি মৌন ও পরোক্ষ

সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। উপরন্তু এতে প্রচুর সময় ও অর্থের অপচয় হয়। যা একজন মু'মিনের জন্য কিছুতেই বৈধ নয়।

সর্বোপরি এসব খেলায় যেহেতু দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ থাকে, তাই দর্শক মাত্রই যে কোন পক্ষের সমর্থন করে থাকে এবং তার বিজয় কামনা করে থাকে। যেটা ঐ দল বা খেলোয়াড়ের সাথে মুহাব্বতের সুত্র থেকেই হয়ে থাকে। অথচ তা সম্পূর্ন নিষেধ।

কেননা, এসব খেলার খেলোয়াড়রা প্রায় প্রত্যেকেই চরম পর্যায়ের কাফির বা ফাসিক। যা তাদের ব্যক্তি জীবনের দিকে লক্ষ করলেই বুঝা যায়। সুতরাং, তাদের খেলা দেখা মানে তাদের সাথে মুহাব্বতেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো, যা নাজায়িয। প্রিয়নবী ﷺ বলেন, " মানুষের হাশর তার সাথেই হবে যাকে সে মুহাব্বত করে"। (মিশকাত শরীফ,২:৪২৬)

তাছাড়া দিন-রাতভর এগুলো দেখতে গিয়ে দুনিয়াবী জরুরী কাজ নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি অনেকের নামায পর্যন্ত কাযা হয়ে যায়। যা পৃথক গুনাহের কাজ।

(গ) খেলার ভিতর মুসলিম বা অমুসলিম কোন দলকে সমর্থন করা যাবে না। অতএব, তারা জয়ী হলে আনন্দ করার তো প্রশ্নই আসে না। কেননা, জয়-পরাজয় উদ্দেশ্য করে কোন খেলাই জায়িয নয়। অথচ এসব খেলায় তা-ই হয়। সুতরাং, কোন দলকে সমর্থন করার প্রশ্নই উঠে না। [ফাতাওয়া শামী ৫:২৭৫, কানযুল উম্মাল ১৪:৪১৪]

মেয়েদের কপালে টিপ দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ বিধর্মীদের অনুকরণের নিয়্যাত না থাকলে স্বামীকে খুশী করার জন্য কপালে টিপ দেয়া জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ কপালে টিপ দেয়া যেহেতু হিন্দুয়ানী প্রথা, শুধু হিন্দুয়ানী প্রথা নয় বরং তাদের জাতীয় শি'আর, আর বিধর্মীদের প্রথা পালন করাই নাজায়িয। আর তাদের জাতীয় শি'আরের অনুকরন তো স্পষ্ট হারাম কাজ। সুতরাং, তা পরিত্যাজ্য। বান্দাকে খুশী করার জন্য আল্লাহর এবং আল্লাহর রাসূলের হুকুম অমান্য করা কখনও জায়িয হতে পারে না। [প্রমাণঃ তাফসীরে কুতুবী ৯:২৬৬, আবূ দাউদ ২:৫৫৯]

মাছ বা ডিম কাঁচা বা পুড়িয়ে খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ কাঁচা ডিম খাওয়া হালাল না হারাম? এবং তা আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া কি জায়িয? এমনিভাবে কাঁচা মাছ খাওয়া অথবা তা আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার ব্যাপারে হুকুম কি?

জবাবঃ হালাল বস্তু যেভাবেই খাওয়া হোক, সেটা যদি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তাহলে তা খাওয়া হালাল। তাই কেউ যদি ডিম কাঁচা বা আগুনে পুড়ে খেতে পারে, এমনিভাবে কাঁচা মাছ আগুনে পুড়ে কাবাব করে খেতে পারে এবং সেটা যদি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তাহলে কোন আসুবিধা নেই। তবে খাদ্যের যে অংশ পুড়ে কয়লা হয়ে যায়, তা খাওয়া বৈধ নয়। [হিন্দিয়া ৩:৩৪০]

টাই ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ টাই পরা কখন থেকে শুরু হয়, শরী'আতে টাই ব্যবহার করার হুকুম কি?

জবাবঃ টাই বর্তমানে বিধর্মীদের শি'আর বা জাতীয় নিদর্শন। অবশ্য শুরুতে টাই খৃষ্টানদের ধর্মীয় শী'আর ছিল। কেননা, তারা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র। বিশ্বের সকল মানুষের পাপ মুক্তির জন্য তিনি ক্রসবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। (তাদের এ আকীদা সম্পূর্ন

কুরআন-হাদীস বিরোধী ও কুফরী) তাই এই আকীদার ধারক-বাহক হিসাবে ক্রস সদৃশ্য টাই খৃষ্টানরা গলায় ধারণ করে এবং লেবাসের মধ্যে টাইকে শামিল করে। পরবর্তীতে অবশ্যই টাই এর সাথে এ বিশ্বাস আগের ন্যায় সম্পৃক্ত থাকে নি; বর্তমানে তা বিধর্মীদের জাতীয় শী'আর তথা বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে। আর মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের জাতীয় শি'আর ব্যবহার করা নাজায়িয কাজ। কেউ করে থাকলে, তা সম্পূর্নরূপে পরিত্যাগ পূর্বক খালেস তাওবা করা উচিত। [আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া ২:৯৪; খাইরুল ফাতাওয়া ১:১৫১; আবু দাউদ শরীফ ২:৫৫৯; মীশকাত শরীফ ২:৩৭৫; কিফায়াতুল মুফতী ৯:১৫৩]

মাসিক অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত, সুরমা ব্যবহার ও তালীমের কিতাব পড়া

জিজ্ঞাসাঃ (ক) মেয়েদের মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফের আয়াত দু'আর নিয়্যাত পড়া যাবে কি-না?

(খ) মাসিক অবস্থায় চোখে সুরমা ব্যবহার বা যমযমের পানি পান করা যাবে কি-না?

(গ) মাসিক অবস্থায় তালীমের কিতাব পড়া যাবে কি-না?

জবাবঃ (ক) হ্যাঁ, মাসিক অবস্থায় কুরআন শরীফের ঐ সব আয়াত দু'আর নিয়্যতে পড়া যায়, যেগুলোকে দু'আ হিসাবে পড়া হাদীসের দ্বারা প্রমানিত আছে। [প্রমাণঃ বেহেশতী যেওর ২:৬৩; শামী ১-২৯৩]

(খ) মাসিক অবস্থায় চোখে সুরমা ব্যবহার বা যমযমের পানি পান করা যাবে।

(গ) মাসিক অবস্থায় তা'লীমের কিতাব ও অন্যান্য ইসলামী বই পড়া যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে উক্ত বইয়ে যদি কুরআন শরীফের আয়াত থাকে, তাহলে উক্ত আয়াত স্পর্শ ও তিলাওয়াত করা যাবে না। শুধু অর্থ পড়ে নিবে। [হিদায়া ১:৬৪; আহসানুল ফাতাওয়া ২:৭১; বেহেশতী যেওর ২:৬৩]

টেলিভিশন দেখা

জিজ্ঞাসাঃ টেলিভিশন দেখা শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন? টেলিভিশনের মালিক ও অন্যান্য দর্শকদের মধ্যে গুনাহের পার্থক্য কতটুকু?

জবাবঃ টেলিভিশন রাখা, দেখা, দেখানো ও টেলিভিশনে কোন কিছু শুনা বা শুনানো নাজায়িয ও হারাম। কারণ, বর্তমানে টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে বেহায়া, অশ্লীল ও অবৈধ প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। যা সম্পূর্নরূপে শরী'আত পরিপন্থী। যেমন, প্রানীর ফিল্ম, ছবি-বাজনা, খেলা-তামাশা, নাচ-গান, বেগানা-বেপর্দা মেয়েলোক ও ছতরহীন খেলোয়াড়দেরকে দর্শন করা প্রভৃতি। টেলিভিশনের মালিকের আমলনামায় টেলিভিশন দেখার ও সকল দর্শকের গুনাহর সমপরিমাণ গুনাহ লিখা হবে। আর দর্শকের আমলনামায় তার একার গুনাহ লেখা হবে। [বুখারী শরীফ ২:৮৮১; আদ দুররুল মুখতার ৫:২৪৫; নিযামুল ফাতাওয়া ২:৯৯]

কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বরকতের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন কারী সাহেবের মাধ্যমে প্রতিদিন সকালে সূরায়ে ইয়াসিন তিলাওয়াত করান এবং বিনিময় স্বরূপ প্রতি মাসে ১০০/= টাকা করে প্রদান করেন। তিলাওয়াতকারীর জন্য উক্ত টাকা গ্রহণ করা জায়িয আছে কি?

জবাবঃ দুনিয়াবী কোন কোন কাজের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয বিধায় উক্ত কারীর জন্য ১০০/= টাকা গ্রহণ করা জায়িয আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করে তার বিনিময় গ্রহণ করা ও দেয়া উভয়টাই নাজায়িয হারাম। [বুখারী শরীফ ২:৮৫৪; ফাতাওয়া আলমগীরী ৪:৪৪৯; আহসানুল ফাতাওয়া ২:২৯৯]

বিধর্মী লোক মারা গেলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ কোন বিধর্মী লোক মারা গেলে ফী নারি জাহান্নামা পড়তে হয় কি না? জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, অবশ্যই পড়তে হবে।

জবাবঃ এটা ভিত্তিহীন কথা। আমাদের জানা মতে, বিধর্মীদের মৃত্যুতে এ ধরনের কোন কিছু পড়ার কথা কুরআন-হাদীসে নেই।

মুসলমানদের জন্য কাঁকড়া ও কুঁচে খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ মুসলমানদের জন্য কাঁকড়া ও কুচে খাওয়া জায়িয কি-না? যদি জায়িয না হয়, তবে উক্ত জীবগুলি বিক্রয় করে বিক্রিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি-না?

জবাবঃ আমাদের হানাফী মাযহাব মতে মাছ ছাড়া পানির অন্য কোন প্রাণী যেমনঃ কচ্ছপ, কাঁকড়া ও কুঁচে ইত্যাদি খাওয়া। অপরদিকে এসব বস্তু জায়িযভাবে অন্য কোন বৈধ কাজে ব্যবহার করারও কোন প্রচলন নাই। যেহেতু এগুলো খাওয়া হানাফী মাযহাব মতে নিষেধ। সুতরাং, বিক্রি করাও নাজায়িয। নিষিদ্ধ বস্তু বিক্রি করে পয়সা পাওয়াটা তার বিক্রি জায়িয হওয়ার দলীল নয়, বরং খাওয়া নিষেধ হওয়া সত্বেও বৈধভাবে অন্য কোন হালাল কাজে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন হওয়া তার বিক্রি জায়িয হওয়ার দলীল। [প্রমাণঃ বাযযাযিয়া ৩:৩৫৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ৩:১১৪]

খরগোশ খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ খরগোশ খাওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন?

জবাবঃ খরগোশ খাওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয আছে। খরগোশ সাধারণত দু'ধরণের হয়ে থাকে। বকরীর মতো পা-ওয়ালা ও বিড়ালের মত পা-ওয়ালা। উভয় প্রকার খরগোশ উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে খাওয়া জায়িয। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:৩৬৯; ফাতাওয়া আব্দুল হাই ২:২৯৭; হায়াতুল হায়ওয়ান ১:১৯]

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

জিজ্ঞাসাঃ (১) আগুন জ্বালাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সম্পূর্ন বলা যাবে কি? নাকি শুধু বিসমিল্লাহ বলতে হবে? আগুন তো জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, দেয়। ধ্বংস করে দেয়। এজন্য এতে 'রহমান' এবং 'রাহীম' শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি-না?

(২) ঔষধ পান করতে বিসমিল্লাহি আল্লাহ শাফী, আল্লাহ মাফী, আল্লাহ কাফী বলতে হয় কি-না? বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বললে কোন অসুবিধা আছে কি-না? প্রমান সহ জানতে চাই?

(৩) এক ড্রাইভার বেতন পায় সর্বমোট ৪২০০ টাকা। ৪০জন ড্রাইভার একই কোম্পানীতে চাকুরী করে। এখন কথা হল, এই ব্যক্তি যদি অবৈধ পয়সা রোজগার না করে তাহলে বাকী ৩৯ জনের চাকুরী থাকবে না। অথবা নিজের চাকুরী থাকবে না। তার ওভার টাইমের জন্য কোন ভাতা দেয়া হয় না। আর বাকী সব ড্রাইভাররা অবৈধ পন্থায় প্রয়োজনীয় টাকা নিয়ে নেয়। এ অবস্থায় এই ড্রাইভারের করনীয় কি?

জবাবঃ ১. আগুন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। এর মাধ্যমে মানুষের অসংখ্য জরুরত পুরা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে আগুন ছাড়া মানুষের জীবন চলাই মুশকিল। খনা-পিনা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। সুতরাং, এহেন গুরুত্বপূর্ন নিয়ামত ভোগ করার জন্য তা জ্বালানোর শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলা দোষের কিছু নয়। বরং বলাটাই জরুরী। কারণ, কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বিভিন্ন নিয়ামতের বর্ণনা করতে গিয়ে ঘোষণা করেন, "তোমরা যে আগুন প্রজ্জলিত কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? যা দ্বারা আগুন জ্বালাও তা কি তোমরা সৃষ্টি করেছ? না আমিই তার সৃষ্টিকর্তা" কে এই নিয়ামত দাতা? কে এই নিয়ন্ত্রনকর্তা"। তাছাড়া হাদীস শরীফে প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং, পূর্ন বিসমিল্লাহ পড়া যাবে।

(২) প্রশ্নে বর্ণিত দু'আ কোন হাদীসের কিতাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে এর মধ্যেমে আল্লাহ মাফী কথাটি সম্পূর্ন নিরর্থক। সুতরাং, এটা বলা যাবে না। অবশিষ্ট দু'টিতে এমন কোন খারাবীও নেই যে তা পড়া যাবে না। তেমনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পূর্ন বলাতেও কোন অসুবিধা নেই। বরং বলাটাই শ্রেয়।

(৩) জীবিকা উপার্জনের বেলায় দু'টি মৌলিক নীতিমালার প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। (ক) উপার্জিত রিযিক হালাল থেকে হবে। (খ) উপার্জনের পন্থাও হতে হবে বৈধ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন, হে মানব মণ্ডলী! তোমরা পৃথিবীর হালাল এবং পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"। সুতরাং, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় করণীয় হলো, আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে

শুধু কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত চাকুরীর জন্য নির্ধারিত বেতনের টাকা গ্রহণ করা। আর অবৈধভাবে এক পয়সাও গ্রহণ না করা। এভাবে যতদিন সম্ভব এখানে চাকুরী করা। এভাবে সম্ভব না হলে অন্যত্র সম্পূর্ন হালালভাবে বেশী বেতনে চাকুরীর সন্ধান করা। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে ভাল চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কোন রাস্তা খুলেই দেন এবং তার জন্য এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেন যা তার কল্পনায়ও ছিল না।"

নিষ্প্রয়োজনে তা'লীম ও যিকিরে মাইক ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ বাসার ছাদে অল্প কিছু সংখ্যক মুসল্লী সপ্তাহে একবার মাইকে যিকির ও তা'লীম করে থাকে। সেখানে মুসল্লীদের মাইক ছাড়া শুনতে কোন অসুবিধা হয় না। এ অবস্থায় মাইক ব্যবহার করা কেমন হবে?

জনাবঃ শুধু পুরুষদের জন্য উচ্চঃস্বরে যিকির করা জায়িয আছে যদি যিকিরের দ্বারা রিয়া উদ্দেশ্য না হয় এবং ঘুমন্ত অথবা অসুস্থ ব্যক্তিদের কিংবা মুসল্লীদের নামাযের ও তিলাওয়াতকারীদের তিলাওয়াতে অসুবিধা না হয়। আর যদি উল্লেখিত লোকদের অসুবিধা হয়, তাহলে উচ্চঃস্বরে যিকির করা জায়িয হবে না। তবে শুধু যিকিরের জন্য মাইক ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং তা বর্জনীয়। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ২৪৮ মিশকাত ২৫৫]

বিবিধ

“সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়” এর অর্থ কি?

জিজ্ঞাসাঃ আমরা সচরাচর তাবলীগ জামাতে গিয়ে শুনে থাকি, “কিছু থেকে কিছু হয় না, সব কিছু আল্লাহর থেকে হয়”, কথাটির বাস্তবতা কতটুকু? বিস্তারিত জানালে খুশী হব। কারন বিভিন্ন সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, কেউ বলে মানুষ চুরি করে, ডাকাতি করে, কত ধরনের খারাপ কাজ করে থাকে, এটাও কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে মানুষের অপরাধ কি? তাকে কেন শাস্তি দেয়া হয়।

জবাবঃ “কিছু থেকে কিছু হয় না, সব কিছু আল্লাহর থেকে হয়।” এ বাক্যটি তাকদীর সংক্রান্ত কথা। এ কথাটির আসল ব্যাখ্যা হল, যে সমস্ত বিশ্ব জগতের ভাল-মন্দ যা কিছু হয় সবই আল্লাহ তা‘আলা প্রথম থেকে জানেন, লাউহে মাহফুযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন তেমনই হয়। তার মধ্যে কোন ব্যাতিক্রম হয় না। আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী। তাঁর ক্ষমতার পরিধি থেকে বের হতে পারে এমন কেউ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, আদি-অন্ত, সব কিছু তিনি সঠিকভাবে জানেন। মানুষকে ভাল-মন্দ বুঝার এবং করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং ইচ্ছা শক্তিও দান করেছেন, যদ্বারা নিজ ক্ষমতায়, নিজ ইচ্ছায় সে পাপ-পুণ্যের কাজ করে। পাপ করলে আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন এবং পুন্যের কাজ করলে সন্তুষ্ট হন।

এখানে ভালভাবে বুঝতে হবে যে, কাজ করা ভিন্ন কথা আর সৃষ্টি করা ভিন্ন কথা, সৃষ্টি তো সব কিছুই আল্লাহ তা‘আলা করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে দান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের অসাধ্য কোন হুকুম করেননি। যা

কিছু আদেশ বা নিষেধ করেছেন সবই বান্দার আয়ত্বে ও ইখতিয়ারে। সুতরাং এখন যদি কেউ ইচ্ছা করে চুরি-ডাকাতি করে তাহলে সে তার শাস্তি পাবে। আর যদি পুন্যের কাজ করে তাহলে তার প্রতিদান পাবে। অবশ্য কিছু লোক এ কথা কালিমার অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং তাওহীদ বুঝনোর জন্য বলে থাকেন অথচ সেক্ষেত্রে কথাটি ঐ ভাবে বলা ঠিক নয়। বরং এ ভাবে বলা উচিত যে, মাখলূক বা চীজ আসবাব বান্দার উপকার বা অপকার করার নিজস্ব কোন ক্ষমতা রাখে না। বরং তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপকার বা অপকার করার জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। বরং তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। [প্রমাণঃআকিদাতুত তাহাবী ৪০-৪৩, কিফাতুল মুফতী ১:১৩৭, ইমদাদুল আহকাম ১:১১৬]

خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا لم يخف عليه شيئ قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم

عن معصيته وكل شيئ يجرى بقدرته ومشيته تنفذ لا مشية للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن.

عقيدة الطحاوى ص / ///

কি ধরনের বই পড়া উচিত?

জিজ্ঞাসাঃ বাজারে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী বই পাওয়া যায়, যেমন, বেহেশতি যেওর, তরীকুল ইসলাম, মাজমু'আয়ে ওযায়েফ, মাকসুদুল মু'মিনীন, আমলে নাজাত, দাকায়েকুল আখবার, সুন্নাত বিদ'আত, বিষাদ

সিন্ধু, মা'রেফাতের ভেদতত্ব, খেলাফত ও মুলুকিয়াত, আহকামুল মাজার ইত্যাদি। এগুলো আমরা পড়তে পারি কিনা?

জবাবঃ প্রত্যেক মুসলমানদের এমন ধরনের কিতাব পাঠ করা উচিত, যা ঈমান ও আমলের জন্য সাহায়ক হয়। সুতরাং কোন কিতাব পাঠ করতে হলে, উক্ত কিতাবের লেখক এবং লিখিত কিতাব সম্পর্কে কোন হক্কানী আলেমের পরামর্শ নেয়া জরুরী। কেননা বর্তমানে বাজারে হরেক রকমের কিতাব ইসলামী লেভেলে চালু রয়েছে। অথচ সেগুলোর মধ্যে প্রচুর শরী'আত পরিপন্থী কথা বিদ্যমান আছে। আর সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা এসব কিতাবের ভুল শুদ্ধের মধ্যে তারতম্য করতে পারেন না। যার কারনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। বহু লোক দ্বীনের সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। প্রশ্নের উল্লেখিত কিতাবগুলোর মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. লিখিত কিতাব বেহেস্তী যেওর ছাড়া আর বাকি কিতাবগুলোতে প্রচুর ভুল রয়েছে। কোন কোন কিতাব নির্ভরযোগ্য বুযুর্গদের নামে চলছে। কিন্তু বিষয়বস্তু দেখলে বুঝা যায়, পরবর্তী লোকেরা তার মধ্যে এমন কথা অন্তর্ভুক্ত করেছে যা সহীহ নয়। তাই উক্ত কিতাবসমূহ পড়া থেকে বিরত সকলের জন্য একান্ত জরুরী। অন্যথায় শিরিক বিদ'আতে জড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। সেজন্য যে কোন কিতাব পাঠ করা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই ঝুকিপূর্ন। তবে বেহেশতি যেওর বা থানভী রহ.-এর লিখিত অন্য যে কোন কিতাব নির্দিধায় পড়তে পারেন। যেমন, দ্বীনের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য 'হায়াতুল মুসলিমীন' 'সুখ-দুঃখ কেন?' ঈমান আকীদা সহীহ করার জন্য 'ফুরুউল ঈমান' ইবাদত দুরস্ত করার জন্য 'তা'লীমুদ্দীন', রিযিক হালাল রাখার জন্য 'সাফাইয়ে মু'আমালত', বান্দার হক আদায় করার জন্য 'হুককুল ইসলাম' ও 'আদাবুল মু'আশারাত' আখলাক বা আত্ন শুদ্ধির

জন্য ‘কসদুস সাবীল’ ও ইমাম গাযযালী রহ.-এর ‘তাবলীগে দ্বীন (এর দ্বিতীয় খন্ড)’ প্রভৃতি।

মুহাম্মদ শব্দের বিশুদ্ধ বানান

জিজ্ঞাসাঃ একটি মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগের একটি প্রশ্নে দেখতে পেলাম যে, মুহাম্মদ ও মোহাম্মদ এ দু’টি শব্দের মাঝে দ্বিতীয় বানানটিই শুদ্ধ। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে মাসিক রাহমানী পয়গামের নবীন কাফেলার সদস্যদের নামের শুরুতে ‘মুহাম্মদ’ লেখা হয় কেন?

জবাবঃ বাংলা ভাষায় যেসব আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে আরবী উচ্চারনের মত বাংলাতেও সহীহ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া জরুরী। প্রশ্নে উল্লেখিত ‘মুহাম্মদ’ শব্দটি আরবীতে লেখার সময় ‘মীম’ এর উপর পেশ হয়। আরবীতে পেশের উচ্চারন হয়ে থাকে ‘উ’ কার। পেশ এর উচ্চারন কস্মিনকালেও ‘ও’ কার হয় না। সে হিসাবে ‘মুহাম্মদ’ শব্দটি ‘ও’ কার দিয়ে না হয়ে ‘উ’ কার দ্বারা লিখতে হবে, তা অতি সহজেই অনুমিত হয়। এর জন্য কোন দলীল-প্রমানের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে আরবী পেশ উচ্চারণ করার সময় ও লেখার সময় ‘ও’’ কার এর উচ্চারণ করা হয়। তা নিঃসন্দেহে ভুল। তেমনিভাবে আরবী যের এর উচ্চারণ “ই” কার হওয়া বঞ্চনীয়। অনেকে এটাকে অজ্ঞতাবশতঃ “এ” কার এর ন্যায় উচ্চারণ করে থাকেন-এটা সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

ওয়ায়েস কুরুনী নাম রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আমার নাম ওয়ায়েস কুরুনী। অনেকেই আমাকে বলে থাকেন তুমি তো এর কুরুন দেশের নও। সুতরাং, তোমার নাম ওয়ায়েস হতে পারে, ওয়ায়েস কুরুনী নয়। একথাটি সঠিক কি-না জানতে চাই। আরো জানতে চাই আমার নামের বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণটি কিরূপ হবে?

জবাবঃ "কুরুন" কোন দেশের নাম নয়। বরং মূল শব্দটি হচ্ছে "ক্বারন" যার অর্থ হল শিং বা বিশেষ এলাকার নাম। সে এলাকার লোক না হওয়া সত্ত্বেও বিখ্যাত সেই বুজুর্গের নামের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে ওয়ায়িস ক্বারনী নাম রাখার কোন অসুবিধা নেই। তবে যেহেতু ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে, এ কারনে কেবল মাত্র ওয়ায়িস নাম রাখা এবং এর সঙ্গে ক্বারনী যুক্ত না করাই উত্তম।

হিলফুল ফুজুল পাঠাগারের নামকরণ

জিজ্ঞাসাঃ আমি একটি ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করেছি। এর নামকরন করা হয়েছে "হিলফুল ফুজুল ইসলামী পাঠাগার"। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাঠাগারের সাথে এ নামটির প্রয়োগ যথার্থ হয়েছে কি-না? আর হিলফুল ফুজুল এর অর্থ কি? বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ আপনি একটি উত্তম কাজ করেছেন। সেজন্য আপনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। বর্তমান বাজারে নোংড়া ও বিকৃত রুচির পত্র-পত্রিকার ব্যাপক ছড়াছড়ি রোধে ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। সুতরাং, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আপনার পাঠাগারে যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা পরিপন্থী কোন বই-পুস্তক স্থান না পায়। কারন, বর্তমান বাজারে ধর্মের নামে এমন অনেক বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলো মানুষের ঈমান-আক্বীদার জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ। তাই আপনি আপনার পাঠাগারের পুস্তকগুলো কোন একজন বিজ্ঞ ও হক্কানী আলিমকে দেখিয়ে নেবেন। আর আপনার পাঠাগারের নামকরন যথার্থই হয়েছে। কারন, হিলফুল ফুজুল অর্থ হচ্ছে কল্যানের অঙ্গীকার। নবুওয়াত প্রাপ্তীর পূর্বে রাসূল ﷺ এ নামে একটি সেবা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের

সদস্যগণ মহান আল্লাহর নামে শপথ করে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ছিলেন যে, তারা উৎপীড়িত অত্যাচারিতদের পক্ষ নিবেন। এবং অত্যাচারীর নিকট থেকে অত্যাচারীতের প্রাপ্য আদায় করে দিবেন। যেহেতু আরবী ভাষায় প্রতিজ্ঞাকে 'হিলফ' এবং অত্যাচারীর নিকট অত্যাচারিতের প্রাপ্য অধিকার 'ফুজুল' বলা হয়। এজন্যই এই সেবা সংঘের নামকরণ করা হয়েছিল 'হিলফুল ফুজুল'। [বিদায়াহ নিহায়াহ ২:২৭১ হযরত মুহাম্মদ ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন ২০১ পৃষ্ঠা]

কালো খেজাব ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার স্ত্রি কম বয়সী ও ধর্মভীরু। ইদানিং আমার চুল-দাঁড়ি পাকতে শুরু করেছে। স্ত্রীর অনুরোধে খেজাব বা কালো কলপ ব্যাবহার করতে চাই। জায়িয হবে কিনা?

জবাবঃ দ্বীন ইসলামের জন্য জিহাদরত মুজাহিদ ব্যতীত অন্য কারো জন্য দাড়ি বা চুলে সম্পূর্ন কালো খেজাব বা কালো কলপ লাগান জায়িয নয়। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্নিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "শেষ যামানায় এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে, যারা কালো খেজাব লাগাবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না"। (আবু দাউদ শরীফ ২:৫৭৮) অন্য এক হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কালো খেজাব লাগাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার চেহারা কাল করে দেবেন"। [কানযুল উম্মাল ৬:৬১৭]

সুতরাং, আপনার স্ত্রীর অনুরোধে বা মন রক্ষার্থে কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহ হবে। তবে মেহেদী বা সবুজ বা কালোর কাছাকাছি অন্য কোন রং-এর খেজাব ব্যবহার করতে পারেন। [আবু দাউদ ২:৫৭৮;

ফাতাওয়া শামী ৬:৪২২, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩৫৯, ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:২৯০, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২:৪২৪]

واما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون اهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشائخ رحمهم الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه اليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ عالمگيرى /

নিজ অফিসে ফেলে যাওয়া জিনিসের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ এক ব্যক্তি আমার অফিসকক্ষে একটা ছাতা রেখে গেছে। প্রায় ২ মাস অতিবাহিত হলো, তবুও উক্ত ছাতার মালিক পাওয়া যাচ্ছে না, উক্ত ছাতা এখন কি করা উচিত?

জবাবঃ আপনার অফিসে সাধারণতঃ যারা আসা-যাওয়া করে তাদের নিকট খোঁজ খবর নিবেন। কেউ দাবী করলে, প্রমাণ জিজ্ঞাসা করে নিবেন। উপযুক্ত মালিক পেলে দিয়ে দিবেন। যদি আসল মালিককে না পাওয়া যায়, তখন মালিকের নামে সাওয়াব পৌছানোর নিয়্যতে কোন গরীবকে দান করে দিবেন। [হিদায়া ২:৬১৪]

قال فان كانت اقل من عشرة دراهم عرفها اياما وان كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا هداية /

রেডিও, টিভিতে সালাম, সিজদার আয়াত শুনলে করনীয়

জিজ্ঞাসাঃ রেডিও ও টিভিতে সালাম শুনলে, তার জবাব দিতে হবে কিনা? অনুরূপভাবে সিজদার আয়াত শুনলে, সিজদা ওয়াজিব হবে কি না?

জবাবঃ রেডিও, টিভিতে সালাম শুনলে, তার জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে আগে ধারণকৃত আয়াতে সিজদা শুনলে তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা ওয়াজিব নয়। [ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:২৪৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১:৪২]

তাওবার দ্বারা কি গুনাহ মাফ করা হয়?

জিজ্ঞাসাঃ তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা শিরক ব্যতীত সমস্ত গুনাহ মাফ করতে পারেন। এক জন নাস্তিক ব্যক্তি জীবনে বহু শিরক করেছে। আল্লাহ তার ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন। এখন তার অতীতের শিরকী গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি?

জবাবঃ তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা শুধু শিরক নয়, বরং শিরকসহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। সুতরাং, কোন নাস্তিক ব্যক্তি যদি ইখলাসের সাথে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তার জীবনের পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। উল্লেখ্য, আপনি যে কথাটি শুনেছেন তা এভাবে হবে কুফর-শিরক ব্যতীত অন্য গুনাহ নিয়ে মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তাকে মাফ করেও দিতে পারেন। কিন্তু কুফর-শিরক বা বেঈমান অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করবেন না বলে কুরআন পাকে ঘোষণা করেছেন। [মা'আরিফুল কুরআন ৭:৫৬৯]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামের উসিলা দিয়ে দু'আ করা

জিজ্ঞাসাঃ বিভিন্ন বইয়ে আমরা পড়েছি যে, হযরত আদম আ., হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে উসীলা করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবুল করেছিলেন। কিন্তু জনৈক ক্বারী সাহেব বললেন যে, তখন তো কুরআন শরীফ ছিল না। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা আমার নামসমূহ এবং তোমাদের নেক আমল সমূহকে উসীলা করে দু'আ কর"। সুতরাং আমরা জানতে চাচ্ছি যে, নবী ﷺ- এর নামের উসীলায় আমরা কি দু'আ করতে পারব?

জবাবঃ কুরআন ও হাদীসের এটা প্রমানিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামের উসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়িয আছে এবং সাহাবায়ে কিরামও তাঁর নামের উসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন। সুতরাং এতে দোষের কিছু নেই। কেননা, এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [প্রমাণঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৩:১২৮, খাইরুল ফাতাওয়া ১:১৯১]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ..... الخ سورة المائدة

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ (منار)

কারো নামে প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কেউ দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয় এবং তাঁর অনুদানেই ঐ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে তার নামে ঐ প্রতিষ্ঠানের নামকরন করলে সুন্নাতের খেলাফ হবে কি?

জবাবঃ প্রত্যেকটি ধর্মীয় বা দ্বীনী কাজের সাওয়াব পেতে হলে, তাকে অবশ্যই সব ধরনের পার্থিব স্বার্থ যেমন, সুনাম অর্জন, প্রসিদ্ধি লাভ, প্রশংসিত হওয়া ইত্যাদির খারাপ নিয়্যাত থেকে নিয়্যাতকে পরিষ্কার রাখতে হবে। অন্যথায় দাতা ব্যক্তি সাওয়াবতো পাবেই না, উপরন্তু সে

গুনাহগার হবে। ব্যক্তি বিশেষের নামে মাদরাসা, মসজিদের নামকরন করা যদিও জায়িয আছে, তবুও দানকারী নিজে এরূপ বা শর্ত করতে পারে না। এছাড়াও সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ না করাই উচিত। কারন এর দ্বারা তার নফস বড় হয়ে তার অবদানের সাওয়াব নষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে।

তবে বরকতের নিয়্যতে কোন বুযুর্গের নামে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা জায়িয আছে। [প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ১:২]

কুরআনে কারীম স্মরণ না থাকা

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন হাফেজে কুরআন। ছাত্রজীবনে অনেক কষ্ট করে কুরআন হিফজ করেছি। বর্তমানে আমার কুরআন মুখস্ত থাকে না। অনেক কষ্টের পর মুখস্ত করলেও পরে ভুলে যায়। তাই কুরআন মুখস্ত থাকার জন্য রাসূলের যুগের কোন আমল আছে কিনা জানিয়ে কৃতার্থ করবেন বলে আশা করি।

জবাবঃ গুনাহের কারণে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেয়ে যায়। তাই আপনার উচিত গুনাহের কাজ সম্পূর্ন পরিত্যাগ করা এবং বেশী বেশী তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী কান্নাকাটি করা। রমাযান মাসে কষ্ট করে কুরআন মুখস্ত করে কোন মসজিদে বিনা পয়সায় আপনার খতমে তারাবীহ পড়ানো উচিত। কুরআন শরীফ মুখস্ত করে ভুলে যাওয়া খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। সুতরাং,আপনি উপরোক্ত পরামর্শ অনুযায়ী আমল করবেন বলে আশা করি। [মিশকাত ১:১৯০]

উল্লেখ্য যে, কুরআন মুখস্ত রাখার জন্য নিম্নোক্ত আমল কয়টি বিশেষ উপযোগী।

(১) প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের পর সূরা আর-রাহমানের চার আয়াত বিসমিল্লাহ সহ এগারো বার পাঠ করা। (২) প্রত্যহ ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে বাম বুকের উপর ফুঁক দেয়া। তাছাড়া মিসওয়াক করা; মধুপান করা ও প্রত্যহ খালি পেটে একুশটি কিসমিস খাওয়ার দ্বারা স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কোন কাজকে হারাম বললে

জিজ্ঞাসাঃ দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা অনেকে বলে থাকি যে, আমার জন্য এ জিনিষটা হারাম বা আমার জন্য এ কাজটা হারাম অথবা বলে থাকি, ঐ জিনিষ হারাম ও খাবোনা বা এ কাজটা হারাম ও করবোনা। এরপর যদি সেই কাজটি করি বা সেই জিনিসটা খাই, এতে কাফফারা ওয়াজিব কি না?

জবাবঃ প্রথম দু'বাক্য যেভাবে হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এভাবে হারাম শব্দের ব্যবহার দ্বারা শরী'আতের দৃষ্টিতে কসম সাব্যস্ত হয়। উদ্দিষ্ট বস্তু হালাল-হারাম, যাই হোক না কেন। যেমন, কেউ বললো, সিনেমা দেখা আমার জন্য হারাম। এরপর সে যদি কখনো সিনেমা দেখে, তাহলে সে মন্দ কাজ সিনেমা দেখার জন্য গুনাহগার তো হবেই সাথে সাথে কসম ভাঙ্গার দায়ে সে দায়ী হবে। এজন্য তাকে কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে। এমনিভাবে যদি বলে, এ জিনিসটা আমার জন্য হারাম। এরপর যদি সে তা খায়, তবে কসম ভঙ্গের দরুন কাফফারা দিতে হবে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৯৫, দুররুল মুখতার ৩:৬৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৯৩]

পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে হারাম শব্দের উল্লেখে কসম সাব্যস্ত হবে না। কারণ এর দ্বারা স্বাভাবিকাভাবে কথার দৃঢ়তা প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে এমন না বলাই উচিৎ। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৫:৪৯৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর নামের পূর্বে জনাব শব্দের ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব তাফসীরে জালালাইন শরীফে ৩০২ নং পৃষ্টার ১০ নং টীকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ শব্দটির পুর্বে জনাব শব্দ ব্যবহার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কথাটি কতটুকু সত্য?

জনাবঃ হুযুর ﷺ-এর নামের পুর্বে জনাব শব্দ ব্যবহার করলে সে কাফির হয়ে যাবে, বক্তব্যটি ভিত্তিহীন এবং বক্তা জালালাইন শরীফে ৩০২ নং পৃষ্টার ১০ নং হুশিয়ার উপর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। এ রকম অপব্যাখ্যার দ্বারা জন সাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়। কারন সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্ম হচ্ছে তোমরা হুযুর ﷺ-এর নাম ধরে ডাকবে না। যেমন ‘ইয়া মুহাম্মদ’ বলা এবং হুযুর ﷺ- এর কুনিয়ত দ্বারা ডাকবেনা। যেমন “ইয়া আবাল কাসিম” বলা। বরং হুযুর ﷺ -কে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া নাবীয়াল্লাহ, ইয়া ইমামাল মুরসালীন, ইয়া রাসূলা রাব্বিল আলামীন, ইয়া খাতামান নাবিয়্যিন ইত্যাদি বলে সম্বোধন করতে হবে। সারকথা হুযুর ﷺ-কে এমন শব্দ দ্বারা ডাকা যাবে না, যে শব্দ দ্বারা হুযুর ﷺ- এর সম্মান প্রকাশ পায় না আর জনাব শব্দ সম্মান বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। [প্রমাণঃ সূরা নূর ৬৩, সূরা হুযুরাত ২, হাশিয়ায়ে জালালাইন ২:৩০২, মাআরিফুল কুরআন ৬:৪৫৫]

অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মাঝে অনেকেই স্থানীয় কোন ক্বারী বা আলিমের নিকট থেকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করে থাকেন, কিন্তু তাজবীদ বা কুরআন তিলাওয়াতের নিয়মনীতি ও কায়দা-কানুন তাদের জানা নেই। ফলে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবুও ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। এমতাবস্থায় তাদের গুনাহ হবে কি? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

জবাবঃ তাজবীদের সাথে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা জরুরী। সুতরাং নামায সহীহ করার জন্য সূরা ফাতিহাসহ অন্ততপক্ষে পাঁচটি সূরা সহীহরূপে তিলাওয়াত শিক্ষা করা জরুরী। যারা সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না, তাদের উচিত যথাশীঘ্র নূরানী ট্রেনিং- অংশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা। মানুষকে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়ার মহান লক্ষ্যে বাংলাদেশ নূরানী তালীমুল কুরআন ওয়াকফ এস্টেট-এর পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নূরানী পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে কুরআন শিক্ষার সু-ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যাদের কুরআন তিলাওয়াত একেবারে এমন অশুদ্ধ যে, এতে অর্থ বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে তাদের জন্য সাময়িক কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ রেখে প্রথমে সহীহ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা জরুরী। [সূরা মুযযাম্মিল ৪, মিশকাত ১৯০, দুররে মুখতার ১:৬৩০]

ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل الآية

ومنها القراءة بالالحان ان غير المعنى والا لا الا فى حرف مد ولين اذا فحش والا لا بزازية الدر المختار ۰/

স্বপ্নদোষ

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তির ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হয়। তাহলে এটা দূর করার জন্য ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে কি?

জবাবঃ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করা সুন্নাত। রাসূলে আকরাম ﷺ নিজে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে চিকিৎসা গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তবে মনে এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সুস্থতা প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। ঔষধ কেবল ওসীলা হতে পারে। সুতরাং, এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসা গ্রহণে অসুবিধা নেই। বরং স্বাস্থ্য রক্ষার্থে চিকিৎসা গ্রহণ করাই উত্তম। তবে মাঝে মধ্যে এরূপ হওয়া রোগ নয়। সেক্ষেত্রে এর চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই। [আবু দাউদ ২:৫৩৯, তিরমিজী ২:২৪]

عن اسامة بن شريك قال قالت الاعراب يا رسول الله الا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الاداء واحدا فقالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم ترمذى /

নব ভূমিষ্ট সন্তান মরে গেলে তার নাম রাখা

জিজ্ঞাসাঃ সন্তান মৃত অবস্থায় জন্ম নিলে বা জন্মের পরেই মারা গেলে তার নাম রাখতে হবে কি না?

জবাবঃ সন্তান জীবিত জন্মগ্রহণ করুক বা মৃত উভয় অবস্থায় তার নাম রাখা সুন্নাত। [দুররে মুখতার ২:২২৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২০৬, নাফউল মুফতী ওয়াসসায়িল ৩৪৩, বেহেশতী যেওর ২:৫৫]

ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ويسمى (ان) استهل) (والا)

يستهل (غسل وسمى عند الثاني وهو الاصح الدر المختار ٢/٢٢٧

হায়াত বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন কোন কাজের দ্বারা মানুষের হায়াত বাড়ে? আর কোন কোন কাজের দ্বারা মূলতঃ মানুষের হায়াত হ্রাস পায়?

জবাবঃ নেক কাজ করার দ্বারা মানুষের হায়াত বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে সিলাহরাহমী তথা আত্নীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার দ্বারাও হায়াত বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে গুনাহ করার দ্বারা হায়াত হ্রাস পায়। তেমনিভাবে আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দ্বারাও হায়াত কমে যায়। তবে হায়াত বৃদ্ধি পাওয়া ও হ্রাস পাওয়া দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে, হায়াতে বরকত হওয়া বা না হওয়া। [মিশকাত শরীফ ২:৪১৯]

وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأله في اثره فليصل رحمه . متفق عليه مشكوة /

পড়ার অযোগ্য কুরআন হিফাজতের তরীকা

জিজ্ঞাসাঃ পুরাতন ছিঁড়া কুরআন শরীফ যা পড়ার অযোগ্য, তা কিভাবে হিফাজত করব?

জবাবঃ কুরআন শরীফ ছিঁড়ে যাওয়ার কারনে যদি তা পড়ার অযোগ্য হয় তাহলে তা খুব আদরের সাথে পাক কাপড়ে পেচিয়ে মায়্যিতকে দাফন করার ন্যায় দাফন করতে হবে। এটাই উত্তম পন্থা। অবশ্য যদি কেউ হিফাজতের নিয়্যতে পুড়িয়ে ফেলে, তাহলে এটাও জায়িয আছে। তবে উত্তম নয় এবং এক্ষেত্রে পুড়ানো অংশ (ছাই) গুলো কোন পাক পানিতে মিশিয়ে দিবে। [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:২২, খাইরুল ফাতাওয়া ১:২১৮]

المصحف اذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف ان يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف ان يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك ويلحد له لانه لوشق ودفن يحتاج الى اهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير الا اذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب اليه فهو حسن ايضا كذا فى الغرائب عالمگيرى /

চান্দ্র মাসের ক্যালেন্ডার

জিজ্ঞাসাঃ আমরা মুসলমান হিসাবে ইবাদতের সময় নির্ধারন করে থাকি চন্দ্র মাসের হিসাবে, অথচ চন্দ্র মাসের কোন ক্যালেন্ডার নাই। তাহলে ইসলামী মাসের আসল হিসাব কি?

জবাবঃ কুরান-হাদিসের দৃষ্টিতে ইসলামী মাসের আসল হিসাব চাঁদের দ্বারাই নির্ধারিত। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেন, "তোমার নিকট তারা জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদের বিষয়। (তাহলে) বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারন এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম।" [সূরা বাকারাহ ১৮৯]

এই আয়াত দ্বারা একথা বুঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা আমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারব, যার উপর আমাদের লেনদেন,আদান-প্রদান প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে, "অতঃপর নির্ধারিত করেছেন চাঁদের জন্য মনযিল সমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। [সূরা ইউনুসঃ ৫]

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিবর্তনের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বছর, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়। হাদীস শরীফে ও প্রিয়নবী ﷺ শরী'আতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন আহকামকে চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল করেছেন।

প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ঈদও করো না। আর যদি চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে তোমরা হিসাব ত্রিশ দিন পূর্ন করো"। [বুখারী শরীফ ১:২৫৬]

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় শরী'আতের এ সকল ইবাদত আমাদের চান্দ্র মাসের হিসাবেই পালন করতে হবে। এজন্য ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন নেই। বাজারে চাঁদের তারিখ সম্বলিত অনেক ক্যালেন্ডার পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার পর তা ঠিক থাকে না। বরং প্রত্যেক মাসের শুরুতে চাঁদ দেখে সেই হিসাবে আমরা ইসলামী বিধান পালন করব। এ জন্যই চাঁদের হিসাব রাখা ফরজে কিফায়া। [প্রমাণঃ মা'আরিফুল কুরআন ১:৪১২]

ইসলামে পালিত দত্তক বিধান

জিজ্ঞাসাঃ ইসলাম দত্তক বা পালিত পুত্রকে স্বীকৃতি দেয় কি-না?

জবাবঃ ইসলাম পালকপুত্রকে মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু কার্যত স্বীকৃতি দেয় না। হুযুর ﷺ স্বয়ং হযরত যায়িদ বিন হারেছা রা.-কে মৌলিকভাবে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পালকপুত্রের বংশধারা তার আসল পিতা থেকেই প্রমাণিত হবে এবং পালকপুত্র আপন পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকার পাবে না। এমনিভাবে পালকপুত্রের স্ত্রীর সাথে তালাকের পরে বিবাহ জায়িয হবে। কেননা, হুযুর ﷺ যায়িদ বিন হারিসার স্ত্রী হযরত যাইনাব বিনতে জাহাশ রা.-কে বিবাহ করেছিলেন। [প্রমাণঃ সূরা আহযাব, ৪-৫, জালালাইন শরীফ ২:৩৫৫,৩৫১, সিরাজী ২৭]

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ *

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

নামাযের বাহিরে কুরআন শোনা

জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানি, নামাযের ভিতরে কুরআন শুনা ওয়াজিব। কিন্তু নামাযের বাইরে তার হুকুম কি?

জবাবঃ নামাযের ভিতরে ইমামের তিলাওয়াতে কুরআন শুনা সকল উলামাদের নিকট ওয়াজিব। নামাযের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত হলে, তা শুনা ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হযরত থানভী রহ. মানুষের সুবিধার্থে নামাযের বাইরে তিলাওয়াতে কুরআন শুনা মুস্তাহাব বলেছেন। [প্রমাণঃ খাইরুল ফাতাওয়া ১:২৬০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৫৯]

কবীরা গুনাহের পর তাওবা

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি অনেক কবীরা গুনাহ করেছে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বর্তমানে তাওবা করে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার ইচ্ছা পোষণ করেছে। এমতাবস্থায় তার কিভাবে তাওবা করতে হবে এবং তার কোন কোন আমল বেশী করতে হবে।

জবাবঃ কুরান-হাদীসের পরিভাষায় তাওবা বলা হয় বিগত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং গুনাহ ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতে গুনাহ না করার ব্যাপারে অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করাকে। কোন ব্যক্তি যদি খালেস অন্তরে এভাবে তাওবা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

তবে যে সব গুনাহের কাযা আছে যেমন নামায, রোযা, যাকাত, ইত্যাদির কাযা হিসাব করে আদায় করা জরুরী।

তাওবা করার পর করনীয় কাজ হল সহীহ ঈমান নিয়ে টিকে থাকার জন্য তাবলীগ জামা'আত এর সাথে সম্পর্ক রাখা, মাঝে মাঝে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানো, হক্কাণী উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং কারো হক জিম্মায় থাকলে সেগুলো পরিশোধ করে দেয়া বা তাদের থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া। [সূরা যুমার ৫৩, মিশকাত শরীফ ১:২০৬]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

যাদের অনুকরণ জরুরী

জিজ্ঞাসাঃ রাসূল ﷺ এবং সাহাবাগনের রা. অবর্তমানে আমরা কাদের অনুসরণ করবো? উলামায়ে হক্কানী করা?

জবাবঃ রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামের অবর্তমানে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা হক্কানী উলামাগনের অনুসরণ করব। আর উলামায়ে হক্কানী তাদেরকে বলা হবে, যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত দশটি আলামত পাওয়া যাবেঃ

(১) ইলম দ্বারা দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্য থাকবে না বরং ইলম দ্বারা শুধু দ্বীনের প্রচারই তাদের উদ্দেশ্য হবে।

(২) ইলম অনুযায়ী তাদের আমল থাকতে হবে।আমল ব্যতীত ইলম অর্থহীন।

(৩) অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক ইলম থেকে বেঁচে থাকবে, ফালসাফা ইত্যাদিকে তারা মাশগালা বানাবেন না।

(৪) খানা-পিনা, পোষাক-পরিচ্ছদের ও ঘরবাড়ী ইত্যাদির ব্যাপারে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হবেন।

(৫) আমীর-উমারা এবং ধনীদের থেকে দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের ফিকির তাদের থাকবে না। তাদের নিকট তারা কখনও গেলে, শুধু দ্বীন পৌঁছানোর নিয়্যতে যাবে।

(৬) কোন মাসআলা বয়ান করার ব্যাপারে খুবই সতর্কতার সাথে বয়ান করেন। তাড়াহুরা করে উত্তর দেয়ার মনোভাব পরিহার করে থাকেন।

(৭) তাযকিয়া-আত্নশুদ্ধির ব্যাপারে খুবই ইহতিমাম করেন। তাদের অন্তরে এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। (৮) আল্লাহর উপর ঈমান ও ইয়াকীন গালেব রাখতে তারা সর্বদা তৎপর থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, বস্তু নির্ভরশীল হওয়া দুনিয়াদারদের চরিত্র।

(৯) প্রত্যেক কাজের মধ্যে আল্লাহর ভয় তাদের দিলে জাগ্রত থাকে। যে ইলম অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না, সেটা সহীহ ইলম নয়।

(১০) প্রত্যেক কাজে তারা খুঁজে খুঁজে সুন্নাতের ইত্তিবা করতে থাকেন এবং বিদ'আত থেকে কঠোরভাবে বেঁচে থাকেন। কোন অন্যায় বা অপকর্মে অভ্যস্থ হওয়ারতো প্রশ্নই উঠে না।

কোন দুষ্কর্ম কি মৃত্যুর কারণ হতে পারে?

জিজ্ঞাসাঃ আমার ছেলে ঢাকা সিটি কলেজে অধ্যায়নরত থাকা অবস্থায় একদিন তার এক আত্নীয় তাকে বলল, তুমি যখন কলেজে যাও তখন

তুমি আজিমপুর গোরস্থানে যে কোন একটা কবরে এই তাবিজ ফেলবে এবং একটা তাবীজ নদীতে ফেলবে। তখন সে বলল ঠিক আছে।

সে তাবীজ কথামত কবর ও নদীতে ফেলাতে ছেলের কোন পাপ হবে কিনা? যদি হয়, তবে মোচনের পথ কি?

এই ছেলে বড়ই খোদাভক্ত ছিল। তারপরে ১৯৯২ সনের ২৫ জুলাই তার রোগ হয় এবং সে ১৯৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী ১০ তারিখে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়। আমার মনে শুধু এ ঘটনা মনে পড়ে। এ সম্পর্কে আমাকে কোন ফায়সালা দিবেন কি?

জবাবঃ মানুষ দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী বাসিন্দা। একটি নির্দিষ্ট সময়ের হায়াত নিয়ে দুনিয়ায় আসে। আবার সেই হায়াত শেষ হয়ে গেলে, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাকে দুনিয়া ছেড়ে পরপারে যাত্রা করতে হয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা যেখানেই থাক, নির্দিষ্ট সময়ের মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করবেই। যদি তোমরা নিচ্ছিদ্র ও দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যেও অবস্থান কর"। [সূরা নিসাঃ ৭৮]

এ চিরাচরিত শাশ্বত বিধান মতে আপনার ছেলেকেও এই জগত ত্যাগ করে মহান মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তার হায়াত শেষ হয়েছে ,এটাই তার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। সুতরাং, অন্য কোন কারণ খুঁজে আস্থির হওয়া আপনার মোটেও উচিত নয়। মানুষ ভুল-ভ্রান্তি করলেও তার শেষ অবস্থার উপরই তার পরকালের ফলাফল অনেকটা নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্নিত হয়েছে, "মানুষের সমুদয় কর্মকাণ্ড তার শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আপনার ছেলে শেষ হায়াতে খোদাভীরু ও দ্বীনদার আবস্থায় কাটিয়ে থাকলে, তার পরকাল সুখের হবে। এটাই আশা করা যায়। তাবীজের

ব্যাপারে সে যা করেছে, তাতে বে-আদবী বা অপরাধমূলক কোন কিছু দেখা যায় না। তথাপি তাওবা ও অনুশোচনা দ্বারা আল্লাহ্ পাক হয়ত তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আপনার উচিত, তার জন্য কোন দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতা প্রকাশ না করে মহান আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং তার জন্য দু'আ ও দান করা। [সূরা নিসাঃ আয়াত ৭৮]

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ

ইবলিশের বেহেস্তে প্রবেশ করা ও ময়ূর পাখা ঘরে রাখা

জিজ্ঞাসাঃ ইবলিশকে বেহেশতে প্রবেশ করানোর জন্য ময়ূর নাকি সাহায্য করেছিল? একথা ঠিক কিনা? যদি সত্য হয়, তাহলে ময়ূরের পাখা ঘরে রাখা কি ঠিক?

জবাবঃ শয়তান আদৌ বেহেশতে প্রবেশ করেছিল কিনা বা করে থাকলে কিভাবে প্রবেশ করেছিল, বেহেশতে নিজে নিজে প্রবেশ করেছে নাকি ময়ূর বা সাপের সাহায্যে প্রবেশ করেছে, এ ধরনের বিভিন্ন রকমের কথা রয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য কোন রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কীয় বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং, এগুলো নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন। ইসলাম যেহেতু সৌন্দর্যকে সমর্থন করে, তাই সৌন্দর্যের জন্য ময়ূরের পাখা ঘরে রাখা জায়িয আছে। [প্রমাণঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ১:১৩৪, তাফসীরে মাজহারী ১:৫৭, ক্বাছাছুল কুরআন (বাংলা) ২৮:২৯]

হস্তমৈথুন বৈধ কিনা?

জিজ্ঞাসাঃ একটি দ্বীনী পত্রিকায় জানতে পারলাম, হস্তমৈথুনকারী স্বীয় হাতে গর্ভাবস্থা নিয়ে হাশরের দ্বীন উঠবে ইত্যাদি, এখন আমার প্রশ্ন হল- (১) হস্তমৈথুন এমন একটি আপরাধ যার শাস্তি কঠোর, তারপরও

আমাদের দেশের ডাক্তারী পত্রিকা যেমন প্রেসক্রিপশন ও আজকের স্বাস্থ্য পত্রিকার ডাক্তাররা সপ্তাহে দু'বার হস্তমৈথুন করার নির্দেশ দিচ্ছে। এমতাবস্থায় দেশের আলিমগন সেই পত্রিকার বিরোধিতা করছেন না কেন?

জবাবঃ হস্তমৈথুন হারাম ও লা'নতের যোগ্য পাপ। যারা এ রকম করে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে রহমতের নজর করবেন না এবং তাদের আংগুলগুলো গর্ভবতী হবে এবং তারা চরম অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। ডাক্তাররা যৌন শক্তি বজায় রাখার জন্য বা প্রবৃত্তি পুরা করার জন্য হস্তমৈথুনের পরামর্শ দিচ্ছে, এটা তাদের অজ্ঞতার কারণে। দ্বীনের সঠিক ইলমের অভাবে তারা এ ধরনের ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উচিত রোযা রাখা। কারণ- রোযা প্রবৃত্তি দমনের উত্তম পন্থা। হক্কানী উলামায়ে কিরাম সাধ্যমত হক ও সঠিক কথা বলেই যাচ্ছেন। তাতে তাঁরা কার্পণ্য করেননি বা কোন বাতিল শক্তিকে ভয় করেননি। তবে এ ধরনের অনেক তথ্য উলামাগনের গোচারিভূত হয় না। ডাক্তারদের করনীয় হচ্ছে, উলামাগনের সাথে সম্পর্ক দ্বীনের সঠিক ইলম অর্জন করে মানুষদেরকে সঠিক পথের পরামর্শ দেয়া। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:১০৯, ফাতহুল কাদীর ২:২০৬, হিদায়া ১:২১৭, ইনায়া ২:২০৬]

জোড় ফল খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমরা শুনেছি জোড় কলা খেলে নাকি জমজ সন্তান হয়। কথাটি কতটুকু সত্য।

জবাবঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কথা সম্পূর্ন ভিত্তিহীন, ঈমান-আকীদা ও শরী'আত পরিপন্থী কথা। এ ধরনের কথা বললে বা বিশ্বাস করলে মারাত্মক গুনাহ হবে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ৩৯১]

নবী ﷺ-এর শরীরে ছায়া থাকা

জিজ্ঞাসাঃ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীরে ছায়া ছিল কিনা?

জবাবঃ নবী করীম ﷺ-এর শরীর মুবারকের ছায়া ছিল বলে হাদীস গ্রন্থাদিতে প্রমান পাওয়া যায়। হুযুর ﷺ তো সৃষ্টিগত মানুষই ছিলেন, তার পবিত্র শরীরের ছায়া না হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১:১০৯, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৩:৩৩৮, ৫:২৩১, মুস্তাদরাক ৪:৪৫৬, ১:৫৩৪, খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৩৩]

পড়া মনে থাকার গুরুত্বপূর্ন পরামর্শ

জিজ্ঞাসাঃ আমি যখন বই ও কিতাব পড়ি, তখন অনেক কষ্টে মুখস্ত করি, কিন্তু দু'এক দিনেই ভুলে যাই। এমনকি একেবারে বলতেই পারি না, কি করলে মুখস্ত থাকবে?

জবাবঃ পড়া মনে থাকার জন্য আপনাকে তিনটি কাজ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছেঃ

(এক) স্মরণশক্তি লোপ পায়, এমন কাজ থেকে বিরত থাকবেন। বিশেষ করে গুনাহের কারনে স্মরণশক্তি লোপ পেয়ে থাকে। তাই সকল প্রকার গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে।

(দুই) স্মরণশক্তি বাড়ার জন্য তদবির-চিকিৎসা করবেন।

(তিন) পড়ার সময় বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলবেন। এতে আশা করি, পড়া মনে থাকবে। উল্লেখিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশ্লেষণ করছি।

(এক) স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার কারনসমূহঃ

১। গুনাহ করা। ২। অধিক হাসি-ঠাট্টা করা। ৩। কবরের সম্মুখে হাসা। ৪। ইস্তিঞ্জার স্থানে উযু করা। ৫। মসজিদে নিয়মের উল্টো অর্থাৎ বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং ডান পা দিয়ে বের হওয়া। ৬। লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো। ৭। দুনিয়ার জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকা। ৮। দুনিয়ার কাজ-কর্মের মধ্যে অধিক লিপ্ত থাকা। ৯। গোসল ফরয হওয়ার পর আসমানের দিকে তাকানো। ১০। রাস্তার মধ্যে পস্রাব করা। ১১। ফলদার বৃক্ষের নীচে পস্রাব করা বা আবদ্ধ পানিতে পস্রাব করা ইত্যাদি। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:২২৫]

(দুই) স্মরণশক্তি বাড়ার জন্য তদবীর

(ক) স্মরণশক্তি বাড়ার জন্য দু'ধরনের কাজ করতে পারেনঃ (ক) দু'আ কালাম পড়া যেমন, প্রতিদিন ফজরের পর রাব্বিশ রাহলি.....। (১৬ পারার সূরা ত্বোহার ২৫-২৮ নং মোট ৪ আয়াত ২১ বার পড়বেন।) যখন বই/কিতাব পড়া শুরু করবেন, তখন এ আয়াতগুলো কয়েকবার পড়ে নিবেন।

(খ) স্মরণশক্তি বাড়ার জন্য ডাক্তারী চিকিৎসা করা, হোমিওপ্যাথিতে 'anacardiam' (আনাকার্ডিয়াম) ৩০ শক্তি প্রতিদিন ১ ফোঁটা করে পানির সাথে মিশিয়ে খেলেও স্মরণশক্তি বাড়ে বা হেকিমী ঔষুধ-খামিরায়ে গাওযবান যাওয়াহের ওয়ালা খাবেন।

(তিন) পড়ার সময় যে সব নিয়ম খেয়াল রাখা উচিতঃ (১) রুটিন মাফিক নিয়মিত পড়া। নিয়ম বিহীন পড়ার দ্বারা ক্ষতি বেশী। পড়ার সময় কোন অন্য ফিকির না করা। যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে সুস্থ মন নিয়ে পড়তে চেষ্টা করা। সামনের ক্লাসের পড়াটা একবার দেখে ক্লাসে যাবেন।

(২) যে অধ্যায় পড়বেন, সে অধ্যায় কয়েকবার পড়ে তার মূল কথা কয়েকটা পয়েন্ট করে শুধুমাত্র পয়েন্টগুলো ভাল করে মুখস্ত করবেন এবং খাতায় লিখবেন। একবার মুখস্ত করার পরবর্তীতে পড়ার সময়ে পয়েন্টগুলো মনে করার চেষ্টা করবেন। আপনার পড়ার সাথীকে বা বন্ধুকে পয়েন্টগুলো বলবেন এবং আবার তার কাছ থেকে শুনবেন। এভাবে কয়েকবার পড়বেন। আশা করা যায়, এতে ভাল মুখস্ত হবে এবং মনে থাকবে।

চক্ষু, রক্ত ইত্যাদি দান করা

জিজ্ঞাসাঃ মানুষের চক্ষু, রক্ত ও অন্যান্য অঙ্গ দান বা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়িয আছে কিনা? আজকাল মরণোত্তর চক্ষুদান দ্বারা সমাজের অন্ধ মানুষের অনেক কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা কতটুকু বৈধ? দলীল-প্রমানসহ জানতে চাই।

জবাবঃ কোন কিছুর প্রচলন ব্যাপক হওয়া তা জায়িয হওয়ার দলীল নয়। যেমন, সুদ, ঘুষ, ও ব্যভিচার ও যামানায় ব্যাপক হয়ে গিয়েছে তাই বলে এ সবকে জায়িয বলা যায় না। তেমনি কোন কিছুর মধ্যে ফায়দা থাকলেই তা জায়িয হয় না। যেমন, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, ইত্যাদির মধ্যে ফায়দা দেখা গেলেও এর কোনটাই জায়িয নয়। উল্লেখিত বিষয়টির অবস্থাও তাই। যদিও বর্তমানে মরণোত্তর চক্ষুদান সর্বস্তরে ব্যাপকতা লাভ করেছে। কিন্তু শরী'আতের দৃষ্টিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হল, চক্ষু বা (রক্ত ব্যতিত) শরীরের যে কোন অঙ্গ দানের অসীয়ত করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম ও নাজায়িয।

দলীলসমূহঃ

(ক) আল্লাহ পাক বলেন, "আমি (সমগ্র জীবের মধ্যে) মানব জাতিকে (সবচেয়ে) সম্মানী করে সৃষ্টি করেছি"। (সূরা বাণী-ইসরাঈল ৭০) "পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি জীবই মানুষের খাদিম হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তৈরি করেছেন"। (সূরা বাক্বারা)। সুতরাং, অন্য জিনিস-পত্রের ন্যায় মানব অঙ্গের লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় মানব জাতির সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী।

(খ) আল্লাহ পাক মানুষের অঙ্গসমূহকে তাদের উপকারার্থে তাদের নিকট আমানত হিসাবে দিয়ে নির্ধারিত ক্ষেত্র সমূহে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। মানুষ সে সবের প্রকৃত মালিক নয়। এ কারনেই আত্মহত্যা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত ক্ষুধা বা পিপাসার সময় মৃত জানোয়ার অথবা যে কোন হারাম জিনিষ দ্বারা হলেও প্রান রক্ষা করা ওয়াজিব করা হয়েছে। তাই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেচা-কেনা বা দান করার কোনই অধিকার তার নাই। কারন, বেচা-কেনা ও দানের জন্য মালিকানা জরুরী।

(গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, " মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে দেয়া জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার সমান অপরাধ"। (আবু দাউদ শরীফ)। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি জীবিতের ন্যায় কষ্ট অনুভব করে। যদিও প্রকাশ করতে পারে না। আর এর দ্বারা জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির অসন্মানী করা হয়। (মিশকাত)

(ঘ) হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর ﷺ -এর হিজরতের সময় তুফাইন বিন আমর দাউসী রা. হিজরত করেন এবং তার সাথে তার গোত্রের এক ব্যক্তিও হিজরত করেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় অধৈর্য্য হয়ে ছুরি দ্বারা নিজ আঙ্গুল কেটে ফেলেন। ফলে অধিক রক্তক্ষরণ হয়ে লোকটি মারা যান। তুফাইল রা. স্বপ্নে তার সাক্ষাৎ লাভ করে তার হাত আবৃত অবস্তায় দেখতে পান। তখন তুফাইল রা. জিজ্ঞাসা করলেন,

আল্লাহ্ পাক আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, হিজরতের কারনে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

অতঃপর তুফায়েল রা. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হাত আবৃত কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছে, যে অঙ্গ তুমি নষ্ট করে এসেছ, সেই অঙ্গ আমি দুরস্ত করে দেব না। তুফাইল রা. হুযুর ﷺ -এর দরবারে ঘটনা আরজ করলেন। হুযুর ﷺ দু'আ করলেন, হে খোদা! হাতের ব্যাপারে তাকে ক্ষমা করো। (মুসলিম শরীফ)

(ঙ) ফাতওয়ার কিতাবে বর্নিত আছে, "মানুষের চুল বিক্রয় করা নাজায়িয এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়াও নাজায়িয। কারন মানুষ সম্মানিত"। (হিদায়া,শামী আলমগীরী) তবে স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। শরী'আতের দৃষ্টিতে রক্তদান করা জায়িয। দুধের সাথে সাদৃশ্য হওয়াই রক্তদানের বৈধতার কারন। তাই মাতা যেমন অন্যের সন্তানকে দুধপান করাতে পারেন, তেমনি কোন ব্যক্তি ঠেকার সময় তার রক্ত অন্যকে দান করতে পারেন। কিন্তু রক্তের বিনিময় গ্রহণ করা হারাম। কারন- রক্ত বিনিময়যোগ্য মাল নয়। (জাওয়াহির)

শরী'আতের বিধি-নিষেধে সংকটের কোনই কারন নেই। কারণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ যদি মানব অঙ্গের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জড় পদার্থ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রানী নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে তা থেকে ইস্পৃত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। আর তা মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়া সম্পুর্ন শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে হতে পারে। প্রমান স্বরূপ প্লাষ্টিকের বৈজ্ঞানিক সংস্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। যা দ্বারা মানুষ বর্তমানে অনেক উপকৃত হচ্ছে। তেমনিভাবে বিভিন্ন প্রাণীর নানা প্রকার অঙ্গ দ্বারা উপকার লাভ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু যদি শরী'আতের এ বিধানের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হয় তাহলে সে দিন আর বেশী দূরে নয়, যে দিন সুস্থ-সবল ব্যক্তির কিডনী, চক্ষু ইত্যাদি অপর মানুষের শোভা বর্ধনে লাগানো হবে, গরীবদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধনীদের কাছে বিক্রি হবে এবং পর্যায়ক্রমে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লুণ্ঠন বা হাইজ্যাক হওয়াও বিচিত্র নয়। বরং বর্তমানে পত্র-পত্রিকা এসব আশংকাকে বাস্তব বলে প্রমান করেছেন। দুর্বৃত্তরা ইদানিং সুস্থ-সবল লোকদের ধরে সমুদ্রবক্ষে নিয়ে তাদের শরীরের দামী অংশ নিয়ে দেহের অবশিষ্টাংশ সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। এরূপ ঘটনা পত্রিকায় অনেক ছাপা হয়েছে।

হিন্দু কর্তৃক অনুদিত কুরআন শরীফ পড়া

জিজ্ঞাসাঃ কুরআন শরীফ সর্বপ্রথম বাংলা অনুবাদ করেছেন একজন হিন্দু লোক। এর দ্বারা তিনি কি কোন সাওয়াবের অধিকারী হবেন? তার অনুদিত কুরআন শরীফ আমাদের পড়া ঠিক হবে কি?

জবাবঃ কুরআন পাকের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদকারী হিসাবে "গিরিশ চন্দ্র সেন" এর নাম উল্লেখিত হলেও তিনি আসলে প্রথম বঙ্গানুবাদকারী নন। বরং প্রচুর সংখ্যক ধর্মীয় বই পত্রের অনুবাদক কলিকাতাবাসী মাওলানা আব্বাস আলী রহ. সর্বপ্রথম সম্পূর্ন কুরআন পাকের বাংলা অনুবাদ করেন। কোন ধর্মীয় কাজের পুণ্য লাভ করতে হলে, তার জন্য পূর্বশর্ত হল-ঈমান আনয়ন করা। ঈমান ছাড়া যত নেক কাজই করা হোক না কেন, তার কোন প্রতিদান আখিরাতে দেয়া হবে না। তবে দুনিয়ার বুকে সে মাল-দৌলত ও আরাম-আয়েশের দিক দিয়ে কিছু প্রতিদান পেতে পারে। এক্ষেত্রে গিরিশ চন্দ্রের ইসলাম গ্রহনের কোন প্রমান পাওয়া যায় না। কাজেই তিনি সাওয়াবের অধিকারী হবেন না। আর তার অনুদিত কুরআন শরীফ পড়াও কোন ফায়দা আশা করা যায় না।

কারন-কুরআনের তরজমা বা তাফসীর কোন মামুলী ব্যাপার নয়। এর জন্য সুনির্দিষ্ট পনেরটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান হাসিল করা জরুরী। ঐ জ্ঞানসমূহ হাসিল করা ব্যতীত তরজমা–তাফসীর করার কারো কোন অধিকার নেই এবং ঐ ধরনের লোকের কৃত তরজমা বা তাফসীর পড়াও জায়িয নয়। গিরিশ চন্দ্র সম্ভবতঃ ঐ পনেরটি বিষয়ের নামও জানতেন না। কাজেই তার তরজমাকে কুরআনের সহীহ তরজমা বলা যায় না। সুতরাং এমন লোক, যারা কুরআনের সহীহ তরজমা জানেন না, তাদের জন্য ঐ তরজমা পড়া জায়িয হবে না। কারন তাতে হিতে বিপরীত হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। [প্রমাণঃ আল কুরআন মাওলানা আবু তাহির ১:১০]

পরীক্ষার ফি উদ্ধৃত্ত টাকার ব্যাবহার

জিজ্ঞাসাঃ পরীক্ষার জন্য মাদরাসায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে ফি বা চাঁদা নেয়া হয়, তা পরীক্ষার খরচ বাদ দিয়েও যদি কিছু বেঁচে যায় তবে তা কোন খাতে খরচ করতে হবে? উক্ত টাকা ষ্টাফগণ কি ব্যবহার করতে পারেন?

জবাবঃ পরীক্ষার জন্য যে ফি নেয়া হয়, তা পরীক্ষার জন্য খরচ করার পর কিছু উদ্ধৃত্ত হলে, তা মাদরাসার অন্য যে কোন খাতে ব্যয় করা যায়। কারন পরীক্ষার ফি মাদরাসার সাধারণ ফাণ্ডের আয়ের মধ্যে শামিল। তাই সাধারণ ফাণ্ডের সব খাতেই তা ব্যবহার করা যাবে।

ক্লাশে অনুপস্থিতির জরিমানা

জিজ্ঞাসাঃ অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা নেয়া জায়িয আছে কিনা?

জবাবঃ অনুপস্থিতির কারনে আর্থিক জরিমানা আদায় করা জায়িয নয়। তবে যদি এরূপ আইন থাকে যে, অনুপস্থিত থাকলে, জরিমানা দিতে হবে, তাহলে ছাত্রের সংশোধন হওয়ার পর বৎসরের শেষে তার জরিমানার

টাকা তাকে ফেরত দিয়ে দিবে। উল্লেখিত নিয়মে জরিমানা জায়িয হবে। জরিমানার বিকল্প হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ অনুপস্থিতির কারনে ভর্তি বাতিল করে দেওয়া যেতে পারে। অতঃপর ভর্তি হতে চাইলে নির্ধারিত ফিস দিয়ে ভর্তি হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:১৯৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৫৩৬-৫৪২]

সংক্ষিপ্ত নাম রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে অনেক নামের অংশ হিসাবে ইংরেজী অক্ষর ব্যবহার করেন যেমন, এম এ ফারুক। আবার অনেকে 'মুহাম্মদ' শব্দকে 'মোঃ' লিখে থাকেন। আবার অনেকে নামকে পরিষ্কারভাবে দুই তিন অংশ করে লেখেন, যেমন-মুহাম্মদ উল্লাহ, আনওয়ার-উল-ইসলাম ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ এমন বাংলা নাম রাখেন, যা শুনলে বুঝাই দুস্কর যে, লোকটি কোন ধর্মের, যেমন, কুসুম, দুলাল, চাঁদ, বাবু, মানিক, সেন্টু, মন্টু ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

জবাবঃ হাদীস শরীফে এসেছে, " তোমাদের কারো সন্তান হলে, তার জন্য সুন্দর নাম রাখ"। [মিশকাত ২:৪০৮]

সুন্দর নাম কাকে বলে, তা অপর এক হাদীসে এসেছে-" আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান সবচেয়ে সুন্দর নাম"। [বুখারী ২:৯১৪, মিশকাত ২:৪০৭]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর নামের শুরুতে আব্দ শব্দ যোগ করে নাম রাখা সবচেয়ে উত্তম। তারপর নবী-ওলীদের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা ভাল।

নাম সুন্দর রাখার একটা বড় ফায়িদা এই যে, নামের একটা প্রভাব প্রতিক্রিয়া সন্তানের উপর পড়ে। ভাল নাম হলে তার চরিত্রও ভাল হয় এবং নাম খারাপ হলে, তার চরিত্রের উপরও এর খারাপ প্রভাব পড়ে।

ইংরেজী নাম বা নামের সাথে ইংরেজী অক্ষর যোগ করলে, এটা আর ভাল নাম থাকে না। কারন, হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে তার নিজের নামের সাথে ডাকা হবে। [মিশকাত ২:৪০৮] যাদের নামের সাথে ইংরেজী যোগ আছে, তখন তারা শরী'আতের বরখেলাপ করার দরুন তখন কত লজ্জিত হবেন এবং এ ধরনের ইংরেজী নামের কারনে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কতটুকু নারাজ হবেন, তা বলা বাহুল্য। নামের সাথে ইংরেজী অক্ষর যোগ করা বা কথায় কথায় বিনা দরকারে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা এবং ইংরেজদের মত বেশ-ভূষা ইখতিয়ার করা, এসবই ইংরেজ প্রীতির বহিঃপ্রকাশ, যা কোন মুসলমানের জন্য সাজে না। কারন, নবী করীম ﷺ ইংরেজ তথা ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও বিধর্মীদের রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচারন করতে বলেছেন এবং তাদেরকে অনুকরন ও অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "তোমরা (চাল-চলন ও কথা- বার্তায়) ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধাচারন কর"। [মুসলিম শরীফ ১:১২৮; কানযুল উম্মাল ৭:৫৩৫] সুতরাং, মুসলমানদের ঈমানের দাবী অনুযায়ী এ প্রবণতা পরিত্যাগ করে ইসলামী নাম রাখা ও ব্যবহার করা উচিত।

"মুহাম্মদ" নামটি আমাদের নবী করীম ﷺ- এর নাম। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক খায়ের ও বরকতের নিয়্যতে নিজের নামের সাথে তা মিলিয়ে রাখে। কিন্তু নামটি সংক্ষেপ করতে গেলে অর্থবিহীন বা অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। এ কারনে এটা নামের সাথে রাখতে হলে, পূর্নভাবে লিখতে হবে। আর যদি কেউ এটা নামের সাথে না রাখতে চায়, তাদের জন্য না রাখার অনুমতি আছে।

আর বর্তমানে যেভাবে নাম লেখার প্রচলন শুরু হয়েছে, আরবী গ্রামার হিসাবে এটা সম্পূর্ন ভুল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গুনাহের আশংকা আছে।

যেমন, সহীহ হলোঃ "মুহাম্মদুল্লাহ"। এটা আলাদাভাবে লিখতে হয়, মুহাম্মদ আল্লাহ। উল্লাহ আরবী ভাষায় গ্রামার হিসাবে কোন ভাবেই সহীহ হতে পারে না। বরং আল্লাহর নাম বিগড়ানোর শামিল। দ্বিতীয় নামটি সহীহভাবে লিখলে হবে, আনওয়ারুল ইসলাম। এটা পৃথক করে লিখলে হবে আনওয়ার-আল-ইসলাম। উল ইসলাম কোন ভাবেই শুদ্ধ হবে না। আমরা একদিকে আধুনিকতার পাগল, অন্যদিকে, আরবী গ্রামার সম্বন্ধে ভাল ধারণা নেই। যে কারনে মারাত্নক ভুলসমূহে সমাজে চালু হয়ে গেছে।

বর্তমান যামানার আরেক প্রবণতা হচ্ছে, বাংলা নাম রাখা। যেমন, বিপ্লব, সংগ্রাম, শুভ রহমান ইত্যাদি। এ সমস্ত নাম ও 'হাদীসে যে ভাল নাম রাখতে বলা হয়েছে তার মধ্যে পড়ে না'। সুতরাং, সে সব পিতাকে এ ধরনের নাম রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে জওয়াবদিহী করতে হবে। কোন হিন্দু বা অমুসলিম মুসলমানদের খুশী করার জন্য তাদের নিয়ম-নীতির মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটাতে রাজী নয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ঈমান আমলের কদর না থাকায় এবং দ্বীনী গায়রত না থাকায় তারা নিজেকে অসাম্প্রদায়িক বা অতি বাঙ্গালী প্রমান করার এ ধরনের খিচুরী মার্কা নামের প্রথা চালু করেছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা অশোভনীয় ও বর্জনীয়। [প্রমাণঃ মিশকাত ২:৪০৭]

মৌলবাদ শব্দের অর্থ

জিজ্ঞাসাঃ 'মৌলবাদ' শব্দের অর্থ কি? মৌলবাদী কারা? এক শ্রেণীর লোক মৌলবাদ শব্দকে গালী হিসাবে ব্যবহার করছে, তার তাৎপর্য কি?

জবাবঃ 'মৌলবাদ' শব্দের অর্থ কোন ধর্মের মূলভিত্তি ও আদর্শকে নিগুঢ় অনুসন্ধান করে তা যথানুরূপ অনুসরণে সচেষ্ট হওয়া। যারা সচেষ্ট হয়, তাদেরকে বলে 'মৌলবাদী'। যদি সেই অনুসৃত ধর্ম ইসলাম হয়, তবে

বলা হয় ‘মুসলিম মৌলবাদী’। যদি খৃষ্টান হয়, তবে খৃষ্টান মৌলবাদী। এরূপ ইয়াহুদী মৌলবাদী, হিন্দু মৌলবাদী, মুশরিক মৌলবাদী প্রভৃতি। তবে ‘মুসলিম মৌলবাদী’ ব্যতিত অন্য সকল মৌলবাদী পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী। কারণ মুশরিকদের নিকট কোন আসমানী কিতাব নেই। আর ইয়াহুদ-নাসারাদের নিকট আসমানী কিতাব থাকলেও তারা নিজেরা তা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

শিকড় হচ্ছে গাছের আহার সংগ্রাহক মূল অংশ। শিকড় যত দিন বেঁচে থাকে, ততদিন গোটা গাছ বেঁচে থাকে। শিকড় না বাঁচলে, গাছ বাঁচে না। গাছের শাখা-প্রশাখা আর পত্র-পল্লবের সব বাহাদুরীর তখন মৃত্যু ঘটে। তদ্রুপভাবে মৌলবাদীরা হচ্ছেন আদর্শের মূল শিকড় বা ধর্মকে কঠোরভাবে ধারনকারী। মুসলিম মৌলবাদী বলতে সহীহ ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের মূল ও প্রকৃত দলকেই বুঝায়। তাদের ধর্মীয় আকায়িদ এমন, যা ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পর্যন্ত কামনা করা যায় না। ইসলামের মূল ধরে থাকার কারনে তারা মৌলবাদী খিতাবের অধিকারী। তাদের মৌল ঈমান রয়েছে লা-শরীক আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি, রাসূলগনের প্রতি, পরকালের প্রতি, তাকদীরের প্রতি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি। তাছাড়াও ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম তারা যথাযথ পালন করে। শরী‘আতের পূর্ন পাবন্দী ছাড়া মৌলবাদী মুসলমান হওয়া যায় না। নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও যাদের আমল নড়বড়ে, নামায মন চাইলে পড়ে বা পড়ে না, রোযা ইচ্ছা হলে রাখে বা রাখে না, মাঝে মাঝে ইসলামের জন্য উৎসাহিত হয়ে যায়, আবার অন্য সময় বিধর্মী-বেদ্বীনদের অনুসরণ- অনুকরণেও তৎপর। তারা কখনো মৌলবাদী হতে পারে না। মৌলবাদী মুসলমান অর্থ খাটি প্রকৃত মুসলমান ধর্মের জন্য যাদের

সবকিছু। আর অমৌলবাদী মুসলমান অর্থ সুযোগ সন্ধানী নড়বড়ে মুসলমান। মৌলবাদী মুসলমানদের জন্য পরকালীন নাজাত সুনিশ্চিত। কিন্তু অমৌলবাদী মুসলমান নাজাত পেতে চাইলে তাদের মৌলবাদী মুসলমান হতে হবে। অন্যথায় তাদের নাজাত সুদূর পরাহত।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদেরকে মূল থেকে সরানোর চক্রান্ত করে 'মৌলবাদী' শব্দটি বিধর্মী শত্রুরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গালি হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃত ধর্মপালনকে ব্যঙ্গরূপে 'মৌলবাদ' আখ্যা দিয়ে মানুষের অন্তরে এ শব্দটির প্রতি ঘৃণা জন্মানোর গভীর ষড়যন্ত্রে তাঁরা লিপ্ত। যাতে এ শব্দটির প্রয়োগ থেকে বাঁচতে গিয়ে মুসলমান ধর্ম-কর্ম ভাগ করে ফেলে, (নাউযুবিল্লাহ)। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে 'মৌলবাদ' শব্দের প্রথম প্রচারক হলো, বি.বি.সি ও ভয়েস অব আমেরিকা। এ প্রচার মাধ্যম দু'টি কোন দেশের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রনাধীন হওয়ার কারনে খৃষ্টান জগতের ফাণ্ডামেনটালিজম বা মৌলবাদ শব্দটি তাদের কাছে পরিচিত।

বর্তমানে এর দ্বারা তারা বিশেষ মতের অনুসারী লোকদের গালি দিয়ে থাকে। কিন্তু শব্দের অর্থের সাথে তাদের এ গালির কনোই মিল নেই। কারন, মুসলমানদেরকে এ শব্দ দ্বারা গালি দেয়া হতে পারে না। দিলে গালি হয় না, বরং প্রশংসা হয়। যেমন, কাউকে 'নীতিবাদী' বললে গালি হয় না, বরং প্রশংসা হয়। অবশ্য কোন অমুসলিমদের ব্যাপারে এ শব্দ ব্যবহার করলে, তা শব্দের অবাস্তব প্রয়োগ হবে। যেমন- চোরকে 'সাধু' বলা।

মোদ্দাকথা, 'মৌলবাদ' বা 'মৌলবাদী' কোন গালির শব্দ নয়। তা হচ্ছে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা। বস্তুত আমাদের দেশের যারা মৌলবাদী শব্দদ্বয় গালি হিসাবে ব্যবহার করছে, তারা আসলে বে-ওয়াকুফ, মৌলবাদের অর্থই জানে না। তারা যদি মৌলবাদের প্রকৃত অর্থ জানতো, তাহলে তারা

কখনও ভুলেও ঐ সম্মানজনক শব্দ দ্বারা কাউকে ঘায়েল করতে ব্যর্থ চেষ্টা করতো না। বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় যে, মৌলবাদী হওয়াটা যখন বিশ্বে খাটি ও নিখুঁত হওয়ার সার্টিফিকেট হিসাবে বিবেচিত, তখন বাংলাদেশে এক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী মুলুকের ভক্ত লোকেরা মুসলিম বিদ্বেষীদের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে মৌলবাদের অর্থ না বুঝে ইসলামের মৌলনীতির অনুসারীদের 'মৌলবাদী' বলে গালি দিচ্ছে। আর এর মাধ্যমে তারা বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জন ব্যাপৃত। দেশের আদর্শের স্বার্থে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের স্বার্থে তাদের এ জাতীয় বোকামীর কাণ্ড ছেড়ে দেয়া উচিত।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার জবাবে অসুস্থ ব্যক্তিরও ভাল আছি বলা

জিজ্ঞাসাঃ বাংলা বেহেস্তী জেওরের সপ্তম খণ্ডের ৩৭৩ পৃষ্ঠায় ৯৫ নং হাদীসে এবং দাকায়িকুল আখবারের ৪১নং পৃষ্ঠায় বর্নিত হাদীসের সারমর্ম এই, মুসলমানদের দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ ও শোক- তাপ প্রভৃতিতে ধৈর্যধারণ করতে পারলে, গুনাহ মাফ হয় ও পরকালে অনেক উচ্চ মর্যাদা পাওয়া যায়। এখন আমার জিজ্ঞাসা, আমি প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকি। অতএব, এমতাবস্থায় যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার শরীর কেমন? আমি বললাম, বেশী ভাল না। তবে কি আমি অধৈর্যধারণকারীর অন্তুর্ভুক্ত গণ্য হব? আর যদি বলি ভাল আছি। তবে কি আমি মিথ্যাবাদি হবো?

জবাবঃ আপনার অসুখ থাকা অবস্থায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার শরীর কেমন? উত্তরে যদি আপনি বলেন যে, বেশী ভাল না, তাহলেও আপনি ধৈর্যধারণকারীর মধ্যে গণ্য হবেন। কারন, এখানে আসল অবস্থাটা আপনি বলে দিচ্ছেন। যাতে করে ঐ ব্যক্তি আপনার সুস্থতার ব্যাপারে কোন পরামর্শ দিতে পারে বা আপনার সুস্থতার জন্য

আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে। তবে আপনার অন্তরে সব সময় অসুখে গুনাহ মাফ ও রহমত প্রাপ্তির সান্ত্বনা এবং আপনি এজন্য কোন সময় হা-হুতাশ করবেন না। এটাই আপনার ধৈর্যের প্রমাণ। মোদ্দাকথা, শরীরের বাস্তব অবস্থা বলার কারনে আপনি ধৈর্যশীলদের কাতার থেকে খারিজ হবেন না। হ্যাঁ, অসুস্থতার কারনে যদি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ করেন, তাহলে ধৈর্যশীলদের কাতার থেকে খারিজ হয়ে যাবেন। মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকর আদায় করা। আর যদি আপনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, মোটামুটি ভালই আছি। তবুও আপনি মিথ্যাবাদী হবেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এর চেয়েও মারাত্মক অসুখ দিতে পারতেন। সেই তুলনায় আপনি নিশ্চয়ই ভাল আছেন। অতএব, এ কথাটা মিথ্যা নয়।

কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে চরমপন্থী বলা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কেউ কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে চরমপন্থী বলে উল্লেখ করে, তাহলে কোন অন্যায় হবে কি-না?

জবাবঃ কোন মুসলমানকে গালি দেয়া বা চরমপন্থি বলে উল্লেখ করা বা এ ধরনের কোন শব্দ বলে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া জায়িয নয়।

সুতরাং, কাশ্মীরের মুসলমানরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যদি জিহাদ করেন, তাহলে তাদেরকে চরমপন্থি বলে গালি দেয়া জায়িয হবে না। তদুপরি তারা ক্ষমতা দখল করার জন্য সংগ্রাম করছে বলে ধারনা করা যাচ্ছে না। বরং তাদের অবস্থা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছে। সুতরাং, তাদের চরমপন্থি বলে গালি দেয়া সঠিক হবে না।

অতএব, গালি দিয়ে থাকলে আল্লাহর নিকট তাওবা করে নিবে। [প্রমাণঃ দারুল উলূম (জাদীদ) ১০:২৩২]

কলবের জং পরিষ্কার করার উপায়

জিজ্ঞাসাঃ দীর্ঘদিন যাবৎ নানা অন্যায়-অত্যাচার ও পাপাচারের ফলে কলব-আত্মায় যে জং, কালিমা পরে, তা থেকে পরিত্রান পেয়ে আল্লাহর রিজামন্দী অর্জনের পন্থা কি?

জবাবঃ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর লিখিত কসদুস সাবীল-যার বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.। এ কিতাবটি গভীরভাবে পাঠ করুন এবং তার মধ্যে হক্কানী বুযুর্গের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে কোন বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। অন্ততঃ তাবলীগী জামা'আতের সাথে কিছু দিন সময় লাগান। ইনশাআল্লাহ তাতেই বেশ সফলকাম হওয়া যাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শুধু দ্বীনী কিতাব পড়ার দ্বারা ইলম আসে সত্য, তবে অনেক ক্ষেত্রে সে ইলমের উপর পরিপূর্নরূপে আমল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু হক্কানী উলামা ও বুযুর্গদের সুহবত দ্বারা ইলম ও আমল উভয়টা সহজভাবে হাসিল হয়ে যায়।

কোন বুযুর্গ নির্বাচন করতে গিয়ে বেশী খেয়াল রাখবেন যে, টাকা-পয়সার লেনদেন বা এ ব্যাপারে লোভী কি না? এবং তার দরবারে মেয়েদের বেপর্দা যাতায়াত আছে কি না? এ দুই জিনিষ থাকলে, কখনও সে ব্যক্তি হক্কানী বুযুর্গ হতে পারে না। এবং সে ব্যক্তি নিশ্চয় দুনিয়াদার, পীরগীরী তার ব্যবসা মাত্র। তার দ্বারা কেউ কখনও আল্লাহকে পাবে না। আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র রাস্তা প্রত্যেক কাজে নবী ﷺ- এর দ্বীন ও সুন্নাতের পূর্ন অনুসরণ এবং গুনাহ ছেড়ে দেয়া। তাই হক্কানী বুযুর্গের পরামর্শমত

রিয়াজত-মুজাহাদা করে পূর্নরূপে দ্বীনদারী গ্রহণ করলে অতীতের গুনাহ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে, দিলের জং দূর হবে এবং আমল-আখলাক সুন্দর হয়ে মহান আল্লাহর রিজামন্দী হাসিল হবে।

মহিলাদের দাড়ি হলে

জিজ্ঞাসাঃ কোন কোন মহিলাদের দাড়ি হয় কেন? দাড়ি হওয়ার পড়ে তাদের করনীয় কি? এক্ষেত্রে বয়সের কম-বেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে নারী-পুরুষ দু'ভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। দাড়ি নারী-পুরুষের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য। দাড়ি হল পুরুষের বৈশিষ্ট্য, আর দাড়ি না হওয়া হল নারীদের বৈশিষ্ট্য। তবে যদি কোন নারী-পুরুষের মধ্যে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিপরীত কিছু দেখা যায়, তাহলে সেটাও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত মনে করতে হবে। সুতরাং যদি কোন পুরুষের দাড়ী না হয়,অথবা কোন মহিলার দাড়ী হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এটাও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিকাশ। এতে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা যে, আল্লাহ তা`আলার জন্য কোন কিছুর বাধ্য-বাধকতা জরুরী নয়। তিনি যা চান, তাই করতে পারেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী হরমোনের তারতম্যের কারনে এটা হতে পারে। যে কারনেই হোক, কোন মহিলার যদি দাড়ি-মোচ উঠে, তাহলে তা কেটে ফেলাই মুস্তাহাব ও উত্তম। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রাহীমিয়া ২:২৪৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১৯৫]

হযরত ঈসা আ.-কে অবৈধ সন্তান বলা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তি হযরত ঈসা আ.-কে অবৈধ সন্তান বলেছে। প্রশ্ন হল, সেই ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে কি? যদি কাফির হয় তবে তার স্ত্রী তালাক হবে কি? আর তার সাথে আমরা সম্পর্ক রাখতে পারব কি? উত্তর জানিয়ে সুখী করবেন।

জবাবঃ হযরত ঈসা আ.-একজন পুতঃপবিত্র নবী এবং রাসূল। তিনি পিতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হযরত মারইয়াম আ.-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আ`লামিন পবিত্র কুরআন মাজীদে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হযরত ঈসা আ.-কে অবৈধ সন্তান বলার অর্থ হলো কুরআনকে তথা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করা। আর যদি কেউ কুরআনকে তথা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করে তা হলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। তাছাড়া কোন নবীকে গালি দেয়া বা মন্দ বলা কুফুরী কাজ।

সুতরাং, উক্ত ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেছে। আর কোন মুরতাদের সাথে মুমিন মহিলাদের বিবাহ শুদ্ধ নয়। তাই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। অতএব, উক্ত মহিলা তার ইদ্দত পালনের পর তিন হায়েয এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের পর অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বসতে পারবে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে মুরতাদের হুকুম হল, তার সামনে ইসলামের সহীহ আকিদা পেশ করা হবে। যদি সে কবুল করে তাহলে তো ভাল। অন্যথায় তাকে তিন দিন কারাগারে বন্দী করে রাখতে হবে যাতে সে পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসে। যদি তিন দিনের মধ্যে ফিরে না আসে তাহলে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

উল্লেখ্য, এ ধরনের খোদাদ্রোহীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং তাদের সাথে উঠাবসা করা হারাম। এমন লোক বিনা তাওবায় মারা গেলে

মুসলমানদের গোরস্থানে তাদের দাফন করাও জায়িয হবে না। [সূরা মারইয়াম ১৯:৩০, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ২:২৬৩, রদ্দুল মুহতার ৪:২২২, দারুল উলূম ১২:৩৬৩]

قال ابو حفص الكبير كل من اراد بقلبه بغض نبى كفر عالمغيرية : / سئل عمن ينسب الى الانبياء الفواحش الخ قال يكفر لانه شتم لهم واستخفافا بهم.

قال في المسايرة وبالجملة فقد ضم الى التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان في تحقيق الايمان امور والاخلال بها اخلال بالايمان اتفاقا كترك السجود لصنم وقتل نبى والاستخفاف به رد المحتار /

ইলেকট্রিক বিল প্রদান পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ আমি প্লাষ্টিক ব্যবসার সাথে জড়িত। নিজস্ব কারখানা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আমার ব্যবসা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর আমাদের দেশে যেসব কল-কারখানা চলছে, এগুলোর ইলেকট্রিক বিল পরিপূর্নরূপে পরিশোধ করা হয় না। কারন, পরিপূর্নভাবে বিল আদায় করতে গেলে কারখানার লোকসান হয়, তাই সরকারী লোকদের সাথে কন্ট্রাক্ট করে মূল বিল থেকে কমিয়ে ইলেকট্রিক বিল পরিশোধ করা হয়। আর এ পন্থা অবলম্বন না করে কেউ যদি প্রকৃত বিল পরিশোধ করতে চায়, তাহলে দেখা যায় মূল বিল থেকে আরো বাড়িয়ে বিল বানানো হয়। সুতরাং, আমি কারখানা চালাতে গিয়ে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারি? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ আপনি যদি প্লাষ্টিক ব্যবসার সুবিধার্থে নিজস্ব কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে ইলেকট্রিক বিল পরিপূর্নভাবেই পরিশোধ করতে

হবে। কেননা, প্রকৃত বিল পরিশোধ করার পরিবর্তে সরকারী লোকদের সাথে কন্ট্রাক্ট করে কম দেয়া, জাতীয় সম্পদ চুরি করার নামান্তর। যদিও অনেক সরকারী লোকেরা এমন সুযোগ দিয়ে থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী এমন করে থাকে, তাই বলে ইসলামী শরী'আতে চুরি ও প্রতারণা জায়িয হতে পারে না। সুতরাং,আপনি তাকওয়ার উপর থাকতে চাইলে নিম্মোক্ত তিনটি পদ্ধতির মধ্যে থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন।

(ক) যেহেতু নিজস্ব কারখানা চালাতে গিয়ে ইলেকট্রিক বিল পরিপূর্নভাবেই পরিশোধ করায় লাভের পরিবর্তে লোকসান হয় তাই আপনি কষ্ট হলেও অন্যের কারখানা থেকে মাল নিয়ে আপনার ব্যবসা চালাতে থাকুন।

(খ) অন্যের কারখানার দু'একটি মেশিন আপনার জন্য কন্ট্রাক করে নিন, যা সর্বদা আপনার মাল তৈরীতে নিয়োজিত থাকবে।

(গ) আর নিজে কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইলেকট্রিকের বিলসহ ঘরভাড়া নিতে পারেন অর্থাৎ ইলেকট্রিকের বিল পরিশোধ করা মালিকের দায়িত্বে থকবে। [প্রমাণঃ সূরা মুতাফফিফীন ১-৩, তাফসীরে মাযহারী ১০:২১৭, কানযুল উম্মাল ১৫:৬৭, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৮:৬৯৩]

কোটি গুন সাওয়াব সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাঃ অনেক ভণ্ড পীরের মুরিদরা বলে যে, তাবলীগ জামাতের সাথীরা ফজীলতের কথা বয়ান করে। যেমন ১ টাকা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলে সাত লক্ষ টাকা খরচ করার সমান সাওয়াব পাওয়া যায় এবং ১ বার সুবহানাল্লাহ পড়লে ৪৯ কোটি বার সুবহানাল্লাহ পড়ার সমান

সাওয়াব পাওয়া যায়। এসব নাকি মিথ্যা। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সঠিক প্রমান দিয়ে দেখাবেন। অনেকের উপকার হবে।

জবাবঃ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে একবার সুবহানাল্লাহ ও এক টাকা খরচ করার ব্যাপারে উক্ত ফজীলতের কথা হাদীসের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করল, অথচ সে নিজে আল্লাহর রাস্তায় বের হল না, সে তার ব্যয়কৃত এক দেরহামের পরিবর্তে সাতশত দিরহামের সাওয়াব পাবে। আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজের জন্য উক্ত টাকা ব্যয় করবে, সে এক টাকায় সাত লক্ষ টাকা সদকা করার সওয়াব পাবে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটি তিলাওয়াত করেন যার অর্থ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করবেন, তাকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। [ইবনে মাজাহ ১৯৮]

হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজের জন্য মাল খরচ করলে সাত লক্ষ গুন সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আদায়কৃত নামায, রোযা, জিকির ইত্যাদির সাওয়াব আল্লাহর রাস্তায় মাল ব্যয় করার সাওয়াবের চেয়ে সাতশত গুন বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ ৩:৪৪০) সুতরাং, সাত লক্ষকে সাতশত দ্বারা গুন করলে ঊনপঞ্চাশ কোটি হয় (৭০০০০০X৭০০=৪৯০০০০,০০০)।

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো যদিও ফাযায়েলে জিহাদে বর্ণনা করা হয়েছে তথাপিও এই হাদীসগুলো দাওয়াতও তাবলীগের ক্ষেত্রে এবং এ ধরনের অন্যান্য সহীহ দ্বীনী খিদমতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কেননা, জিহাদ করার যে মূল উদ্দেশ্য তার সাথে দাওয়াতও তাবলীগের পুরোপুরি সামঞ্জস্যতা রয়েছে বিধায় তার জন্যও এ হাদীস ব্যবহার করা যাবে।

বস্তুত জিহাদকে ফরয করা হয়েছে আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসারে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। আর সেই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়েই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছে। খোদার দ্বীন প্রচার ও প্রসার করছে। তাই হক্কানী উলামায়ে কিরামগন এ মর্মে একমত পোষণ করেছেন যে, দাওয়াতও তাবলীগের ক্ষেত্রে এবং এ ধরনের অন্যান্য দ্বীনী দাওয়াত ও তা'লীমের ক্ষেত্রেও জিহাদের ফযীলতপূর্ন হাদীসগুলো বর্ণনা করা যাবে। এতে কোন প্রকার আপত্তি নেই। যেমন, ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় কিতাবে কিতাবুল জিহাদের হাদীস দ্বারা জুমু'আর নামাযে কষ্ট করে হাজির হওয়ার ফযীলত প্রমাণ করেছেন।

[বুখারী শরীফ ১:১২৪, আবু দাউদ ১:৩৩৮, ইবনে মাজা ১৯৮, তিরমিযী ১:২৯২, মুসনাদে আহমদ ৩:৪৪০, মিশকাত ১:৩৪, মিরকাত ১:২৮৫, তুফফাতুল আহওযাজি ৫:২০৯, খাইরুল ফাতাওয়া ১:৩৭১, তারগীব ওয়াত তারহীবঃ ২:২৫৩]

عن علي وأبي الدرداء وابي هريرة رضى الله عنهم اجمعين كلهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارسل نفقة في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبع مائة الف درهم ثم تلا هذه الاية والله يضاعف لمن يشاء ..... رواه ابن ماجة ١٩٨

عن معاذ رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز و جل سبع مائة ضعف . رواه ابو داؤد

আখলাক ও আত্নশুদ্ধি

তাযকিয়ার গুরুত্ব

জিজ্ঞাসাঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে আত্নশুদ্ধির হুকুম কি? আত্নশুদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট শাইখের সাথে সম্পর্ক রাখা জরুরী কিনা? হাওয়ালা সহ জানতে চাই।

জবাবঃ শরী'আতে অন্যান্য আহকাম যথা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদি। (নেসাব পরিমাণ মালের মালিকানা থাকার শর্তে) যেমন, প্রত্যেক আক্কেল বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরযে আইন তথা আবশ্য পালনীয়, তদ্রুপ অন্তরে দশটি অর্থাৎ (১) লোভ, (২) অহেতুক কথা বলার আগ্রহ, (৩) অযথা ক্রোধ, (৪) হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা, (৫) কৃপণতা, (৬) পদের মোহ তথা বড়ত্ব কামনা (৭) দুনিয়ার মোহ (৮) তাকাব্বুরি বা অহংকার, (৯) খোদপসন্দী তথা আত্মাস্লাষা, (১০) রিয়া তথা প্রদর্শীনী ও লৌকিকতা, এর চিকিৎসা করানোর মাধ্যমে সমস্ত জাহেরী গুনাহ তরক করা এবং অন্তরের দশটি ভাল গুন তথা (১) তাওবা, (২) খোদাভীতি, (৩) যুহদ বা দুনিয়ার প্রতি অনিহা (৪) সবর বা ধৈর্যশীলতা, (৫) শুকর বা কৃতজ্ঞতা, (৬) ইখলাস তথা নেক কাজে খালেস নিয়ত বা একনিষ্ঠতা, (৭) তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর পূর্ন ভরসা, মুহাব্বত বা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা (৯) তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট, (১০) মৃত্যু চিন্তা অর্জন করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ রাখার সিফাত হাসিল করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর এরই নাম হচ্ছে তাযকিয়া বা আত্নশুদ্ধি। এ আত্নশুদ্ধি এমনই এক ফরয দায়িত্ব যে, আল্লাহ তা'আলা এর গুরুত্ব বুঝাতে কুরআনে পাকের সূরা আশ-শামশে ১১ বার কসম খেয়ে এই আত্নশুদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। যেই কসম অন্য কোন বিষয়

বর্ণনার ক্ষেত্রে এতোবার খাওয়া কুরআনে অন্য কোথাও নেই। তামাম আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রধানতঃ যে চারটি দায়িত্ব ছিল তন্মধ্যে অন্যতম একটি হল আত্মার পরিশুদ্ধি।

আর কুরআনের অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত বানী ও আমল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীনসহ সকল যুগের আউলিয়ায়ে কিরামের আমল ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা স্বীকৃতি যে, আত্মশুদ্ধি তথা আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য এমন কোন শাইখের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা জরুরী যিনি অন্য শাইখের সুহবতে থেকে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি করেছেন। এ ক্ষেত্রে উত্তম হল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাইখের দারস্ত না হয়ে এমন কোন একজনকে নির্দিষ্টকরে নেওয়া, যার সাথে মনের অধিকতর মিল আছে, এবং যার প্রতি মনের আকর্ষণ বেশী যদিও তিনি তত প্রসিদ্ধ বা খ্যাতি সম্পন্ন না হন।

উল্লেখ্য, আত্মশুদ্ধির জন্য কারো সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা জরুরী বটে যাকে বাইআতে হাকীকী বলে তবে কোন শাইখের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত হওয়া বা তার মুরীদ হওয়া যাকে যাহেরী বাই'আত বলে এটা জরুরী নয়। বরং এটা মুস্তাহাব ও বরকতের কাজ।

[প্রমাণঃ সূরা তাওবা ১১৯, আনআম-১২০, বাকারা-১২৯, সূরা আশ-শামস-৭-৯, ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৪৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩৯, মাহমূদিয়া-১৫/৮৮]

আত্মশুদ্ধি বাদ দিয়ে শুধু ইবাদত-বন্দেগী করা

জিজ্ঞাসাঃ কেহ নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত যথাযথভাবে পালন করে কিন্তু আত্মশুদ্ধি করে না বা এর প্রয়োজন মনে করে না, তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে কি?

জবাবঃ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.বলেন, নামায, রোযা, ইত্যাদি ইবাদতশরী'আতে ফরযে আইন। তেমনিভাবে আত্মশুদ্ধি ফরযে আইন। আর কেউ এক ফরয আদায় করে অপর ফরয ছেড়ে দিলে শাস্তিযোগ্য হবে। তাই শুধু নামায রোযা করল কিন্তু আত্মশুদ্ধি করল না, এতে তার ফরয তরক করার গুনাহ হবে, শুধু এতটুকুই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে ইসলাহে নফস না থাকার দরুন এবং ইখলাস হাসিল না হওয়ার দরুন সমস্ত ইবাদত-বন্দেগীই বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন, কেউ আল্লাহওয়ালার দরবারে গিয়ে অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা করিয়ে আত্মার গুনগুলো অর্জন করল না। তাহলে রিয়ার কারনে তার সকল ইবাদত বরবাদ হয়ে যাওয়ারই প্রবল আশংকা আছে। কারন অন্তরের গুণাবলীর মধ্যে একটা হল ইখলাস। এখন কেউ যদি রিয়ার সাথে ইবাদত করে অর্থাৎ তার ইবাদতে ইখলাস বা লিল্লাহিয়াত না থাকে তা হলে তার ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না, বরং বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহা ইবাদত মনে হলেও মূলত তা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন শ্রেণীর লোকদের দ্বারা আল্লাহ তা`আলা জাহান্নাম উদ্বোধন করবেন। যথা, (ক) শহীদ (খ) আলেম (গ) দানবীর, তারা পূর্ন যিন্দেগী জান-মাল দিয়ে ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনের কাজ করে গেছে, তবে তাদের অভাব এতটুকুই ছিল যে, তারা অন্তরে রোগ-রিয়া দূর করে নাই এবং অন্তরের গুন ইখলাস হাসিল করে নাই। অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক মহিলা বেশী বেশী নামায রোযা-সাদকা ইত্যাদি আদায় করত

কিন্তু প্রতিবেশীদেরকেও কষ্ট দিত, হুযুর ﷺ বলেন, সে জাহান্নামী। এখানেও ইবাদত থাকা সত্ত্বেও অন্তরে খোদাভীতির অভাব ছিল, যদ্দরুণ সে মানুষকে কষ্ট দিত। এবং শেষ পর্যন্ত জাহান্নামী হল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, শুধু নামায রোযা ইত্যাদি আদায় করলেই চলবে না বরং আত্মশুদ্ধিও করে ইবাদত-বন্দেগী কবুল করানোর ব্যবস্থা করতে হবে অন্যথায় আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে ইবাদতও বিফলে যাবে এবং জাহান্নামে যাওয়ার কারন হবে। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১/৩৩, ২/৪২৪]

হক ও বাতেল পীরের পরিচয়

জিজ্ঞাসাঃ হক্কানী পীর ও বাতিল পীরের পরিচয় কি?

জবাবঃ এদেশের মানুষ সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণ। তাদের এ ধর্ম পরায়ণতার সুযোগ নিয়ে সমাজে বেশ কিছু ব্যবসায়ী পীরের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের ভিতর হক্কানী পীর (যারা আল্লাহর রাস্তার সঠিক পথ প্রদর্শক)- এর দশটি আলামতের কোন একটিও পাওয়া যায় না। হক্কানী পীরের দশটি আলামত এইঃ

(১) পীর সাহেব তাফসীর, হাদিস,ফিকাহ ও ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলীম হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃপক্ষে মিশকাত শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়েছেন পরিমাণ ইলম থাকা জরুরী।

(২) পীরের আকীদা এবং আমল শরী'আতের মুয়াফিক হওয়া অপরিহার্য। তার স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুনাবলী যে রকম শরী'আতে চায়,সে রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) পীরের মধ্যে লোভ (টাকা-পয়সা, সন্মান-প্রতিপত্তি, যশ-সুখাতির লিপ্সা) থাকবে না। নিজে কামিল হওয়ার দাবি করবে না। কেননা, এটাও দুনিয়ার মুহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৪) তিনি কোন কামিল পীরের খিদমতে থেকে ইসলাহে বাতিন (অন্তকরনে পরিশুদ্ধি) এবং তরীকত অর্জন করেছেন এমন হতে হবে।

(৫) সমসাময়িক পরহেযগার-মুত্তাকী আলেমগন এবং সুন্নাত তরীকার ওলীগন তাঁকে ভাল বলে মনে করেন-এমন হতে হবে।

(৬) দুনিয়াদার অপেক্ষা দ্বীনদার লোকেরাই তাঁর প্রতি বেশি ভক্তি রাখে-এমন হওয়া আবশ্যক।

(৭)তাঁ র মুরীদের মধ্যে অধিকাংশ এরকম হতে হবে যে তারা প্রানপণে শরী'আতের পাবন্দী করেন এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ-লালসা রাখেন না।

(৮) তিনি এমন হবেন যে, মনোযোগের সাথে মুরীদদের তা'লীম-তালকীন করেন এবং অন্তর দিয়ে এটা চান যে, তারা ভাল হোক। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পায়রবী করুক। তিনি মুরীদদেরকে তাদের মতলব মত স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারেন না। তাদের মধ্যে যদি কোন দোষ দেখতে বা শুনতে পান, তবে তা যথারীতি (কাউকে নরমে কাউকে গরমে) সংশোধন করেন।

(৯) তাঁর সুহবতে কিছু দিন থাকলে, দুনিয়ার মুহব্বত কমে যায় এবং আখেরাতের চিন্তা-ফিকির বাড়তে থাকে।

(১০) তিনি নিজেও রীতিমত যিকির শোগল করেন। অন্ততপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা রাখেন। (কেননা নিজে আমল না করলে, অন্ততপক্ষে করার

পাক্কা ইরাদা না থাকলে, তা'লীম–তালিকীনে বরকত হয় না। [প্রমাণঃ কসদুল সাবীল পৃঃ ৯]

সমাজের যে সকল পীর সাহেবানের মধ্যে এ আলামতগুলো পাওয়া যাবে, তারাই হক্কানী পীর। যাদের মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে না; এরপরও পীর নাম ধারন করে বসবে, তারা বাতিল, ভণ্ড ও ব্যবসায়ী। বর্তমানে তাদের দ্বারা মুসলমানদের অবশিষ্ট ঈমানটুকুও বরবাদ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

মুনাসাবাতের উদ্দেশ্য

জিজ্ঞাসাঃ ইসলাহী সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে বলা হয় যে, যার সাথে মুনাসাবাত হয়। তার সাথেই ইসলাহী সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয়, প্রশ্ন হল, এই মুনাসাবাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? একটু ব্যাখ্যা সহ জানতে চাই ।

জবাবঃ আত্মশুদ্ধি–আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত বা তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা ব্যতীত অর্জন হয় না। তবে শর্ত এই যে পীর বা শাইখের সাথে মুরীদের আন্তরিক মুনাসাবাত (মনের মিল) থাকতে হবে। তা না হলে ফায়দা কম হয়। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন যে, পীর যত বড়ই হোক না কেন, মুনাসাবাত (মনের মিল) না থাকলে তাঁর দ্বারা বিন্দুমাত্রও ফায়দা হবে না। তাই কোন শাইখের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগেই পরস্পরের মধ্যে মুনাসাবাত আছে কি-না তা ভালভাবে যাচাই করে নিতে হবে।

আর শাইখের সাথে মুনাসাবাত হওয়ার অর্থ হল, তার সাথে মুরীদের এমন আন্তরিকতাও আনুগত্যের সম্পর্ক হওয়া যার দ্বারা শাইখের যে কোন কথা বিনা দ্বিধায় মানতে প্রস্তুত থাকে। এবং শাইখের প্রতি এমন আস্থাশীল হওয়া যে, শাইখের কোন কথা বা কাজের প্রতি বিরুপ ধারণা সৃষ্টি না হয়।

বা শয়তানের ওয়াসওয়াসা দ্বারা এমনটি হলেও সে নিজের আকল বুদ্ধি দ্বারা সেটা রহিত করতে সক্ষম হয়, এবং মন কে বলে যে, আমার শাইখতো ফেরেশতা নন বরং তিনি একজন মানুষ। সুতরাং কোন উযর বা বেখেয়ালিতে এমনটি হওয়া অসম্ভব নয়। কোন মানুষই তো ভুল ভ্রান্তির উর্ধেব নয়। তাছাড়া শাইখের ব্যাপারে প্রবল ধারণা থাকা যে, এ শাইখের মাধ্যমেই আমার বাতেনী রোগের চিকিৎসা যথাযতভাবে হবে। কোন কামিল পীরের সান্নিধ্য কিছু দিন যাতায়াত করার দ্বারা যদি মনে উপরোক্ত ভাব জন্ম নেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে পীরের সাথে যাতায়াতকারীর মুনাসাবাত রয়েছে। যাতায়াতকারীর জন্যে সে পীরের নিকটই তাযকিয়া (আত্নশুদ্ধি) করানো উচিত। যদিও পীর তত প্রসিদ্ধ বা কাশফ-কারামতের অধিকারী না হন। দেখা যায় অনেকের বড় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা হয় না অথচ সাধারন ডাক্তার দ্বারা রোগ ভাল হয়ে যায়। সুতরাং শাইখ বড় ছোট না দেখে মুনাসাবাত বা মনের আকর্ষণ আছে কিনা এটা দেখা জরুরী। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২/৪২৫, ৪২৭, মিরকাত ৯/২৪৬]

ভণ্ড পীর বা মুনাসাবাত ছাড়া পীরের কাছে মুরীদ হলে করনীয়

জিজ্ঞাসাঃ কেউ কোন ভণ্ড পীরের বা হক্কানী পীরের মুরীদ আছে নিয়মতান্ত্রিক মেহনতের পরও আত্নশুদ্ধির ব্যাপারে কোন ফায়দা হচ্ছে না, এমতাবস্তায় তার কি করনীয়?

জবাবঃ যদি কেউ নিজের অজান্তে কোন ভণ্ড পীরের মুরীদ হয়ে যায়, তাহলে সে পীর যে ভণ্ড একথা জানা মাত্রই তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা জরুরী। কারন এ শ্রেণীর পীরেরা শরী'আতের দৃষ্টিতে বিদ`আতি ও গোমরাহ। আর বিদ`আতীর শাস্তি কাল কিয়ামতে অত্যন্ত ভয়াবহ, আর যারা তাদের আনুসারী, তাদেরও ঐরুপ শাস্তি হবে, কেননা বুখারী ও

মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সুত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, দুনিয়াতে যে যার সম্পর্ক ও মহব্বত রাখবে, আখেরাতে সে তার সাথেই থাকবে। [মুসলিম শরীফ ২/৩৩২]

আর যদি কেউ কোন হক্কানী পীরের সাথে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও তার তা'লীম তারবিয়তের দ্বারা ফায়দা না পায়, তাহলে তার জন্য করনীয় হল প্রথম শাইখকে না জানিয়েই অন্য যে শাইখের সাথে সম্পর্ক গড়লে নফস ও শয়তানকে বেশী কাবু করা যাবে বলে প্রবল ধারণা হয়, তার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করে তাকে নিজের আত্মিক ব্যাধী সম্পর্কে অবহিত করত তার চিকিৎসা গ্রহণ করা, এটা এজন্য জরুরী যে, খাস কোন ব্যক্তির সম্পর্ক রাখা দ্বীনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল অন্তরের পবিত্রতা অর্জন, আর প্রথম শাইখের নিকট তা অর্জিত হচ্ছে না, এর প্রথম শাইখকে এ বিষয় এজন্য জানাবে না যে, এটা ঐ শাইখের আন্তরিক ব্যাথার কারন হয়ে ঐ মুরীদের ক্ষতি থেকে পারে। তবে সম্ভব হলে প্রথম শাইখের সাথে মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ করে দু'আ নিবে। [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ২/৩৩২, আবূ দাউদ শরীফ ২/৫৫৯, তালিফাতে রশীদিয়্যাহ ২০৩, মাহমুদিয়্যাহ ১৫/৯০]

জান্নাতের আমল না করে পীরের উপর ভরসা

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে মনে করে কোন আল্লাহওয়ালা শাইখের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত হয়ে গেলে আমল না করলেও তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। কারন ঐ পীর তার কবরের সাওয়ালের জওয়াব দিয়ে দিবে এবং হাশরের ময়দানে পুলসিরাত হাত ধরে পার করে দিবে। এ ধারণার কারনেই তারা আর পীরের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক রেখে আত্মশুদ্ধির কোন ফিকির করে না। তাদের এ ধারণার কোন ভিত্তি আছে কি?

জবাবঃ কোন পীরের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করার মাকসাদ হল যে, পীর সাহেব আল্লাহর হুকুম ও রাসূল ﷺ-এর হুকুম আহকাম মুতাবিক নির্দেশনা দিবেন। আর মুরীদ সেই মুতাবিক আমল করে নিজের জীবনকে হুযূর ﷺ- এর আদর্শে আদর্শবান করে তুলবেন। এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব হবেন। পীর-মুরীদের মধ্যে উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া, পীর শুধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মাধ্যম। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কোন বিষয়ের মালিক বা স্বয়ং সম্পন্ন নন। তিনি ইচ্ছা করলে মুরীদকে যা কিছু দিতে চান তা দিতে পারেন না। নবী ﷺ স্বীয় চাচার হেদায়েত চেয়েছিলেন আরো অন্য আত্নীয়স্বজনের হেদায়েত চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা হয় নাই বলে নবী ﷺ-এর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা হেদায়েত পায় নাই, তাহলে পীর বেচারা নিজের ইচ্ছা মাফিক মুরীদকে কী দিতে পারে? তিনি তো শুধু সহীহ রাস্তা দেখানোর মালিক। এ পর্যন্ত তার দায়িত্ব শেষ।

হাদীসে রয়েছে,

(নিশ্চয়ই সকল আমল শেষ পরিণামের উপর নির্ভরশীল) যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যে ঈমান সহ মৃত্যুবরন করতে পারল সেই কামিয়াব।

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে

এর আলোকে প্রতীয়মান হয়, যে জান্নাতে যেতে পারলো সেই কামিয়াব। আর কেউ বলতে পারে না যে তার মৃত্যু কিসের উপর হবে। হুযূর ﷺ- এর সমস্ত গুনাহ মাফ, তিনি নিষ্পাপ তা সত্ত্বেও বলেছেন,

আল্লাহর কসম আমি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। রাসূল ﷺ -এর চেয়ে বড় পীর আর কে হতে পারে?

তিনি স্বয়ং নিজের প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা রাযি.-কে বলেছেন,

হে ফাতেমা! তুমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। অর্থাৎ নিজেই নিজের নফসের ইসলাহ করো, শরী'আতের পাবন্দী কর, বাবা নবী বলে আমল ছেড়ে বাবার উপর ভরসা করে বসে থেকো না। [কসদুস সাবিল পৃঃ-১২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, হাক্কানী পীরের হাতে হাত দিয়ে বাই'আত হলেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট না বরং হক্কানী পীরের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের আমল নিজে করে জান্নাতের সামান নিজেরই প্রস্তুত করে যেতে হবে। পীর সাহেব আখেরাতের মু`আমালায় কোন অধিকার রাখেন না। সুতরাং পীর সাহেব ইচ্ছা করলেই মুরীদকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারবেন না। কবরে মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবেন না। এসব বাতিল ধারণা ও কুসংস্কার মাত্র। উল্লেখ্য, পীর সাহেব নিজে বেহেশতে যাবেন তার কি গ্যারান্টি আছে? তাহলে অন্যকে কিভাবে বেহেশতে নেয়ার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন? কোন হক্কানী পীর এ ধরনের দায়িত্ব কখনো নিতে পারেন না। হাশরের ময়দানে নবীদের পিত্তা পানি হয়ে যাবে, হে আল্লাহ সালামত দাও এ দু`আ করতে থাকবে। সেখানে পীর বেচারার কি অধিকার থাকবে? সুতরাং এ ধরনের গলদ আকীদা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফঃ ২/৪৫৬, ৪৬০]

পীরের ইন্তেকালের পর নতুন পীর ধরা

জিজ্ঞাসাঃ পীরের যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় তখন মুরীদের করনীয় কি? অন্য কোন বুযুর্গের সাথে নতুনভাবে সম্পর্ক করা বা বাইয়াত হওয়া জরুরী কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ যদি কারো ইসলাহী মুরব্বী ও পীরের ইন্তেকাল হয়ে যায় এমনকি তাকে যদি ইজাযত তথা খিলাফতও দিয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রেও তার জন্য অন্য কোন হক্কানী, শাইখ এবং পীরের সাথে পুনরায় ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করত পরিপূর্ন আত্মিক পরিশুদ্ধি ও অন্তরের দশটি গুণাবলী অর্জন এবং বিভিন্ন নিত্য নতুন হালাতের ব্যাপারে তার পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী। কেননা শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। মুরব্বী বিহীন থাকলে সে সুযোগ পেলেই লাইনচ্যুত করে ছাড়বে। চাই সে যত বড় আলেমই হোক না কেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত নফসের নেগরানী করতে বলেছেন। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুমিন বান্দা ঘর্মাক্ত ললাট নিয়ে মৃত্যুবরন করে। অর্থাৎ নফসের বিরুদ্ধে মেহনত মুজাহাদার মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরন করে।

হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর প্রসিদ্ধ কিতাব "শরীআত ও তরিকত"-এ মুসলিম শরীফের এক হাদীস যা হযরত আবু দারদা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ ইবলীস একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আমার মুখে লাগাবার জন্য আনলো .....। ঐ হাদীসেই আছে আল্লাহ তা`আলা নবীজীকে  হেফাযত করেছেন) এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, "কোন লোক যত বড় কামেলই হোক না কেন, শয়তান থেকে নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়। [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ১/২০৫ সুত্রঃ শরী`আত ও তরীকত পৃঃ ৪১৬]

যখন কেউ তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি বিহীন থাকে তখন তার অন্তরের ভাণ্ডার থাকে খালি। আর খালি ভাণ্ডারের প্রতি শয়তান, চোর, ডাকাত এর দৃষ্টি পরে না। কিন্তু পরবর্তীতে তাযকিয়া করানোর দ্বারা তার খাযানায় যখন ধনদৌলত এসে যায়, তখন তার প্রতি শয়তানের দৃষ্টি বেশী পরতে থাকে। এমতাবস্থায় যদি তার উপর কোন শাইখ বা মুরব্বীর ছায়া না থাকে, তাহলে তার ধ্বংস ও পদস্খলনের আশংকা অনেক বেশী থাকে। সুতরাং প্রথম শাইখের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় শাইখের সাথে ইসলাহি সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. লিখেছেন মৃত্যু পর্যন্ত নিজের মাথার উপর একজন মুরব্বীর ছায়া রাখা গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য রক্ষাকবজ। যদি বড় কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে অন্তত নিজের সমকক্ষ কাউকে হলেও মুরব্বী মানবে। তাও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে নিজের শাগরেদদের মধ্য থেকে যারা অন্যের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখে, তাদের সাথে পরামর্শ করে কোন সিদ্ধান্ত নিবে। নিজেকে কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করবে না। কারণ এটাই পদস্খলনের কারণ হয়।

[প্রমাণঃ সূরা তাওবা ১১৯, মুসলিম শরীফ ১/২০৫, তিরমিজী শরীফ ১/১৯২ এবং ১/৩০১, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৫/৯৫]

সর্বযুগেই কি আত্মার রোগের চিকিৎসক বিদ্যমান?

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে বলে আজকাল যেহেতু জুনায়িদ বাগদাদী, শিবলী, ফুযাইল রহ. তাঁদের মত বুযুর্গ দুনিয়াতে নেই। সুতরাং এখন আর কার নিকট আত্মশুদ্ধির জন্য সম্পর্ক করা যায়? অতএব এখন নিজেই নিজের

ফিকির করা ছাড়া উপায় নাই। তাদের কথা কতটুকু সঠিক ও যুক্তিযুক্ত জানতে চাই।

জবাবঃ আত্মশুদ্ধি তথা দিলকে রূহানী রোগ যথা লোভ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা ফরয এবং এর জন্য রূহানী ডাক্তারের সাথে সম্পর্ক করাও ফরয। শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে যেমন সমকালীন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় তেমনিভাবে রূহানী রোগের ক্ষেত্রেও সমকালীন রূহানী ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা`আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে নির্দেশিত আয়াত মনসূখও হয়নি বরং তার হুকুম এখনও বিদ্যমান আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুতরাং আত্মশুদ্ধির ডাক্তারও দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকবেন। কেননা মহান আল্লাহর হুকুম বিদ্যমান থাকবে আর তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে তা কস্মিনকালেও থেকে পারে না। এ ব্যাপারে আরিফ বিল্লাহ হজরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব দা.বা. বলেন যে, "মক্কা শরীফে যদি কেউ জ্বরে আক্রান্ত হয়, তবে কি সে এই অপেক্ষায় থাকবে যে দিল্লীর কবরস্থান থেকে সুবিখ্যাত হাকীম আজমল খান উঠে আসবেন। তারপর আমি আমার রোগের চিকিৎসা করাব? কারণ আমি বড় মানুষ আমার বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডাক্তার দ্বারাই চিকিৎসা করাতে হবে। কেউ এমন করবেন না। বরং দেহের যে সকল ডাক্তার বর্তমান আছেন তাদের মধ্যে বিজ্ঞজন দ্বারাই চিকিৎসা করাবেন, কারণ তার রোগমুক্তি দরকার। অনুরূপভাবে বর্তমান যামানায় আল্লাহপাক যে সকল রূহানী ডাক্তার তথা আল্লাহওয়ালা সৃষ্টি করেছেন তাদের চিকিৎসা ও সোহবত গ্রহণ করেই আমরা বায়েযীদ বোস্তামী ও হাজী এমদাদুল্লাহ রহ. হতে পারি" আর যুগের খাঁটি মুত্তাকী ও খাঁটি ওলীই হলেন ঐ যুগের

রূহানী ডাক্তার। আর প্রতি যুগে খাঁটি ওলী থাকবেন এটা সুনিশ্চিত। কারণ, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হুকুম করেছেন .....

অর্থাৎ তোমরা সাদেকীনের সঙ্গ অবলম্বন কর। সাদেক অর্থ খাঁটি মুত্তাকী, খাঁটি ওলী। আল্লাহপাক এখানে সালেহীন, মুত্তাকী ও কামেলীনের সঙ্গ অবলম্বনের হুকুম দিয়েছেন। এতদসত্বেও কোন কোন যুগে তিনি কামেলীন পয়দা করবেন না এটা কি করে হতে পারে। মোটকথা, বর্তমানেও কামেলীন, আল্লাহওয়ালা আছেন, তাইতো হাকীমূল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হজরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. কসম করে বলেন যে, "এই যামানাতেও বায়েযীদ বোস্তামী রহ. আছেন, শামসুদ্দীন তাব্রীযী, জালালুদ্দীন রুমী, জুনাইদ বাগদাদী ও ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. আছেন। কিন্তু তাদের চেনার মত পিপাসার্ত চোখ প্রয়োজন। অতএব, শয়তানের ধোঁকার বশীভূত হয়ে নিজেই চিকিৎসা করার শয়তানী ধোঁকায় না পড়ে অতি তাড়াতাড়ি স্বীয় যামানার ইজাযত প্রাপ্ত আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করা জরুরী। [প্রমাণঃ সূরা তাওবা ১১৯, তিরমিযী শরীফ ২/৯৭]

অন্তরের রোগের কথা না বলে শুধু পীরের মুহব্বতেই কি আত্মশুদ্ধি হয়ে যায়

জিজ্ঞাসাঃ অনেকে বিশেষ আল্লাহওয়ালাদের সাথে মুহাব্বত রাখেন। মাঝে মধ্যে যাতায়াত করে হাদিয়া পেশ করেন। পীর সাহেবও তাকে খুব আদর আপ্পায়ন করেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি পীর সাহেব এর নিকট নিজের অন্তরের রোগের কথা বলে কোন চিকিৎসা নেন না। তাহলে তার উল্লেখিত

কাজটি আত্মশুদ্ধির মধ্যে গণ্য হবে? না কি তার জন্য ভিন্নভাবে আত্মশুদ্ধি করাতে হবে।

জবাবঃ কোন ব্যক্তি কোন বুযুর্গের দরবারে খুব আসা যাওয়া করেন, সেই বুযুর্গ ও তাকে আদর আপ্যায়ন করেন কিন্তু উক্ত ব্যক্তি অন্তরের দশটি রোগ থেকে আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য সেই বুযুর্গের নিকট নিজের অবস্থা পেশ করে তার থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না, এ ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি হবে না বরং তার আত্মার রোগ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে, ঐ ব্যক্তির উদাহরণ ঐ শারীরিক রোগীর ন্যায় যে দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সাথে উঠা বসা করে ঠিক, মুহাব্বত করে তার বাড়ীতে খাওয়া দাওয়াও করে কিন্তু তার নিকট ধ্বংসাত্মক রোগের কথা প্রকাশ করে তার থেকে উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করে না। এটা খুবই স্পষ্ট এবং স্বতসিদ্ধ বিষয় যে, এই রোগী যদি সারাটা জীবনও ঐ ডাক্তারের সংস্পর্শে কাটিয়ে দেয়, তথাপিও তার ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসা কখনো হবে না। কারণ, ডাক্তার তার রোগ সম্পর্কে অবগত নয় বা অবগত হলেও যতক্ষণ সে নিজেকে নিজে রোগী হিসাবে পেশ না করে ডাক্তার তার চিকিৎসা করে না, এটাই ডাক্তারদের চিরাচরিত নিয়ম যে, ডাক্তার যদি রোগীর সাথীর মধ্যে কোন রোগ লক্ষ্য করেন কিন্তু ঐ ব্যক্তি সেই রোগের চিকিৎসা না চায় তো ডাক্তার নিজের পক্ষ থেকে তার চিকিৎসা পত্র লিখেন না। ঠিক তদ্রুপ কোন আল্লাহওয়ালার দরবারে যদি কারো সারাটা জীবনও কেটে যায়, আর সে ঐ বুযুর্গকে নিজের আত্মিক ব্যাধির সম্পর্কে অবহিত না করে শুধু খেদমতই করতে থাকে, এর দ্বারা তার আত্মার রোগের চিকিৎসা তথা আত্মশুদ্ধি কখনোই সম্ভব নয়। বরং বুযুর্গের আদর আপ্যায়নে তার নফস ফুলে সে অহংকারে লিপ্ত হতে পারে যে অমুক বুজুর্গ আমাকে এত মুহাব্বত করেন তাহলে নিশ্চয় আমার মধ্যে বিশেষ গুণ আছে নতুবা তিনি

কেন আমাকে এত সম্মান দেখান। তার বুঝা উচিত এটাতো এই ব্যক্তি মেহমানের সম্মান দেখানোর জন্য করে থাকেন যা হাদীসের নির্দেশ, চাই ঐ মেহমান যে দরজার হোক না কেন? সুতরাং তার দ্বারা নিজেকে বুজুর্গ ভাবা বেওকুবী ছাড়া আর কি?

তাই তাদের জন্য তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির পূর্ণতা অর্জন করতে হলে কোন একজনকে ইসলাহী মুরব্বী মেনে তার নিকট থেকে আত্মার দশটি রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে জাহেরী গুনাহ তরক করে অন্তরের ১০টি ভাল গুণ অর্জন ও সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ রাখার সিফাত হাসিল করতে হবে, আর এটাই অভিজ্ঞতা সর্ব স্বীকৃত তরীকা। [প্রমাণ ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৫/৮৮]

ক্রোধ বা রাগের চিকিৎসা

জিজ্ঞাসা: হুজুর, আমার অবস্থা হল যেখানে সেখানে, কারণে অকারণে অযথা রাগ উঠে যায়, সামান্য সামান্য কারণে এমন ক্রোধ এসে যায় যে, সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে অনেক অঘটন ঘটে যায়। এমতাবস্থায় আমার করনীয় কি?

জবাবঃ কুরআনে মুমিনের সিফাত বলা হয়েছে,

“তারা ক্রোধ দমন করে, মানুষকে মাফ করে।”

হাদীসে এসেছে,

“দুশমনকে ধরাশায়ী করার নাম বাহাদুরী নয় বরং রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার নাম বাহাদুরী।” [বুখারী শরীফ]

তাই প্রকৃত মুমিন হতে হলে রাগ ক্রোধকে অবশ্যই দমন করতে হবে, ক্রোধ দমনের জন্য নিম্নে বর্ণিত কাজ করতে হবে।

(১) রাগের সময় প্রথমত আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশকে খেয়াল করবে, হাদীস অনুযায়ী রাগকে জাহান্নামের আগুন মনে করবে।

(২) দ্বিতীয়ত এ খেয়াল করবে যার উপর আমি রাগান্বিত হচ্ছি এ ব্যক্তি আমার বান্দা বা গোলাম নয়, অপরদিকে আমি যার গোলাম তার মরযী ও মতের বিরুদ্ধে কত কাজ আমি করছি কিন্তু তিনি আমাকে আযাব দিচ্ছেন না।

(৩) তারপর পূর্ণ আউযুবিল্লাহ কয়েকবার পড়বে।

(৪) অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন করবে যেমন, দাড়ানো থাকলে বসে পড়বে।

(৫) এবং ঐ ব্যক্তির সম্মুখ থেকে সরে যাবে, এবং সুন্দরভাবে উযু করে জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে ফেলবে, প্রয়োজনে জমিনে চোয়াল রেখে নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করবে, এইভাবে আমল করার ২০/২৫ দিন পর অবস্থা শাইখকে জানাবে, ভবিষ্যতে অবৈধ রাগ প্রকাশ পেলে প্রতি একবারের জন্য ২০ রাকা`আত নফল নামাজ পড়ে নিজের নফসকে শাস্তি প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, রাগের সময় যেহেতু আক্বল ঠিক থাকে না, সুতরাং ঐ অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত বা বিচার করবে না। ঐ অবস্থায় যা করবে সবই ভুল হবে এবং এর জন্য পরে লজ্জিত হতে হবে।

(বি.দ্রঃ প্রদত্ত জবাব নমুনা স্বরূপ পেশ করা হল। নতুবা প্রত্যেককেই তার মুর্শিদের পরামর্শ মুতাবিক আমল করতে হবে।)

হিংসা বা হাসাদের প্রতিকার

জিজ্ঞাসাঃ হিংসা বা হাসাদ থেকে বাঁচার উপায় কি? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

জবাবঃ (১) যার প্রতি হিংসা হয় তাকে আগে আগে সালাম করা। (২) সফরে যাতায়াতের সময় তার সাথে মুসাফাহা করা। (৩) তাকে হাদিয়া তুহফা দেওয়া। (৪) তাকে দাওয়াত করা। (৫) তার নেয়ামত বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা। (৬) তার প্রশংসা করা। (৭) মনে মনে চিন্তা করবে যে, আল্লাহ পাক তাকে নেয়ামত দান করেছেন, আর আমি সেই নিয়ামত দূরীভুত হয়ে যাওয়া কামনা করছি এতো আল্লাহ পাকের সাথে মুকাবালা যা আদৌ আমার জন্য উচিত নয়।

নামাযে খুশুখুযু হাসিল করার পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ নামাযে খুশুখুযু হাসিল করার তরীকা কি? চুপ করে থাকলে দুনিয়ার চিন্তা এসে যায়, এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

জবাবঃ নামাযে হুজুরে ক্বলব অর্থাৎ একাগ্রতা হাসিল করার ব্যাপারে হাকীমূল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, হুজুরে ক্বলব হাসিল করার বিভিন্ন তরীকা আছে। এখানে কয়েকটি নিয়ম লেখা হল। যার নিকট যেটি সহজবোধ হয়, সে সেটি আমল করবে। প্রথমত নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ধ্যান রাখবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছি। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। তৃতীয়তঃ যা কিছু পড়বে তার অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পড়বে। চতুর্থতঃ প্রত্যেক শব্দ চিন্তা করে পড়বে যে, প্রথম এই শব্দ পড়ব, তারপর এই শব্দ পড়ব। এভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক শব্দ চিন্তা করে উচ্চররণ করবে। একটি শব্দও চিন্তা ছাড়া শুধু মুখস্থের জোরে পড়বে না। পঞ্চমতঃ এই চিন্তা করবে যে, এটাই আমার জীবনের শেষ নামায, হয়ত এখনই এই নামায নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। অতএব যদি দিল এদিক ওদিক রেখে নামায পড়ি, তবে তাঁর নিকট লজ্জিত এবং তিরস্কৃত হতে হবে। এই নিয়মগুলির মধ্য থেকে যেটি সহজবোধ হয় সেটি

আমল করবে। এবং কোনো হক্কানী পীরের পরামর্শ সাপেক্ষে সকাল-বিকাল কিছু অযীফাও হুজুরে ক্বলবের সাথে পড়বে। (তা'লীমুদ্দীন ২য় খণ্ড)

এসব পদ্ধতিতে মনোযোগ বসানোর চেষ্টা করার পরেও যদি বাইরের চিন্তা এসে যায় তাহলে নামাযের মধ্যে যখনই খেয়াল হয়, তখনই নিজ ইচ্ছায় অন্তরকে নামাযের মধ্যে নিয়ে আসবে। যতবার খেয়াল হয় ততবার এমন করবে। এর উপর আমল করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ মন স্থীর হয়ে যাবে।

আত্মশুদ্ধি সংক্রান্ত কিতাবাদী

জিজ্ঞাসাঃ আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কি কি কিতাব পাওয়া যায়? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাবঃ চরিত্র সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির মূল উপায় হচ্ছে কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করা। অতঃপর সে বুযুর্গের পরামর্শক্রমে আত্মশুদ্ধি বিষয়ে লেখা কিতাবাদী পড়াও ভাল। আর আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য এবং কামেল পীরের পরিচয় লাভের জন্য এ বিষয়ে লিখিত কিতাবাদী কারো হাতে বাই'আত না হয়েও পড়া যাবে। এক্ষেত্রেও উচিত হল কোন হক্কানী আলেমের পরামর্শ ক্রমে বই নির্বাচন করা। কারণ যদি কিতাবের লেখক ফাসিক বাতিল আকীদায় বিশ্বাসী ও সাহাবা বিদ্বেষী হয় তাহলে তার দিলের অন্ধকারের প্রভাব লেখার মধ্যে পড়বে এবং তা পাঠ করার কারণে পাঠকের দিলেও প্রভাব পড়বে এবং লাভের তুলনায় ক্ষতির আশংকাই বেশি, পক্ষান্তরে যদি কিতাবের লেখক হক্কানী আলেম, আল্লাহওয়ালা হয় তাহলে তার অন্তরের নূরের প্রভাব লেখার মধ্যেও পড়বে এবং এই কিতাব পাঠের দ্বারা

পাঠকের হৃদয় নূরে ভরপুর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অবশ্য এমন কিছু কিতাব আছে যুগ যুগ ধরে যেগুলোর দ্বারা উম্মত উপকৃত হচ্ছে। যেগুলোর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে হক্কানী উলামাদের ঐক্যমত রয়েছে। নিম্নে হক্কানী আলেমগণের লেখা এমন কিছু নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের নাম দেয়া হল।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রহ. এর কিতাব-তবলীগে দীন। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর কিতাব (১) কছদুস সাবীল। (২) তালীমুদ্দীন-২ অংশ। (৩) আত্মার প্রশান্তি। (৪) আশরাফ চরিত। (৫) শরী'আত তরীকত।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. এর কিতাব (১) আত্মশুদ্ধি (২) আল্লাহওয়ালা। মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব দা. বা. এর কিতাব (১) মাজালেসে আবরার (২) তোহফায়ে আবরার (৩) আখেরাতের পাথেয়। আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের দা. বা. কিতাব (১) তাআল্লুক মাআল্লাহ (২) অহংকার ও প্রতিকার (৩) ক্রোধদমন (৪) কুধারনা ও প্রতিকার (৫) কুদৃষ্টি ও অসৎ সম্পর্কের ধ্বংসলীলা ও প্রতিকার। হযরত মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের দা.বা. কিতাব গুনাহ ও তওবা। [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ১:১১]

আলেমগণের জন্যও কি আত্মশুদ্ধি জরুরী?

জিজ্ঞাসাঃ মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের জন্য বাইয়াত হওয়াও কি জরুরী? তারা কি নিজের আত্মশুদ্ধি নিজেই করতে পারে? এসম্পর্কে বিস্তারিত সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে আত্মশুদ্ধি তথা নফসের সংশোধন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। আর আত্মশুদ্ধি বা অন্তরের রোগের চিকিৎসা অতি সূক্ষ্ম বিষয় যা নিজে নিজে করা সম্ভব নয়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন হক্কানী কামিল ব্যক্তিদের স্মরণাপন্ন হয়ে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করা জরুরী।

তাযকিয়া শব্দটিই ..... যা শুধু কর্তা দ্বারা পূর্ণ হয় না। বরং–এর জন্য কর্মও জরুরী। কাজেই এ শব্দটিই প্রমাণ করে যে একজন আত্মশুদ্ধির ডাক্তার এবং একজন আত্মশুদ্ধির রুগী থাকবে। যিনি ডাক্তার হবেন তিনি রুগীর চিকিৎসা করবেন। রুগী কখনো নিজে নিজে চিকিৎসা করতে পারে না।

যদি বড় আলেম হয়ে একা আত্মশুদ্ধি সম্ভব হতো তাহলে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ. মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. মত ব্যক্তিদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এর হাতে নিজেকে সোপর্দ করার কোন প্রয়োজন পড়তো না।

অথচ দুনিয়া সাক্ষ্যি ইলমের সাগর তুল্য এসব আলেম তাদের থেকে বাহ্যিক ভাবে ছোট আলেমের নিকট আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন এবং হাজী সাহেবের সুহবতের বদৌলতে সমগ্র দুনিয়াতে পরিচিত হয়েছেন। এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, হাজী সাহেবের হাতে আত্মশুদ্ধির আগে তাদের এই প্রসিদ্ধি কখনো অর্জিত হয়নি। সুতরাং এটাই বাস্তবতা যে, আলেম যত বড়ই হোক শুধু ইলমের দ্বারা কেউ নিজেও হেদায়াতের উপর কায়েম থাকতে পারেন না এবং দুনিয়াকে আলোকিত করতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আল্লাহওয়ালার সুহবত হাসিল না করেন এটা মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ. যিনি বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব মসনবী শরীফের প্রণেতা তার জীবন আদর্শ থেকে প্রমাণিত যে, হযরত শামসে

তাবরীয রহ. এর হাতে হাত দেয়ার পর তিনি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। আরো পরিষ্কার করে বলতে হয় যারা প্রচুর ইলমের অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু অহংকারের কারণে কোন আল্লাহওয়ালার সুহবত অবলম্বন করেন নাই, তাদের দ্বারা আল্লাহ তা`আলা মাখলূকের হেদায়েতের কাজ নেন নাই বরং তারা পরবর্তীতে বাতিল ফেরকাসমূহের ধারক বাহক হয়েছেন। আল্লাহর পানাহ। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/৮৮, তালীফাতে রশীদিয়া ১৯৬ পৃঃ, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৫৪৫]

কউমী মাদরাসার তালিবে ইলমদের আত্নশুদ্ধিও উস্তাদের যিম্মাদারী

জিজ্ঞাসাঃ পূর্নাঙ্গ কওমী মাদরাসার মধ্যে তালিবে ইলমদের কি কি বিষয় শিক্ষা দেয়া জরুরী। ছাত্রদের আত্নশুদ্ধি উস্তাদের যিম্মাদারি কি-না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ কউমী মাদরাসার পরিচালকগণ মুসলিম জাতির বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহনের কারনে তারা এ মর্মে জাতির নিকট ওয়াদাবদ্ধ যে, তারা জাতিকে খালেস নায়েবে রাসূল তৈরী করে উপহার দিবেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তৈরীর কোন ওয়াদা জাতির সাথে তাদের নাই। সুতরাং হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম যে সিফাতের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করে গেছেন এদিকটা সামনে রাখতে হবে এবং তারই ভিক্তিতে তালিবে ইলমদের তৈরী করতে হবে। দুনিয়াতে তামাম আম্বিয়া কিরাম আ. তিনটি কাজের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (১) আল্লাহ তা`আলা প্রদত্ত দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ (২) তালীম তথা দীনের আহকামের আমলী নমুনা সহ শিক্ষা প্রদান করা,(৩) তাযকিয়া তথা মানবাত্মার পরিশুদ্ধি।

এই একই উদ্দেশ্যেই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাল্লামের আগমন। বর্তমান কওমী মাদরাসার সুত্র রাসূল ﷺ এর মক্কী জীবনে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয় 'দারে আরকাম'-এর সাথে সম্পৃক্ত, কাজেই বর্তমান কওমী মাদরাসাগুলোতেও উক্ত তিনটি বিষয় থাকা অপরিহার্য। অর্থাৎ দ্বীনের আহকাম সমূহের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রশিক্ষণ দেওয়া,এবং পাঠ্য অবস্থায় তাদেরকে স্বীয় আত্মার পরশুদ্ধির প্রতিও যত্নবান করে তুলা আর এই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক আসাতিযায়ে কিরামের। কারণ আসাতিযায়ে কিরাম নবী ﷺ-এর নায়েব। নবী ﷺ যেরূপ সাহাবায়ে কিরামকে উপরোক্ত বিষয় সমূহে পারদর্শী এবং নমুনা রূপে গড়ে তুলেছেন, নায়েবে রাসূল আসাতিযায়ে কিরামকেও হুবহু সেই নমুনার উপর ছাত্রদেরকে গড়ে তুলতে হবে।

তাছাড়া তালিবে ইলমারও যেহেতু ভবিষ্যতে নবী ﷺ এর নায়েব হতে যাচ্ছে সেহেতু তাদেরকেও নবী ﷺ এর যিম্মায় অর্পিত কাজগুলো শিখিয়ে পুরাপরি নায়েবে রাসূল ﷺ বানানোর চেষ্টা করতে হবে। যাতে করে অযোগ্যতা ও অদক্ষতার দরুন কর্মজীবনে তারা দ্বীনের যথাযত খেদমত ও জনগনের তা'লীম-ভবিষ্যতে ব্যর্থ ও অযোগ্য প্রমাণিত না হন।

হাকীমুল উম্মত মজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. থেকে 'আল ইলমু ওয়াল উলামা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হাদীসে এসেছে, ...

এর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদেরকে (উস্তাদ মহোদয়) এ ব্যপারে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তালিবে ইলমের পাশাপাশি আমলে কতটুকু অগ্রগতি অর্জনে যত্নবান ছিলেন । কেননা আপনারা তাদের নেগরান বা যিম্মাদার,আর ছাত্ররা আপনাদের অধীনস্থ। সুতরাং তাদেরকে

শুধু সবক পড়িয়ে ক্ষান্ত হয়ে যাওযা জায়িয হবে না? আর আমলের পরিপক্কতার জন্য আত্মশুদ্ধির তথা ইখলাস, সবর, শোকর এবং রিয়া, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি দূর করা অপরিহার্য। সুতরাং যে মাদরাসায় উল্লেখিত তিন বিষয়ে উস্তাদ ও ছাত্রগণ মেহনত করবে, সেটাই পূর্নাঙ্গ কওমী ও দেওবন্দি মাদরাসা। আর যেখনে এর কোন কোনটা আছে, কোন কোনটা নেই সেটাকে পূর্নাঙ্গ কওমী বা দেওবন্দী মাদরাসা বলা যায় না। [প্রমাণঃ সূরা বাকারা-১২৯, ১৫১, আলে ইমরানঃ ১৬৪, জুমু'আ ৩, তিরমীযী শরীফ ১/২৯৯, আল ইলমু ওয়াল উলামা ১০৫,১২৫,১২৭]

ছাত্রাবস্থায় বাই'আত হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের জন্য বাই'আত হওয়ার অনুমতি আছে কিনা? শুনেছি দেওবন্দের আকাবিরগন (মুরব্বীগন) নাকি ছাত্রাবস্থায় বাই'আত হওয়ার অনুমতি দিতেন না। বাস্তবে কি তাই?

জবাবঃ আত্মশুদ্ধি প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের জন্য ফরয। বিশেষ করে ইলমে দ্বীন অন্বেষণকারীদের জন্য একান্ত জরুরী। আর একথা অনস্বীকার্য যে, নিজে নিজের আত্মশুদ্ধি করা সম্ভব নয়। বরং কোন হক্কানী পীরের সাথে ইসলাহি সম্পর্ক স্থাপন করে অন্তরের রোগের অবস্থা জানিয়ে তার বাতানো পথে চলে আত্মার পরিশুদ্ধি করতে হয়। ইহা অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিষয়। কোন অবস্থায়ই আত্মার চিকিৎসা তার ডাক্তার ছাড়া একা সম্ভব নয়। অপরদিকে শরীরে ক্যানসার এখন আর তার চিকিৎসা হবে কয়েক বছর পরে এটা কোন অবস্থাতেই সঠিক নিয়ম নয়। বরং মারাত্মক ভুল। এতে রোগীই মারা যাবে। এক্ষেত্রে কর্তব্য হল তৎক্ষণাত চিকিৎসা করা।

সুতারং ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ আত্মার পরিশুদ্ধি করতে যত্নবান হতে হবে। এক্ষেত্রে মুনাসেব হলো ইজাযত প্রাপ্ত নিজের কোন

কামেল উস্তাদের নিকট নিজের অবস্থা জানিয়ে তার পরামর্শে চলা। এতে ফায়দা বেশি হয়। তবে নিজের উস্তাদগনের মধ্যে বা সংশ্লিষ্ট মাদরাসার মধ্যে এ ধরনের শাইখ না থাকলে নিকটে অবস্থানরত শাইখের মধ্যে যার প্রতি মনের বেশি আকর্ষণ হয়, তার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করে ইসলাহ শুরু করে দেবে। যদি ফায়দা হতে থাকে ভবিষ্যতে কখনো বাই'আত বা মুরীদ হওয়ার দরখাস্ত করতে পারে। যদিও তা জরুরী নয়।

পীরের প্রদত্ব ওযীফা পালন করতে গেলে লেখা পড়ার ক্ষেত্রে একাগ্রতার স্থলে মন দ্বিমুখী হয়ে পড়ে এবং পড়া লেখায় ক্ষতি থেকে পারে। এ জন্য আকাবিরগন ছাত্রদের আত্নশুদ্ধির ব্যাপারে ইসলাহ করতেন কিন্তু যিকির ও অযীফা দিতেন না।

হ্যাঁ! যারা দরসী ইলম থেকে ফারিগ হয়ে যেত তাদেরকে যিকির-শোগল দিতেন। ছাত্রদের যিকির শোগল না দেওয়ার দরুন অনেকে মনে করেছে যে, ছাত্রদেরকে ইসলাহী সম্পর্কেরই ইজাযত দেয়া হতো না। এটা মূলতঃ মানুষের ভুল ধরনা। কারন একজন ছাত্রের মধ্যে কুদৃষ্টির অভ্যাস, হিংসা, লোভ, অহংকার সহ অনেক রুহানী রোগ থাকে। সে রোগসহ সহীহ ইলম, আমল হাসিল করা সম্ভব নয় সুতরাং এ অবস্থায় যদি তাকে ছাত্রাবস্থায় আত্নশুদ্ধি নিষেধ করা হয়, তাহলে সে কিভাবে বাআমল আলেম ও সহীহ নায়েবে রাসূল হবে? আদৌ তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রত্যেকের ছায়াবস্থায়ই আত্নার রোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য। [প্রমাণঃ মাহমুদিয়া ১৫/৮৮, ৮৯ আল ইলমু ওয়াল উলামা: ১৯১,১৯২]

মহিলাদের জন্য বাই'আত হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ মহিলাদের আত্নশুদ্ধির জন্য আল্লাহওয়ালাদের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা ও বাই'আত হওয়ার হুকুম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাবঃ মানবজাতি তথা নর-নারী নিজের দিলকে দিলের রোগসমূহে হিংসা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে উৎকৃষ্ট গুনসমূহ তথা আল্লাহর ভয়, ধৈর্য্য, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি গুন হাসিল করতঃ আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা ফরযে আইন। দিল থেকে রোগ সমূহ দূর করা তথা আত্মশুদ্ধি করানোও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নবী ﷺ কে প্রেরণের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। আর নবীর অবর্তমানে ওয়ারেসে নবী তথা খাঁটি আল্লাহওয়ালাগণ মানুষকে আত্মশুদ্ধি করানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন।

অতএব নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক করে নিজের আন্তরের রোগের হালাত জানিয়ে তাদের পরামর্শ মত আমল করা নর-নারী সকলের উপর ফরযে আইন। আর হাতে হাত দিয়ে প্রচলিত বাইয়াত হওয়া জরুরী বিষয় নয়। তবে মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয হওয়ার কারনে কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সরাসরি দেখা-সাক্ষৎ করে পরামর্শ নেওয়া মাসআলা জিজ্ঞাস করা জায়িয নাই। মহিলাগন নিজের মাহরাম তথা স্বামী, পিতা, ছেলে ভাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালার কাছ থেকে পরামর্শ নিবেন এবং আত্মার রোগসমূহের কথা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে পরামর্শ নিবে। এক্ষেত্রে ঐ চিঠির মধ্যে স্বামী বা মাহরামের দরস্তখত থাকাও জরুরী। ইচ্ছা করলে আল্লাহওয়ালাগন মহিলাদেরকে মৌখিকভাবে বা দরখাস্তের মধ্যে লেখিতভাবে বাইয়াতও করে নিতে পারেন এবং মুনাসেব মনে করলে পর্দার আড়াল থেকে কাপড় ধরেও বাইয়াত করা জায়িয।

উল্লেখ্য যে, পুরুষের উচিত তার অধীনস্ত মহিলাদের দ্বীনী তারাক্কীর ব্যাপারে ফিকির করা। এমনকি তার ঘরের কাজের লোকদের দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে তাকে হাশরের ময়দানে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই লক্ষ্যে

হক্কানী আলেম ও আল্লাহওয়ালাদের মাসআলা-মাসাইল ও ওয়ায নসীহত থেকে কিতাবাদী তাদের পড়ানোর ও শোনানোর ব্যবস্থাকরা এবং মাঝে মাঝে আলেম উলেমা তথা আল্লাহওয়ালাদেরকে নিজ বাসায় এনে পর্দার আড়াল থেকে মহিলাদেরকে নসীহত শোনানোর ফিকির করা এবং কোন আল্লাহওয়ালার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করিয়ে দেয়া পুরুষদের দায়িত্ব।

এক্ষেত্রে যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে খাঁটি আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করার ব্যাবস্থা না করে বা অনুমতি না দেয় তাহলে সে অন্য মাহরাম তথা বাবা, ভাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহয়ালার সাথে সম্পর্ক করবে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আজীবন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত করে যাবে। [প্রমাণঃ সূরা জুমু'আ-৩, বুখারী শরীফ ১:২০, ২:১০৭১; তিরমিযী শরীফ ১:৩০০, ২:৯৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৫:৯৪ বযলুল মাজহুদ ১৭:৪৯]

যিকির তাহাজ্জুদ ইত্যাদির দ্বারা আত্মশুদ্ধি

জিজ্ঞাসাঃ যিকির তাহাজ্জুদ প্রভৃতি ইবাদতের মাধ্যমে কি আত্মশুদ্ধি হাসিল করা যায়? বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ ফরমান,

অর্থ যে নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করেছে সেই সফলকাম হয়েছে।

আত্মশুদ্ধি আল্লাহ্ ওয়ালাদের সুহবত ও তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ ব্যতীত অর্জিত হয় না। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, বর্তমান যামানায় অধিকাংশ মুসলমানের আমলের যে অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মূল কারন হল আল্লাহওয়ালাদের সুহবত থেকে মাহরূমী। আমি তো (থানভী রহঃ) বর্তমান যমানার সকল মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতকে ফরযে আইন বলে থাকি।

কাবা শরীফ আল্লাহ তা'আলার মুবারক ঘর হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ৩৬০টি মুর্তি হতে পবিত্র রাখতে পারিনি, বরং নবী ﷺ এসে নিজে মূর্তি সরিয়ে কাবা শরীফকে পবিত্র করেছেন।

আগাছা বা নিজে নিজে উৎপন্ন হয় যে সমস্ত গাছ পালা, তা একা একা পরিপাটি, সুশৃংখল হয়ে উঠানো বরং কৃষক সেগুলোকে সুসৃংখল করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি কামেল শাইখের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করে নিজেকে সংশোধন না করায়, সে শুধু কিতাবাদী পড়ে, কামেল শাইখের পরামর্শ বিহীন যিকির আযকার তাহাজ্জুদ ইত্যাদির দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধি করতে পারবে না। নিজেকে শাইখের হাতে সোপর্দ করে তদনুযায়ী নিজেকে না গড়লে নিজের মনমতে যিকির আযকার, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির মাধ্যমে সাওয়াব অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আত্মশুদ্ধি হাসিল হয় না, বরং আত্মা নতুন নতুন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে, এমনকি আত্মারপরিশুদ্ধি না হলে মনমত যিকির শোগলই পরবর্তীতে পথ ভ্রষ্টতার কারন হতে পারে, যেমন, কুরআন শরীফে আলোচিত হয়েছে বণী ঈসরাঈলের জনৈক বুযুর্গের কথা, প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী তার নাম বালআম ইবনে বাউরা, সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ন মারেফত হাসিল করার পরও যখন রৈপিক কামনা বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান গরীমা নৈকট্য এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন থেকে হল। সুতরাং আত্মশুদ্ধি চারা যিকির আযকার করলেও যে সওয়াব হাসিল হয়, রিয়া তাকাববুরের কারনে তার সমস্ত সাওয়াব ধ্বংস হয়ে যায়। পাকস্থলী ঠিক না থাকলে যেমন ডিম, ঘি, বিরিয়ানী-পোলাও স্বাস্থের জন্য উপকারী না হয়ে ক্ষতির কারন হয়। তেমনি আত্মশুদ্ধি ব্যাতীত যিকির, তাহাজ্জুদ অন্তরের ধ্বংসাত্মক রোগ সৃষ্টির কারন হয়ে থাকে, এজন্য আল্লাহওয়ালাগন যিকির আযকারের

তুলনায় মুরীদের অন্তরের রোগের চিকিৎসার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, আর এটাই সঠিক পন্থা। [প্রমাণঃ সূরা আরা'ফ -১৭৫, আল ইলমু ওয়াল উলমা ১৮৫]

শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হাসিল হয় কি?

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহওয়ালার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক না রেখে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে থাকে তথা চিল্লা বা ১সাল লাগায় তাহলে এর দ্বারা তার আত্মশুদ্ধি হাসিল হবে কি না?

জবাবঃ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত করে, মানুষের মধ্যে ঈমান আমল, তায়াক্কুল ইত্যাদি গুনাবলী অর্জন হয়, মুজাহাদা করার যোগ্যতা হাসিল হয়, দ্বীনী কাজ করার জযবা জন্মে, আরও অনেক ফায়দা রয়েছে, তবে এর এই অর্থ নয় যে, তাবলীগী মেহনত করলে দ্বীনের অন্য কোন মেহনত করার প্রয়োজন হবে না, বরং দাওয়াতের মেহনত করার পর যাদের কিরা'আত সহীহ নয় তারা ক্বারী সাহেবদের নিকট গিয়ে সূরা-কিরা'আত সহীহ করে নিবে, উলামা মুফতীদের নিকট গিয়ে মাসাইল জেনে নিবে, এবং আল্লাহওয়ালাদের নিকট যেয়ে আত্মশুদ্ধি করবে, তা হলে তার দ্বীনদারী পরিপূর্ন হবে। তাবলীগের তৃতীয় সিফাত ইলম ও যিকির এবং তাসহীহে নিয়ত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের হিফাযতের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। এর প্রত্যেকটার অবদানও খিদমত ভিন্ন ভিন্ন। এর কোন একটার দ্বারা দ্বীনের সকল লাইনের খিদমত আনজাম দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মসজিদ-মাদরাসা-মক্তব খানকাহ, দাওয়াত, জিহাদ ইরশাদ এ সবই দ্বীনের এক লাইনের মেহনত, এর কোনটাকে বন্ধ করা বা বাদ দেয়া সম্ভব নয়।

প্রচালিত তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজেও হযরত মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহীর খানকাহে থেকে নিজ আত্মার পরিশুদ্ধি করিয়েছেন এবং হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর বিশেষ যে কয়জন মুরুব্বী ছিলেন যথা, হযরত গাংগুহী সাহেব রহ. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., ও হযরত মাওলানা খললী আহমদ সাহরানপূরী রহ., এসকলেই শাইখের দরবারে নিজেকে মিটিয়ে আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন, এর পর আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে চমকিয়েছেন।

তাছাড়া শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. যার লিখিত কিতাবাদীর মাধ্যমে তাবলীগ জামা'আতের এবং মুসলিম মিল্লাতের ব্যাপক ফায়দা হচ্ছে, তিনিও আল্লাহওয়ালাদের দরবারে গিয়ে আত্মার পরিশুদ্ধি করিয়েছেন। আমাদের বাংলাদেশের তাবলীগ জামা'আতের যিনি সর্বপ্রথম আমীর ছিলেন মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয রহ. তিনিও হযরত যাকারিয়া রহ.-এর দরবারে নিজেকে সোপর্দ করে আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন এবং তিনি শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর বিশিষট খলীফাও ছিলেন। শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই যদি আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়ে যেত তাহলে তাবলীগের উপরোল্লেখিত বড় বড় মুরব্বীগনের নিজেদের আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য আল্লাহওয়ালাদের দরবারে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হত না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার ক্ষেত্রে যখন বিভিন্ন দেশ ঘোরা হয় বা কারোর দাওয়াতে প্রচুর লোক আল্লাহর রাস্থায় বের হয়ে পড়ে তখন নিজের মধ্যে আত্মগর্ব বা অহংকার চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা নিজের আমল বরবাদ হওয়ার কারন হয়ে দাড়াতে পারে।

সুতরাং দাওয়াতের পাশাপাশি নিজের আমলের হিফাযতের লক্ষ্যে অন্তরের রোগসমূহেরও সংশোধন করতে হবে, যা আল্লাহওয়ালার

বাতানো পদ্ধতি ছাড়া কোন অবস্থায় সম্ভব নয়। দীর্ঘ ১৪০০ বছর এভাবেই আত্মশুদ্ধির কাজ চলে আসছে। [প্রমাণঃ সূরা আলে ইমরান ১৬৪, মিশকাত শরীফ ২/৪৩৩]

সমাপ্ত